

2

Cur
Aug
15/15

বর্ষ ৭
সংখ্যা ১

বিশ্বায়ন : বিজ্ঞান ও কৌশল

জানুয়ারি-জুন
২০০২

CWK-H05241-2-P36167

ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও আত্মজাগরণ বিষয়ক কণ্ঠস্বর



বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ ॥ শ্রয়ণস্থল ॥ জানুয়ারি-জুন ২০০২

P

বিষয়

বিশ্লেষণ : বিজ্ঞান ও কৌশল

2



২১৮ প্রতিকল্প ॥ ৪৯বি সম্ভ্রমপুত্র ইষ্ট বোড ॥ কলকাতা ৭৫ ॥ দূরত্ব ৪১৬২১০২

ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও আত্মজাগরণ বিষয়ক কৃষ্টিপত্র

P 36,167



বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ ॥ শ্রয়ণস্থল ॥ জানুয়ারি-জুন ২০০২

বিশ্বের শুভ-অশুভ পবিবর্তনকে সহজভাবে অর্থ সন্তোষ অপলাপ না করে সবার কাছে পৌঁছে দেয়াব চেষ্টা করে যাচ্ছি। একই সঙ্গে চাইছি, আমাদের পবিত্রিত বিধে ধরা পদার্থমূলক সেবার কাজ করে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে সবার পরিচয় ঘটতে। এই দুই কাজ করতে করতে শ্রম ছয় বছর পর করল। সাত বছরে প্রবেশ ককর মুহুর্তে বন্ধুসেব দু'একটা কথা জানাতে চাই। প্রথমটি পত্রিকার অর্থিক অবস্থা নিয়ে—এখানে পর্যন্ত আমাদের দুই বছ পত্রিকা খরচের নিঃসৃতাপ বহন করাছেন, বেশদিন এভাবে চালাতে পারলে বলে মনে হয় না এসেবও। সেক্ষেত্রে প্রকাশ, প্রকাশকার মত, সুদৃশ্য ও শানিতরূপে বার করতে হলে আমাদের একটা মহাবৃত্ত ব্যালেন্স তৈরি করতে হবে। আমরা দু'মুজাব থেকে পঁচিশ হাজার টাকার একটা আবেদন রাখছি—কিন্তু দ্যতটায় সক্ষম তিনি সেটাই দেখেন। টাকটি আমরা, যতদিন শ্রম প্রকাশিত হবে, ততদিন বাসব, তার সূদে পত্রিকা চালাব—যেদিন শ্রম প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবে—টাকটি সেবত পঠান, অথবা, তিনি চাইলে, অন্য কোন ক্রিয়াকীল প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেব। প্রথমত মত পত্রিকা বাব করা একটি নিতিত সমাজসেবক কাজ, সেই কাজে এই অর্থ ব্যবহার করতে আপনাদের কি কোন সংশয় আছে? জানাওকেন।

— — —

টাকা Shrayansthal নামে চেকে পাঠাবেন।

শ্রয়ণ — সম্পাদনা গবেষণা

অভিজিৎ চক্রবর্তী, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম রায়,

রূপা দত্ত, শামিম আহমেদ, শুক্রা বসু, সৌরভ ঘোষ

এই সংখ্যা — সহায়তা

অরিন্জিৎ কুমার ও টেকনোগ্রাফি বন্ধুবর্গ, মৃত্তিকা বসু, রুচিরা গঙ্গোপাধ্যায়-ক্রেত

শিল্প সম্পাদনা

শুভাপ্রসন্ন

সম্পাদনা

পাখিক বসু

মুদ্রণ : টেকনোগ্রাফি, ৭ সূতিধর দত্ত লেন, কলকাতা ৬

সদস্যমূল্য : ২ বছর ১০০ টাকা, ৪ বছর ২০০ টাকা

মূল্য : পঁচাত্তর টাকা



২বি প্রতিরূপা ॥ ৪৯বি সন্তোষপুর ইষ্ট রোড ॥ কলকাতা ৭৫ ॥ দূরভাষ ৪১৬২১০২

সম্পাদকীয়

হাত ধরাধরি করে চলেছে বিজ্ঞান প্রযুক্তি রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি, সারা বিশ্ব জুড়ে। এ চেষ্টাটি আজকের নয়, একদিনের নয়, যবে থেকে বিনিময় প্রথা চলতে শুরু করল, ফিরতে হবে মার্কস-ক্যাপিটাল পর্বে—course of true love never did run smooth—এই বাজার ধরা, পণ্য বেচা, মুদ্রাবিনিময়, সাম্রাজ্যবিজ্ঞার এবং বিজ্ঞানপ্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করা, এটি চলছেই। চিন্তকেরা দেখেছেন, পৃথিবীর দাপট বিশ্বায়ন নাম নিয়ে আরো আরো কৌশলে আরো আরো দেশ দখলে নেমেছে, দখলের মূল বিষয়টা আগে যা ছিল তাই রয়েছে আজো—মানুষ এবং প্রকৃতিকে যারপরনাই শোষণ। নানা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চলছে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে অনুমান। ইতিমধ্যে ঘটে গেছে অভাবনীয় এক ঘটনা, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১, আক্রান্ত হয়েছে আমেরিকা। বিশ্বায়ন তথা সাম্রাজ্যগ্রাসের কুৎসিত দিকটা সর্বসমক্ষে চলে এসেছে। মিথ্যা আর অসত্য নিয়ে যে বিশ্বার তাকে চিহ্নিত তো করেছেন মার্কস গান্ধি রবীন্দ্রনাথ—তা আজ সর্বজনের সামনে এসে পড়েছে। ফলটিও মজার—প্রভু নন্দ্র হন নি বরং ক্রুদ্ধ, ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, চলো ধ্বংস করি। আমরা আগেও বলেছি, মৃত্যু খুব সহজ, তাই আজকের ভাবনা হবে মৃত্যুর উর্ধ্বে মনকে রেখে জীবনের কাজ করে চলা। শ্রমণের এবারের নির্মাণ তাহলে কী?

বিশ্বায়নের যুক্তিবিজ্ঞান নিয়েই আমাদের এখনকার গবেষণা অনুসন্ধান। আমরা চারটি পর্বে তাকে সাজিয়েছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস দিয়ে আলোচনা শুরু করেছি। কীভাবে কীভাবে আবিষ্কারগুলো ঘটছে, কাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে, কীভাবে তাদের কাজে লাগানো হচ্ছে—একধরনের জিগজ্যাগ

ভাবে আমরা বলেছি যা থেকে মনস্ক পাঠক বিশ্বায়নের ভূমির পরিচয় পেয়ে যান। এরপর আলোচনাকে বিশেষদিকে নিয়ে যাচ্ছি, যা এখনকার বিজ্ঞানভাবনার কথা—সিস্টেমস্ থিওরি এবং তার অভ্যন্তরীণ যুক্তির পরিচয় নিচ্ছি। আলোচনাটি অতঃপর আরো বিশিষ্ট হয়েছে—বিশ্বায়ন যাকে ছাড়া অচল এবং বিজ্ঞান যা ছাড়া আজ অকেজো—সেই ইন্টারনেট পর্ব, ভাবনাচিন্তার আদানপ্রদান, যদিও তা এক অর্থে সাম্রাজ্যপ্রভুদের দখলে কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাপকতা যেহেতু তার কোষে, তাকে কিভাবে সম্ভাবহার করা যাচ্ছে, কিভাবে প্রতিরোধের বীজ একটু একটু করে প্রাণের বার্তা দিচ্ছে, তার পরিচয় নিলাম। প্রশ্নটা এরপর এই হলো : একদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বায়ন, অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রতিরোধ—কী সত্য কতটা সত্য—আমরা বিচার করলাম। অতঃপর যাচ্ছি অন্য এক ইতিহাস পাঠে। বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ইতিহাস। সেটি শিখতে শিখতে বুঝে নিলাম দ্রুত লাভ করার লোভ কিভাবে সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে, যার অনিবার্য অঙ্ককার দিক হলো সম্ভ্রাস দুর্বৃত্তায়ন—এই জটিল আন্তঃসম্পর্কটি বুঝিবা বোধ্য হলো। প্রশ্ন করলাম বিশ্বায়নের যুক্তিবিজ্ঞান যেমন রয়েছে বিশ্বায়নের পরিচালন কৌশলে তেমন কি কি যুক্তি বা ভাব কাজ করেছে। শিখতে চাইলাম ম্যানেজারিয়াল অ্যাটিটিউড—মার্কিনভাষ্য, জাপানিভাষ্য এবং তাদের সীমাবদ্ধতা (সীমাবদ্ধ হয় বলেই সম্ভ্রাসে ধ্বংসে প্ররোচনা যুগিয়ে তারা নতুন গতি আনে) ; একই সঙ্গে জেনে নিলাম প্রাচ্যভাবধারায় পরিচালন রীতির তত্ত্ব ও তথ্য, সমস্যাসংকুল কিন্তু শুভবুদ্ধি বিলুপ্ত নয় তাতে। শেষ হলো প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্ব শুরু করেছি, আন্তরিক অর্থেই, একজন বিশ্বনাগরিকের নিজস্ব ভাবনা দিয়ে। এরপর বিশ্বায়ন ও সামাজিকতা এই প্রশ্নে সমাজতাত্ত্বিকদের ভাবনাগুলো জানতে চেয়েছি। অতঃপর পা বাড়লাম অভিনব এক দিকে, ভূগোলের দিকে, ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণ ভাবনা পুঁজিপ্রভুদের কতটা ভাবাচ্ছে তার পরিচয় নিলাম। এলাম পরিবেশ ভাবনায়, সাম্রাজ্যবাদ যে বিজ্ঞানে ঘায়েল হতে পারত আজ তাকেই তারা কীভাবে কুক্ষিগত করে নিয়েছে সেটি শিখলাম। দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করলাম : ভূবনীকরণের এই বেগে জীবনযাত্রার মান কি হচ্ছে

ও কী হতে পারে। এবং খাদ্য, যা জীবনীশক্তির যোগানদার, তার কোথায় বণিকিকরণ ঘটছে আর কোথায় সে এখনো সবল প্রত্যাী আমাদের অনুসরণযোগ্য—সেটি চিনে নিলাম। পৰ্বটি অবশেষে সেই মনথারাপ করা প্রদ্বের মুখে এনে দিল। কারা উঠছে এবং কারা উচ্ছেদ হচ্ছে—বিশ্ব এক ছাতার তলায়, কিন্তু ছাতাটি বিশ্ব নয়, বরং বেশ ছোট, ফলে ছাতার তলায় যারা এল, এল, বাইরে তো বহু লোক—অনাবশ্যক অপ্রয়োজনীয় মূল্যহীন, যার ভয়ঙ্কর পরিণাম, উচ্ছেদ, এই পশ্চিমবঙ্গেও, যা ঘটে চলেছে। ঘটবে, কারণ ছাতাটি ছোট, সবার তাতে ঠাই নেই। এই ঠাইহীন মানুষদের মধ্যে যারা কাজ করছেন এমন দরদী বন্ধুর থেকে জানলাম সেই করুণ ঘটনাটি। এবং, এও তো বলার যে আমরা মরতে পারি, হার মানতে পারি না, আমরা এতদসত্ত্বেও ভাবছি বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার কথা, যেখানে ঐ ছাতার বাইরের না-দাম মানুষেরা মানুষের মতই বাঁচতে পারেন। এও বলার যে, ভাবনাটি আঙ্গ শুধু শ্রয়ণে সীমাবদ্ধ নেই, অস্ত্রত একটি রাজ্যকে (পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে) তার স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। যার প্রস্তাব প্রধানত এর মধ্যে কাজ করেছে, শ্রয়ণের গৰ্ব, তিনিই, বিগত সংখ্যাগুলোর মত, এখানে সেই বিকেন্দ্রীকৃত মতটি উপস্থাপিত করেছেন।

যাব তৃতীয় পর্বে। বিশ্বায়ন এবার প্রেক্ষাপটে। ব্যক্তিকে কেন্দ্রে রেখে পরপর বিবেচ্য হবে—আমাদের সম্মানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে, ব্যক্তি সমষ্টির দ্বন্দ্বসম্পর্ক নিয়ে, পরিবার নিয়ে, সম্প্রদায় নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে। সর্বোপরি, ভাবুক সম্প্রদায়ের রিঅ্যাক্ট করার অংশগুলো নিয়ে। এই পর্ব পাঠ করে যদি প্রথম পর্বের প্রথম লেখাটি আরেকবার পড়ি, এরকম ঘুরে ঘুরে পাঠ নির্মাণবিনির্মাণ, আমাদের অবস্থান দায়িত্ব কর্তব্য সংহত করবে, আশা রাখি।

চতুর্থ পর্বে আমরা কয়েকটি দেশের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব বুঝতে চেয়েছি। রাশিয়া বিশ্বায়নকে কীভাবে নিয়েছে জানতে চেয়েছি, অনালোচিত থেকেছে রাশিয়ার মিলিটারি বিজনেস কমপ্লেক্সের দিক, একইভাবে অনুপস্থিত থেকেছে চিনের নবতম দাসতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিবরণ, যা বলেছি তা হলো বিশ্বপণ্য ব্যবসাকে কীভাবে ধরতে চাইছে চিন। আফ্রিকা প্রসঙ্গে একটু অন্যরকম ট্রিটমেন্ট করেছি—সাম্রাজ্যবিস্তারের

কৃষ্ণ

সূচিপত্র

প্রথম

বিজ্ঞানের অভিযুক্ত—বিশ্বায়ন । ১১ । অশোকপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়
বিজ্ঞান, বিশ্বায়ন ও স্ব-সংগঠন । ৬০ । পার্থপ্রতিম রায়
চিন্তার বিশ্বায়ন । ৬৮ । অমিতাভ লাহিড়ী
সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন : বিজ্ঞান ও বিপ্লব । ৮২ । পথিক বসু
বিশ্বায়নের রকমফের—কী এবং কেন । ১০১ । অরুণ মজুমদার
বিশ্বায়ন ও সন্ত্রাসবাদ : এক সংক্ষিপ্ত আন্তঃসম্পর্ক । ১২২ । দুর্বারা রক্ষিক
বিশ্বায়ন ও ম্যানেজমেন্ট : কিছু প্রশ্ন । ১২৮ । বাবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয়

বিশ্বায়ন সম্বন্ধে বিশ্বনাগরিকের কথা । ১৫৯ । সন্দীপ ঠাকুর
সম্ভাব্য সংকটে সমাজ । ১৬২ । আনন্দমোহন কর
বিশ্বায়ন : অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও
ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ । ১৭৪ । স্বতন্ত্রত মুখোপাধ্যায়
বিশ্বায়ন ও পরিবেশ । ২০১ । রবীন মজুমদার
বিশ্বায়ন কি বিশ্বহিতায় । ২১০ । অরুণ মুখোপাধ্যায়
ভূবনীকরণ, জীবনযাত্রার মান । ২২১ । পার্থপ্রতিম মণ্ডল
খাদ্য, অখাদ্য, অনাহার ও বিশ্বায়ন । ২২৯ । সৌরভ ঘোষ
বিশ্বায়ন, উন্নয়ন ও উচ্ছেদ । ২৪৪ । অভিজিৎ গুহ
বিশ্বায়ন বনাম বিকেন্দ্রীকরণ । ২৬৩ । অজিত নারায়ণ বসু

ব্রহ্ম

তৃতীয়

বিশ্বায়ন : বিপ্লব ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তা । ২৮৩ । রণজিৎ চৌধুরী
বিশ্বায়ন ও আমাদের ছেলেমেয়েরা । ২৯০ । সিন্ধা সেন
বিশ্বায়ন, পরিবার ও আমরা । ২৯৩ । পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বায়নের অনুঘর্মে সম্প্রদায়ের প্রাথমিক প্রত্যয় । ৩০৫ । রূপা দত্ত
শিক্ষা ও বিশ্বায়ন : কিছু বিক্ষিপ্ত কথা । ৩১০ । ইয়াবতী মিত্র রহমান
বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা । ৩১৫ । শামিম আহমেদ

চতুর্থ

বিশ্বায়ন ও রাশিয়া । ৩৩১ । সবিতা গুহ
বিশ্বায়ন ও চীন । ৩৩৭ । নারায়ণ সেন
হিপ হুপের মাধ্যমে আফ্রিকার চ্যালেঞ্জ । ৩৫৫ । ক্যাথারিন হেভারসন
অন্ধকার আফগানিস্তান : আলোকিত বিশ্ব । ৩৬০ । মহসীন মখমলবাফ

বিশ্বায়ন : বিজ্ঞান ও কৌশল

বিজ্ঞানের অতিমুখ—বিশ্বায়ন । অশোকপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
বিজ্ঞান, বিশ্বায়ন ও স্ব-সংগঠন । পার্শ্বপ্রতিম রায়
চিন্তার বিশ্বায়ন । অমিতাভ লাহিড়ী
সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন : বিজ্ঞান ও বিপ্লব । পবিত্র বসু
বিশ্বায়নের রকমফের—কী এবং কেন । অরুণ মজুমদার
বিশ্বায়ন ও সম্ভ্রাসবাদ : এক সংক্ষিপ্ত আন্তঃসম্পর্ক । দুর্বারা রফিক
বিশ্বায়ন ও ম্যানেজমেন্ট : কিছু প্রশ্ন । বাবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম

বিজ্ঞানের অভিমুখ—বিশ্বায়ন

অশোকপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়ে গেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আজকের দিনে নতুন লেখা মানেই কিছুটা পুরোনো লেখার সংক্ষিপ্তসার, কিছুটা নিজের দৃষ্টিকোণ আর আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিত।

১

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজকের জিনিষ নয়। মানুষ যেদিন আগুন জ্বালতে শিখল, যেদিন চাকাওয়ালা গাড়ি বানাল, বনের জন্তুকে পোষ মানাল কি গাছগাছালি উদ্ভিদ থেকে রোগ নিরাময়ের রাস্তা খুঁজল তখনই সে বিজ্ঞানের কিছুটা শিখেছে, প্রযুক্তি ত বটেই। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্কতা বা সচেতনভাবে প্রায়ুক্তিক বলতে যা বোঝায় তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে মোটামুটি চতুর্দশ শতক পর্যন্ত, যখন সাধারণ লোকের কাছে এর তত্ত্ব, তথ্য ও প্রযুক্তিগত দিকগুলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কারণ তার আগে এই দিকগুলো সমাজের (বা গোষ্ঠীর) অল্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যেমন গোষ্ঠী বা ট্রাইবে ওঝা বা শামান, নয়ত মঠ মন্দিরের পুরোহিত, যাজক শ্রেণীর মধ্যে।

রেনেসাঁ কথাটা নিয়ে এত কচকচি হয়ে গেছে যে আর চটকাতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু অস্বীকার করাব উপায় নেই ঐ সময় থেকেই একটা যথার্থ পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছিল, প্রথমে ইতালি, পরে অন্যত্র। এর আসল কারণ দ্বাদশ শতাব্দী থেকে চার্চ আর হেলি রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্য ক্রমশ কমে যাওয়া। ছোট ছোট রাজ্যগুলি মাথা চাড়া দিচ্ছে, তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগে আছে। আঞ্চলিক, প্রাদেশিক বিষয় নিয়ে বিতর্ক। ভাষা ভিত্তিক আঞ্চলিক, প্রাদেশিকতা (যার চূড়ান্ত রূপ হলো জাতীয়তাবাদ)। সব মিলিয়ে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোটা আস্তে আস্তে খুলে আসছিল। কিন্তু ব্যাপারটা ত রাতারাতি হবার নয়। যার জন্য চতুর্দশ শতকেব মাঝামাঝি এসে পের্গার্ক তাঁর সময়কে ‘অন্ধকার যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন। অথচ পরিবর্তনের সূচনা এসেছে অনেক আগেই। রোজার বেকন এক শতক আগেই তাঁর (অ্যাল) কেমিকাল এস্ট্রপেরিমেন্টগুলি কবে গেছেন। আরও শ’দেড়েক বছর আগে, দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই পিটার আবেলার্ড খোলাখুলি চার্চের বিরোধিতা করেন। পাবে অবশ্য তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। বেকনের কিছু পরে দাস্তুর লেখাতেও, মধ্যযুগীয় থীমেব মধ্যেই, পাই আধুনিকতার ছোঁয়া। ত্রয়োদশ শতকের শেষে মার্কো পোলোর কাছে লোকে শুনতে পেল তাঁর প্রাচ্য ভ্রমণের অদ্ভুত গল্প।

অর্থাৎ জমি ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল নতুন ফসলের জন্য। যার জন্য ইতালিতে ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতকের প্রথম দিককে প্রাক-রেনেসাঁ যুগ বলা হয়েছে। জিন্তো, চিমাবু, দাস্তে, পেত্রার্ক, বোকাচিও সকলেই এই যুগের। সেন্ট ফ্রান্সিসের সরল আর প্রকৃতির কাছে থাকার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সহজ সরল থিম আর মানবিকতা এই সময়ের সমৃদ্ধ কাজে দেখা যায়।

১৩৪৮ এর ভয়াবহ প্লেগে ইউরোপের এক চতুর্থাংশ লোক মারা যায়। তারপর লড়াই ত লেগেই ছিল। পঞ্চদশ শতক থেকে আবার অন্ধন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, রচনা সবেতেই পুনরুত্থান ঘটে। প্রথম দিকের নামগুলি (যেমন ম্যাসাচিও, পিয়ের দেলা ফ্রানচেস্কা) পাই ফ্লোরেন্স থেকে, কারণ ওখানকার ধনী ব্যবসায়ীরা (যেমন মেদিচি পরিবার, পরে ক্ষমতায় এসে, বিভিন্ন রাজপরিবারে বিয়ে দিয়ে এবং বেশ কয়েকজন পোপের আসনে বসে এঁদের আরও নামডাক হয়) শিল্পী, ভাস্কর, স্থপতিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম দিকের ছবিতে ডিটেল আর প্রতীকের ব্যবহার বেশি। তেলরঙের বেশি ব্যবহার চালু হলো পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে। তখন থেকেই রেনেসাঁর জয়জয়কার। দা ভিকি, মিকেলান্জেলো, রাফায়েল। দা ভিকি পাক্সা রেনেসাঁর নাগরিক—ছবি আঁকছেন, মূর্তি গড়ছেন, বাড়ির ডিজাইন, ওড়বার যন্ত্র, গাড়ির মাইল মিটার উদ্ভাবন করছেন, আবার শব্দব্যবচ্ছেদ করে মাংসপেশীর ড্রইং রাখছেন যাতে আঁকা ছবি বা মূর্তিতে গলদ না থাকে। তাঁর নোটবইগুলো এখনও বিশ্বয় উদ্বেক করে। সেদিক থেকে ছবি আঁকার তাঁর সময় কোথায়? অল্প কয়েকটি যা এঁকেছিলেন তাই তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। মিকেলান্জেলো শুধুমাত্র তাঁর ক্ষমতার জোরে বিশাল বিশাল কাজ করে গেলেন। রাফায়েল, বেশি মাত্রায় ক্লাসিসিস্ট, ভ্যাটিকানেই ছবি আঁকছিলেন যখন মিকেলান্জেলো সিস্টিন চ্যাপেল চিত্রিত করছেন।

ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিক সেন্ট পিটারের ডিজাইন হলো। ১৫২৭ সালে রোমের পতন। উত্তর ইতালি ও অন্যত্র শিল্পীদের কাজ অব্যাহত। তেলরং এসে যাওয়ায় উত্তরের শিল্পীদের সুবিধা হলো, কারণ স্নাতস্যাতে আবহাওয়ায় ফ্রেস্কোর কাজ ভাল ধরত না। ভেনিসের বেলিনি, কোরেগ্নিও, টিশিয়ান, তিনতোরেস্তো, ভেরোনিজ—সবেতে ইন্ডিয়ানডুতির প্রাধান্য। কিছু আগে অবশ্য ড্যারার জার্মানি থেকে ভেনিসে এসেই আঁকা শিখে সম্পূর্ণ অন্য স্টাইলে ছবি এঁকেছেন। কিন্তু মাঝ রেনেসাঁর পারস্পেকটিভ আর অ্যানাটমি থেকে পরের দিকের ছবিগুলি বেশি স্টাইলনির্ভর হয়ে পড়ল।

এখন, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির আলোচনার শুরুতেই রেনেসাঁ শিল্পের এরকম শিবের গীত গাইবার মানে কী? একটা উত্তর সহজে দেওয়া যায় যে ছবি আঁকাটাই তখন কয়েকজনের কাছে বিজ্ঞানচর্চার অঙ্গ ছিল, যেমন দা ভিকি। অথবা ভাস্করের মধ্যে তাঁর স্নায়ুর কাজে অধীত বিদ্যা কাজে লাগিয়েছিলেন ঘিবার্টি। ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকো বা তিনতোরেস্তো তাঁদের ছবিতে পারস্পেকটিভ বা আলোর ব্যবহার মনে হয় বৈজ্ঞানিকভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রয়োগ আটে আরও

প্রকটভাবে দেখা যাবে ইমপ্রেশনিজমের সময়। এ বিষয় পরে আলোচ্য।) কিন্তু আরও মূলগত ঐক্য আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসে সাধারণত বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদদের কথাই থাকে। বাকিরা সেখানে গৌণ। বর্তমান লেখকের মতে এরকম চিন্তা সঠিক নয়। বিজ্ঞান যেহেতু মানুষই চর্চা করে এবং যেহেতু সমাজবদ্ধ মানুষকে বাদ দিয়ে কি বিজ্ঞানী কি অন্য বস্তির লোকের কথা—ব্যতিক্রমী হিসাব ছাড়া—ভাবা যায় না, তাই বিজ্ঞানের/বিজ্ঞানীর সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন সমাজ ও ব্যক্তিবৃন্দের আলোচনায় এসে পড়া অবশ্যস্বাভাবিক।

রেনেসাঁর প্রবলতম প্রকাশ আর্টে। তাই ঐ সময়ের কথা বললে আর্টের কথাই আগে আসতে বাধ্য। কিন্তু সেটাই একমাত্র বিষয় নয়। সামন্ততান্ত্রিক শাসন কাজ করে কোনও অর্থরিটির কাছে নিঃশর্ত সমর্পণে। রেনেসাঁর সময় মানবিকতা আর যুক্তি অনেক বেশি গুরুত্ব পেল। প্রাক্ রেনেসাঁ যুগেই পিটার অ্যাবেলার্ড ন্যায়াশাস্ত্র বা লজিকের অধ্যাপক হিসাবে বিশেষ নাম করেছিলেন। লজিকের সাহায্যেই তিনি চার্চের অর্থরিটির বিরোধিতা করেন। সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস আবার যুক্তিব ভিত্তিতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে চেষ্টািত হন। এঁদের যোগ্য উত্তরসূরী ইরাসমাস, যিনি মার্টিন লুথার বা পোপ দশম লিও উভয়পক্ষ থেকেই সমান দূরে ছিলেন। অথবা তাঁর বন্ধু টমাস মুর, ইউটোপিয়ার লেখক, যিনি মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন না।

কিন্তু রীজন বা যুক্তি সত্যি কথা বলতে রেনেসাঁর যথার্থ পরিচায়ক নয়। রেনেসাঁর পরিচয় তার প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে, আতিশয্যে এমনকি উচ্ছৃঙ্খলতায়। মানুষ আর সমাজব্যবস্থায় আগ্রহ, প্রাকৃতিক রহস্য উন্মোচনে চেষ্টা, দেশভ্রমণের নেশা, সব মিলিয়ে আবিষ্কারের উন্মাদনা, কিছু করার ইচ্ছা—এটাই বোধহয় ঐ সময়ের লক্ষণ। যুক্তি সপক্ষে থাকলে ভাল, না হলে নিজের সমর্থনে যুক্তি খুঁজে নেওয়া এটাও ছিল। মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতকে, কলম্বাস পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ম্যাগেলান পঞ্চদশ-ষোড়শ, ডি স্টো ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগ, ওয়াল্টার র্যালি আরও অর্ধ শতাব্দী পরের লোক। এই সময়ে আরও কতকগুলি নাম করা যায় যাদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার আর লুণ্ঠতরাজের নেশা সমানভাবে ছিল মনে হয়—কোর্টেজে যিনি মেক্সিকো লুণ্ঠ করেন আর পিচ্চারো যিনি ধ্বংস করেন পেরুর ইনকা সভ্যতা। নিছক জলদস্যুরা, যেমন হেনরি মর্গান আবেকটু পরের লোক।

সুতরাং লোরেন্সো দ্য ম্যাগনিফিশিয়েন্টও এই সময়ের লোক আর অত্যাচারী সিজার বোর্জিয়াও (ম্যাকিয়াভেলির প্রিন্সের মডেল)। মাঝামাঝি অবস্থানে রাখা যায় অষ্টম হেনরীকে। এমনিতে শিল্পী ভাস্কর, লেখক ও গুণীজনের আদর করেন, আবার দরকার পড়লে নিজের শ্রদ্ধার পাত্র টমাস মুরকে মিথ্যা অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধে না। নিজের স্ত্রীদের কী করেছিলেন তা ত বলাই বাহ্য। তারজন্যই বোধহয় অষ্টম হেনরী একজন টিপিকাল রেনেসাঁর প্রতীক, যেমন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

ঐ সময় থেকেই বৃজ্জোয়া, নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে গুণীদের কদর শুরু হলো তাদের পিতৃ পরিচয়, কুল ও আর্থিক অবস্থার বিচার ছাড়াই। তাই ইতালিতে সাধারণ

অবস্থা থেকে একজন মিকেলাঞ্জেলো, সেলিনি বা দা ভিঞ্চি হতে পারতেন। ইংল্যাণ্ডে লর্ড বেকন, সার ওয়াল্টার র্যালের সঙ্গে জনপ্রিয়তায় পাল্লা দিতে পারতেন অজ্ঞাত পরিচয় উইলিয়াম শেক্সপিয়ার।

এই অবস্থায় ধারণা করতে হবে দা ভিঞ্চি, কোপার্নিকাস প্রভৃতির কাজ এবং তা সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে কীরকম সম্পর্ক তৈরি করেছিল। মনে রাখতে হবে তার আগের হাজার বছরের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন, বিজ্ঞান, সমাজ সবক্ষেত্রে চার্চের অনুশাসন। ঐ সময়ে বিজ্ঞানচর্চা, প্রধানত রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ ও গণিতচর্চা ইউরোপের বাইরে হয়েছিল। এ ব্যাপারে ইসলামী দেশগুলোর কথা আমরা জানি বা পড়ি। অন্য দেশ, বিশেষত চীন, সম্বন্ধে আমরা বিশেষ জানি না।

এই সমস্ত কিছুর মধ্যে, এই পরিবেশে দা ভিঞ্চি, কোপার্নিকাস, ভেসালিয়াস প্রথমে এলেন। দা ভিঞ্চির বিজ্ঞান চর্চা, মাংসপেশির ড্রইং ছাড়া মূলত ফলিত বলবিদ্যা ও যন্ত্র সঙ্কল্পীয়। ডাচ ভেসালিয়াস শব্দব্যবচ্ছেদকারী হিসেবেই খ্যাত। কোপার্নিকাসের উত্তরসূরী হিসাবে টাইকো ব্রাহে, গ্যালিলিও, কেপলার, দেকার্ত, যার শেষ পরিনতি নিউটন (ও লাইবনিৎস)। ভেসালিয়াসের উত্তরসূরীদের মধ্যে সমকালীন সার্জন পারে, ল্যাক্সারো স্প্যালানজানি প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু ষোড়শ শতকে চিকিৎসাশাস্ত্রে সবচেয়ে বড় কাজ হলো শরীরে রক্তের চলাচল বুঝতে পারা। সে কাজটা করেন উইলিয়াম হার্ভে ইংল্যাণ্ডে। স্টিফেন হেলস প্রথম রক্তচাপ মাপেন ১৭২৬ নাগাদ। স্প্যালানজানি, লিনেক (স্টেথোস্কোপ উদ্ভাবন ১৮১৯) অষ্টাদশ শতকের শেষের লোক। বাকিরা, অর্থাৎ ইগনাজ সেমেলভাইস, হেল্মহোল্জ, কথু, পাস্তুর প্রভৃতি সকলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর।

আবার পঞ্চদশ শতকে ফিরে যাওয়া যাক। ম্যাকিয়াভেলি আর গুরু নানকের জন্ম এক সালে (১৪৬৯)। কলম্বাস জন্মেছেন ২৩ বছর আগে, দা ভিঞ্চি ১৭ বছর, ইরাসমাস ৩ বছর আগে। কোপার্নিকাস জন্মান ৪ বছর পরে, মিকেলাঞ্জেলো ৬ বছর আর মার্টিন লুথার ১৪ বছর পরে। অষ্টম হেনরি যে বছর জন্মান তার পরের বছর অক্টোবর মাসে কলম্বাস অতলান্তিক মহাসাগর পার হয়ে “পশ্চিম ভারতে” (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) পৌঁছন। আরও ষাট বছর পরে এলিজাবেথ ইংল্যাণ্ডের রানি হবেন। টাইকো ব্রাহে, সার ওয়াল্টার র্যাল, ফ্রান্সিস বেকন ও গ্যালিলিও এলিজাবেথের থেকে যথাক্রমে ১৩ বছর, ১৯ বছর, ২৮ বছর ও ৩১ বছরের ছোট (হিসাব একটু এদিক ওদিক হতে পারে, তবে এক বছরের মধ্যে)। সবাই জানেন, গ্যালিলিও যে বছর মারা যান, নিউটন জন্মগ্রহণ করেন সে বছর। কিন্তু কজন জানেন গ্যালিলিও, শেক্সপিয়ার আর ক্রিস্টোফার মার্লো একই বছর (১৫৬৪) জন্মান? তখন দিল্লিতে আকবর, চিনে মিং শাসনে কারিগরেরা অভ্যাসচর্চা সব পোসেলিনের জিনিস বানাতেন। আবার নিউটনের জন্মের দশ বছর আগে একই বছরে স্পিনোজা, লিউয়েনহুক আর দার্শনিক লকের জন্ম। কুখ্যাত জলদস্যু (বুকনিয়ার বলা হতো) হেনরি মর্গান ও চতুর্দশ লুই কবছর পরে। তারপর নিউটন, লাইবনিৎস, জেকব বার্নোলি।

২

নিউটন আর লাইবনিৎস চার বছরের বড় ছোট। এঁদের মধ্যে প্রফেশনাল হিংসা, ঝগড়া একসময় চরম আকার ধারণ করে। দুজনেই প্রায় এক সময়ে ক্যালকুলাস উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ইউরোপে লাইবনিৎসের নোটেসন চালু হলেও স্বেচ্ছ নিউটনের বিরোধিতার জন্যে ইংল্যান্ডে তা চালু হতে কয়েক দশক লেগে যায়। শেষ অবধি লাইবনিৎসের নোটেসনই চালু রইল, নিউটনের নয়। অবশ্য নিউটন বিজ্ঞানচর্চাই করেছেন সারাজীবন (টাকশালের অধিকর্তা থাকলেও)। সেই তুলনায় লাইবনিৎস কেবল রাজনীতিকদের, ক্ষমতার কাছে থাকতে চাইতেন। প্রত্যাশিতভাবেই, শেষ জীবনে অপমানিত, প্রত্যাখ্যাত হয়ে মারা যান লাইবনিৎস। শুধু তাই নয়, নিউটন (ও অন্য বিজ্ঞানের দিকপালরা) যে সকলেই আদর্শ মানুষ ছিলেন এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। বর্তমানে নিউটনের চেয়ারে অধিষ্ঠিত এবং বিশ্ব পরিচিত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার এক দশকের ওপর আগে লেখা বইতে নিউটনকে নিয়ে কটাক্ষ করে গেছেন।

আসলে ইতিহাসচর্চার একটা বিপদ আছে। সাথে কি এলিয়ট লিখেছিলেন—

...Think now

History has many cunning passages, contrived corridors

And issues, deceives with whispering ambitions,

Guides as by vanities,...

তাই যখন বার্নাল তাঁর “ইতিহাসে বিজ্ঞান” বইতে লেখেন বিপ্লবী বিজ্ঞানের প্রথম পর্বে দা ভিক্সি, ভেসালিয়াস আর কোপার্নিকাস পুরানো ক্ষমতার কবল থেকে মানুষ আর পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন, তার অল্প পরে দ্বিতীয় খেপে বেকন, গ্যালিলিও, দেকার্ত থেকে নিউটন পর্যন্ত এসে যান্ত্রিক বলবিদ্যার মডেল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাখ্যা করল, তৃতীয় পর্বে শিল্প পণ্য উৎপাদনকারী বৃটেন ও বিপ্লবী প্যারিস মিলে দুনিয়ার কাছে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হাজির করল, তখন মনে হয় ‘সত্যিই ত’। আসলে “কালো কালো অক্ষর চোখ পাকাইয়া থাকে যেন সক্রোটস কিংবা গৌতম বুদ্ধের চোখ, সত্য ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।” বার্নাল দাবি করেন তার পরেকার পর্ব, অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানের চতুর্থ পদক্ষেপ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত চলেছে এবং তার অবধারিত ফল সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞান।

বস্তুত কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, টাইকো ব্রাহে ত বটেই, কেপলার এমনকি নিউটন পর্যন্ত যে পুরোপুরি তাদের পূর্বসূরীদের ধারণা উল্টে দিতে পারেননি তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গ্যালিলিও বস্তুর বাধাহীন পতন নিয়ে কোনওদিন পিসার হেলানো টাওয়ার থেকে পরীক্ষা করেননি, আরও সহজ, আরও সুন্দর পরীক্ষা করেছিলেন ঢালু বা আনত তল দিয়ে বল গড়িয়ে। দোলক নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন বা দেখেছিলেন বলা ভাল গির্জায় ঝুলন্ত লন্ঠনের দোলন দেখে। তিনিও অনন্ত অবকাশ কল্পনা করতে পারেননি, টেলেমি, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের ধারায় বিশ্বকে সসীম ধরে নিয়েছিলেন। কেপলারের সূত্র থেকেই (ও গ্যালিলিও প্রভৃতির পথ ধরেই) নিউটন তাঁর সূত্রগুলি রচনা করেন। তিনি কিন্তু অনন্ত

অবকাশকে ধারণার মধ্যে আনতে পেরেছিলেন, যেমন কোন সমগতিতে চলমান বস্তু কোনও বাইরের বল থেকে বাধা না পেলে যতদূর যেতে পারে এটা ধারণা করে। সেই নিউটনই যখন আলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন তখন সেই চিন্তাতে ঐশ্বরিক প্রক্ষেপ দেখা যায়।

রোজার বেকনের নাম অ্যালকেমিস্ট হিসাবে হলেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে আসতে পারে। তিনি হাতে কলমে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে যাঁর নাম থাকে, বিশেষ করে গ্যালিলিওর সমকালীন হিসাবে, তিনি ফ্রান্সিস বেকন। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, ভাল লেখাপড়ার সুযোগ পান। তাঁর প্রধান কাজ হলো পুরোনো লেখা নিয়ে, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের লজিক, নতুন করে উপস্থাপন করা। নতুন বোতলে পুরাতন পানীয়। তাহলে প্রশ্ন আসে বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইনি স্মরণীয় কেন?

আসলে বিজ্ঞানের চলন নিয়েই বহুদিন পর্যন্ত লোকের ধারণা ছিল সমাজের মত এখানেও অগ্রগতি হয় একমুখী। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কি জীবনযাত্রা, কি সমাজের অন্যান্য দিক—যার মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা রয়েছে—ক্রমশ উন্নত হয়। এই ধারণা মূলত আলোকপ্রাপ্তির যুগের (এজ্ অফ এনলাইটেন্মেন্ট)। ঐ সময়েই অর্থাৎ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে যুক্তি প্রাধান্য পেল। বেকন (ও আরও কয়েকজন) হৃদয়বস্তার ওপরে যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাই তাঁরা স্মরণীয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের চলন বা বিজ্ঞানের ইতিহাসের দর্শন একটু আলোচিত হোক।

৩

আগের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে আসা যাক টমাস কুনের “বিজ্ঞান বিপ্লবের কাঠামো”য় (স্ট্রাকচার অফ সায়েন্টিফিক রিভলিউশন্স)। আরও আগে কয়রে প্রমুখ ঐতিহাসিকদের কাজের, যেখানে কোনও বিশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেমন অক্সিজেন গ্যাসের আবিষ্কারের সঠিক সময় নির্ণয় করতে ঐ ঐতিহাসিকদের ব্যর্থতা উল্লেখ করে কুন বলছেন বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয় দুভাবে। সাধারণ অবস্থায় বিজ্ঞানীরা কোনও বিশেষ ভাবাদর্শ (ওয়ার্ল্ড ভিউ) মেনে নিয়ে তার পরিসীমার মধ্যে কাজ করেন। ঐ আদর্শের ভিত্তি নিয়ে কখনও প্রশ্ন ওঠে না। বহু পরীক্ষায় বহুদিন ধরে ঐ আদর্শগত তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষিত তথ্যের গরমিল জন্মতে থাকে। একটা সময় আসে যখন গরমিলের সংখ্যা আর চাপা দিয়ে রাখা যায় না। তখন শুরু হয় অসাধারণ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের বিপ্লব। একাধিক মত বা আদর্শ ঐ সময়ে উঠে আসে গরমিলগুলির উত্তর দেবার তাগিদে। তাদের মধ্যে কোনও একটি গৃহীত হয়, অন্যগুলি চাপা পড়ে যায়। আবার বেশ কিছুদিন ধরে সকলে ঐ মত মেনে নিয়ে কাজ করতে থাকেন। কুন নিজে ঠিক করে বলেননি কেন, কীভাবে এক মত গৃহীত হয়, অন্য মত নয়। পরে অন্য চিন্তাবিদরা এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে সামাজিক পরিবর্তনের মার্ক্সীয় তত্ত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ব্যাপারে কুনের আলোচনার মিল লক্ষণীয়।

যাইহোক, আমাদের বিজ্ঞানের আলোচ্য সময়ের পদার্থবিদ্যার পরিবর্তনের নাম কুন দিয়েছেন কোপার্নিকান রিভলিউশন বা কোপার্নিকীয় বিপ্লব। এটাই বোধহয় বিজ্ঞানের জগতে রেনেসাঁর সবচেয়ে বড় দান। এর চরম আকার নিউটনে, যদিও সব মিলিয়ে সমস্ত অসঙ্গতি বাদ দিয়ে সর্বজনগ্রাহ্য, এবং বর্তমান কালে পঠিত, আকারের এই যান্ত্রিক বস্তুবাদেব জন্য আমাদের আরও দু'শ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এর প্রভাবেই নিউটনেব একশ বছর পরে লাপ্লাস বলেন, “আমাকে বর্তমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি কণার অবস্থান ও ভরবেগ দিলে আমি অতীত তথা ভবিষ্যৎ নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারি।” এই বিশ্ব থেকে ঈশ্বর সম্পূর্ণ বিতাড়িত হন নি। তিনি একজন মহান ঘড়িওয়ালা মাত্র। বড় বড় ঘড়ি যেমন বহু যন্ত্রাংশের সৃষ্টি সমন্বয়ে আমাদের সঠিক সময় জানিয়ে চলে, ঈশ্বরও তেমনি নিউটনের বলবিদ্যার সূত্রগুলির মারফৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—যা কিনা বহুসংখ্যক পদার্থকণার সমষ্টিমাত্র—সঠিকভাবে চালনা করেন।

এর মধ্যে পদার্থবিদ্যা ছাড়া প্রধানত চিকিৎসাবিদ্যা শুরু হয়েছিল। বিশেষ কবে অ্যানাটমি'ব চর্চা। ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে ফরাসি দেশে পারি ও আরও উত্তরে ভেসালিয়াসের শব্দব্যবচ্ছেদ সহ লেকচার যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। ষোড়শ শতকের শেষদিকে এলেন উইলিয়াম হার্ভে। পরের শতাব্দীর প্রথমে তিনি শরীরে রক্ত সঞ্চালনের প্রক্রিয়া সঠিক জানলেন ও সকলকে জানালেন। ঐ শতাব্দীতে লিউয়েনহুক প্রভৃতির অনুবীক্ষণের সাহায্যে প্রথম প্রোটোজোয়া জাতীয় প্রাণী দেখতে পেলেন। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে কিন্তু এনলাইটেনমেন্টের সময়। নিউটনের জন্মের দুবছর পরে চিনে মিংদের হটিয়ে যুদ্ধপ্রিয় মাঞ্চু উপজাতি ক্ষমতা দখল করল। নিউটনের জন্মের বিশ বছরের মাথায় বৃটেন রয়্যাল সোসাইটির (ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অভ সায়েন্স) প্রতিষ্ঠা। ১৬২০ সালে মেগ্নাওয়ার জাহাজে করে ‘তীর্থযাত্রী পিতাদের’ (পিলগ্রিম ফাদার্স) প্রিমাথ বন্দর ছেড়ে উত্তর আমেরিকায় আগমন। এবপর থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে, প্রথমে রাজনীতি, বাণিজ্য ও পরে শিল্প বিজ্ঞানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করতেই হবে। তবে এখনও ঘটনার ক্ষেত্র ইউরোপ। সেখানে রেনেসাঁর যুগের অবসান হয়েছে বলা চলে, তার রেশটা কেবল থেকে গেছে নানা ভাবে। অষ্টাদশ শতকের আগেই চার্চের শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছিল। প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সুসমাচারবাদীরা কোনওরকম চার্চের গঠন ছাড়াই খৃষ্টধর্ম মানতে চান। কেলভিনপন্থী, লুথারপন্থী ও ইংরেজ চার্চের মতাবলম্বীদের (অ্যাংলিকান) মধ্য থেকে সুসমাচারবাদী, অ্যানাবাপটিস্ট (যাঁরা শিশুর বদলে বড়দের পবিত্র জল দিয়ে দীক্ষাদান করতেন), পিউরিটান ও মেথডিস্টদের উদ্ভব হলো। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসি দেশে রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে ইউজেনো (হিউজেনট) প্রটেস্ট্যান্টদের যে বহু বছর ব্যাপী যুদ্ধ চলে তার সমাপ্তি হয় ১৬৯৪ সালে পাণ্ডের অনুশাসনে। শেষোক্তদের ইংলণ্ডে অত্যাচারের ফলেই মেগ্নাওয়ার জাহাজের সেই বিখ্যাত যাত্রা ১৬২০ সালে—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (খৃষ্টধর্মী) অধিবাসীরা যাদের থেকে নিজেদের বংশ পরম্পরা দেখাতে পারলে বিশেষ গর্ববোধ করেন। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে

মার্টিন লুথার ডাইনি ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতেন, যেমন পরের শতকের প্রটেষ্ট্যান্ট কবি মিল্টন বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীকেন্দ্রিক সৌরজগতে (কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও এমনকি কেপলারের চেয়ে ছোট, ইনি আবার গ্যালিলিওর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন)।

এইরকম এক ধন্দময় বহুমুখীনতার সামনে আসতেই হয় ইতিহাসচর্চার সময়। অথচ যে আলোকময় যুগের কথা আমরা আলোচনা করছি, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের সবচেয়ে বড় উদ্ভাবনিকার হলো ইতিহাসের একমুখী গতিতে বিশ্বাস। ১৬০১ সালে টাইকো ব্রাহের মৃত্যু হয়। গ্যালিলিওর তখন মধ্যবয়স আসেনি। হব্‌স্‌, (ভবিষ্যৎ কার্ডিনাল) রিনালু তখন টিন এজার, দেকার্ত কয়েক বছর আগে জন্মেছেন। এই আরেকজন, যিনি পরবর্তী চিন্তাধারাকে বহুদিন প্রভাবিত করে রেখেছিলেন। শুধুমাত্র অস্ত্রবিচার দিয়ে মানস গঠন সম্বন্ধে ধারণাতেও ইনি পথিকৃৎ, সম্পূর্ণ লজিকালভাবে ব্যক্তিকে নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানের মত চিন্তা করে সমাজচিন্তার পথিকৃৎ যেমন হব্‌স্‌, বা অন্য দিক থেকে মনোবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেছিলেন যেমন লক আরও কিছুদিন পরে। পণ্ডিত, শিক্ষক, চিন্তাবিদ, লেখক, অঙ্কবিদ (কার্তেসিয় বা কোঅর্ডিনেট জ্যামিতি ত আজ স্কুলে পড়ানো হচ্ছে), প্রাফেশনাল যোদ্ধা, তলোয়ারবাজ দেকার্ত। ইনিই বলতে পারেন “ঘুম ভাঙার পর প্রত্যেক মানুষের অন্তরত ঘণ্টাখানেক বিছানায় শুয়ে থাকা উচিত; তাতে চিন্তার সময় পাওয়া যায়।”

লেস তৈরির সঙ্গে সঙ্গে সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে গ্যালিলিও যেমন মহাকাশের রহস্য উন্মোচনে আবিষ্ট হয়েছিলেন, ঐ শতকেব শেষ দিকে তেমনই ডাচ প্রকৃতিবিদ লিউয়েনহুক অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করে প্রথম ব্যাকটেরিয়া দেখলেন। তিনি ওদের ছোট্ট জন্তু বলে অভিহিত করেছেন। এই ধরনের জীব ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের এক নতুন ধারা খুলে দেবে। অষ্টাদশ শতকের ল্যাজারো স্প্যালানজানি, লিনেক প্রভৃতি এই ধারায় কাজ করে গেলেন, ঊনবিংশ শতকে যে ধারার কাজে বিস্ফোবণ ঘটল যেন।

৪

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকেই পদার্থবিদ্যা আর রসায়ন আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট রাস্তায় চলছিল। ডালটনের পরমাণু তত্ত্ব, প্রথম পারমাণবিক গুরুত্বের সারণি ইত্যাদি ঠিক এই সময়েই না হলেও অল্প পরেকার ঘটনা। লাভোয়্যাসিয়ে তার কিছু আগে। উনি আবার ঠিকমত ওজন করে রাসায়নিক বিক্রিয়া চালানোর ওপর জোর দেন। রসায়নের ইংবাজি প্রতিশব্দ কেমিস্ট্রি। এটা কোথা থেকে এল তা পরিষ্কার নয়। কেউ বলেন মিশরীয়দের নিজের দেশের নাম (খিম=কালো জমির দেশ) থেকে, কেউ বলেন গাছপালা থেকে রস বাব করার গ্রিক প্রতিশব্দ থেকে, কেউ আবার বলেন ঢালাই করার গ্রিক শব্দ থেকে কথটা এসেছে। এটা কিন্তু সবাই স্বীকার করেন যে আলকিমিয়া ব্যাপারটা (নাম শুদ্ধ) আরবরাই চর্চা করতেন সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। কিন্তু সেখানেও সোনার বিশেষ প্রাধান্য পাওয়া খুব সম্ভবত চিনাদের কাছ থেকেই আরবদের কাছে এসেছিল। মূলত ধর্মযুদ্ধের (ক্রুসেড) জন্যেই এই বিদ্যা আরবদের থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে, লাতিন

ভাষায় অনুদিত হয়ে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকেই ইউরোপের নামকরা আলকেমি বিশারদের নাম জানা যায়, তাদের খোঁজা পরশ পাথর বা প্রক্রিয়া যা কোনও ধাতুকে সোনার পরিণত করতে পারে এ নিয়ে গল্পকথা শুরু হয়। রোজার বেকন বোধহয় এই ধারার শেষ বড় কারিগর। তাঁর কাজের মধ্যে ম্যাজিক আর বিজ্ঞান সম পরিমাণে যেন মিশে আছে।

তারপর পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পদার্থবিদ তথা জ্যোতির্বিদদের প্রাধান্য। তারপর থেকে রসায়নবিদ্যা আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারল। এ সময়ের কথা আগে কিছুটা আলোচনা হয়েছে। লক্ষণীয়, অষ্টাদশ শতকের গোড়াতেই আবার ফ্লজিস্টন তত্ত্ব প্রচার হয়, চলে ঐ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত। এটা যেন আলকিমিতির পুনর্জাগরণ। তত্ত্বের দ্বন্দ্বিক গতিবিধি কখনও কখনও অদ্ভুত কিছু তথ্যের যোগান দেয়। যেমন অষ্টাদশ শতকে লাভোয়াসিয়ে শুধু ফ্লজিস্টন তত্ত্বের বিনাশ করেন নি, তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে প্রাণ মানেই কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া মাত্র। এই লাভোয়াসিয়েই কিন্তু তাপের ক্যালরিক তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন, যা একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং যা বিনষ্ট হতে অনেকদিন লেগেছিল। ভাবতে ভাল লাগে যে তার কিছু আগে আরেকজন বিখ্যাত ফরাসি (ভোলতেয়ার) তাঁর মৃত্যুশয্যা বলেছিলেন “ভগবান? তাঁকে ত চিনি না!” অর্থাৎ এঁদের সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণাব প্রতিভূ হিসাবে ধরা যেতে পারে। আবার ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে অর্থাৎ লাভোয়াসিয়ে, ভোলতেয়ারের বহু বছর পরে অরি বার্গস চালু করেন তাঁর “উদ্ভাবক” ক্রমবিকাশতত্ত্ব (ক্রিয়েটিভ ইভলিউশান) যা সমসাময়িক বহু ব্যক্তিকে, এমনকি বার্নার্ড শ’র মত প্রগতিশীল বুদ্ধিমান লোককে প্রভাবিত করেছিল। বার্গস তাঁর জীবনের সায়াহ্নে নোবেল পুরস্কার পান (১৯২৭), তাও সাহিত্যে। কিন্তু আর্নস্ট মাখ, বার্গস ইত্যাদির সমসাময়িক বিজ্ঞানকে বিপথে (নিজেদের পছন্দ মত) চালিত করতে চেষ্টার ক্রটি করেন নি। এমনকি আইনস্টাইনের মত ব্যক্তিও পরে স্বীকার করেছেন যে তিনি প্রথম জীবনে মাখের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যা পরে তাঁর কাছে ব্যক্তি মনে হয় নি।

এহ বাহ্য। আবার ফিরে যাওয়া যাক রসায়ন চর্চায়। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়েই পঞ্চাশটির বেশি মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও ধারাবাহিকতার দেখা মেলে নি তখনও। অবশ্য ১৮২৯ সালেই জার্মান ডোবেরাইনার ব্রোমিন, ক্লোরিন, আয়োডিন, অথবা ক্যালসিয়াম, স্ট্রনশিয়াম, বেরিয়াম কিংবা সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়ামের মধ্যে মিল দেখে এদের ‘ত্রয়ী’ (ট্রায়ড) নাম দেন। ১৮৬৪ সালে নিউল্যাণ্ডস দেখেন যে জানা মৌলদের পারমাণবিক গুরুত্ব অনুযায়ী সাজালে প্রতি অষ্টম মৌলে আগের ধারার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। কিন্তু এর মধ্যে নানারকম গরমিল থাকায় তাঁর এই অষ্টকের নিয়ম প্রকাশ করেননি। প্রায় একই সময়ে লোথার মেয়ার পারমাণবিক আয়তনের সঙ্গে ওজনের পরিবর্তন থেকে নিউল্যাণ্ডসের অষ্টকের নিয়ম বুঝতে পারেন, কোথাও কোথাও পুনরাবৃত্তির জন্য আটের বেশি সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে

তাও দেখতে পান। কিন্তু তাঁর কাজ প্রকাশ করার আগেই মেণ্ডেলিয়েভ তাঁর মৌলের সারণি প্রকাশ করেন ১৮৬৯ সালে। তাঁর সারণিতে তিনটি ফাঁকা ঘর ছিল। সেই অনাবিষ্কৃত মৌলগুলির ধর্ম সম্বন্ধেও মেণ্ডেলিয়েভ কিছু ধারণা দেন। এই আবিষ্কারের ১৫ বছরের মধ্যেই মৌল তিনটি আবিষ্কৃত হলে ও তাদের ধর্মগুলি মোটামুটি মিলে গেলে অবিশ্বাসীরা তাঁদের মত পালটে ফেলেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের উদ্ভব থেকেই মূলত ভৌত রসায়ন চর্চা শুরু হয়। ঐ সময়ের কিছু আগেই হেস দেখান যে মোট উদ্ভূত তাপের পরিমাণ কোন পথে বিক্রিয়া চলেছে তার ওপর নির্ভর করে না। এর থেকেই সৃষ্টি হলো তাপরসায়নবিদ্যার। যদিও এর বেশ কিছুদিন আগেই সাদি কারনো তাঁর একটিমাত্র গবেষণাপত্রে অসাধারণ আইডিয়া দিয়ে গেছেন। এই ফরাসি সামরিক ইঞ্জিনিয়ার, যার বাবা ছিলেন নেপোলিয়ঁর অধীনে জেনারেল ও যুদ্ধমন্ত্রী, গেলুসাক, পয়সঁ, আঁপিয়াঁর প্রমুখের কাছে শিক্ষালাভ করেন। বাবাও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তখন স্টিম ইঞ্জিন বার হয়েছে, যদিও উপযুক্ত প্রসার লাভ করেনি। তাদের কার্যকরিতা ছিল ৫% এরও কম। সুতরাং এগুলি চালু করতে গেলে এদের দক্ষতা বাড়ানোর দরকার ছিল। এ ব্যাপারে তাত্ত্বিক গবেষণা করে ১৮২৪ সালে কারনো তাঁর গবেষণাপত্রটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। পরবর্তী সমস্ত তাপগতিবিদ্যার, তথা ইঞ্জিনাদি সমস্ত যন্ত্রের কাজের তাত্ত্বিক আলোচনার উৎস এই পুস্তিকা। ক্ল্যাপেরঁ, ক্লসিয়াস ইত্যাদিরা এর গুরুত্ব বুঝে এটির প্রচার করেন। নতুনভাবে এর ব্যাখ্যাও করেন।

লক্ষণীয়, কারনোকে তাপগতি বিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের জনক বলা হয়। ১৮২৪ সালে কিন্তু ঐ বিষয়ের প্রথম সূত্রই জানা ছিল না। যদিও কাউন্ট রামফোর্ড যান্ত্রিক শক্তি আর তাপের পারস্পরিক নির্ভরতা দেখান, এদের মধ্যে সংখ্যাগত মাত্রা বা নিয়ম জানা ছিল না। রবার্ট মেয়ার বলে এক জার্মান ডাক্তারও উনিশ শতকে এই ব্যাপারে লেখালেখি করেন, কিন্তু বিশেষ ফল হয় নি। ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ এর মধ্যে জুল ও লর্ড কেলভিন কতকগুলি পরীক্ষা করে যান্ত্রিক ও তাপ শক্তির পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতার মান নির্ণয় করেন, এদের অনুপাতের নাম দেওয়া হয় ‘জুল’। ক্লসিয়াস, কেলভিন প্রভৃতির এ পরেই তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি রচনা করেন। এই সূত্রের মূল বক্তব্য হলো সামগ্রিক শক্তির অবিনশ্বরতা—যা এই সূত্র রচনার আগেই সাধারণভাবে বিজ্ঞানীদের ধারণায় ছিল এবং আজকের দিনে একটি স্কুলের পড়ুয়াও যা সহজে বুঝতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রটি আরও গোলমালে। সহজভাবে বললে এর বক্তব্য হলো কোনও যন্ত্র কিছু কাজ করলে কিছুটা শক্তির অপচয় ঘটবে। অন্যভাবে, এনট্রপি যা কি না বিশ্বজ্বলার একটা মাপ, তা বরাবর বাড়তে থাকবে। এই প্রথম সময়ের দিক নির্দিষ্ট হলো। ক্লসিকাল পদার্থবিদ্যায় সময়ের কোনও বিশেষ গতি নেই। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (জন্ম, বড় হওয়া, বার্ধক্য, মৃত্যু) সবসময়েই সময়ের একটি দিকে প্রবাহ চিহ্নিত করেছে। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে এনট্রপি বা তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রই এ ব্যাপারে প্রথম ঘোষণা। উল্লেখ্য, ডায়উইনের

“প্রজ্ঞাতির উৎপত্তি” ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্রের পবেকার ঘটনা। ডারউইনের অভিযুক্তবাদ এবং তাব প্রবক্তারা, বিশেষ করে হাক্সলি, ওয়ালেস, সর্বোপরি হার্বার্ট স্পেন্সার অভিযুক্তির একমুখীনতা প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন।

৫

আবার রসায়নের অগ্রগতির আলোচনায় ফেরা যাক। অস্টভান্ড রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবিধি, অনুঘটক ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন। তাঁর আগেই ফ্যারাডে ডেভি প্রভৃতিদের ইলেক্ট্রোবাসায়ন নিয়ে কাজ চলিয়ে যান ভ্যান্ট হফ, আবেনিয়াস প্রমুখেরা। উনিশ শতকেব শেষে বোঝা যাচ্ছিল যে গ্যাসীয় পদার্থের মতই দ্রবণের ধর্ম বোঝা যেতে পারে আণবিক পদার্থের ব্যবহার দেখে। এই সময়ে আবার গ্যাসীয় পদার্থের চর্চা নতুন করে শুরু হয়। ম্যাক্সওয়েল, বোলজম্যান প্রভৃতি তাত্ত্বিক পদার্থবিদরা উৎসাহের সঙ্গে এ কাজে যোগ দেন। ভ্যান ভার ওয়ালস তাঁর গ্যাসীয় পদার্থের অবস্থার সমীকরণ বাব করলেন। গিবস শুরু কবলেন অসাঁবল তত্ত্ব, যা পরিসাংখ্যিক বলবিদ্যাকে (স্ট্যাটিস্টিকাল মেকানিক্স) অনেক সহজলভ্য করে দেবে। বোলজম্যান ক্লাসিকাল ধারণা থেকে সময়ের বিশেষ গতির ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। ফল, তাঁর বিখ্যাত উপপাদ্য (H—থিয়োরেম)। এছাড়াও পরিসংখ্যানভিত্তিক বলবিদ্যা, গ্যাসের অবস্থার তত্ত্ব, আণবিক তত্ত্বে তাঁর অসাধারণ কাজকর্ম রয়ে গেছে। দুঃখের বিষয় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সূত্র, যা এন্ট্রপিকে বিশৃঙ্খলাব মাপ বলে চেনাতে শেখায়, সমকালীন দার্শনিক তথা বিজ্ঞানীদের কাছে উপযুক্ত সমাদর না পাওয়ায় তিনি আত্মহত্যা করলেন ১৯০৬ সালে। P 38, 167

তখন নতুন যুগের সূচনা হয়ে গেছে। টমসন ইলেক্ট্রন আবিষ্কার করেছেন ১৮৯৭ সালে। প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে ১৯০০ সালে। এমর্নিক আইনস্টাইনের বিখ্যাত ৫টি গবেষণাপত্র, ১৯০৫ সালের জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং পেটেন্ট অফিস থেকে আইনস্টাইনকে বিজ্ঞানের রাজপথে টেনে আনা, সবই ঘটে গেছে।

আবার পিছনে ফেরা যাক, রসায়নচর্চায়। উনিশ শতকেব প্রথম দিকে বার্জেলিয়াস বলেন প্রাণীজ পদার্থ যেমন অলিভ তেল, চিনি এগুলিকে জৈব আর সালফিউরিক অ্যাসিড, নুন এগুলিকে অজৈব রাসায়নিক পদার্থ বলা উচিত। উনিই বোধ হয় প্রথম যিনি রাসায়নিক পদার্থের আধুনিক নাম (বাতে তাঁর নিজেরও যথেষ্ট অবদান ছিল) ব্যবহারে উৎসাহী ছিলেন। যেমন মিউরিয়াটিক অ্যাসিডের জায়গায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। জৈব পদার্থকে তাপের সাহায্যে অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, এই উপলব্ধি তখন যথেষ্ট প্রতিপত্তি পেয়েছে। কিন্তু বিপরীত প্রক্রিয়া অসম্ভব বলেই ভাবা হতো। কারণ প্রাণশক্তিবাদ, অর্থাৎ জীব থেকেই কেবল জৈব পদার্থ সৃষ্ট হতে পারে এই মতবাদ মোটামুটি সকলেই জানতেন। অবশেষে উইলার অ্যামোনিয়াম সায়ানোট থেকে ইউরিয়া তৈরি করলেন ১৮২৮ সালে। আরও পরে, ১৮৪৫ সালে কোলবে তৈরি কবলেন অ্যাসিটিক অ্যাসিড (ডিনিগারেব মূল উপাদান) অজৈব পদার্থ থেকে।

প্রাণশক্তিবাদের মূলে কুঠারাঘাত পড়ল। ১৮৫৬ সালে উইলিয়াম পার্কিন অ্যানিলিন, পটাশ ক্রোমেট আর অ্যালকোহল মিশিয়ে চমৎকার বেগুনি রং পেলেন। রসায়নবিদ ফন হফম্যানের অল্পবয়সী এই শাকরেদ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে (৩৫ বছর বয়সে) রং তৈরির কারখানা খুললেন। ঐ ব্যবসার সেই শুরু। ১৮৬১ সালে কেকুলে বললেন জৈব পদার্থ মানে কার্বনের যৌগ। আরও চার বছর বাদে বেঞ্জিনের চেহারা সঠিক জানালেন তিনি। আরও বছর দশেক পরে ভ্যাণ্ট হফ কার্বন যৌগের চতুস্তলক আকাব হতে পারে বললেন, এখান থেকে জৈব পদার্থের আলোর বামাবর্ত বা দক্ষিণাবর্ত গতি পরিচালনার সম্ভাবনা এল। ভিক্টর মেয়ার এ ধরনের ক্রিয়া নাইট্রোজেন যৌগেও সম্ভব জানালেন। ভার্নার তার বিশ্বাস করলেন অজৈব কমপ্লেক্স যৌগে। সমন্বয়ী যৌগের (কো অর্ডিনেশন কমপ্লেক্স) তত্ত্ব দিলেন তিনি। উনিশ শতকের গোড়ায় এ সমস্ত তত্ত্ব সহজভাবে বোঝা যেত, যদিও ইলেক্ট্রন দিয়ে ব্যাখ্যা অনেক পরেকার। কিন্তু ঐ সময়েই বোঝা গিয়েছিল কাঠামোগত আকার থেকে জৈব অণুর তৈরির প্রক্রিয়া কী হতে পারে তা বোঝার চেষ্টা করা। এ ব্যাপারে সুন্দর বিশ্লেষণ পাই পরমাণু বোমার জনক হিসাবে খ্যাত অটো হানের আত্মজীবনী “আমার জীবন” থেকে। মূলত জৈব রসায়নবিদ হিসাবে প্রশিক্ষণ পাওয়া এই বিজ্ঞানী সমকালীন জার্মান রসায়নবিদদের প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, বিশেষ করে বিভিন্ন জৈব যৌগের তৈরি ও বিক্রিয়াগুলো তাঁরা ধৈর্য ধরে ঐ সময়ে করে গিয়েছিলেন বলেই পরে জৈব রসায়ন এত সুসংবদ্ধভাবে গড়ে তোলা গিয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে : ভিলস্ট্যাটার, যিনি ক্লোরোফিলের গঠন বার করেন ; ভাইল্যাণ্ড, যিনি কিছু স্টেরয়েডের আকার জানিয়েছেন ; পল ক্যারার, যাঁর কাজ ছিল ক্যারটিনয়েড ও কিছু ভিটামিনের গঠন আবিষ্কার করা ; রবিনসন, যিনি মর্ফিন ও স্ট্রিকনিনের আকার জানিয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে কেমোথেরাপির সূত্রপাত হয়েছে পল এরলিখের কাজের থেকে, যা জানানো হবে বায়োটেক সংক্রান্ত আলোচনায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় ওষুধ আর রোগ নিরাময়ের গবেষণা অনেক জোরদার হলো। ফ্লেমিং, ফ্লেসরি আর চেন পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করলেন। স্ট্রেপটোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন এল অল্প সময় পরেই। ক্যারো থার্স তৈরি করলেন নাইলন, কৃত্রিম রবার। জিগলার ও নাটা দেখালেন কি করে পলিমার তৈরি আরও সুষ্ঠুভাবে, পছন্দমত করা যায়। সোয়েট, মার্টিন ও সিঞ্জের ক্রোমাটোগ্রাফি আর টিসেলিয়াসের ইলেক্ট্রোফোরেসিসের পরে প্রোটিন জাতীয় বড় জৈব অণুর বিশ্লেষণের কাজ সহজ হলো। স্যাংগার, কেনড্রিউ, পেরুৎস এক্স রশ্মির সাহায্যে এই সব অণুর বিশ্লেষণ সম্ভব সেটা দেখালেন। ১৮৯৫ সালে রনটজেন এই রশ্মি আবিষ্কার করেছেন।

১৯০২ সালে আলকেমিস্টদের মত তেজস্ক্রিয় পদার্থের অন্য পদার্থ রূপান্তর দেখা গেল। পরবর্তী দশ বছরে এরকম বেশ কিছু পদার্থের রূপান্তরের সম্পূর্ণ চেহারাটা বার করে ফেলা সম্ভব হলো। এ কাজের ফলে সডি আইসোটোপ আবিষ্কার করলেন। ম্যাক্স ফন লাউএ ১৯০৯ সালে দেখালেন এক্স রশ্মি দিয়ে কেলাসের গঠন দেখা সম্ভব।

১৯১৩ সালে মোজলে প্রতি মৌলের বিশেষ এক্স রশ্মির বিকিরণের কথা জানানেন। এখন থেকে পারমাণবিক গুরুত্বের জায়গায় পারমাণবিক সংখ্যার (=কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা) পিরিয়ডিক সারণির চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়াল। ততদিনে বোরের পরমাণুর সৌরমণ্ডলীয় মডেল প্রকাশিত হয়েছে। এর পরে ইনগোল্ড এই মডেলের সাহায্যে জৈব যৌগের বিক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলেন। এখন থেকে ইলেক্ট্রনের গতিবিধিই সব বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করবে। পাউলিং এই দিকে আরও অনেক কাজ কবলেন। তিনি এমনকি অজানা বড় জৈব অণুর আকার ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। অ্যাস্টন তাঁর মাস স্পেকট্রোগ্রাফ যন্ত্রে আইসোটোপের অস্তিত্ব দেখালেন, অজানা যৌগেব বিশ্লেষণে এই যন্ত্র অপরিহার্য। উরে ১৯৩১ সালে ভারী হাইড্রোজেন, ডয়টেরিয়াম, আবিষ্কার করলেন। ১৯৩৪ সালে ফার্মি ভারি মৌলের কেন্দ্রকে নিউট্রন দিয়ে ধাক্কা দিতে শুরু করলেন। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার দিন শুরু হলো। সিবার্গ, কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন, এভাবে ৯৪ থেকে ১০৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করলেন মৌলের সংখ্যা।

৬

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভ্যান্ট হফ, আরেনিয়াস, অস্টওয়াল্ড, রায়মজ (নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কারের জন্য) প্রভৃতি নোবেল পুরস্কার পান। রাদারফোর্ড, ক্যুরি, ভার্নার, ডিলস্ট্যাটার, নার্নস্ট, সডি, অ্যাস্টন এঁরাও ছিলেন। অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তা, ভৌত রসায়ন তথা জৈব, অজৈব রসায়ন সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি এমিল ফিশার, বুখনার ইত্যাদির বায়োকেমিস্ট্রির কাজও পুরস্কৃত হয়েছিল। এখন এসব কাজ কলেজের প্রথম দিকে স্নাতক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হয়, কিছুটা পড়ানো হয় স্কুলের শেষের দিকেই।

বিশ আর ত্রিশের দশকের রসায়নে নোবেল পুরস্কারের মধ্যে ভাইল্যান্ডের পেটের ভিতরেব (বাইল) অ্যাসিড, হার্ডেন ও অয়লার চেলপিনের চিনি গাঁজে যাওয়ার এনজাইম, ফিশারের হিমের গঠন, পল ক্যারার, ক্যান, বুটেনাস্ট, রুজিকা ইত্যাদির জৈব অণু সংক্রান্ত কাজ যেমন রয়েছে, তেমনি বশ ও বার্জিয়াসের উচ্চচাপ বিক্রিয়া, ল্যাংমুরের বহিস্তুল সংক্রান্ত গবেষণা, উরে ও জোলিও ক্যুরিদের তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ, এ সবও রয়েছে। ১৯৪০এর দশকে অটো হান, রবিনসন, টিসেলিয়াস পুরস্কার পান। ভিটামিন পান কৃষিতে রসায়নের অবদান নিয়ে। সামনার, স্ট্যানলি প্রভৃতি এনজাইম, ভাইরাল প্রোটিন ইত্যাদি কেলাসনের জন্য। ৫০ এর দশকে সিবার্গ, মার্টিন, সিঞ্জ, পাউলিং, স্যাংগার ইত্যাদিরা নোবেল পেলেন। ডিলস, অম্ভার পেলেন একধরনের জৈব যৌগ তৈরির জন্যে, স্টাডিডিংগার পলিমার নিয়ে কাজের জন্য। ৬০এর দশকে এলেন কেনড্রিউ, পেরুৎস, জিগলার, নাটা। এলেন ডবোথি হজকিন এক্স রশ্মি দিয়ে মায়োগ্রোবিনের গঠন জানার জন্য; উডওয়ার্ড বড় জৈব অণু তৈরির জন্য; আইগেন, নরিশ ও পোটার দ্রুতগতি বিক্রিয়ার জন্য। কার্বন ডেটিং, যা দিয়ে প্রাচীন বস্তুর বয়স মাপা হয়, তা পুরস্কৃত হলো। তাত্ত্বিক গবেষণাও।

১৯৭০ এর দশক থেকে যেসব কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ গত বছর ত্রিশেক ধরে, তা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। যেমন থিগোজিনের অসাম্য অবস্থার তাপগতি বিদ্যা, বা মুর, স্টাইনদের রাইবোনিউক্লিয় অনুঘটন বা মিশেলের কেমিঅস্মোটিক তত্ত্ব। জৈব বা অজৈব যৌগ বা বিক্রিয়া নিয়ে অন্যান্য কাজ, যেমন বার্টন, ব্রাউন বা উইটিং অথবা উইঙ্কিনসনের, সেটা অপেক্ষাকৃত সহজ। ১৯৮০ সালে স্যাংগার দ্বিতীয়বার রসায়নে নোবেল পেলেন, এবার অন্যদের সঙ্গে, নিউক্লিয় অ্যাসিডের গঠন আরও ভালভাবে জানার জন্য। এই কাজ, এবং পূনর্যুত ডি এন এ প্রক্রিয়া নিয়ে বায়োটেক সংক্রান্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য। ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ আর তার জৈব কাজে ব্যবহারও পুরস্কৃত হলো, যেমন হলো কঠিন বস্তু ওপর পেপটাইড তৈরির বিক্রিয়া, আলোকসংশ্লেষ ঠিক কোন জায়গায় হয় সেটা জানা, আর এন এন অনুঘটন ক্রিয়া। আবার খুব ছোট অণুদের মধ্যে বিক্রিয়া খুব ভালভাবে জানার জন্য পুরস্কার দেওয়া হলো, যেমন দেওয়া হলো গঠন নির্দিষ্ট বিক্রিয়ায়। বিগত দশকে উচ্চ বিশ্লেষক এন এম আব যম্ম, পি সি আর বিক্রিয়া ও নির্দিষ্ট জায়গায় পরিব্যক্তি সংক্রান্ত কাজ পুরস্কৃত হলো। শেষের কাজগুলি নিয়ে বায়োটেক আলোচনায় আরও বলা আছে। তেমনি বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তর নিয়ে কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হলো, যেমন দেওয়া হলো ফুলারিন যৌগ আবিষ্কারকে। এটিপির এনজাইম ও সোডিয়াম-পটাশিয়াম পাম্পের কাজ পুরস্কার পেল। তাত্ত্বিক গবেষণা যেমন পুরস্কৃত হলো তেমনিই হলো জৈব রসায়নও আগের মতই, বিক্রিয়াগুলি আরও ভালভাবে জানা।

আরেকটা মজার ছবি উঠে আসে দেশ বা অঞ্চলভিত্তিক পরিসংখ্যান থেকে। রসায়নে প্রথম দশ বছরে পাঁচটি পুরস্কারই পান জার্মান নাগরিকরা, বাকি পাঁচটির দুটি ইংল্যান্ডে, অন্যগুলি হল্যান্ড, সুইডেন আর ফ্রান্সের অধিবাসীরা পান। পরের দশকেও অর্ধেক পুরস্কার আসে জার্মানিতে। ১৯১৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রিচার্ডস অনেক মৌলের পারমাণবিক গুরুত্বের জন্য রসায়নে নোবেল পান। তার পরের দশকেও ৫০% জার্মানির কপালে, যুক্তরাষ্ট্রে একটিও না। ত্রিশের দশকে তিনটি। ১৯১৪ এর পব একেবারে ১৯৩২ এ ল্যাংমুর পেলেন। তারপর ১৯৩৬ এ পিটার ডিবাই, যিনি আসলে হল্যান্ডের লোক, যুক্তরাষ্ট্রে নিজের নাম পিত্রাস থেকে পালটে পিটার করে নিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে অধিবাসীদের জয়যাত্রা শুরু হলো। সেই দশকেই তিনজন জার্মান পুরস্কার পান। এই সংখ্যাটা জার্মানির দিক থেকে কমতে কমতে ১৯৬০ এর দশক থেকে কখনও এক, কখনও দুই জন প্রতি দশকে। অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ৫০ এর দশকে ৩ জন, ৬০এর দশকে ৪ জন, ৭০এর দশকে ৫০% এর বেশি, ৮০র দশকে ৬০% এর বেশি, ৯০এর দশক থেকে ৮০% এর বেশি রসায়নে নোবেল পুরস্কার এসেছে। মাত্র একজন রাশিয়ান রসায়নে নোবেল পান, তাও এককভাবে নয়। সেদিক থেকে তিন জন এশীয় (জাপানি) এই পুরস্কার পেয়েছেন, যদিও অন্যদের সঙ্গে যুক্তভাবে। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে একজনও পাননি।

আফ্রিকার কপালে জোটেনি পদার্থবিদ্যায় নোবেলও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত নোবেলজয়ী জার্মান পদার্থবিদের সংখ্যা ছিল পাঁচজন। সেই তুলনায় ডাচদের সংখ্যা চার, প্রায় সমান সমান। ফরাসি, ইতালীয়, সুইডিশ, পোলিশ (মাদাম কুরি) একজন করে। যুক্তরাষ্ট্রের মাইকেলসনও পেয়েছেন, ১৯০৭ সালে। ১৯১৪ এর পব থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ৭ জন জার্মান, ৭ জন ইংরেজ, ৫ জন যুক্তরাষ্ট্রের লোক এই পুরস্কার পান। তার মধ্যে আইনস্টাইন, জেমস ফ্রাঙ্ক যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়েছেন জার্মানি থেকে, যেমন হয়েছেন ইতালীয় নোবেলজয়ী এনরিকো ফার্মি। ভিক্টর হেস অস্ট্রিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন, যেমন এসেছিলেন ঐ দেশ থেকে ইংল্যান্ডে আরেক নোবেলজয়ী ডিরাকের বাবা। যুদ্ধে প্রথম কয়েকবছর বাদ দিয়ে ১৯৪৩ এ আবার পদার্থবিদ্যায় নোবেল দেওয়া শুরু হতেই পেলেন জার্মানি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা অটো স্টার্ন। ১৯৪৬ পর্যন্ত টানা যুক্তরাষ্ট্রে এল এই পুরস্কার, অন্যদের সঙ্গে পেলেন অভিবাসী পাউলি। ১৯৪৯এ প্রথম জাপানি হিসাবে ইউকাওয়া এই পুরস্কার পান। ৫০ এর দশকে অধিকাংশই (>৫০%) যুক্তরাষ্ট্রের, যদিও তিনজন রাশিয়ান ও দুজন চিনাও রয়েছেন। জার্মানির মোটে একজন। ঐ চিনারা যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী, যেমন অস্ট্রিয়ান ফেলিক্স ব্লখ অথবা ইতালীয় সেগরে। ৬০ এর দশকেও ৬০% এর বেশি যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী (যদিও এঁদের অর্ধেক আবার অভিবাসী, জার্মানি বা পূর্ব-ইউরোপ থেকে)। এছাড়া তিনজন রুশ ও একজন জাপানি আছেন।

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন প্রথম পাকিস্তানি আবদুস সালাম ১৯৭৯ সালে পুরস্কৃত। দ্বিতীয় ভারতীয় চন্দ্রশেখর ১৯৮৩ সালে (ততদিনে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী)। ৮০র দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের দাপট কিছুটা ফিরে আসে যখন কোয়াণ্টাম হলো প্রক্রিয়া, স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ, আয়ন ফাঁদ ইত্যাদি জন্য পুরস্কার দেওয়া হলো। ১৯৯১ সালে ফরাসি দ্য গেনেস পেলেন তরল কেলাস জাতীয় পদার্থের ওপব গবেষণার জন্য। ১৯৯৭ সালে ফোহেন-তানুজী পেলেন পরমাণু ধরে রাখার জন্য। ১৯৯৯ সালে ওলন্দাজ বিজ্ঞানীরা পেলেন তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য। এছাড়া অধিকাংশ পুরস্কারই গিয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে।

৭

শারীরবিদ্যার অবস্থাও একইরকম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দখলে ছিল একটি নোবেল যেখানে জার্মানির ৫টি। বাকি সব ইংল্যান্ড, ফ্রান্স সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের দখলে। ১৯২৬ থেকে ১৯৫০-এ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এল ১৩টি, পরের ২৫ বছরে ৩২টি এবং ১৯৭৬-২০০০-এর মধ্যে ৪০টি নোবেল। সেখানে জার্মানিও হাতে প্রতি ২৫ বছরে ৩-৪টিতেই রয়ে গেছে। ইংল্যান্ডের অবস্থা মাঝখানে ভাল হয়েছিল। ১৯০১-২৫-এর মধ্যে ২টি থেকে ১৯২৬-৫০এ ৭টি, পরের ২৫ বছরে সেই সংখ্যা ১০টিতে গিয়ে দাঁড়ায়। গত শতকের শেষ ২৫ বছরে অবশ্য ইংল্যান্ডের হাতে ৪টি নোবেল। ফরাসি দেশে এই সংখ্যা থেকে তিনের মধ্যে থেকেছে।

এই বিষয়ে অর্থাৎ শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারের প্যাটার্ন সম্বন্ধে নোবেল সংস্থার বক্তব্য হলো :

(ক) অধিকাংশ নোবেলজয়ীই ইউরোপ অথবা উত্তর আমেরিকায় জন্মেছেন অথবা কাজ করেছেন।

(খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই এই তালিকায় শীর্ষে থাকছে। তার কারণ হিসাবে তাঁরা বলছেন ত্রিশের দশকে নাৎসি জার্মানির উত্থানের জন্য বহু ইহুদি বিজ্ঞানী ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যান। ১৯৫১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত এ বিষয়ে ৩২ জন যুক্তরাষ্ট্রীয় নোবেলজয়ীর মধ্যে ৯ জনই ওদেশের বাইরে জন্মেছেন।

(গ) সেদিক থেকে সুইডেন, সুইৎজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ অনেক ভাল করেছে। সুইডেনের ৭ জন, সুইৎজারল্যান্ডের ৮ জন, ডেনমার্কের ৪ জন এবিষয়ে নোবেল পেয়েছেন। নোবেল সংস্থার মতে এর কারণ বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দেশগুলির অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। প্রথম দুটি দেশের নিরপেক্ষতা নিশ্চয় তাতে সহায়ক হয়েছিল।

৮

উনিশ শতকের শেষের দিকে ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার ভিত খুবই পাকা মনে হচ্ছিল, লোকের কাছে, বা প্রধানত ঐ শতকের বহু পদার্থবিদ তথা রসায়নবিদের ও গণিতশাস্ত্রীর অবদান। বলবিদ্যা, তাপগতিবিদ্যা, ম্যাক্সওয়েলের সূত্রগুলি—সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল হয়ত সামান্য কিছু কিছু (ডিটেল) কাজ হলেই পুরো চিত্রটা সম্পূর্ণ হয়। গণিতের প্রসঙ্গে এই সময়ের কথা আসবে, তবু বলা ভাল যে ঐ সময়টা ছিল সিস্টেম তৈরির স্বর্ণযুগ। তাই পরের পরিবর্তনগুলো আকস্মিক ঠেকে, তাদের যুগান্তকারী নাম দেওয়া হয়। কুন দেখিয়েছেন সে সত্যিই যুগান্তকারী বিজ্ঞান কিন্তু বহুদিনের প্রচলিত বিজ্ঞানধারায় গলদ জমতে জমতে একসময় তৈরি হয়, ব্যাপারটা দুর্ঘটনা নয়।

যেমন এক্স রশ্মির আবিষ্কার, যা দিয়ে পুরো ব্যাপারটা শুরু বলা যেতে পারে। ১৮৯৫ সাল, গল্‌লট ও আমরা সবাই জানি। রনটজেন, সমসাময়িক বিজ্ঞানী মহলে এতই অপরিচিত ছিলেন যে, নোবেল কমিটির প্রথম চিঠিতে তাঁর নামটা ভুল ছাপা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পদার্থবিদ্যায় উনিই প্রথম নোবেল। ১৮৯৬ সালে পিচব্লেন্ড থেকে বেকেরেল তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করলেন। কুরিরা সেই কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যান। এক্স রশ্মি বা তেজস্ক্রিয়তার কারণ তখনও জানা নেই কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই এক্স রের হাড় দেখার কাজে ব্যবহার শুরু হয়েছে। পিচব্লেন্ড বহু নতুন তথ্যের উৎস, নোবেল পুরস্কারেরও। বেকেরেল, কুরিরা পেলেন ১৯০৩ সালে একসঙ্গে। রাদারফোর্ড রসায়নে পেলেন ১৯০৮-এ। তখন জানা গেছে পরমাণুর কেন্দ্রই এসব রশ্মির উৎস।

ইতিমধ্যে ক্রুকসের তৈরি ক্যাথোড রশ্মির যন্ত্র, আজ যা টেলিভিশন, কম্পিউটার ও অন্যান্য তথ্য প্রদর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ, বেশ কিছু নতুন আবিষ্কারের উৎস। টমসন

ক্যাথোড রশ্মিকে ইলেকট্রন বলে জানলেন, তার আধান ও ভরের অনুপাত মাপলেন ১৮৯৭ সালে (নোবেল ১৯০৬)। লেনার্ড নোবেল পেলেন ১৯০৫-এ ঐ ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে কাজ করার জন্যে। তিনি দেখান এই রশ্মি ধাতুর পাত ভেদ করে যেতে পারে, প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করে। এই ইলেকট্রনের আধান আলাদা করে মাপলেন মিলিক্যান ১৯১২ সালে, নোবেল পেলেন ১৯২৩-এ।

এক্স রশ্মির কাজ এখনও শেষ হয় নি। জার্মান ফন ল্যাউএ ১৯১৪ সালে নোবেল পেলেন কেলাসে এর বিচ্ছুরণ দেখে। পরে বছর ইংল্যান্ডের উইলিয়াম ও লরেন্স ব্র্যাগ (বাবা-ছেলে) পেলেন সেই কাজেব বিশ্লেষণ করে। তার পরের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেন আবার এক ইংরেজ, বার্কলা। তিনি দেখালেন প্রতি মৌলের বিশেষ এক্স রশ্মি আছে, যা দিয়ে তাদের আলাদা করা যেতে পারে। এই তথ্য থেকে সুইডিশ বিজ্ঞানী সিগবান উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এক্স রশ্মির স্পেকট্রোফটোমিটার যন্ত্র বানালেন। তা দিয়ে বিভিন্ন মৌলের ইলেক্ট্রন স্তরের মধ্যে শক্তির তফাৎ, কিভাবে সেখান থেকে এক্স রশ্মি পাওয়া যেতে পারে, তার খুঁটিনাটি জানালেন। তা দিয়ে পরে বিভিন্ন অজানা যৌগে কি মৌল রয়েছে তা জানা যাবে। এখনও এই কাজ (আরও সূক্ষ্মভাবে অবশ্য) করা হয় রুটিনমাসিক। সিগবান পদার্থবিদ্যায় নোবেল পান ১৯২৪-এ। এখন পর্যন্ত কিন্তু নতুন তত্ত্ব ব্যবহৃত নয়।

ইলেকট্রন স্তরের কথা বলা হয়েছে। সেটা কিন্তু ঠিক ঐ ভাবে জানা ছিল না প্রথমদিকে। ১৯১২ নাগাদ ডেনমার্কের নিলস্ বোর তাঁর বিখ্যাত মডেল দিয়ে টমসন, রাদারফোর্ডদের পারমাণবিক গবেষণা ও তাঁর পূর্বজন্মের দেখা হাইড্রোজেনের বর্ণালীর একসঙ্গে ব্যাখ্যা দিলেন। বোর নোবেল পেলেন ১৯২২-এ।

ইতিমধ্যে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মাইকেলসন নতুন পদ্ধতিতে দূরত্ব মাপছেন যার নাম ইন্টারফেরোমেট্রি। সূক্ষ্মতর, সঠিকতর এই পদ্ধতি পরে আন্তর্জাতিক মানক সংস্থার মাপকাঠি আগেকার রাখা এক মিটারের ধাতব খণ্ড থেকে বিকীরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিয়ে আসবে। মর্লির সঙ্গে তাঁর পরীক্ষায় তিনি আলোর গতিবেগ তার উৎস ও পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক গতি নিরপেক্ষ দেখলেন। অর্থাৎ ঈশ্বর, ম্যাক্সওয়েলের পর থেকে আলোর চলন বোঝাতে যা চলে আসছিল, পরিত্যক্ত হলো এখন। মাইকেলসন নোবেল পেলেন ১৯০৭ সালে।

পদার্থবিদ্যায় দ্বিতীয় বছর নোবেল পুরস্কার পান দুজন। দুজনেই ওলন্দাজ। জিমান সোডিয়ামের বর্ণালিবি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হওয়া দেখিয়েছিলেন তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র ব্যবহার করে। লোরেনজ তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন ম্যাক্সওয়েলীয় ভাষায়। লোরেনজ ম্যাক্সওয়েলের সূত্রগুলির সম্ভবত প্রথম পদার্থের আধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। পরে কোয়ান্টাম তত্ত্ব (বোরের) ও বলবিদ্যার (শ্রোডিংগার, হাইজেনবার্গ প্রভৃতির) সাহায্যেই তার সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয়। লোরেনজ কিন্তু অন্য কারণেও বিশিষ্ট। সমসাময়িক সমস্ত বিজ্ঞানীদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এই

বিজ্ঞানী, তাত্ত্বিক আলোচনায় অস্তুত ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার প্রয়োগে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বর্ণালির বিভাজনের কাজে, বিশেষ করে তড়িৎ ক্ষেত্র ব্যবহার করে, আরেকজন বিজ্ঞানী নোবেল পান পদার্থবিদ্যায়। তিনি জার্মান জোহানেস স্টার্ক, পান ১৯১৯-এ।

৯

১৯০০ সাল অনেকদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তার পরের বছর মারা যান। কিন্তু পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো কৃষ্ণবস্তুর বিকীরণের সমীকরণ খুঁজে পাওয়া। ঐ বছরেই লর্ড র্যালৈ আর জেমস জীনস তাঁদের একটি সমীকরণ প্রকাশ করেন, বিকীরণের কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকটাতে যা ভুল করছিল। ভিন তাব আগেই এ ব্যাপারে কাজ কবেছেন। তাঁর সমীকরণ এদিকটা ঠিক দেখালেও বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দিকটা ব্যাখ্যা করতে পারছিল না। জার্মানীর ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বিকীরণের পুরোটাই ব্যাখ্যা করতে ও তাঁর নতুন সমীকরণ দিয়ে মেশাতে সক্ষম হন ১৯০০ সালেই। কিন্তু সেখানে একটি বিশেষ ধ্রুবক ঢুকে পড়ল, যাকে আমরা প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক বলে জানি, এবং যার ব্যাখ্যা প্ল্যাঙ্কের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। পরে অনেকেই, আইনস্টাইন ও অন্যান্যরা, এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সর্বেরই মূল উৎস সেই ১৯০০ সালের গবেষণাপত্র। ভিন নোবেল পান, ১৯১১-এ, প্ল্যাঙ্ক ১৯১৮-এ।

বিশ শতকের তথ্য সবসময়ের অন্যতম সেবা বিজ্ঞানী আইনস্টাইন নোবেল পান ১৯২১-এ, মূলত আলোকতড়িৎ প্রক্রিয়ার সঠিক ব্যাখ্যাব (কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে) জন্য যদিও “তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় তাঁর অবদান” নোবেল কমিটি উল্লেখ করেছেন। সাধারণ্যে ওঁর পরিচিতি অবশ্য রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্যে, যাব বিশেষ রূপ (১৯০৫)ও সাধারণ রূপ (১৯১১) প্রকাশিত হলেও লোকের গ্রহণ করতে সময় লেগেছিল। শেষমেষ ১৯১৮ সাল নাগাদ একটি জাহাজে করে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এডিংটনের নেতৃত্বে একটি দল সূর্যগ্রহণের সময় বুধ গ্রহের প্রভাবে কাছের তারার আলোর দিক পরিবর্তনের মান নির্ণয় করেন। আইনস্টাইনের জীবনীকাবেরা দেখিয়েছেন খবরটা খবরের কাগজে বার হয়েছিল কারণ এরকমভাবে সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যাওয়া অনেকের কাছেই বড় খবর ছিল। গুরুত্ব আরেকটা কারণে, এতদিনকার পুরোনো (সেই গ্যালিলিও-কোপার্নিকাস-নিউটনের সময় থেকে) এবং ক্লাসিকাল ধ্যানধারণার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। মোটামুটি সেই থেকেই আইনস্টাইন একজন ‘তারকা’ পদার্থবিদ। ওঁর এক জীবনীকার জানিয়েছেন, প্রিন্সটনে আপনমনে গমনরত আইনস্টাইনকে দেখতে দেখতে একজন তাঁর গাড়ি একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে দেন।

পাৰমাণবিক তথ্য ও তত্ত্ব কিন্তু বরাবরই গুরুত্ব পেয়েছে পদার্থবিদ মহলে। জার্মান ফ্র্যাঙ্ক ও হার্ড্জ পরমাণুর ওপর ইলেকট্রন নিষ্ক্ষেপ কবলেন। কম্পটন ইলেকট্রন রশ্মির ও আলোর প্রভাব দেখলেন। বোর মডেল তখন পুরোনো। এমন সময় ফরাসি

দ্য ব্রয় তাঁর দ্বৈতবাদের তত্ত্ব দিলেন। আলোর কণা (যা তখনও নতুন আইডিয়া), ইলেকট্রন এগুলি কখনও কণা কখনও তরঙ্গ (সাধারণ আলোব মত)। এই মত দিয়ে কম্পটন, ডেভিসন, ইলেকট্রন আবিষ্কারী টমসনের ছেলে জর্জ টমসন এঁদের পরীক্ষাব ফলাফল ব্যাখ্যা করা গেল। একই সময়ে অনেকে এইসব বিভিন্ন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সমাহার করে নতুনতর, উন্নততর কোনও থিয়োরি বার করার চেষ্টা করছিলেন।

১৯২৪ সাল থেকে এর ফল দেখা গেল। শ্রোডিংগার প্রথম তরঙ্গ সমীকরণে প্লাঙ্ক ধ্রুবক (বা যে কোনও ধ্রুবক) আনার চেষ্টা করলেন। হাইজেনবার্গ পরের বছর একই কাজ করলেন ম্যাট্রিক্স দিয়ে। ডিরাক, ম্যাক্স বর্ন (হাইজেনবার্গের মাষ্টারমশাই) ও আরও অনেকে এই নতুন তত্ত্ব, যার নাম হলো কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, বোঝাব চেষ্টা করছিলেন। বোর এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। বোর, আইনস্টাইন, শ্রোডিংগার, লোবেনজ প্রভৃতির মধ্যে চিঠিপত্র পড়লে বোঝা যায় কি সাংঘাতিক রকম বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল এই নতুন বলবিদ্যা নিয়ে এবং এ ব্যাপারে পুরোনো, ক্লাসিক্যাল আইডিয়াগুলি কীরকম প্রতিপন্থী ছিল। ঐ সময়ে বড় রাসায়নিক কারখানার মালিক সলভে কতকগুলি অধিবেশনের খবচ যোগান, যাতে পৃথিবীর সব বড় বিজ্ঞানীরা একসঙ্গে বসে এই বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। জগদীশ মেহরা তাঁর কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ইতিহাসে দেখিয়েছেন যে প্রথম দুটি অধিবেশনেই স্পষ্ট মেঝুকরণ হয়ে যায়। একদিকে তথাকথিত পুরোনো পন্থী, আইনস্টাইন, প্লাঙ্ক (এ সব বিতর্কে নীরব থাকতেন), লোবেনজ ও শ্রোডিংগার। অন্যদিকে তরুণ ভূকীর, তাঁদের মধ্যে বোর, বর্নের মত বয়স্করাও আছেন। আরও দেখা যায় যে এই বিষয়ে যাঁরা ত্রিশ কি চল্লিশের দশকে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁরা প্রায় সবাই পঁচিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। ব্যতিক্রম, শ্রোডিংগার (৪৬), ম্যাক্স বর্ন (৭২) প্রভৃতিরা।

প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সময়টাতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রথম বিপ্লব সমাপ্ত। নিউট্রন আবিষ্কার করেছেন চ্যাডউইক, ফার্মি তা দিয়ে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। আর্নেস্ট লরেস সাইক্লোট্রন তৈরি করেছেন যা দিয়ে আরও শক্তিশালী পরমাণু কেন্দ্রের বিক্রিয়া দেখা যাবে। আণবিক রশ্মির পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, তা দিয়ে প্রোটনের চৌম্বকীয় মোমেন্ট মাপা গেছে (অটো স্টার্ন, নোবেল ১৯৪৩)। ইসিডর রাবি নিউক্লিয়ার চুম্বক অনুবাদ প্রক্রিয়া ও যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যার সাহায্য ছাড়া এখন বহু রসায়নবিদ, জীববিজ্ঞানী ইত্যাদিরা চোখে অন্ধকার দেখেন (আধুনিক ক্যাটস্ক্যানের একদম আদিম অবস্থা)। এমনকি পলিট্রন নামক বিপ্রতীপ ইলেকট্রন, যা ডিরাকেব ভবিষ্যৎ বাণী ছাড়া অনেকের উপহাসের বস্তু ছিল, তাও দেখা গেছে (অ্যাণ্ডারসন, নোবেল ১৯৩৬)।

পঞ্চাশের দশক থেকে (যা বলা উচিত চল্লিশের থেকেই) দ্বিতীয় কোয়ান্টাম বিপ্লব। এবং তা মূলত কোয়ান্টাম কণাদের নিয়ে। ইতিমধ্যে মেঘ-বাক্স (ক্লাউড চেম্বার)

(উইলসন, নোবেল ১৯২৭; ব্ল্যাকট, নোবেল, ১৯৪৮) ও কণাদের বিক্রিয়ার ফটো তোলা (পাওয়েল, নোবেল ১৯৫০) আরম্ভ হয়ে গেছে। আগেকার পণ্ডিতদের চ্যালেঞ্জ জানানোও শুরু হয়েছে। পলিকার্প কুশ বললেন ইলেকট্রনের চুম্বক মোমেন্টের মান ডিরাক যা বলেছেন তা ঠিক নয়। উইলিস ল্যাঘ পরীক্ষা করে কুশের কথামত একটু অন্য মান পেলেন। এঁরা দুজনে একসঙ্গে নোবেল পান ১৯৫৫ সালে। আসলে তথ্য ও তত্ত্ব একইসঙ্গে পালটায়। নতুন যন্ত্র এলে আরও নিখুঁত তথ্য জানা সম্ভব। কিন্তু নতুন তত্ত্ব না এলে নতুন যন্ত্র আসবে কেমন করে? পাউলি তাঁর ব্যতিক্রম তত্ত্ব, যার জন্য তাঁর নামডাক, তৈরি করেন বোরের পুরোনো কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে। পরে জানা গেল তা আসলে আরও গভীরে, এইসব কণার প্রতিসাম্য বা সিমিট্রির ওপর নির্ভরশীল। এখান থেকে ইলেকট্রনের (ও অন্যান্য কণার) ঘূর্ণন, তাব ভিত্তিতে স্টার্ন, রাবি, ব্লখ, পার্সেল প্রভৃতির অনুবাদ প্রক্রিয়ার পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যন্ত্রপাতি তৈরি। এই সিমিট্রির সঙ্গে আবার আমাদের সত্যের বসুর নাম চিরকাল জড়িয়ে থাকবে।

ততদিনে কোয়ান্টামের তরুণ তুর্কীদের বয়স হয়েছে। তরুণতর তুর্কীরা আসরে নেমেছেন। '৪০-এর দশকে যে কাজের জন্য রিসার্চ স্কলার ফাইনম্যান, শুয়িংগার পাউলি ইত্যাদির কাছে বকুনি খান, '৬০-এর দশকের মাঝামাঝি এসে সেই কাজের জন্যই তাঁরা নোবেল পুরস্কার পান। অন্য বিষয়ের মত বিজ্ঞানের এই দ্বন্দ্বিতা গতি খুব আকর্ষণীয়, খুব শিক্ষাপ্রদ। ইতিমধ্যে ডিরাকের পজিট্রনের মত জাপানি ইউকাওয়া মেসন বলে একটি কণার কথা বলেন, প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে যার বিনিময় কেন্দ্রে অনেক কণাকে ধরে রাখতে পারে। ইউকাওয়া ও তাঁর কণার আবিষ্কারক পাওয়েল যথাক্রমে ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে নোবেল পুরস্কার পান। ফাইনম্যান, শুয়িংগার ও টোমোনাগা মনে করেন এইসব কণাগুলির আধান কখনই কুলম্বের বা আগেকার ধারণা অনুযায়ী থাকে না। প্রতি কণার আশেপাশে যে কণা ও প্রতিকণা ঝাঁক বেঁধে থাকে, তাতে বিভিন্ন কণার মধ্যে বল বা আদানপ্রদান ক্লাসিকাল কুলম্বীয় ধারণায় ঘটে না। তৈরি হলো কোয়ান্টাম তড়িচ্চুম্বকীয় বলবিদ্যা, বিভিন্ন পরিবর্তনের পর যা আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের উজ্জ্বলতম মণি হিসাবে খ্যাত। ফাইনম্যানের সৃষ্ট ছবি বা ডায়াগ্রাম, যা নিয়ে হাসিঠাট্টা হয়েছিল আগে, তা এখন পদার্থবিজ্ঞান এমনকি তাত্ত্বিক রসায়নের পত্রিকাগুলির পাতায় পাতায় নিত্য দেখা যায়।

১০

সিমিট্রি কণাব অদলবদল নিয়ে হতে পারে, যেমন পাউলির তত্ত্ব, আবার দৈশিক পরিবর্তনেও প্রযোজ্য। ক্লাসিকাল এমনকি কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় ডানদিক বাঁদিক নেই। সময়ের চলনও দুইদিকে হতে পারে। ১৯৫৬ সালে দুই চিনা বিজ্ঞানী লী ও ইয়াং তত্ত্বগত দিক থেকে দেখালেন ডানদিক বাঁদিক থাকতে পারে কিছু বিক্রিয়ায়। যেমন দুর্বল শক্তি বা বিটা কণা ক্ষয় কেন্দ্রের একদিকে বেশি অন্যদিকের চাইতে। পরের বছরই প্যারিটি

বা সাম্য অনবস্থিতির জন্য তাঁরা নোবেল পুরস্কার পেলেন। মাদাম উ এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন। তবে লি ও ইয়াং-এর ক্ষেত্রে আধানযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল, অর্থাৎ কোনও কণাকে তার বিপরীত কণা দিয়ে বদলে দিলেও সিস্টেমটা একরকম থাকত। একে বলে CP-র একত্র অভিমতা। ১৯৬৪ সালে ক্রোনিং আর ফিচ দেখালেন যে মসন নামক কণার এক বিক্রিয়ায় এটাও স্থির থাকছে না। বাকি রইল কেবল সময় (T)। CPT একত্রে একরকম থাকারাই বিজ্ঞানীমহলে ধরে নেওয়া হয়, এব বিরুদ্ধে কোনও তথ্য সেরকম জোব দিয়ে বলার মত এখনও নেই। ক্রোনিং ও ফিচ নোবেল পেলেন ১৯৮০ সালে। তার আগে পদার্থবিদ্যায় বহু ঘটনা ঘটে গেছে।

যেমন সেরেনকভ বিকীরণ আবিষ্কার, যা কোনও মাধ্যমে কোনওভাবে আলোব গতি নির্দিষ্ট মানের চাইতে কমে গেলে হতে পারে। আবিষ্কার্তারা (রুশ) নোবেল পেলেন ১৯৫৮ সালে। পরের বছর সেগের ও চেস্বারলেন পেলেন বিপরীত প্রোটন আবিষ্কারের জন্য। তারপবেব বছর ফেনা বাক্স (বাবল চেস্বার) তৈরির জন্য পুরস্কার দেওয়া হলো। পরমাণু কেন্দ্রে নিষে গবেষণার জন্য ১৯৬১ (হফস্ট্যাটার ও মসবাওয়ার), ১৯৬৩ (ডিগ্‌নাব, গোপার্টমেরার ও জেনসেন), ১৯৬৭ (বেথে), ১৯৬৮ (আলভারেস), ১৯৭০ (গেল ম্যান), ১৯৭৫ (বোব—নিলস্ বোরের ছেলে, নোটেলসন ও রেনওয়াটার), ১৯৭৬ (বিখটার ও টিং) ও ১৯৭৯ (গ্ল্যাশো, সালাম, ভাইনবার্গ) সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো। ১৯৬১, '৬৮, '৭৫ ও '৭৬ সালে হাতে কলমে পরীক্ষা, যন্ত্রপাতি তৈরি ও কণা আবিষ্কারের জন্য দেওয়া হলো। অন্য বছরগুলিতে মূলত তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য। তার মধ্যে গেলম্যানের কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। আগেকার ও সমকালীন সমস্ত কণার ধর্ম দেখে তাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনার কাজ উনি করলেন। প্রোটন, অ্যান্টিপ্রোটন, ইলেকট্রন, পজিট্রন, কয়েক ধরনের মেসন, এমনকি পাউলির ভবিষ্যদ্বাণী করা নিউট্রিনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে (কোওয়ান ও রেইনস, ১৯৫৭; নোবেল ১৯৯৫)। এদের একদল হলো লেপটন, আরেকদলের নাম হ্যাড্রন। দ্বিতীয় দলটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় বল মেনে চলে। এদেরই শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন গেলম্যান জেমস জয়েসের সৃষ্ট কোয়ার্ক শব্দটি ব্যবহার করে। হ্যাড্রনগুলি এখন তিনটি ভাগে ভাগ হলো—একদল ওপর ও নিচ কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি, সঙ্গে রয়েছে ইলেকট্রন ও ইলেকট্রন-নিউট্রিনো। দ্বিতীয় দল আশ্চর্য (স্ট্রেন্জ) ও চার্ম কোয়ার্ক দ্বারা নির্মিত, সঙ্গে মিউঅন (আগেব নাম মিউ মেসন) ও তার নিউট্রিনো। তৃতীয় দল টপ ও বটম কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি, সঙ্গে টাউঅন ও তার নিউট্রিনো। এর ব্যাখ্যায় গেলম্যান বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গ মার্গ প্রভৃতি নানা চিত্রকল্প হাজির কবেছিলেন, পুরোনো গবেষণাপত্র ও বইতে তার খবর মিলবে। এখন ছাত্রদেব বিষয়টা বুঝতে এগুলির প্রয়োজন হয় না।

গেলম্যানের কাজের পরে যদিও পরমাণু কেন্দ্র নিয়ে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় (যেমন ১৯৭৫ সালে), স্পষ্টতই পরমাণুকেন্দ্রিক গবেষণার গুরুত্ব কমে গেল। বাড়ল কণা নিয়ে গবেষণা। পদার্থবিদ্যার প্রশাখা হিসাবে আস্তে আস্তে কণা

পদার্থবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো আরম্ভ হলো। '৮০-র দশক থেকে ত ভাল ছাত্র কেউই আর পুরোনো পরমাণুকেন্দ্রিক গবেষণা করতে চাইত না, সকলেই কণাব খোঁজে ব্যস্ত। আকাশবিদ্যার গবেষণাও গুরুত্ব পাচ্ছিল বেশ।

এ ব্যাপারে প্রথম নোবেল জয়ী হেস (১৯৩৬), মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কারের জন্য। তারপর ইংরেজ অ্যাপলটন (১৯৪৭) যিনি প্রথম দেখান পৃথিবীর একপিঠ থেকে রেডিয়োটরঙ্গ কি করে অন্যপিঠে পৌঁছতে পারে। হাঙ্গ বেথের গবেষণার বিষয় ছিল তারাদের শক্তির উৎস। গল্প আছে একদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়ে তাঁর বান্ধবী আকাশের তারাদের সুন্দর ঔজ্জ্বল্যের কথা বললে বেথে বলেন, “হ্যাঁ আর একমাত্র আমিই জানি কেন ওরা অত উজ্জ্বল।” তাঁর প্রদর্শিত পথেই পরবর্তী বহু বিজ্ঞানী নক্ষত্রলোকে বিচরণ করেছেন। ১৯৭৪-এ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পান হেউইশ ও রাইল, পালসার আর রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যার জন্য। এই পালসার যে নিউট্রন তারা, যার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী চন্দ্রশেখর আগেই করেছেন, তা বুঝতে কিছু সময় লেগেছিল। চন্দ্রশেখর নোবেল পেলেন ১৯৮৩ সালে, ফাউলারের সঙ্গে, যিনি বেথের কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যান। ইতিমধ্যে '৬০-এর প্রথমেই উইলসন ও পেনজিয়াস মহাকাশের সর্বত্র একটা অদ্ভুত শব্দের উৎস পান যার ব্যাখ্যা একমাত্র বিগ ব্যাং বা মহাবিশ্ফোরণ তত্ত্ব দিয়েই করা সম্ভব। ঐ শব্দ হলো সেই মহা বিশ্ফোরণের স্ফীয়মান রেশ, যার তাপমাত্রা এখন তিন ডিগ্রি কেলভিনের কাছাকাছি। উইলসন, পেনজিয়াস শব্দ সর্বত্র প্রায় সমান দেখেন, সামান্য অসামানতা, যা এখন আরও বড় ও ভাল যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হচ্ছে, হয়ত মহাবিশ্বের প্রথমদিকের ইতিহাস গড়তে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করবে। উইলসন, পেনজিয়াস নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯৭৮ সালে। তারপর ১৯৮৫ সালে চন্দ্রশেখর ও ফাউলার ছাড়া জ্যোতির্বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে একমাত্র ১৯৯৩ সালে হালস ও টেলরকে, যারা ১৯৭৪ নাগাদ প্রথম ডবল পালসার দেখেন। এই ডবল পালসার আবার মাধ্যাকর্ষণীয় বিকিরণের একমাত্র উৎস, এখনও পর্যন্ত যা ধরায় অধরা হয়ে রয়েছে।

১৯১২-তে ভিক্টর হেসের দেখা মহাজাগতিক রশ্মি দেখিয়েছিল মহাকাশ কণা পদার্থবিদদের কাছে এক বিশাল ল্যাবরেটরি। তারপর কণার ত্বরণ নিয়ে বহু গবেষণা, যন্ত্র আবিষ্কার ও নোবেল পুরস্কারের পরেও ঐ রশ্মি ও তা থেকে উপজাত কণা এখনও মানুষের তৈরি সমস্ত ত্বরণযন্ত্রকে হার মানায়, যদিও বেশি শক্তিশালী কণার সংখ্যা এই রশ্মিতে নগণ্য। মোটামুটিভাবে ১৯৪০-এব দশক পর্যন্ত কিন্তু ঐ রশ্মিই পদার্থবিদদের অধিকাংশ নতুন কণার সন্ধান দিয়েছে। '৫০-এর দশক থেকে মানুষের তৈরি ত্বরণযন্ত্রে গিগাভোল্ট পর্যন্ত কণাদের ত্বরণ করা গেল, অর্থাৎ এই শক্তিতে প্রোটনের মত ভরযুক্ত কণাদের তৈরি করা সম্ভব। যত ত্বরণ বাড়ানো গেল তত অধিক ভরযুক্ত বা স্বল্পস্থায়ী কণা দেখা সম্ভব হলো। লেডেরম্যান, শোয়ার্জ কিংবা পার্ল এ ধরনের কাজ সহজতর করে দিলেন। পার্ল নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৯৫ সালে লেপটন নামে ইলেকট্রন ও মিউঅনের এক জাতভাইকে আবিষ্কার করার জন্য ('৭০-এর শেষের দিকে)। এদিকে

হফস্ট্যাটারের মত ফ্রিডম্যান, কেশাল ও টেলার অতি উচ্চগতির ইলেকট্রন দিয়ে হ্যাড্রনদের আক্রমণ করলে তাদের মধ্যে দানার মত কিছু দেখতে পান, যা কোয়ার্ক ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এই প্রথম কোয়ার্কের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো হাতে কলমে।
এঁরা নোবেল পেলেন ১৯৯০ সালে।

তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের ‘গেজ’ ধর্ম দেখা যায় অর্থাৎ তাদের সমীকরণ অবিকৃত যাকে যদি ক্ষেত্রগুলি কোয়ান্টাম ‘গেজ’ বলে একরকম জটিল সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয়। কম শক্তির কেন্দ্রীয় বলের ক্ষেত্রেও এই ধর্ম থাকবে কিনা এটা আগে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এই পথে চেষ্টা করে গ্লাশো, আবদুস সালাম আর ভাইনবার্গ ষাটের দশক থেকে ধীরে ধীরে তড়িচ্চুম্বকীয় বলের সঙ্গে কমশক্তির কেন্দ্রীয় বলকে একভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। তাঁরা নোবেল পুরস্কার পান ১৯৭৯ সালে। তাঁদের কাজের আরেকটা অংশ ছিল এক ধরনের ক্ষীণ বলের ফলে নিরপেক্ষ প্রবাহ দেখতে পাওয়া। এই ধরনের প্রবাহ কিছুদিন আগে দেখতে পাওয়া গেছে। এখানে বিভিন্ন বলের একীকরণ একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ জ্যোতির্বিদ্যা ও কণাবিদ্যার সর্বগ্রাহ্য মডেল তথা বিগ ব্যাং মডেল অনুযায়ী বর্তমান সৃষ্টির একেবারে শুরুতে একটি ধরনের পদার্থ ও বলই ছিল। বিস্ফোরণের ফলে তাতে অতিদ্রুত সম্প্রসারণ হতে থাকে। ফলে সর্বত্র সাম্যাবস্থা বজায় থাকে না, বিভিন্ন বল আলাদা হতে থাকে। শেষমেষ যে চারটি বল আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ, তড়িচ্চুম্বকীয় বল, শক্তিশালী (কেন্দ্রীয়) বল ও ক্ষীণ (কেন্দ্রীয়) বল, এগুলির একরকম বর্ণনা তাহলে সম্ভব। এখনও পর্যন্ত শেষ তিনটি একসঙ্গে ক’বা গেছে (তড়িচ্চুম্বকীয় আর ক্ষীণ বলের মেল ত সালাম, গ্লাশোরাই ঘটিয়েছিলেন), কিন্তু মাধ্যাকর্ষণকে এখনও এদের সঙ্গে মেলানো যায় নি। আইনস্টাইন থেকে বহু বিজ্ঞানীই এই কাজে বহু সময় ব্যয় করেছেন। বর্তমান বিজ্ঞানীদের আশা স্থিৎ তত্ত্ব।

পদার্থবিদ্যার একটি বিষয় আমরা এখনও আলোচনা করিনি, তা হলো ঘন পদার্থের বিজ্ঞান। বরাবরই এই বিষয়টি প্রযুক্তিভিত্তিক ছিল। একসময়ে উল্লাসিক ছাত্ররা এই বিষয়ে পড়তে নাক কঁচুকোতেন পর্যন্ত। বিশ শতকের প্রথমদিকে ত্র্যাগদেব কাজ, কি সিগবানের ইলেকট্রন স্পেকট্রোস্কোপি, এগুলি খুব শীগগিরই ঘন পদার্থের তথা কেলাসিত পদার্থের বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে। পার্সি ব্রিজম্যান উচ্চচাপে পদার্থের অবস্থা পরিবর্তন দেখেন ত্রিশের দশকে, নোবেল পুরস্কার ১৯৪৬-এ। ’৪০-এর দশক থেকেই কম শক্তির নিউট্রন পরীক্ষা পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছিল কণাবিদ্যার পরীক্ষা থেকে। দেখা গেল এই কণার বিচ্ছরণও কেলাসিত পদার্থের গঠন খুব ভাল জানাতে পাবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য উপায়ে ব’লে চাইতে (যেমন এক্স রশ্মি, ইলেকট্রন রশ্মি) চাইতে আরও ভালভাবেই। বর্তমানে এই প্রক্রিয়া পদার্থের গঠন জানার সবচেয়ে সংবেদনশীল উপায় হিসাবে পরিচিত। এই কাজের জন্য গুল ও ব্রুকহাউস নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯৯৪ সালে।

ফিলিপ অ্যান্ডারসন ঘন পদার্থের তত্ত্বের জন্য বহু খ্যাত। তিনি প্রথম বিশৃঙ্খল কেলাসের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন। অধিকাংশ ঘন পদার্থই যা আমরা দেখি বা ব্যবহার

করি, সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। সুতরাং অ্যাণ্ডারসনের কাজের প্রচারও হয়েছে বহুদিন আগে থেকেই। বৃটিশ বিজ্ঞানী নেভিল মট ঘন পদার্থের অবস্থান্তর নিয়ে গবেষণা করেছেন। কোন অবস্থায় চৌম্বক পদার্থ ঐ ধর্ম বজায় রাখবে বা হারিয়ে ফেলবে এ ব্যাপারে মট, নিল, কুরি প্রভৃতিদের কাজ এখনও স্মরণ করতে হয় গবেষকদের। ভ্যান ড্লেক, ব্লখের মত, চৌম্বক পদার্থের ইলেকট্রন ঘূর্ণনের দিক থেকে ব্যাখ্যা করেন। কেনেথ উইলসন দেখান পদার্থের অবস্থান্তর কীভাবে আণবিক চিত্র থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।

এঁদের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রমী চরিত্র লিও ল্যানডাউ। তাঁর শিক্ষক পিটার কাপিংসার আগেই ইনি নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ল্যানডাউ তাঁর এক ছাত্র তথা সহকর্মী লিফশিৎসের সঙ্গে রাশিয়ায় পদার্থবিদ্যায় উচ্চশিক্ষার্থীদের জন্য আকাদেমি খোলেন। তাদের শিক্ষা দেবার প্রয়োজনে পদার্থবিদ্যার সমস্ত শাখার ওপর বড় বড় বই লেখেন, আজও যা গবেষক ও শিক্ষক মহলে সারা বিশ্বে আদরণীয়। ল্যানডাউয়ের যে কাজ নোবেলে স্বীকৃতি পায় তা হলো তরল ইলেকট্রনের মত পদার্থের ধর্ম ব্যাখ্যা করা। পিটার কাপিংসার প্রধান কাজ খুব ঠাণ্ডায় ঘন পদার্থের ব্যবহার নিয়ে।

তাপমাত্রা কমালে অধিকাংশ কেলাসিত পদার্থের তথ্য ধাতুর রোধ কমে যায়, কিন্তু সবসময়ে একভাবে নয়। ১৯১১ সালে হল্যান্ডের ক্যামারলিং ওন্স প্রথম দেখেন পারার রোধ খুব ঠাণ্ডায় (প্রায় ৪ ডিগ্রি কেলভিন) হঠাৎ একেবারে কমে শূন্যের কাছে চলে আসে। এই অবস্থাকে অতিপরিবাহী নাম দেওয়া হয়। প্রযুক্তির দিক থেকে এই সব পদার্থ খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এদের তৈরি তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠালে তার পরিমাণ কমার কোনও কারণ নেই। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর লাভ, ভোক্তাদের কম খরচ। কিন্তু অত ঠাণ্ডায় ধাতুগুলোকে রাখাই মুশকিল। যাই হোক, এই অতিপরিবাহিতার প্রথম ব্যাখ্যা এল '৬০-এর দশকে। বি সি এস তত্ত্ব বলে পরিচিত এই তত্ত্ব তার সৃষ্টিকর্তাদের নোবেল এনে দিল ১৯৭২ সালে। ক্যামারলিং ওন্সেব প্রথম আবিষ্কারের ৭৫ বছর বাদে আরেক বিজ্ঞানী। বেডনোর্জ ও মুলার দেখলেন একধরনের কণার অক্সাইড যৌগের অতিপরিবাহী ব্যবহার ৩৫° কেলভিনে, অর্থাৎ আগের চাইতে অনেক উচ্চ তাপমাত্রায়। দ্রুত বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এই কাজে হাত দিলেন। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরাও বাদ যান নি। এখন প্রায় ১০০° কেলভিন তাপমানেও অতিপরিবাহী পদার্থ তৈরি করা গেছে, যদিও তা দিয়ে ধাতব পরিবাহী তার ইত্যাদি এখন সুলভ করা যায় নি। বেডনোর্জ ও মুলার নোবেল পুরস্কার পান ১৯৮৭ সালে। অতিপরিবাহিতার জন্য আরেকজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ব্রায়ান ডেভিডসন ১৯৭৩ সালে পুরস্কার পান দুটি বিভিন্ন অতিপরিবাহী ধাতু সংযোগস্থলে কী হয় তা নিয়ে গবেষণা করে।

এছাড়া আছে অন্যান্য (অর্থাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ কেলাসিত নয় এমন) ঘন পদার্থ নিয়ে গবেষণা। যেমন শকলি, বার্ডিন ও ব্র্যাটেন নোবেল পুরস্কার পান ১৯৫৬ সালে ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের জন্য, যা সলিড স্টেট ইলেক্ট্রনিক্স নামে একটা ভোগ্যপণ্যের বিপ্লব এনে দিল। ঐ ধরনের অর্ধপরিবাহী পদার্থের ওপর কাজ করে এসাকি টানেল ডায়োড

আবিষ্কার করেন। ৮০-এর দশকের প্রথমে ফন ক্লিৎসিং দেখলেন কোয়ান্টাম হলো প্রক্রিয়া। ২০০০ সালে নোবেল পেলেন আলফেরড, ক্রোমার ও জ্যাক কিলবি বহুদিন আগেকার অর্ধপরিবাহী পদার্থের ওপর কাজের জন্য। কিলবি তৈরি করেছিলেন প্রথম আই সি অর্থাৎ যাকে আমরা আজকাল চিপ বলে থাকি। টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টস কোম্পানির সেটা প্রথম যুগের ঘটনা, আজ থেকে ত্রিশ বছরেরও আগে।

আর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো লেজার ও মেজার, যা যুদ্ধবিমান ধ্বংস করা, ক্ষেপণাস্রের দিক নির্ণয় থেকে মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ, চিকিৎসা তথা বাচ্চাদের খেলনায় (ভিডিও গেম) ব্যবহার হচ্ছে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ও ফেজ কন্ট্রোল মাইক্রোস্কোপ আণবিক গবেষণায়, বিশেষ করে জৈব অণু ও আজকের ন্যানো পদার্থের গঠন বার করতে অপরিহার্য। অবশ্য অসংখ্য নতুন যন্ত্র বার হয়েছে এই দিকে, যেমন স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ, (যাতে প্রথম পরমাণুর ছবি দেখা গেল ৮০-র দশকে), পদার্থের বাইরের স্তরে কোনও গ্যাস অণু লাগিয়ে তার থেকে বিচ্ছুরণ প্রভৃতি।

১১

অর্ধপরিবাহী পদার্থ নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা থেকে ক্রোমার দেখান যে একাধিক এ ধরনের ঘন পদার্থের মিশ্রণে পরিবাহী ধর্ম সম্পূর্ণ অন্যরকম করে সাজানো যেতে পারে। আলফেরডের সঙ্গে তিনি প্রস্তাব দেন এ ধরনের মিশ্রণ, যাদের এখন মিশ্রগঠন (হেটেরোষ্ট্রাকচার) বলে অভিহিত করা, ডিজাইনার লেজারের পর্যন্ত উৎস হতে পারে। জ্যাক কিলবি, যিনি ১৯৫৮ সালে প্রথম একীভূত (ইন্টিগ্রেটেড) চিপ বা সংক্ষেপে আই সি বা শুধুই চিপ তৈরি করেন, আলফেরড আর ক্রোমার একসঙ্গে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেন ২০০০ সালে।

পদার্থবিদ্যায় গবেষণার বহু ফসল প্রযুক্তির জন্ম দিয়েছে সরাসরি—যেমন ট্রানজিস্টর, লেজার ও মেজার। কিছু কিছু গবেষণালব্ধ প্রক্রিয়া (টেকনিক) বা যন্ত্র যে কণার ত্বরণ যন্ত্র ঐ বিষয়ে ছাড়াও ঘন পদার্থের গবেষণা, এমনকি চিকিৎসাতেও কাজে লাগে। আমাদের শরীরের ভিতরের অবস্থা জানতে গেলে ফাইবার অপটিকের সাহায্য নিতে হয়। মস্তিষ্কের ছবি তুলতে গেলে ত ক্যাট স্ক্যান (যার মূল ভ্যান ড্রেক, রাবির আবিষ্কার) এবং উন্নততর পেট (পজিট্রন টোমোগ্রাফি) স্ক্যান (কণার ত্বরণ যন্ত্র থেকে উদ্ভূত পজিট্রন রশ্মি) ছাড়া গতি নেই। কণা দেখার জন্য উইলসনের বাস্তব (নোবেল ১৯২৭) প্রথম দিকে যথেষ্ট ছিল। ৫০-এর দশকে ২০-৩০ গিগাভোল্ট শক্তিসম্পন্ন কণাদের জন্য এই বাস্তব আর কাজ হলো না। তখন প্লেনার বার করলেন তাঁর ফেনা বাস্তব (নোবেল ১৯৬০) ৮০র দশক পর্যন্ত তা দিয়ে দিব্যি কাজ হলো। ইতিমধ্যে আরও শক্তিশালী, আরও অল্পজীবী কণা দেখা দরকার। তখন চারপাখ তাঁর তারের বাস্তব তৈরি করলেন—সেখানে একসঙ্গে অনেক যন্ত্রাংশ, অনেক তাব ইত্যাদি। এতে খুব সূক্ষ্ম কাজ করা সম্ভব হলো। চারপাখ নোবেল পেলেন ১৯৯২ সালে। একেবারে প্রথমদিকে,

১৯১২ সালে ডালেন নোবেল পুরস্কার পান স্বয়ংক্রিয় আলোর কাজে, যা তখনই জাহাজে, বয়ানে ও লাইটহাউসে ব্যবহার হতে শুরু করেছিল। লিপম্যান ফটোগ্রাফির নেগেটিভের ওপর যে কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার পান, ঐ ব্যাপারে তাঁর কাজের প্রয়োগ হয় না ঠিকই। কিন্তু কয়েকদশক ধরে লেজার দিয়ে হলোগ্রাম তৈরিতে তাঁর প্রক্রিয়া অপরিহার্য। গেবর অবশ্য ঠিক এই জন্যই আলাদা করে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৭১ সালে। জার্নিকের ফেজ বৈপরীত্যের মাইক্রোস্কোপের কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পান ১৯৫৩ সালে। ১৯৮৬ সালে পেলেন বিনিং ও রোহরার স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ আর রুস্কা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের জন্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থা বরাবরই প্রযুক্তিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মার্কনি আর ব্রাউন রেডিওর জন্য নোবেল পান ১৯০৯ সালে। আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাঙালিরা, মনে করেন মার্কনির জায়গায় জগদীশ বসুর পাওয়া উচিত ছিল একাজের জন্য এই পুরস্কার। সে যাই হোক, মার্কনি প্রথম অ্যানটেনা ব্যবহার করেন, প্রথম কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত সিগন্যাল সঠিক পাঠাতে পারেন (শেষে যা নোবেল কমিটিকে প্রভাবিত করে তা হলো ১৯০১ সালে অতলান্তিক মহাসাগরের দুই পারের মধ্যে রেডিও যোগাযোগ স্থাপন)। ব্রাউন প্রথমদিকের টিভির ছবির টিউব নিয়েও কাজ করেছেন। অ্যাপালটনের কাজ ত বলাই হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বিশেষ বিশেষ বা কিছু সৃষ্টিছাড়া জিনিষেই যেন পদার্থবিদদের আগ্রহ বেশি। যেমন অতিপরিবাহী কি অর্ধপরিবাহী ঘন পদার্থ, কি অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষণস্থায়ী কণার ভরণ। এর কারণ বলা হয় যে সাধারণভাবে বিজ্ঞানীরা তাতেই আগ্রহী হন যেটা গতানুগতিক ব্যাখ্যার বাইরের জিনিস। অবশ্য এই কথা পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। তার কারণ কণাদের একবার জানা হয়ে গেলে মনে হয় আরও বড় যন্ত্র বানিয়ে কীই বা বেশি জানা যাবে? কণা পদার্থবিদদের কাছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের কাছে তার দাম কতটা। উত্তরে গুঁরা বলবেন, যে স্ট্যাণ্ডার্ড মডেল ধরে আমরা অতিক্ষুদ্র কণা থেকে মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থের ধর্ম ব্যাখ্যা করছি, তাতে কোনও সামান্যতম খুঁত কি অজানা জিনিস থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ১৯৮৪ সালে নোবেলপ্রাপ্ত কারলো কবিয়া বলেই ফেলেছিলেন “এবার থেকে ভাবি যন্ত্র আর ইঞ্জিনিয়ারদের ছাড়া কণা পদার্থবিদ্যা অচল হয়ে যাবে।” অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ।

এবার বিনিয়োগকারীরা এমন একটা ব্যাপারে বিনিয়োগ করবে কেন যেখানে লক্ষ্যটাই ধোঁয়াটে। তাব উপর যেখানে একটি যন্ত্রেব দাম বহুদিন লক্ষ ছাড়িয়ে কোটিতে পৌছেছে। তখন বলা হয় দেখো, এখন থেকেও চিকিৎসায় কাজে লাগে এমন জিনিস (পজিট্রন রশ্মি যেমন) বার হয়। যদি তাত্ত্বিক গবেষণা বলে, বহুদিন আগেই ঘনবস্তুর গবেষকরা কণা পদার্থবিদদের উদ্ভাবিত তত্ত্ব ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছেন।

এখন আবার এই সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য ব্যবহৃত হচ্ছে যাকে বলে নরম ঘন বস্তু (সফট কনডেনসড ম্যাটার) তার গবেষণায়। তার আওতায় পড়ে না এমন বিষয় নেই।

জীববিদ্যা, বিশেষ করে আণবিক স্তরে, প্রাণীর বয়স হওয়া, প্রজাতির বিলুপ্তি বা বৈচিত্র্য, বড়সড় অণুর ব্যবহার ও ধর্ম, বুদ্ধি, বিকাশ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব, এমনকি বাজার ও তার অর্থনীতি—সবই করছেন পদার্থবিদরা। এসব কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে নিয়মিত এমডোকেবডো জিনিষ (ফ্র্যাকটাল), স্নায়ুজাল (নিউরাল নেট), জিন দিয়ে এমনকি ডিএনএ দিয়ে গণনা (জেনেটিক বা ডিএনএ কম্পিউটিং) ইত্যাদির তত্ত্ব। বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব (কেওস) ত কিছুটা পুরোনো হয়ে এল এখন। তবে বিশৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ (কম্প্লেক্স অব কেওস) এখনও ফ্যাশনেবল আছে।

শেষের দিকে যে নামগুলো এসেছে তার মধ্যে অঙ্ক আর কম্পিউটার অনিবার্যভাবে উপস্থিত। সূত্রাং এই দুটি বিষয়ে কিছু আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক। কম্পিউটারের সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা আছে এই পত্রিকায়। আপাতত অঙ্ক নিয়ে কিছু চর্চা করা যাক। আর্কিমিডিস, টলেমির সময় থেকে অঙ্ক বিজ্ঞানীদের একটা বড় হাতিয়ার। অঙ্ক নিয়ে সাধারণ লোকের একটা ভয়ও থাকে। যারা অতিরিক্ত অঙ্ক করেন তাঁরা একটু অন্যরকম। যেমন আর্কিমিডিসের “ইউরেকা, ইউরেকা” বলে মানের টব থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে পড়া, অথবা উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে সৈন্যকে বিরক্ত করতে মানা কবা এই ধারণাকে পাকা করে। আধুনিক যুগেও অনেক ভাল মজার গল্প আছে, অন্য সময় তার অবতারণা করা যেতে পারে। কিন্তু আবস্থাগুণ্টা চিন্তা মাত্রই নিয়ে থাকলে সামাজিক জীবের চালচলন অন্যদের থেকে আলাদা হতে বাধ্য, কারণ সাধারণ লোকে ততটা আবস্থায়াকশনের ধার নাও ধারতে পারে। ভিটগেনস্টাইন কেন্সিজে পাড়ানোর সময় মাঝরাতে ছাত্রদের হোস্টেলে হানা দিয়ে কয়েকজনকে নিয়ে নৌকো বাইতে কি পশ্চিমি ছবি দেখতে যেতেন। এরকম ব্যবহার সঙ্গীতকার, লেখক, দার্শনিকের কাছেও পাওয়া যেতে পারে, পাওয়া গেছেও। তবু সাধারণে অঙ্ক ও অঙ্কশাস্ত্রীদের সম্বন্ধে ভীতিমিশ্রিত বিশ্বাসের ভাব থাকে।

পশ্চিমি ধাঁচের আধুনিক গণিত রেনেসাঁর পরবর্তী। আমরা ইচ্ছে করে আরবদেশের বা আমাদের দেশের কি অন্যত্র এ বিষয়ের চর্চার প্রসঙ্গ তুলছি না। যেমন ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনই অঙ্কে এখন সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে চলতি গণিত হচ্ছে পশ্চিমি আধুনিক গণিত। নিউটন ও তাঁর সময়কার কথা, লাইবনিৎস, দেকার্ত প্রভৃতিদের কথা বলা হয়েছে। লাপ্লাস, লাগ্রাঞ্জের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এরও পরে অর্থাৎ ফার্মা, অয়লার, হ্যামিলটন, গাউস, ভিয়েরস্ট্রাস, কশি, রীমান, গলোয়া, ক্যান্টর, ডেডেকাইন্ডের ধরে উনিশ শতকের শেষের দিক। অর্থাৎ রাসেল, হার্ডি, হোয়াইটহেড, ফিখ্টে, মুব, পোয়াঁকার, হিলবার্ট প্রভৃতি। এঁদের ছাত্ররা অনেকেই ভৌতবিজ্ঞানের নতুন আন্দোলনের সঙ্গে একেবারে যুক্ত যেমন ফন নয়ম্যান, ভিগনার ইত্যাদি। নিউটন থেকে ঐ অবধি পবিত্রবর্তনের ধারার রূপটি কেমন?

ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার মতই ক্লাসিকাল গণিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে লাগল আর একই সঙ্গে বিভিন্ন দিকে বিস্তার লাভ করল। যেমন দ্বি-ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি থেকে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি, সরল থেকে জটিল সংখ্যা, দ্বি-ত্রিমাত্রিক থেকে বহুমাত্রিক সমীকরণ, ভেক্টর

থেকে ম্যাট্রিক্স ইত্যাদি। একই সঙ্গে, বিশেষ করে ভৌত বিজ্ঞানের বর্ণনার কাজে ব্যবহৃত হয়ে ক্যালকুলাসের ক্রমোন্নতি হচ্ছিল। সেই সঙ্গে শ্রেণী ও শ্রেণীবদ্ধ সংখ্যা তত্ত্বও জানা যাচ্ছিল ক্রমশ বেশি করে। এইসব হয়ে উনিশ শতকের দিকে ক্লাসিকাল ভৌত বিজ্ঞান যখন যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, তখন অঙ্কের দিক থেকে ক্লাসিকাল জানা জিনিসগুলি সিস্টেমে দানা বাঁধছে। রাসেল, হোয়াইটহেড তাঁদের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা প্রকাশ করলেন, তার আগে ফ্রিটে ও অন্যান্যরা, তার পর ভিটগেনস্টাইন তাঁর ট্র্যাক্টেটাস লজিকো ফিলজফিকাস। সবই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে নয়ত তার অব্যবহিত পরেই। বাকি থাকে কী?

হিলবার্ট ঐ যুগান্তে পাবিতে যে ঘোষণা করেন, অর্থাৎ তাঁর বলা সেই দশটি সমস্যা যার সমাধান হলে গণিতে তার জানার কিছুই বাকি থাকে না, তার সবগুলিই বহুদিন জ্বলিয়েছে গাণিতিকদের। ত্রিশের দশকে একটি সমস্যার সমাধান হলো, সেটা এত বড় মাপের যে তারপর থেকে গাণিতিকরা ত বটেই, কোনও বিজ্ঞানীই আর সার্বিক সিস্টেম তৈরির কথা ভাবতে পারেন কি বহুদিন। চার্চ, গোডেল আর টিউরিং মিলে দেখালেন এমন গাণিতিক সমস্যা থাকতে পারে গণিতে যার সমাধান নেই। অর্থাৎ কোনও লজিকাল সিস্টেম একই সঙ্গে সার্বিক ও অব্যভিচারী হতে পারে না। টিউরিং-এর কৃতিত্ব এই যে ঐ সঙ্গে তিনি একটি গণকযন্ত্রের তাত্ত্বিক মডেল দিলেন যাতে এই প্রমাণ দেখানো যায়। পরে বোঝা গেল ঐ টিউরিং যন্ত্রই আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের সহজতম খসড়া। দ্বিতীয়যুদ্ধে টিউরিং বৃটেনের সাংকেতিক বার্তা বোঝার কাজে নেতৃত্ব দেন, যাতে জার্মান সেনাদের পাঠানো বহু সাংকেতিক তথ্য বুঝতে পারা সম্ভব হয় এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেওয়া যায়। আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধি গবেষণাতেও টিউরিং একজন পথিকৃৎ। তিনিই প্রথম একটি পরীক্ষার কথা বলেন যাতে করে কৃত্রিম বুদ্ধি প্রকৃতই বুদ্ধিমান কিনা তা ধরা যেতে পারে। প্যাটার্ন ইত্যাদির গবেষণাতেও তাঁর অবদান স্বীকৃত।

কিন্তু এতবড় ধাক্কাতেও অঙ্কশাস্ত্রের ক্লাসিকাল চেহারা পালটালো না। কেবল বিভিন্ন ধারার গবেষণার মধ্যে মিল দেখা, এক বিষয়ের তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া অন্য জায়গায় কাজে লাগানো, এ সবই বেড়েছে। একমাত্র যে নতুন বিষয় অঙ্কশাস্ত্রের শরিক হয়েছে বলা যেতে পারে তা হলো পরিসংখ্যান বিদ্যা (স্ট্যাটিস্টিক্স)। এটি তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণভাবেই অনিশ্চয়তা ব্যাপারটা বোঝার জন্য। প্রোবাবিলিটি ও পরিসংখ্যান দুটিই কিন্তু প্রায়োগিক গণিতের বিষয়। বিশুদ্ধ গণিতবিদরা ঐ সবার ধার মাজান না। তাঁদের কাজেরও কদর আছে (সত্য সেলুকাস!) তবে মূলত তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিদদের কাছে, যারা কেবল দূর মহাকাশের ফাঁকফোকব বা গলিঘূর্ণি নিয়ে মাথা ঘামান, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এর উপস্থিতি সামান্য।

ধরা যাক যে কোনও বহুমান ঘটনার কথা। চলমান প্রক্রিয়ার গাণিতিক প্রতিক্রিয়া সাধাবণভাবে কোনও ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ দিয়ে বর্ণিত হয়। কিন্তু ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ বা তৎসম্বন্ধীয় ক্যালকুলাস মাত্রই লিমিট ও ধাবাবাহিকতার আইডিয়ার ওপর

দাঁড়িয়ে আছে। যার মূল কথা হলো চলন্ত প্রক্রিয়াকে দুটি খুব কাছাকাছি সময়ের বিক্ষিপ্ত ঘটনার পরম্পরা হিসাবেই দেখা। তাহলে দেখা যাচ্ছে চলন্ত প্রক্রিয়ার এরকম বর্ণনাব মধ্যেই অসঙ্গতি রয়েছে। আজকের একবিংশ শতকেও আমরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে এ ব্যাপারে।

অনিশ্চয়তার বিষয়ে গাণিতিকদের ছুতমার্গ আরও ভয়াবহ। রেনেসাঁ পরবর্তী এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিংশ শতকের মাঝামাঝি অ্যান্ডারসন কেবল ননস্ট্যাণ্ডার্ড অ্যানালিসিস বলে একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন, যার মূল কথা হলো বিস্মৃ নয়, খোলা সেট দিয়ে অঙ্কের আলোচনা। এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে উনি একক সেনানী রয়ে গেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ভৌত (এমনকি জৈব) বিজ্ঞানে যে সব সুন্দর গাণিতিক তত্ত্ব ও তথ্যের উদ্ভব হয়েছে, সবই ব্যবহারিক প্রয়োজনে, গণিতশাস্ত্রের আধুনিক রূপকে পালটে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু কি ফ্র্যাক্টাল, কি কেয়স, বা স্নায়ুজাল তত্ত্ব বা অন্য কিছু গণিতের মূল ধাবায় আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। অথচ প্রায়োগিক গণিতে এর মূল্য অপরিমিত। তাই ঐ বিষয়ের গবেষক বিজ্ঞানীরা, পরিসংখ্যানবিদ ও অন্যান্য ভৌত বিজ্ঞানীরা ত বটেই, প্রচুর পরিমাণে এই সব দিকে কাজ করে গণিতের ভিত এই দিকে মজবুত করছেন। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে এই সব বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার শিক্ষক-গবেষকদের, তথাকথিত প্রাকৃতিক ও জৈব বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কম্পিউটার বিশারদ, ফলিত গাণিতিক তথা পরিসংখ্যানবিদ, অর্থশাস্ত্রী, সমাজবিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক এমনকি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের এক জায়গায় এনেছে। কোনও বিষয়ই এঁদের কাছে অচুত্ব নয়।

১২

১৯৮০তে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকেই বায়োটেকের জয়যাত্রা অব্যাহত। আমরা দেখেছি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই, অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের কয়েক দশকের মধ্যেই, যুক্তরাষ্ট্রের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্তব্যাক্তিরা সরকারি মদতে, সরকার হলে আইন করে, বিদেশি গাছগাছড়া উদ্ভিদ ইত্যাদি নিজেদের দেশে নিয়ে আসছেন—ওদেশের জৈববৈচিত্র্য বাড়াতে। সব সময়ে যে ব্যাপারটা আইনমাফিক হচ্ছে তা নয়। পিজ্জাবো, কোর্টেজ প্রভৃতির দক্ষিণ আমেরিকা লুণ্ঠনরাজ করার সময়, অথবা পায়োনিয়াররা (যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দিককার বহিরাগত ইউরোপীয়রা) যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য ও পশ্চিমদিকে নিজেদের অধিকার কায়ম করার সময় নিশ্চয় নেটিভ অধিবাসীদের অভিভাবদন কবে উভয়পক্ষের উকিল ডেকে চুক্তিপত্রে সই করেন নি। ওদেশের স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানদের মেরে সম্পত্তি কেড়ে তছনছ কবে, এমনকি কিছু কিছু জায়গায় অধিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। যেমন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। মনে করা হয়, বহিরাগত ইউরোপীয় নাটক ও সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সিফিলিস ইত্যাদি রোগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আগেকার মানুষজন। এখন ওখানকার অধিবাসীরা বর্ণসঙ্কর জাতি মাত্র।

এহ বাহ্য। আধুনিক যুগে বেআইনি কাজের নমুনা বায়োটেক জগতের প্রথম থেকেই। ১৯২৬ সালে হেনরি ওয়ালেস যখন হাই ব্রেড কোম্পানি খোলেন সঙ্কর ভূড়ার বীজ উৎপাদন করেন তখনও তিনি কেউকেটা হননি। তারপর ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেন্টের সময় তিনি দুবার কৃষি সচিব ও একবার সহ সভাপতি হন। নিশ্চয় তাতে তাঁর কোম্পানির সুবিধে হয়েছিল কারণ এখনও সেই কোম্পানি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ভালই করছে। তারপর '৪০এর দশক থেকে ফোর্ড ও রকফেলার কোম্পানি মেক্সিকোতে দেখাল চাষবাসের উন্নতি করা যায় সঙ্কর প্রজননের সাহায্যে। মেক্সিকো কিছুদিন গম ইত্যাদি রপ্তানিও করল। ১৯৬০ সালে এই দুই সংস্থা ফিলিপিনসে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র খোলার কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের দেশের এক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এদেশের একটি গবেষণাগারে সম্বৃত সমস্ত খাদ্যশস্যের বীজ ওখানে তুলে দিলেন, এদেশের সরকারের অনুমতি ছাড়াই। অবশ্যই তাঁর আন্তর্জাতিক স্তরে পুরস্কার মিলল তাতে এদেশে আরও খ্যাতিলাভের পথ সুগম হলো।

১৯৮৫ সালে জেনেটিক বিজ্ঞান নামের একটি সংস্থা, যা ইতিমধ্যে জেনেটিক পরিবর্তন ঘটানো বীজাণু স্ট্রবেরি গাছে প্রয়োগ করার জন্য ওদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থার কাছে আবেদন করেছিল, চুপিসারে নিজেদের কারখানার বাইরের গাছে আরেকটি পরিবর্তিত জীবাণু ছেড়ে দিল। পরে এই কাজের ফল দেখিয়ে ওরা আরও জিনিষ বাজারে ছাড়ে। ঐ সময় থেকেই অর্থাৎ '৮০র দশক থেকেই জেনেটিক পরিবর্তন ঘটানো গাছপালা, বীজাণু ও প্রাণীর দিকে নজর পড়ছিল বায়োটেক কোম্পানিগুলোর, এদের গুরুত্বও বোঝা যাচ্ছিল।

১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা জিন পরিবর্তিত তামাক গাছ চাষের অনুমতি দিল। পরের বছর ক্যালজিন কোম্পানি পরিবর্তিত টমাটো তৈরি করল, যা অনেক দিন অপরিবর্তিত থাকে। জেনেটিক বিজ্ঞান স্ট্রবেরি ক্ষেতে পরীক্ষার অনুমতি পেল। ১৯৮৮ সালে জেনেনকর কোম্পানি বিশেষ প্রোটিনেজ এনজাইমের পেটেন্ট নিল, যা ভবিষ্যতে কাপড় কাচা সাবানে যুক্ত হবে। হফম্যান লা রোশ আর সেটাম কোম্পানি যুক্তভাবে অনুমতি পেল দুটি ক্যান্সারের ওষুধের—এই সংযুক্ত লাইসেন্স পরে একাধিকবার বিভিন্ন কোম্পানির কাছে লাগবে।

১৯৯০ সালে ব্যানাজিন সংস্থার তৈরি জেনেটিক বদল ঘটানো তুলো গাছের পরীক্ষামূলক চাষ হলো। সে বছর উদ্ভিদ জিন বিকাশ কেন্দ্রে আরও দ্রুত আরও বেশি ও নির্ভরযোগ্য জিন পরিবর্তন ঘটানোর রাস্তা বার হলো। বুকের ক্যান্সারের জিন আবিষ্কৃত হলো। প্রথম মানুষের দুধের প্রোটিন গোরুর জিন পরিবর্তন করে গোরুর দুধে পাওয়া গেল। সেটা এবার বাচ্চাদের শুঁড়ো দুধে যাবে। সেবছরই প্রথম জিন চিকিৎসা হলো একটি চার বছরের বাচ্চা মেয়ের। মেয়েটি বিশেষ ধরনের স্নায়বিক অসুখে ভুগছিল। চিকিৎসার ফল ভালই, কিন্তু প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি হলো। সেই বছর মানুষের জিন প্রকল্প সরকারিভাবে চালু হলো আন্তর্জাতিক স্তরে। সেই বছর “জুরাসিক পার্ক” বলে একটি

বই প্রকাশিত হলো। মাইকেল ক্রিকটনের অন্যান্য বই, যেমন “অ্যাড্‌মিডা স্ট্রেন” নিয়ে আগেই সিনেমা হয়ে গেছে। এই বইটি নিয়ে সিনেমা অবশ্য বিশেষ সাড়া জাগাবে।

১৯৯০ এর দশকের প্রথম দিকে বৃকের ও ডিম্বকোষ নিঃসারক অংশের ক্যান্সারের জিন নির্দিষ্ট করা গেল। ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ নিয়ামক সংস্থা রায় দিল জেনেটিক পরিবর্তন ঘটানো খাবারদাবার নিয়ে চিন্তার কারণ নেই, এগুলো নিরাপদ। তাই এ বিষয়ে কোনও আইনেরও প্রয়োজন নেই। সে বছরই বায়োটেক কোম্পানিগুলির এক সংগঠন তৈরি হলো। সেই বছর আবার মানুষের ভ্রূণ পেট্রি ডিশে কিছুদিন বাঁচিয়ে রেখে পরীক্ষা করা হলে ভীষণ হইচই হয়। ফরাসী বিজ্ঞানীরা মানুষের সব ২৩টি ক্রোমোজোমের একটি খসড়া মানচিত্র করে দিলেন।

পরের বছর আরেকটি পরিবর্তিত টমাটো বাজারে এল। বহু অসুখের, বৃকের ক্যান্সার, মোটা হবার প্রবণতা, কোষের মৃত্যুর জন্য দায়ী, এমনকি এইডস ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির কারক জিনগুলি চিহ্নিত হলো। এছাড়া বধিরতা, থাইরয়েডের ক্যান্সার, বাচ্চাদের অকালমৃত্যু, মেলানোমা, প্রোস্টেটের ক্যান্সার, বামনতা ইত্যাদি জিনও নির্দিষ্ট করা গেল। সিস্টিক ফাইব্রোসিস রোগের চিকিৎসার জন্য জিন পরিবর্তন করে তা ইঁদুরে ঢুকিয়ে আবার মানুষের দেহে ফিরিয়ে আনা হলো। মানুষের ডিএনএজ এনজাইম পরিবর্তন করে ব্যবহার করা সম্ভব হলো, প্রথম মানুষের ডিএনএ সংক্রান্ত পরিবর্তিত ওষুধ। বিপরীত ধাঁচের (অ্যান্টিসেন্স) নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলার সাহায্যে কেবল বিশেষ জিনকে অব্যবহার্য করে রাখা গেল এই প্রথম। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের চিকিৎসার জন্য বেলুন অ্যাক্সিওপ্লাস্টি করলে যেসব অসুবিধা হতো, তার জন্যও বায়োটেক ওষুধ বাজারে এল। মানুষের জিনের প্রথম খসড়া মানচিত্র আরেকটু বিশদ হলো। টেলোমারেজ উৎসেচক ও তার পরিবর্তন থেকে মানুষের ক্যান্সারের সমস্যার কথাও জানা গেল। এর থেকে ভবিষ্যতে বহু নতুন পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রণালী বার হতে পারবে।

১৯৯৫ সালে প্রথম পরিবর্তিত শুয়ার থেকে বেবুনে হৃৎপিণ্ড বদল করা গেল। তারপর সেই বেবুন থেকে একজন এইডস রোগীতে অস্থিমজ্জা সংস্থাপিত হলো। সে বছর ইনফ্লুয়েঞ্জা বীজাণুর পুরো জিনগুলি প্রকাশিত হলো। জিন পেটেন্ট নেওয়ার বিরুদ্ধে ছোট বাঁধল চার্চ, মৌলবাদী ও অন্যান্য প্রতিবাদী গোষ্ঠীরা। আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই ডাক্তার বড়ুয়া শুয়ারের হৃৎপিণ্ড মানুষে বসিয়েছেন বলে দাবি করতে তাকে জেলে যেতে হয়েছে। জঙ্গিরে এবোলা ভাইরাস তখন তাগুব ঘটাতে শুরু করেছে, গেল গেল রব। অ্যালজাইমার আর ক্যান্সারের জিন চিকিৎসা শুরু হওয়ার মুখে। আর জিন ম্যাপিং-এর নতুন “শটগান” পদ্ধতি বার হলো, যাতে মানুষের জিন চিহ্নিতকরণ অনেক দ্রুতগতিতে হতে থাকবে।

পরের বছর বৃটেনে “পাগলা গোরুর রোগ” দেখা গেল। অধিকতর লাভের আশায় বহুদিন ধরেই ওদেশের পশুদের—মুরগি, গোরু ইত্যাদি—বেশি করে প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়ানো হতো, যেমন হাড়ের গুঁড়ো। আমাদের দেশে যা কল্লনাও করা যায় না,

মহাত্মাজীর দেশ কি না! প্রায়ন একটি অদ্ভুত প্রোটিন অণু, যা থেকে প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে দেখা গেল। অসুস্থতাই অসুস্থেব, যা গোরুর পর মানুষকে ধরল এবং তাব মস্তিষ্ক শতচ্ছিন্ন করে মেরে ফেলতে লাগল একের পব এক, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বে এসে পৌঁছলেন—তাহলে জীববিদ্যার মধ্যকার ডগমা অর্থ্যাৎ ডিএনএ→আরএনএ→প্রোটিন, কেবল এই একমুখী ধারণা একেবারে উল্টে গেল।

ঐ ডগমার মূলে বহুদিনকার গবেষণা, বিচার, উরে-মিলার বিক্রিয়া, পোনাং পেকুমার গবেষণা, সব মিলিয়ে ছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরেই এরকম একটা ধারণা বিজ্ঞানী মহলে বলবৎ হচ্ছিল যে ডিএনএ নয়, আরএনএ-ই প্রাণের মূল উৎস, এমনকি সবচেয়ে প্রাথমিক উৎস। তার কারণ আরএনএ-র পরিবর্তনশীলতা, পরিবেশ অনুযায়ী নিজে থেকে দ্রুত বদলে নেবার ক্ষমতা। ডিএনএ সে তুলনায় অনেক কম পরিবর্তনশীল নিজেব মধ্যে সে বহুযুগের পরিবর্তনের সাক্ষ্য ধরে রাখে। কিন্তু ডিএনএ, আরএনএ দুটিই হলো নিউক্লিও যৌগের সমষ্টি। প্রোটিন থেকেও যে প্রাণ তৈরি হতে পারে প্রায়ন তার ভয়ংকর প্রমাণ। এর জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হলেও এখনও সব বিজ্ঞানী এই মত মেনে নিতে পারেননি।

এছাড়া ওই বছর দক্ষিণ মেরুতে পতিত উল্কা বিশ্লেষণ করে আন্দাজ পাওয়া গেল মঙ্গলগ্রহে প্রাণ থাকতেও পারে। রোগ প্রতিরোধকারী টি-কোষের আকার জানা গেল। প্রথম বায়োসংবেদক তৈরি হলো ক্ষতিকর বীজাণুর উপস্থিতি জানান দিতে। পার্কিনসন অসুখের জিন জানা গেল। ১৯৯৭ সালে স্কটল্যাণ্ডে তৈরি হলো ডলি, ক্লোনিংএর প্রথম বড় সাফল্য। পূর্ণবয়স্ক ভেড়ার শরীরের কোষের কেন্দ্রীয় অংশের থেকে ক্লোমোজোম নিয়ে অন্য ভেড়ার নিষিক্ত ডিম্বাণুর কেন্দ্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। প্রথম ভেড়াটির নকল তৈরি হলো এভাবে। ক্লোনিং নিয়ে উৎসাহ ও ভীতি, দুইই বেড়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট অফিস মানুষের জিনের পেটেন্ট দিতে স্বীকৃতি জানালে ভীষণ গণ্ডগোল শুরু হলো। স্তন্যপায়ী প্রাণীর সময়ের নির্ধারক জিন সনাক্ত হলো। প্রথম ডিএনএ কম্পিউটার (খসড়া) তৈরি হলো। এর আগেই পদার্থবিজ্ঞানী এডেলম্যান একগাদা ডিএনএ টুকরো নিয়ে দেখিয়েছিলেন তা দিয়ে কিভাবে সহজে কোনও শব্দ হিসাব (দুটি অবস্থানের মধ্যে হ্রস্বতম পথ নির্ধারণ) করা যায়। ই কোলাই জীবাণু, হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি জীবাণু (আমাদের পেটের আলসার ঘটাবার অন্যতম কারণ) ও আরেকটি বাগজীবাবাণুর পুরো জিনগুলির ছবি পাওয়া গেল। এইডস রোগ নির্ণয়ের বস্ত্রহীন পদ্ধতিও বাব হলো। নন-হজাকিস লিমফোমা ক্যান্সারের প্রথম অ্যান্টিবডি চিকিৎসা বাজাবে এল। রোগ উৎপাদক জিন খুঁজতে পিসিআর, ডিএনএ টুকরো আব কম্পিউটার একত্রে কাজ শুরু করল।

পরেব বছর ভ্রূণের স্টেম কোষ বাইবে বাঁচিয়ে রেখে বাড়ানো গেল। ভবিষ্যতে এ জিনিষ সর্বরোগহর বলে গণ্য হবে। ইদুর, গোরু ইত্যাদি ক্লোনিং সাফল্য লাভ করল। নির্দিষ্ট করে টিউমার কোষ খুঁজে তাকে মেরে ফেলা সম্ভব হলো এই প্রথম, বৃকের ক্যান্সারের চিকিৎসায়। একটি অপেক্ষাকৃত বড় পোকাব পুরো জিন শৃঙ্খল জানা গেল। ত্রিশ হাজারের বেশি মানুষের জিনের অবস্থান (ডিএনএ-তে) প্রকাশ পেল।

২০০০ সালের আগেই যুক্তরাষ্ট্রে দেড় হাজার বায়োটেক কোম্পানি দোকান খুলে বসেছে। শ-তিনেক বায়োটেক ওষুধ, টীকা ইত্যাদি বাজারে বিক্রি হচ্ছে, আবও বেশ কয়েকশ অনুমতিব আশায় বয়েছে। জেনোটিক পরিবর্তিত খাদ্যশস্য বাজারে, অন্যান্য দেশে পরীক্ষাধীন অথবা সেখানেও অনুমতিপ্রাপ্ত। এসবেব পিছনে বাজারনীতির ও অর্থনীতির ছবিটা সবসময়ে পরিষ্কার নয়, কিন্তু যেখানে মোটামুটি বোঝা যায় সেখানেই তার চিত্রটা বড় ভয়ংকর। কেবল খাদ্যশস্য (অন্য কিছু দিক সহ) সম্বন্ধে কিছুটা বিশদ আলোচনা করেছেন শ্রী দেবল দেব, তাঁর “লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি” বইটিতে। তথ্যগুলি প্রায় সবই পরিবেশবাদী ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকা থেকে নেওয়া। দেশে বিদেশে এসব নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে অনেক; পক্ষে ও বিপক্ষে। পক্ষে, বড় বড় মালটিন্যাশনাল, বায়োটেক কোম্পানি ও তাদের মদতপুষ্ট বিজ্ঞানীবৃন্দ এবং অবশ্যই বিভিন্ন দেশের সরকার, যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও রাজনৈতিক সাহায্য যাদের প্রয়োজন। বিপক্ষে কিছু মৌলবাদী (বিভিন্ন ধর্মের) সংগঠন, কিছু সমাজ সচেতন চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের আলগা গাঁটছড়া এবং কিছু দেশের কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা বা গোষ্ঠী। শেষ পর্যন্ত কাবা জিতবে বোঝা যাচ্ছে না। ডেভিডও ত গলিয়াথকে ধরাশায়ী করেছিলেন! কিন্তু আন্তর্জাতিক ঝোঁকটা কোনদিকে বেশি, সেটা মোটামুটি পরিষ্কার।

এর মধ্যেই ধুমধাম করে বছর খানেক আগে “মানুষের সব জিন জ্ঞানা হয়ে গেছে” রব উঠল। ধন্য যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেগ ভেন্টার! ধন্য মানুষের জিন প্রকল্প! লক্ষ্য করুন, এখানে একদিকে যেমন অর্থাকাক্তকী উদ্ভাবক বিজ্ঞানী রয়েছেন, তেমনই অন্যদিকে বিভিন্ন বয়সের বিজ্ঞানীরা রয়েছেন যারা প্রতিদানের আশা করেন না, যারা মনে করেন এর সমস্ত ফসল ওষুধ আবিষ্কার আর অসুখ নিরাময়ের কাজে লাগা উচিত। এই দ্বিচারিতা, এই দ্বন্দ্ব বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকের মত বায়োটেক গবেষণাতেও বেশ প্রকট।

সিনক্রয়ার লিউইস ১৯৩০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান, প্রথম আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী যিনি ওই পুরস্কার পেলেন। বরাবর যুক্তরাষ্ট্রের সমাজের তীব্র সমালোচক, আপটন সিনক্রয়ারের ভাবশিষ্য এই লেখকের নিজের মতে তাঁর সেরা উপন্যাস “আরোশ্বিত”। ১৯২৫ সালে লেখা এই উপন্যাস যুক্তরাষ্ট্রের একজন সমকালীন বিজ্ঞানীর গল্প, যে কিনা কেবলমাত্র প্রতিভা আর ব্যক্তিগত ভালো লাগার টানে ডাক্তারি পাশ কবার পর ধীরে ধীরে একজন বিজ্ঞানীর স্তরে উন্নীত হলো। শেষমেষ যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের একটি নামকরা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের লোভনীয় পদ ছেড়ে সমমর্মী এক বন্ধুর সঙ্গে এক নির্জন জায়গায় নিজেদের গবেষণাগার তৈরি করে গবেষণার কাজ চালিয়ে গেল। নিজেদের খরচ চালাতে তাবা ঘোড়া পুষে সেরাম তৈরি করে বিক্রি করা শুরু কবল। এটি পরবর্তী সমস্ত আধুনিক বায়োটেক কোম্পানির মডেল, বায়োটেক কথটা তখন সবে বাজারে এসেছে (একজন হাদেরিব ইঞ্জিনিয়ার কার্ল এবেকি কথটা চালু করেন ১৯১৯ সালে, উনি মনে কবেছিলেন সমস্ত উপাদান একদিন প্রাণীবা যোগাবে)। সমকালীন সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাগার, করপোরেট বিজ্ঞানীদের ওপর তীব্র কটাক্ষ ছাড়াও বইটি মূল্যবান এই কারণে।

মনে রাখতে হবে আপটন সিনক্লেয়ারের শিক্ষা হিসাবে এই লেখকও সমাজবাদে বিশ্বাসী, নারী ও সংখ্যালঘুদের স্বাধিকারের প্রবক্তা ছিলেন (এবং এটা বিংশ শতকের প্রথম দিকের কথা)।

১৩

তুলনামূলক আলোচনার বিপদ এইখানেই : আলোচনার সীমা নির্ধারণ করার অসুবিধা। আপাতত তাহলে বায়োটেক নিয়েই একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক। একদম প্রাচীনকাল থেকেই লোকে কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেছে বরাবর—যেমন বনের পশুকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগানো আর সঙ্কর প্রজননের চেষ্টাচরিত্রের করা, পশুকে যেমন গাছপালার ক্ষেত্রেও তেমন। এই করে করে মোটামুটি হাজার দশেক বছর আগেই মানুষ রুটি, মদ তৈরি করতে শিখেছিল। ঋষিদের (হয়ত অনেক পরেকার লেখা) শ্লোকগুলি মনে পড়ে? কিম্বা মেসোপটেমিয়ার পুরোনো বর্ণনা? ভৌত বিজ্ঞানের মত এখানেও আমরা শুরু করি রেনেসাঁ পরবর্তী সময় থেকে। ততদিনে অন্য দেশের মত আমাদের দেশেও উদ্ভাবনিকার, প্রজনন ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা তথা পর্যবেক্ষণ হয়ে গেছে। অনেক দেশেই এ ব্যাপারটা সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও আইনের মধ্যে চলে এসেছে। ইসলামী দেশগুলোতে মদ তৈরি বন্ধ হয়ে আসছে। ব্যবসা বাণিজ্য, বিশেষ করে জলপথে ভ্রমণ আর বণিক শ্রেণীর তথা শিল্প সংক্রান্ত কর্মীদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় এক জায়গার সামগ্রী আন্তে আন্তে পৃথিবীর অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে উইলিয়ম হার্ভে, যিনি শরীরে রক্তচলাচল প্রথম ভালভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, উদ্ভিদ ও প্রাণীতে একইরকম যৌন প্রজননের কথা বলেন। আরও বছর চল্লিশেক বাদে লিউয়েনহুক স্ত্রীকোষ দেখেন তাঁর মাইক্রোস্কোপে, যদিও প্রাণীর ডিম্বকোষ দেখার জন্য আরও একশ বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। ইতিমধ্যে অবশ্য (লিউয়েনহুকের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই) অন্যরাও প্রাণী, উদ্ভিদের কোষ দেখতে আরম্ভ করেছেন। যেমন নিউটনের সহকারী পদার্থবিদ রবার্ট হুক কর্কের কোষ দেখেন। ম্যালপিঘি দেখেন কৈশিক জালি, মায়ুতন্ত্রী, বিভিন্ন প্রাণীর শারীরিক গঠন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কতকগুলো ঘটনা ঘটল। একেবারে প্রথমেই কনস্ট্যান্টিনোপলে ডাক্তার পাইনারিনি ইনকুলেশন শুরু করেন। অর্থাৎ ছোট বাচ্চাদের শরীরে জোর করে বসন্তের বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া। এডোয়ার্ড জেনার আরও প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে ইংল্যাণ্ডে জন্মান। ডাকসিন বা ঢীকা সম্বন্ধে তাঁর বই প্রকাশিত হয় এই শতকের শেষে। জেনার দেখেন খামারে কর্মরত লোকের, যাদের গোবসন্ত হয়ে গেছে, গুটি বসন্ত হয় না বা হলে কম ক্ষতি হয়। তিনি তাই গোবসন্তের বীজ ঢীকা হিসাবে দেবার কথা বলেন। সারা অষ্টাদশ শতাব্দী ঢীকাব এই দুই রকমের লড়াইয়ে গেল, শেষে জিতল অবশ্য জেনারের ঢীকা। অন্যদিকে ভুট্টা ইত্যাদিতে সঙ্কর প্রজননের চাষ শুরু হলো। ইউরোপে চাষিদের মধ্যে ফসলের আবর্তন, বিশেষ করে গুটি জাতীয় (লেগুমিনাস) ফসলের চাষ জনপ্রিয় হতে লাগল। দেখা গেল, তাতে ফসলও ভাল হচ্ছে। জমির ব্যবহারও হচ্ছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষেই ল্যাজারো স্প্যালানজানি বন্ধ কাঁচের পাত্রে ব্যাক্টেরিয়া তাপে নষ্ট করে দেখান যে নতুন ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারছে না। “স্বাভাবিক জনন” মতবাদে বড় আঘাত পড়ল। পুরোপুরিভাবে ঐ মত ধ্বংস হবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাস্তুর ও অন্যান্যদের কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ঐ শতকের মাঝামাঝি ইগনাজ সেমেলভাইস ভিয়েনার হাসপাতালে স্ত্রীকাজের কমানোর জন্য ডাক্তারদের অপারেশনের পর হাত ধোবার নির্দেশ দিচ্ছেন। হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বলার জন্য তিনি নিষিদ্ধ হন, তাঁর চাকরি চলে যায়। ঐ সময়েই জার্মান লুডভিগ প্রথম প্রাণীর অঙ্গ বাইরে বার কবে রক্ত সঞ্চালন করিয়ে বাঁচিয়ে রাখলেন। আরও বড় ঘটনা হলো পাস্তুর দেখালেন মদ গাঁজে যাবার জন্য দায়ী জীবাণু। ঐই মত আগেকার রসায়নবিদ লীবিগের মতের বিরোধী। ১৮৫৯ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হলো ডারুইনের প্রজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিখ্যাত বই। বইটা এত সাড়া জাগাল যে এবিষয়ে বহুদিন অন্য বিতর্ক বন্ধ হয়ে গেল। মনে রাখতে হবে ঐই বইটি প্রকাশ হবার ছ বছর বাদেই এক অগাস্টিনীয় পাদ্রী অস্ট্রিয়ার এক ছোট শহরের প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের জমায়েতে তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে গবেষণার ফল জানান। কিন্তু ১৯০০ সালে ডে ব্রিস, ফন শেরমাক আর কেরেস তাঁর কাজের বিশেষ উল্লেখ না করলে মেণ্ডেল সাহেব হয়ত অজানাই থেকে যেতেন।

ইতিমধ্যে পাস্তুরাইজেশন বার হয়েছে। বিভিন্ন অসুখের জীবাণুদের চিহ্নিত করা যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে জোসেফ লিস্টার হাসপাতালে কার্বলিক অ্যাসিড জাতীয় জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে বলছেন। অল্পদিন পরেই, ১৯০০ সালের আগেই, মাইটোসিস প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানা গেছে, মাছের ডিএনএ আলাদা করা গেছে, ডারুইন উত্তরাধিকার তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। ১৮৭০-এর দশকে রবার্ট কথ অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু আবিষ্কার করলেন, বিজ্ঞানী গ্রাম প্রভৃতির সাহায্যে জীবাণুদের রং করে চিহ্নিত করা, ছবি তোলা ইত্যাদি সম্ভব হলো। কথ জীবাণুদের কলোনি তৈরি প্রক্রিয়ার মান নির্দেশ করে দিলেন। পাস্তুর অ্যানথ্রাক্স, জ্বলাতন প্রভৃতির টীকা বার করলেন। পেটরি (তাঁর নামের ডিশ আজও চলছে), লফলার, এরলিং ও আরও অনেকে আমাদের বহু অসুখের জীবাণু আবিষ্কার করলেন। জ্বলাতন, ডিপথিরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতির টীকা, নিরামক চালু হলো। মাইটোসিস প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হলো। পাস্তুর, লিস্টার এঁদের নামে সংস্থান চালু হলো পারি, লণ্ডনে। অনেক অসুখের বাহক পোকামাকড় ইত্যাদির খবরও জানা গেল। রোনাল্ড রস কলকাতায় বসে ম্যালেরিয়ার জীবাণু আর বাহক মশাব খবর জানানলেন। ভাইরাস দেখা গেল, এমন জীবাণু যা ফিলটারে আটকায় না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মেণ্ডেলের পুনরাবিষ্কার হলো, তাঁর উত্তরাধিকার বাহকের নাম দেওয়া হলো জিন। দেখা গেল সাধারণ কোষের সঙ্গে যৌন কোষের তফাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যায়। স্বাভাবিক গুণের পবম্পরনির্ভরশীলতা থেকে জিন সম্বন্ধ ও জেনেটিক ম্যাপিং চিন্তা এল। মর্গ্যান ও তাঁর ছাত্ররা অসাধারণ সব কাজ কবলেন ঐই ব্যাপারে—যেমন, ড্রোসোফিলার পর্যবেক্ষণ থেকে মিউটেশন, ক্রোমোজোম জিনের বাহক

এই তথ্য ইত্যাদি। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত তাঁর “জিন তত্ত্ব” বহু তথ্য ও তত্ত্বের সমাহার। ড্রোসোফিলার জিন ম্যাপ প্রকাশ পেল ১৯১৩ সালে। ইতিমধ্যে শিল্পজগতে ইন্সট ব্যবহৃত হচ্ছে ভালভাবে, বড় শহরগুলির পয়ঃপ্রণালীর সংস্কারের কাজে বীজাণুর ব্যবহার ঘটেছে। ১৯২০-৩০-এর দশকে দোআঁশলা ফসলের ব্যবহার, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে, খাদ্যে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এক্স রশ্মি, অতি বেগুনি রশ্মি, শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের প্রয়োগ, প্রোটিন অণু কেলাসন, সব মিলিয়ে পদার্থবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, জীব ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী, চিকিৎসক—সব মিলিয়ে সবাইকে নিয়ে তৈরি হচ্ছিল আণবিক জীববিদ্যা, যদিও মলিকিউলার বায়োলজি, মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদি নাম পরে এসেছে। আগে ছিল জীব রসায়নবিদ্যা বা বায়োকেমিস্ট্রি। বায়োটেকনলজি নামটিও ত বিংশ শতকের। যেমন ১৯১২ সালে ব্র্যাগদের এক্স রশ্মি দিয়ে কেলাস গঠন বোঝার কাজ, আর ১৯৩৪এ বার্গল সাহেব প্রথম দেখালেন প্রোটিন অণুর গঠনও একই রকম ভাবে বোঝা যায়। বিশ বা ত্রিশের দশকে পাউলিং আণবিক বাঁধনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, আবার জৈবিক অণুর গঠন তৈরির চেষ্টা করছেন হাতে কলমে। বার্গল সাহেব আবার তাঁর বামপন্থী মতের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যাপনার কাজ পান নি বহুদিন, তা সত্ত্বেও কলকারখানার শ্রমিকদের পড়িয়েছেন নিয়মিত, বক্তৃতা করা, লেখা সব করে নিজের তৈরি গবেষণাগারে রিসার্চ করেছেন। ওঁর একাধিক শাগরৈদ ও সহকারী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। উনি পাননি, তা নিয়ে ওঁর বন্ধুদের ক্ষোভ ছিল যথেষ্ট।

সালভাদর লুরিয়া, ম্যাক্স ডেলব্রুক, ম্যাক্স পেরুৎস, জর্জ গ্যামো, এরকম আরও কতজন প্রথম দিকে এই নতুন বিজ্ঞান গড়ে তোলেন। সকলেই অন্য দিককার লোক, নিজেদের উৎসাহ ও আগ্রহে এদিকে এসেছেন, কাজ করেছেন, তৈরি করেছেন নতুন যন্ত্র, নতুন তত্ত্ব। এসব গল্প পাওয়া যাবে হোরেস ফ্রিল্যান্ড জাডসনের লেখা “সৃষ্টির অষ্টম দিন” বইটিতে, অথবা ছোট ছোট ক্লাসিক বইতে, যেমন ওয়াটসনের লেখা “দ্বিকুণ্ডলী” বইতে। বিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে বেশি করে পেনিসিলিন তৈরি সম্ভব হলো, পশ্চিমের দেশগুলিতে চাষবাসে ক্ষুদ্র জানোয়ারের জায়গা নিল যন্ত্র। মনে রাখতে হবে ত্রিশের দশকের ভয়াবহ মন্দায় যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ জমির মালিকানা চলে গেল ব্যাঙ্ক বা বড় সংস্থার হাতে। এর রাজনীতি নিয়ে অন্য কেউ বলবেন, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আঙ্গকের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা আর সম্পত্তির অধিকার। শুধুমাত্র বিজ্ঞানের ইতিহাসটুকু আরেকটু দেখা যাক।

চল্লিশের দশকে লুরিয়া, ডেলব্রুক তাঁদের মিউটেশন পরীক্ষার উপায় বাতলালেন, বিডল, টেটাম এক জিন থেকে এক এনজাইম আসে বললেন, ডিএনএ উত্তরাধিকারী বস্তু হিসাবে বিবৃত হলো। লুরিয়া, ডেলব্রুকদের হাতে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে কোন্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবোরেটরি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগার হিসাবে স্বীকৃত হলো। শার্গার্ক, লেডারবার্গ প্রভৃতির নাম ঘুরে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হলো ওয়াটসন ও ক্রীকের বিখ্যাত দ্বিকুণ্ডলী মডেল। ডিএনএ অণুর এই গঠন অনেক পুরোনো সমস্যার সমাধান করল, নতুন পথের

সন্ধান দিল। যেমন ১৯৫৭ সালে ক্রিক আর গ্যামো বিবৃত কেন্দ্রীয় বিশ্বাস ('গোড়ামি' বলতে বাধে) : ডিএনএ থেকে আরএনএ, তার থেকে প্রোটিন, এভাবেই জেনেটিক তথ্য একমুখী চলে; ট্রান্সক্রিপশন, ট্রান্সলেশন ও রেপ্লিকেশন শিগগিরই সবার জানা হয়ে গেল।

১৯৫৮ সালে ডিএনএ পলিমারেজ আবিষ্কৃত হলো। এবার থেকে টেস্ট টিউবেই ডিএনএ তৈরি করা যাবে। কোষের কেন্দ্রের বাইরে নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া গিয়েছিল আগেই, নাম প্লাসমিড, চেহারাও অন্যরকম। ষাটের দশক থেকে প্লাসমিডের কাজ বোঝা গেল। এরা ছোট ছোট জিনের টুকরো বহন করে এক প্রাণীকোষ থেকে আবেক প্রাণীকোষে যেতে পারে, আরোপ করতে পারে অসুখ বা ওষুধের প্রতিরোধ ক্ষমতা। ১৯৭২ সালে পল বার্গ সীমাবদ্ধক এনজাইম দিয়ে ডিএনএ কেটে লাইগেজ দিয়ে জুড়ে প্রথম পুনর্যুক্ত (রিকম্বিন্যান্ট) ডিএনএ তৈরি করলেন। এই প্রথম সফল ডিএনএ কপি বা ক্লোন তৈরি হলো। পরের বছরই কয়েকজন এই প্রক্রিয়ায় পুনর্যুক্ত ডিএনএ তৈরি করে জীবাণুর ডিএনএতে এক টুকরো নিউক্লিক অম্ল ঢুকিয়ে দিলেন। প্রথম পুনর্যুক্ত ডিএনএ প্রাণী তৈরি হলো। সে বছরই প্রথম মানুষের জিন মানচিত্রের জন্য আলোচনা সভা বসল। '৭২ সালেই পল বার্গ এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী "সায়েন্স" পত্রিকায় চিঠি লিখে পুনর্যুক্ত প্রযুক্তির বিধিনিষেধ ঠিক করার জন্য আবেদন জানান। ১৯৭৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাসিলোমার শহরে বসল সেই আলোচনা সভা। পুনর্যুক্ত ডিএনএ গবেষণা বন্ধ করে দেওয়া, কেবল নিরাপদ প্লাসমিড জীবাণু নিয়ে কাজ যা গবেষণাগারের বাইরে থাকতে পারবে না, ইত্যাদি সম্মত নেওয়া হলো। দু বছর পরে এই নিয়ে ওদেশের কংগ্রেসে ঘোলাটি বিল জমা পড়ল। একটিও পাশ হয় নি। যদিও ১৯৭৬এ ওদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা কিছু বিধিনিষেধের কথা বলে। আজকের দিন হলে আলাদা ব্যাপার হতো।

পুনর্যুক্ত প্রযুক্তির অন্যতম পথিকৃত ব্যার ও সোয়ানসন ১৯৭৬ সালে জেনেটিক কোম্পানি, প্রথম বায়োটেক কোম্পানি, প্রতিষ্ঠা করলেন। সে বছরই ক্যাসার রোগে অস্ত্রোজনের ভূমিকা জানা গেল। এর দু বছরের মাথায় জেনেটিক মানুষের ইনসুলিন তৈরির পুনর্যুক্ত প্রযুক্তি বার করল। সে বছর আরেকটি তথ্য বার হলো, নিউক্লিক অ্যাসিডের কাটা অংশের বহুরূপতা (আর এফ এল পি) জেনেটিক শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ১৯৮০র যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় সমস্ত বায়োটেক প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিল। বাঙালি বৈজ্ঞানিক আনন্দমোহন চক্রবর্তীর (ও অন্যান্যদের) আবিষ্কৃত স্নেহভূক জীবাণু পেটেন্ট করার পক্ষে রায় দিল কোর্ট। অর্থাৎ এখন থেকে জেনেটিক প্রযুক্তিতে তৈরি বা পরিবর্তিত প্রাণী বা বস্তু বা প্রক্রিয়া পেটেন্ট করা যাবে। ঐ বিশেষ জীবাণু পেটেন্ট নিল যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় তেল কোম্পানি, একসন। ওই বছরই ক্যালিফোর্নিয়ার আরেকটি নতুন বায়োটেক কোম্পানি, সেটাস কর্পোরেশন পলিমারেজ চেন বিক্রিয়া উদ্ভাবন করে পেটেন্ট নিল। সেটাস এই প্রক্রিয়া, যার জন্য কয়েক বছর আগে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, মালটিন্যাশনাল ওষুধ

তৈরির কোম্পানি হফম্যান লা রোশকে বিক্রি করে ত্রিশ কোটি ডলারে।

এরপর থেকে বাজার গরম হয়ে উঠল। প্রতিবছরই নতুন কিছু বার হচ্ছে। কোম্পানিগুলো, আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়েরা বাজারে নেমে পড়েছে। ৮১ সালে প্রথম বহির্জিনযুক্ত ইঁদুর, হেপাটাইটিস বি'র অ্যান্টিজেন। সে বছর জার্মানির হেক্সট কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনেরাল হাসপাতালকে সাত কোটি ডলার দিল আণবিক জীববিদ্যা বিভাগ খোলার জন্য। প্রতিদান সামান্যই, সব নতুন আবিষ্কার পেটেন্ট করার একচ্ছত্র অধিকার। সে বছরই গোর সাহেব, ক্রিস্টনের উপ সভাপতি, বুশের প্রতিদ্বন্দ্বী, এই বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা চালান ওদেশের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। দেখা গেল মেধাভিত্তিক সম্পত্তি ভাঙিয়ে রোজগারের সুযোগ প্রচুর। তবে সেখানেও এক নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক অধ্যাপক বললেন, “এ ব্যাপারে সবচেয়ে দরকারি হলো মানুষের সব অসুখের কারণ বার করে তার প্রতিবিধান করা।” ৮২ সালে জেনেনটেক বায়োটেক ইনসুলিন বিক্রি করার অধিকার পেলে—প্রথম জিন প্রযুক্তিতে তৈরি ওষুধ বিক্রি শুরু হলো। তারপর থেকে বায়োটেক কোম্পানিগুলির জয়যাত্রা অব্যাহত। সে বছর প্রথম প্রোটিনের নিউক্লিক অ্যাসিড গঠন বার করার মেশিন বার হলো, খুব কম পরিমাণ প্রোটিন নিয়েই কাজ করা যাবে এখন থেকে। প্রোটিনের নিউক্লিক অ্যাসিডে নিখুঁত পরিবর্তনও সম্ভব হলো।

১৯৮৩ সালে এইডস ভাইরাস আবিষ্কার, পরের বছর তার কোষ্টি ও ক্রোনিং তৈরি করল কাইরন কর্পোরেশন, আরেকটি বায়োটেক সংস্থা। সেবছর জেফ্রিস সাহেব ডিএনএ ছাপ দিয়ে সনাক্তকরণ চালু করেন, পরের বছর তা নিয়ে প্রথম আদালতে মামলা উঠল যুক্তরাষ্ট্রে। তার পরের বছর সেটাস কোম্পানির পি সি আর পদ্ধতি দেখাল কোন জিন শৃঙ্খলের কয়েকশ কোটি কপি কয়েক ঘণ্টায় কীভাবে করা যায়। দু বছর পরে অ্যান্টিবডি ও এনজাইম যোগে ওষুধ তৈরি সম্ভব হলো। তার পরের বছর স্ট্রেন্টের কৃত্রিম ক্রোমোজোম তৈরি করলেন ওলসন। ৮০র দশকের শেষে ওদেশে মানুষের জিন গবেষণার জাতীয় কেন্দ্র তৈরি হলো তিনশ কোটি ডলার ব্যয়ে—লক্ষ্য ২০০৫-এর মধ্যে মানুষের সব জিন জেনে নেওয়া।

১৪

পাশাপাশি উভয় প্রক্রিয়াই চলছে, চলতে থাকছে। লক্ষ্য করুন ১৮১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টারিফ আইনে বিদেশি গাছ বা গুল্মের ওপর আমদানি কর তুলে নেওয়া হলো, যাতে ওদেশের উদ্ভিদ জগতে বৈচিত্র্য বাড়ে। তার বছর দশেক পরে ওদেশের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট সরকারিভাবে ওদের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত দূতাবাসে এঙেলা পাঠালেন বিভিন্ন দেশ থেকে গাছপালা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে যাতে ওদেব চাষবাসের উন্নতি হয়। ১৮৩৯ সালে ওদেশের কংগ্রেস চাষিদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ বন্টনের ব্যবস্থা শুরু করল। ১৮৬২ সালে তৈরি হলো যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (এতদিন পেটেন্ট অফিসের অন্তর্গত ছিল)।

সে বছরই প্রতি প্রদেশে জমি দান করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করার আইন হলো। ১৮৭৯ সালে সঙ্কর ভূট্টা প্রজনন, ১৮৯৫ সালে নাইট্রোজেন ব্যবহারকারী বীজাণুর আবিষ্কার। ১৯২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বিনামূল্যে বীজ বিতরণ বন্ধ করে দেওয়া হলো রাতারাতি (অর্থনৈতিক কারণেই)। তারপর একেবারে ১৯৪৩। রকফেলারের সংস্থা মেক্সিকোতে চাষবাসের পরিবর্তন শুরু করল। এই প্রথম বিদেশি সাহায্য দিয়ে কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ কৃষির পরিবর্তন। পরে মেক্সিকোতে কৃষির উন্নতি হলে সেখান থেকে উন্নত ফলনশীল সঙ্কর প্রজাতির বীজ বিদেশে রপ্তানি হতে লাগল। তবে সেটা '৫০-এর দশকের শেষের দিকে। সেই সময়ই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবে যুক্তরাষ্ট্রে বীজ ভাণ্ডার তৈরি হলো। এমনকি ক্রুশ্চেভ ওদেশের ভূট্টাক্ষেত দেখে নিজের দেশে ফিরে সেখানেও সঙ্কর ভূট্টার চাষ চালু করতে আদেশ দিলেন ঐ সময়ে। ১৯৬০ সালে ফোর্ড ও রকফেলার সংস্থা যুগ্মভাবে ফিলিপিনসে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করল।

ফিলিপ নিডলম্যান-এর কথাতো আসা যাক। ১৯৯০-৯১ সালে ইনি ব্যথার ওষুধ কিভাবে কাজ কবে সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেন। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে কয়েক বিলিয়ন শুধু ব্যথার ওষুধই বিক্রি হয়, বেশির ভাগটা ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়াই। ফলে এ ব্যাপারে নতুন কিছু বার হওয়া একটা বিরাট ব্যাপার। এর আগেই ইংল্যান্ডের জন ভিন '৭০-এর দশকের প্রথমে অ্যাস্পিরিন কীভাবে ব্যথা কমায় তা বার করে বছর দশেক বাদে নোবেল পুরস্কার পান। নিডলম্যান ভেনের কাজটি আরও পরিমার্জিত করেন। আগেকার জানা একটি এনজাইমের (সাইক্লো অক্সিজেনেজ বা কক্স) জায়গায় উনি একই এনজাইমের দুটি আকারের কথা বলেন (কক্স-১ ও কক্স-২)। তার মধ্যে প্রচলিত ব্যথার ওষুধ সবই কক্স-১ এনজাইমকে কাজ করতে বাধা দেয় বা বিকল করে। কিন্তু একই সঙ্গে ঐ এনজাইমের ভাল কাজগুলোও—যেমন পেটের যন্ত্রপাতির দেওয়াল, বৃক্ক ইত্যাদির কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালনা করা প্রভৃতি বন্ধ করে। তার জন্যই সাধারণভাবে ব্যথাব ওষুধ খেলে সঙ্গে জেলুসিল জাতীয় অম্লরোধক অথবা আলসারের ওষুধ খেতে হয়। না হলে নির্ঘাৎ পেটে (বা অস্ত্রে) ঘা, বক্তাক্ষরণ অর্থাৎ আলসার। নিডলম্যান দেখালেন যে ব্যথার মূল কারণ কক্স-১ নয়, কক্স-২ এনজাইম। তার চেহারা, ব্যবহার আন্দাজ করা গেলে ধারণা করা গেল কোন ধরনের অণু কেবল এই কক্স-২ এনজাইম তৈরিতে বাধা দেবে। বছর চারেক বাদেই ফাইজার ও আরেকটি আন্তর্জাতিক কোম্পানি সেলেকসিক্স ও রেফেকসিক্স নামে ওষুধগুলি বাজারে ছেড়েছে (আমাদের দেশেও এখন পৌঁছোয়া যায়, বেশ কিছু ডাক্তার এই ওষুধ খেতেও বলেন)। কিন্তু পবন আশ্চর্য, তাঁর আবিষ্কারের বছর থাকেনের মধ্যেই নিডলম্যান তাঁর বিসার্চ ল্যাবোরেটরি ছেড়ে মনসাণ্টো কর্পোরেশনের শীর্ষ রসায়নবিদ হয়ে বসলেন। ঐই মনসাণ্টো কর্পোরেশনের কীর্তিকলাপ গত দশকের থেকেই আমবা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি—টার্মিনেটর জীনযুক্ত বীজ (নিজেরা পেটেন্ট কবে) আমাদের দেশে বিক্রি করার জন্য।

শুধু বিক্রি নয়, ঠিক যে প্রক্রিয়ায় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (একেবারে আইন করে) সহ পশ্চিমের সুসভ্য দেশগুলি (সবখানে আইনের তোয়াক্কা না করেই) বিদেশ থেকে প্রাণী ও উদ্ভিদজ বস্তু নিজের দেশে এনে (আমদানি শুল্ক কমিয়ে বা লুণ্ঠরাজ্য করে) নিজেদের জৈববৈচিত্র্য বাড়িয়েছিল, নিজেদের দেশে বিনেপয়সায় বা স্বল্পমূল্যে তা বিতরণ করে, বর্তমানে তারাই আগে পেটেন্ট আইনের ব্যবস্থা করে (ডাংকেল চুক্তি, গ্যাট ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কথা চিন্তা করুন) অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলিতে নিজেদের উচ্চ ফলনশীল বীজ, শস্য ইত্যাদি রপ্তানি করছে। এখন তাদের হাতিয়ার আন্তর্জাতিক পেটেন্ট আইন। কিন্তু আবও আশ্চর্যের বিষয়, নিজেদের অসুবিধা হলে উন্নত দেশগুলি এই আইনেব খোড়াই পরোয়া কবে।

মনসাস্টো কর্পোরেশনের কথায় আসা যাক। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় এদের তৈরি “এজেন্ট অরেঞ্জ” নামক কীটনাশক যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গী বিমানগুলি ভিয়েতনামের আকাশে ছড়িয়ে দিত। উদ্দেশ্য—(ক) ওদের বনজঙ্গল পরিষ্কার করতে সাহায্য করা যাতে (১) লুকিয়ে থাকা ভিয়েতনামী গেরিলাবাহিনী মুশকিলে পড়ে ও (২) যুক্তরাষ্ট্রের পদাতিক সৈন্য তাদের সঙ্গে সমান সমান (১) লড়াই করতে পারে; (খ) আনুষঙ্গিক ফসলের ক্ষতি হলে দেশি লোকদেরই অসুবিধা, বহিরাগত সৈন্যদের খাবারদাবার তাদের সভ্য বস্তুই ব্যবস্থা করবে। দুঃখের বিষয়, এই কীটনাশক যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু সৈন্যের ক্ষতি করে, কারও কারও বেশ কষ্টকর ভাবে। জানাজানি হতে যথারীতি মনসাস্টো প্রথমে সব দায় অস্বীকার করে। তারপর একজোটে আক্রমণ হতে ব্যাপারটা ওদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থার এক বড়কর্তার কাছে বিচারধীন থাকে। বেশ কিছুদিন পরে হাওয়া ঠাণ্ডা হতে মনসাস্টোব পক্ষে সম্মানজনকই বায় বার হলো। অল্পদিন পরে এই পরিবেশ বিশারদকে মনসাস্টোর পরিচালক বোর্ডে দেখা গেল। শ্রীদেবল দেব এইধরনের প্রচুর উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর লেখা বইটিতে। এর অনেকগুলিই আবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রিকা থেকে নেওয়া, যার উৎস ওই পশ্চিমের উন্নত দেশসমূহ।

সুতরাং একদিকে বায়োটেক তথা আধুনিক জীববিজ্ঞান ক্রমশ অধিকতর প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে, এবং স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে বিনিয়োগ হচ্ছে প্রচুর। যেসব কোম্পানি বা সংস্থান এই বিনিয়োগ করছে তারা প্রতিদানে উদ্ভূত বস্তুর বা প্রক্রিয়ার উপর স্বত্ত্ব দাখিল করছে, পেটেন্ট নিচ্ছে। ছলে বলে কৌশলে তারা নিজেদের লাভ বজায় রাখতে চাইছে, মূলত একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নেমে। যেসব দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সামাজিক পরিস্থিতি (এর মধ্যে এসব বিষয় সাধারণ জ্ঞান থাকা, তার ভাল মন্দ বিচার কবাব ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা) “ভাল” তারা এই আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলির আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে পারে। মারা পড়ে তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলি, যাদের জৈববৈচিত্র্যেই হয়ত উন্নতি লাভ কবে পশ্চিমের দেশের এই কোম্পানিগুলি তাদের জৈববৈচিত্র্য ধ্বংস করতে উন্মুখ। উপযুক্ত

জ্ঞানের অভাব, উচ্চস্তরের নেতা তথা আমলাদের লোভ এবং সর্বোপরি আইনি ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য এমন জিনিষ এরা এইসব দেশে বিক্রি করছে, হয়ত এখানেই জোর করে পরীক্ষা করে, যা এসব দেশের চিরাচরিত চাষ আবাদ প্রথা নষ্ট করে এদের বরাবরের জন্য এসব বিদেশি কোম্পানির গোলাম করে রাখবে।

একই সঙ্গে আরেকটি প্রক্রিয়াও চলছে পাশাপাশি। তা হলো আন্তর্জাতিক স্তরে দ্রুত খবরাখবর দেয়ানোয় পদ্ধতির সরলীকরণজনিত। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ুক্তিক ইন্টারনেট জড়িত, তাতে ব্যবসা বাড়ে বাজার বাড়ে মুনাফাও, আবার সেখানে বহুবিধ নৈরাজ্যবাদী ব্যক্তি গোষ্ঠীও আখড়া বানাবার, অন্যপথে নিজেকে ভাববার ও ভাবাবার ঠাই করে নিয়েছে। যে বিষয়ে বিশদ লেখা এই সংখ্যায় (চিন্তার বিশ্বায়ন—অমিতাভ লাহিড়ী) থাকছে।

বায়োটেক আলোচনায লিনিয়াসের নাম উল্লিখিত হয়নি। অথচ আধুনিক জীববিজ্ঞান লিনিয়াস প্রভৃতির শুক্লা ধরা না পড়লে হয়ত বহুদিন অনেকের কাছে অধরাই থেকে যেত।

জীববিজ্ঞানে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে লাইসেস্কোর নাম করা হয়নি। কুখ্যাত এই রুশ বিজ্ঞানী তাঁর পূর্বজ্ঞ এক অর্ধশিক্ষিত কৃষকের (মিচুরিন) তথাকথিত গবেষণার ফল যুগান্তকারী আবিষ্কার হিসাবে চালাতে চেষ্টা করেন। স্থলিনের আমলে যথেষ্ট ক্ষমতামূলক হন, বিশেষ করে চল্লিশের দশকে রুশ জীব বিজ্ঞানের উনি একনায়ক ছিলেন একথা বললে অত্যাধিক হয় না। তখনকার প্রথাগত (পশ্চিম) জীববিদ্যা, বিশেষ করে জেনেটিক্স চর্চা করলে প্রাণহানির আশঙ্কা পর্যন্ত ছিল। পরে অবশ্য ক্রুশ্চেভের সময় থেকে তাঁর ক্ষমতা কমে আরম্ভ করে। কিন্তু বিজ্ঞান শুধুমাত্র রাষ্ট্রের ইডিয়োলজি দিয়ে পরিচালিত হলে তার কি চেহারা হতে পারে লাইসেস্কো তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

১৫

১৯৪০-এর দশকের শেষে যুক্তরাষ্ট্রের বেল গবেষণাগারে ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করলেন শকলি, বার্ডিন ও ব্র্যাটেন। সেই থেকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি অর্ধপরিবাহী পদার্থের গম্ভীৰ্ভুক্ত হলো, শুরু হলো সংক্ষিপ্তকরণ। যার ফল ঐ কাজের দশ বছর পরেই জ্যাক কিলবি ও অন্যান্যদের, প্রথম চিপ তৈরি—যাতে একসঙ্গে একাধিক ট্রানজিস্টর ও ঐ জাতীয় যন্ত্রাংশ ঢোকানো গেল একটি ছোট অর্ধপরিবাহী টুকরোয়। ১৯৭০-এর দশকে এসে দেখি তখনও যুক্তরাষ্ট্রের চিপ তৈরির (কম্পিউটারের কাজে) শৈশবাবস্থা। প্রথম চিপ তৈরির বাযনা পায় ইন্টেল কর্পোরেশন জাপানের বিজিকম্প কোম্পানির কাছ থেকে, তাঁদের গণক (ক্যালকুলেটর) তৈরির কাজে লাগবে বলে। এটা ১৯৬৯ সালের কথা। ততদিনে ডগলাস এঙ্গেলবার্ট তাঁর ইদুব যন্ত্রের পেটেন্ট পেয়ে গেছেন। ফেরাবচাইন্ড কোম্পানির গবেষণা ও উন্নয়নের কর্তা গার্ডন মুর বলেছেন (১৯৬৫ সালে) পরবর্তী দশ বছরে চিপে ট্রানজিস্টরের ঘনত্ব প্রতি বছর দ্বিগুণ হারে বাড়বে। ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন তাদের পিডিপি-১ মিনিকম্পিউটার বার করেছে—প্রথম

কম্পিউটার যা কিবোর্ড ও মনিটর (স্ক্রিন, টিভির মত) যুক্ত। বেসিক নামের 'ভাষা' আবিস্কৃত হয়েছে। ম্লপি ডিস্ক আবিস্কৃত হয়েছে। আইবিএম সংস্থা ট্রানজিস্টার তৈরির কারখানা বানিয়েছে। আর গার্ডন মুর, রিচার্ড নয়েসের সঙ্গে ফেরারচাইন্ড ছেড়ে ইন্টেল কর্পোরেশন খুলেছেন।

১৯৬৯ সালেই ইন্টেলের ৮০০৮ মাইক্রোপ্রোসেসর বা চিপ রচনা শুরু হলো। প্রথম লেজার ছাপার কাজ দেখানো হলো। ১৯৭১ সালে টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট একটি চিপে ১৫,০০০ ট্রানজিস্টার একত্র করতে সক্ষম হলো। সেই বছর পাস্কালা ভাষা তৈরি হলো। সেই বছর স্টিভ ওজনিয়াক খুব সস্তার কম্পিউটার তৈরি করলেন, পরে যা আপেল কম্পিউটার হিসাবে পরিচিত হলো। ১৯৭২ এ সি ভাষা তৈরি শেষ। ইতিমধ্যে ছোট ছোট কোম্পানিও চিপ দিয়ে পি সি তৈরির চেষ্টা করছে।

১৯৭৫ সালে অলটায়ার নামের পিসি বাজারে এল। দাম ৫০০ ডলার। বিল গেটস, স্টিভ জবস ও ওজনিয়াক, পল অ্যালেন ও অন্যান্য ভবিষ্যৎ রথী-মহারথীরা সকলেই চটপট এই কম্পিউটারে হাত পাকালেন। এর দ্বিতীয় সংস্করণেই বিল গেটস ও পল অ্যালেন তাঁদের চটজলদি তৈরি মাইক্রো-সফট কোম্পানির তৈরি বেসিকে লেখা অপারেটিং সিস্টেম ভরে দিলেন ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। তারপর ১৯৮১ সালে ত আইবিএমের পিসিই বাজারে এল। তারপর বাকি ইতিহাস।

কম্পিউটার ও বায়োটেক, এই দুটি বিষয়ই প্রচলিত বিশেষ করে মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক দৃষ্টি থেকে ব্যাখ্যা করার মুশকিল আছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে, কম্পিউটারের ব্যাপারে বিশেষ করে, মনে হতে পারে যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা অল্প কিছু ব্যক্তির উৎসাহে একটি নতুন প্রযুক্তি উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই পালটে মিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় প্রতি দুটি পরিবারে একটি কম্পিউটার ইন্টারনেটে যুক্ত, জাপানে ও ইউরোপে তার প্রায় অর্ধেক। আমাদের দেশে অবশ্য অতি সামান্য। আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ জায়গাতেই অথবা এশিয়ার বিপুল জায়গায় অনেকটার চেহারা এই এরকম। ইন্টারনেটের চাইতে কম্পিউটারের ব্যবহার অবশ্য সর্বত্রই অনেকগুণ বেশি। তাও আমাদের দেশে এর ব্যবহার ৫% এর আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে (এবং ইউরোপের অনেক জায়গায়) কম্পিউটারের ব্যবহার প্রচলিত ব্যবসা বাণিজ্যের চেহারা এমন পালটে দিয়েছে যে তাত্ত্বিক দিক থেকে সামাজিক পুনর্গঠনে কম্পিউটার নিয়ে চিন্তাভাবনা গভীরভাবে হচ্ছে, সমীক্ষাও চলছে নানারকম, তাদের ফল প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু প্রথাগত তত্ত্বকথার সঙ্গে এর মিল এখনও হয় নি। একটা ছোট উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার শেখা ও তা নিয়ে নাড়াচাড়া করার ফল নিয়ে একাধিক সমীক্ষা হয়ে গেছে দেশে বিদেশে। কেউ বলছেন কম্পিউটার শিখলে ছোটদের মানসিক উন্নতি দ্রুততর হয়, কেউ আবার ঠিক বিপরীত কথাই বলছেন। সমাজতাত্ত্বিক তথা মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে সারমর্ম সংগ্রহ যে কি কঠিন কাজ, বিশেষ করে তা যদি বিশেষ কৌকনির্ভর না করার চেষ্টা করা হয়, তা যাঁরা একাজ করেছেন তাঁরাই বলতে পারবেন ভাল।

ইন্টারনেট নিয়েও সেইরকম উৎসাহী ও সন্নিধ লোকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু টেলিভিশনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে ‘স্বেতবিন্দু সংগঠন’ (টিভি বন্ধ করে দিলে মাঝখানে একটি সাদা বিন্দু দেখা যায়, বিশেষ করে সাদা কালো টিভিতে) প্রচার চালালেও তার প্রসারে বিন্দুমাত্র ঘাটি পড়েছে কী? ইন্টারনেটের বিরুদ্ধেও লোকের যতই সন্দেহ থাক, এর গ্রাহক সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, ভবিষ্যতেও বাড়তে থাকবে। অথচ আজ থেকে অর্ধশতাব্দীর ওপর আগে মার্শাল ম্যাকলুহান যখন ভবিষ্যতের নেটওয়ার্ক সমাজ, টিভির ব্যাপক প্রসার ও ব্যবহার নিয়ে লেখালেখি করছিলেন, টেলিভিশনের তখন এত রমরমা হয় নি। ডিজিটাল কম্পিউটার সবে বাজারে এসেছে কি আসেনি। প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার বাজারে আসার এক দশক বাদে যখন ব্রিটিশ সরকার কানাডার জলবিভাগে একটি কম্পিউটার বেচে, তখন তাদের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন তাত্ত্বিক রসায়নবিদ ডগলাস হাট্টি। বলা হতো ঐ সময়ে তাঁর চেয়ে এ ব্যাপারে বেশি অভিজ্ঞ লোক নেই (উনি বিভিন্ন পরমাণুতে ইলেকট্রনদের অবস্থান, শক্তি সম্বন্ধীয় গণনা প্রথম কম্পিউটারে করেন)। তিনি ঐ সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে কম্পিউটারে প্রোগ্রাম লেখা (যেটা তখন কেবল শূন্য আর ১ দিয়ে করতে হতো) এত শক্ত আর এত কম লোক এ ব্যাপারে অভ্যস্ত যে ডিজিটাল কম্পিউটারের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। আজ হাট্টি বেঁচে থাকলে কি বলতেন কে জানে।

অন্যদিক থেকে দেখলে দেখা যায় এই আধুনিক কম্পিউটারের উদ্ভব পুরোপুরি বড় পুঁজি অথবা যুদ্ধের প্রয়োজনে হয়েছে। যেমন আধুনিক কম্পিউটারের জনক হিসাবে চিহ্নিত চার্লস বাবেজ তাঁর গণকযন্ত্র তৈরি করেন তাঁর নিজের কারখানায় শ্রমিকদের পরিশ্রমের হিসাব করতে। এই ঘটনা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের। তার প্রায় একশ বছর পরে তৈরি হলো প্রথম ডিজিটাল যন্ত্রগণক, এনিয়াক। তৈরি করলেন যুক্তরাষ্ট্রের পেন্সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যুৎপ্রযুক্তি বিষয়ের দুই অধ্যাপক মচলি ও একার্ট। এই কাজ সম্পূর্ণভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রয়োজনে হয়েছিল, ক্ষেপণাস্ত্র থেকে নিক্ষিপ্ত গোলাগুলি ঠিকমত যাচ্ছে কি না তা বুঝতে। অর্থাৎ তখন থেকেই সামরিক প্রয়োজনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার গবেষণা ও উদ্ভাবন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সবে প্রবেশ করেছে। ব্রুটনে সমকালীন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণাও একই কারণে। টিউরিং ও অন্যান্য বিজ্ঞানী প্রচুর পরিশ্রম করে কম্পিউটার, রেডার প্রভৃতি যন্ত্র তৈরি করেন। পরমাণু বোমা তৈরির চাইতে এইসব ঘটনা কোনওমতেই সামরিক প্রয়োজন থেকে কম মুক্ত নয়। পরমাণু বোমার পরের ধাপ অর্থাৎ হাইড্রোজেন বা ফিউশন বোমা ত এডওয়ার্ড টেলার প্রভৃতি বিজ্ঞানী ও উগ্রপন্থী রাজনীতিকের অশুভ আঁতাত থেকে সৃষ্ট। বিরোধীপক্ষ অর্থাৎ সোভিয়েত রাষ্ট্র তাদের গুপ্তচর তথা সহানুভূতিশীলদের সাহায্যে একই পথে এগিয়েছিল। মহাকাশ যান তৈরি, মহাকাশে যাত্রা, চাঁদে পা রাখা সবটাই যেন দুই বড় ক্ষমতাসালী দেশের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, কে আগে ঐ অঞ্চল দখল করবে।

১৯৮০র দশকে যুক্তরাষ্ট্রে রোনাল্ড রেগান কৃত ‘নক্ষত্রযুদ্ধ’ প্রকল্পে বহু বিজ্ঞানী অর্থসাহায্য পেয়েছেন মিসাইল গবেষণার (ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ, বিদেশি ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস ইত্যাদি) জন্য। এঁদের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে রেগানের রক্ষণশীল রাজনীতির সমর্থন না করলেও টাকাটা নিয়েছেন, ব্যবহার করেছেন, হয়ত কিছুটা অন্য কাজেও লাগিয়েছেন। কিন্তু অনেকটা গবেষণাই যে লক্ষ্য ঠিক রেখে হয়েছিল তা পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে (ইরাকের সঙ্গে বা আফগানিস্তানে) দেখা গেছে, যখন বহুদূর থেকে স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্দিষ্ট জায়গায় পড়ে মারণ ঘটিয়েছে। ইরাকের যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসাবে ‘বুদ্ধিমান’ ধুলো/বালির কথা এই প্রসঙ্গে আনা যেতে পারে।

১৬

আবার অন্যদিকের ঝোঁকে রয়েছেন বহু বিজ্ঞানী। কিন্তু বিজ্ঞানীরা রয়েছেন প্রথমদিকের বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রচেষ্টাতেও। অর্থাৎ একসময়ের সমাজকল্যাণমূলক মনোভাবাপন্ন, কিছুটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে গবেষণাকারী বিজ্ঞানীদের চেহারা পালটেছে, যার শৈশবকাল হয়ত গত শতকের প্রথম দিককার লেখা “অ্যারোস্মিথে” পাওয়া যাবে। আমরা দেখছি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে গবেষণায় বিনিয়োগ, তথা গবেষণালব্ধ ফলের বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎ, সমকালীন আর্থসামাজিক পরিস্থিতি সবকিছু জড়িয়ে আছে। গত শতকের প্রথম দিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য সুবোধ মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করলে লোকে তাঁকে রাজা উপাধি দেয়, মাথায় করে রাখে। আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণই ৪৫-৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ রাজা সুবোধ মল্লিকের ব্যক্তিগত দানের সাড়ে চার-পাঁচ হাজার গুণ। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। আমাদেরদেশের পুরোনো অধিকাংশ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি এমনভাবেই গড়ে উঠেছে। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও তাই। ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবোরেটরি, পাস্তুর ইনস্টিটিউট ত বটেই, আরও অজস্র গবেষণাগার এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি। তবে পশ্চিমের দেশগুলিতে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে, এখনও ব্যক্তিগত (অর্থাৎ বেসরকারি) উদ্যোগে এরকম বহু প্রতিষ্ঠান চলছে, অন্যত্র (যেমন এদেশে) যা চলে মূলত সরকারি উদ্যোগে। তার কারণ বহু ব্যক্তি তাঁদের আত্মীবন সঞ্চয় এসব প্রতিষ্ঠানে দান করে গেছেন, বা তা দিয়ে এধরনের প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। আমাদের দেশে এধরনের মূলধন যেসব ব্যক্তির হাতে পড়েছে, তাঁরা বা তাঁদের উত্তরপুরুষেরা সেটা প্রধানত ব্যবসায় পুনর্নিয়োগ করেছেন বা তা দিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছেন। মুষ্টিমেয় বাণিজ্যিক সংস্থার মধ্যে টাটারা কিছু গবেষণাগার ও বিড়লারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, এদেশের ইতিহাসে তা অবশ্যই অনস্বীকার্য।

বায়োটেকের অবাণিজ্যিক দিক, যেখানে বিজ্ঞানী, সমাজসেবী, জাতীয়তাবাদীরা রয়েছেন, সেখানে স্বভাবতই বিনিয়োগ কম। উদ্ভিদাদিকে রয়েছে বৃষ্টি ওয়েলকাম গ্রুপের মত সংস্থা, মানুষের জিন ম্যাপ বার করতে যারা অগ্রণী ভূমিকা নেয়, বা সেলের

জেনোমিক্সের মত ডুইফোড বায়োটেক সংস্থা যা বায়োটেক উদ্ভাবক ভেন্টারের জনাই হয়েছিল, এরকম বহু প্রতিষ্ঠান যারা শেয়ারবাজার বা অর্থলগ্নীকারীদের থেকে বিনিয়োগ পৈতে পারে।

এ প্রসঙ্গে অবধারিত ভাবে টেকনোলজির অন্যান্য ধারা, ব্যবসা বাণিজ্যের চলনের সঙ্গে যা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে বায়োটেক ধারাব আর বিশেষ তফাৎ থাকছে না। সাবা পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য, টেকনোলজির ধারা সম্বন্ধে শ্রয়ণেই আগে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এর বৈশিষ্ট্যগুলি এইরকম, যে, মূলধনেব জাতীয় চেহারার ক্ষীয়মানতা ও আন্তর্জাতিক স্তরে গাঁটছড়া বাঁধা ; একইসঙ্গে বিভিন্ন মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগকারী সংস্থার মধ্যে আরও লাভজনক হওয়ার প্রতিযোগিতা। এই দুই ধারার আর্থসামাজিক তথা রাজনৈতিক প্রভাব বিভিন্ন দেশে ও একই দেশে বিভিন্ন অবস্থার গোষ্ঠী, তথা সংগঠনের ওপর। টেকনোলজির ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক স্তরে গবেষণা বা প্রস্তুতিকরণে জোট বাঁধা ; প্রয়োজনে এক দেশে উদ্ভূত টেকনোলজি অন্যদেশে রপ্তানি কবা অথবা প্রসার ঘটানো, যৌথ নতুন প্রক্রিয়াকরণ—এখানেও প্রতিযোগিতা লক্ষ্যণীয়। অবশ্য কনভারজেন্স বা একমুখীনতা, যা বিশেষভাবে তথ্য প্রযুক্তি বা দূরসংঘার সম্বন্ধীয় ব্যাপাবে দেখা যাচ্ছে, তা বায়োটেক জগতে (এখনও) অনুপস্থিত। দ্বিতীয়টি হলো, বিজ্ঞানের আব টেকনোলজির সীমা বিলুপ্তিকরণ—পেটেন্ট আইনের কড়াকড়ি ; আইডিয়া বা চিন্তাব ওপরও পেটেন্টের প্রভাব বিস্তার। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহের ওপর পেটেন্টের অধিকার মোটামুটি দুই দশকের ঘটনা। আইডিয়ার ওপর এর বিস্তার আরও নতুন এবং এখনও বিতর্কাতীত নয়। একইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার বিস্তার, বিশেষ কবে আন্তর্জাতিক স্তরে (যা ইউএমএন জেনোম প্রজেক্টে দেখা গেছে) এবং বেশ কিছু ধাবায় বৈজ্ঞানিক তথ্য, তত্ত্ব ও প্রযুক্তির খবর সম্ভার বা বিনামূল্যে বিতরণ (বিশেষ করে জগৎ-জোড়া জালের মাধ্যমে)। আণবিক ঝোক — বিভিন্ন প্রাকৃতিক তথা প্রযুক্তির মূল কারণ তথা তাকে নিয়ন্ত্রণের উন্নততর মাধ্যম হিসাবে প্রক্রিয়ার আণবিক অনুসন্ধানের চেষ্টার সহায়তা ও তাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস। বায়োটেক জগৎ এই ধারার সঙ্গে ভালভাবেই যুক্ত। বিশেষ করে জিন প্রযুক্তির পর ও জায়গামাফিক ওষুধ প্রয়োগের কৌশল সম্পূর্ণভাবেই আণবিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর।

১৭

এই সব মিলিয়ে যেন আরও বড় মাপেব সর্বগ্রাসী একটা একমুখীনতা, বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর আঞ্চলিক বা জাতীয় চরিত্রকে যা বিলীন করে দিচ্ছে এক পশ্চিমি বা পশ্চিম-পূর্বের মিলিত রূপ, যেখানে আকার পুরোপুরি পশ্চিমি না হলেও ভিতরের জিনিষ পশ্চিমেমবই। যেমন আযাতোল্লা খোমেনি ১৯৮১ সালে টাইম পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “এদের (সমকালীন জিনস পরিহিত ইবানি যুবক-যুবতীদের) বাইরেটা এদেশি, ভিতরে বসে রয়েছে পশ্চিমের কোনও লোক।” জৈববৈচিত্র্য, পরিবেশ ইত্যাদি সংরক্ষণের মত ইদানীং

আঞ্চলিক ভাষা ও কালচারের সংরক্ষণের কথা উঠেছে, কারণ প্রতি বছর এরকম কিছু ভাষা ও কালচার টিভি ও ঐ জাতীয় মাধ্যমের চাপে হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে এই মাধ্যমগুলির যোগ অবিচ্ছিন্ন। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা মেনেই নেওয়া হয়েছে। আজকের তথ্য প্রযুক্তির সিংহভাগ বিনোদন শিল্পের কাজে নিযুক্ত, যেহেতু এখানে মূলধন বিনিয়োগ বিশাল এবং আরও বড় কথা, সম্ভাবনা আকাশছোঁয়া। আজ মাইক্রোসফটের সঙ্গে অন্যান্য কোম্পানির, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের, ঝগড়া এটা নিয়েই যে মাইক্রোসফট তার সর্বত্র ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারের সাহায্য নিয়ে অন্যের ওপর নিজের কর্তৃত্ব অন্যায়াভাবে বজায় রাখছে। কর্তৃত্ব রাখাটা অনায়াস মনে হচ্ছে না বিরোধীদের কাছে, কেবল একা কেন, সবাইকে নিয়ে করলেই ত হয় জাতীয় মনোভাব।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ইন্টারনেট বা সেলফোন সবগুলিই নজরদারি করছে—পারে এবং ব্যবহৃতও হচ্ছে সেই কাজে। ওসামা বিন লাদেন শেষবার সেলফোন ব্যবহার করেই সে জায়গা থেকে সরে না গেলে মারা পড়তেন। অনেক বেআইনি কাজ ধরা যাচ্ছে সেলফোন ব্যবহারের সূত্র ধরে। একই রকম ভাবে ই-মেল দেওয়া নেওয়া করলেই তা উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থলের হদিশ জানিয়ে দেয়। একইভাবে ইন্টারনেটে কোনও কাজ করলে তার রেশ থেকে যায় বহুদিন। কেউ আজ কি করছে তা বহুদিন পক্ষে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক থেকে বার করা সম্ভব হতে পারে, আজ যতই নিজের পদচিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা হোক না কেন। এখন ত পাহারাদার সফটওয়্যারও বার হয়েছে, বড় বড় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বা সরকারি দফতর যা ব্যবহার করে বা করতে পারে। এদের কাজ হলো কোনও জায়গায় দাঁড়িয়ে আশপাশ দিয়ে চলে যাওয়া তথ্যাংশের ওপর নজর রাখা, প্রয়োজনে সাবধানবাণী জানানো।

এখানেই “তথ্য এখন তেলের চেয়ে দামি” কথাটার সার্থকতা বোঝা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার দিকে বা বাংলার নবজাগরণের সময়ে নতুন তথ্য ও তত্ত্ব কিরকম বিধবংসী/যুগান্তকারী হতে পারে তা আমরা দেখেছি। হয়ত এখন আরেকটি যুগান্ত আসছে। এটা বোঝা যাচ্ছে না যে তথ্য যারা নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগাচ্ছে, তা দিয়ে ক্ষমতা বজায় রাখছে বা নতুন প্রযুক্তির পথে যাচ্ছে (যা প্রায় সমার্থক), তারাই কি নতুন আলো দেখাবে না বর্তমানে যারা তথ্য বঞ্চিত কিন্তু ক্ষুধার্ত নতুন তথ্যের জন্য (অনেকটা স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় “যারা এক মুঠো ছাতু পেলে পৃথিবী উটে দিতে পারে”) তারা হবে নতুন পথের দিশারী। রাস্তা এখনও কুয়াশায় ঢাকা।

কেবল এটুকু বলা যায়, বর্তমান পৃথিবীতে তথ্যপ্রযুক্তি যে চূড়ান্ত সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে বা দিচ্ছে তা অর্ধশতাব্দী আগে কল্পবিজ্ঞানের লেখাতেই ছিল কেবল। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে এক মিটার পর্যন্ত বস্তুর অবস্থান, নড়াচড়া সঠিক নির্দেশ করা ত ভাল, একমুঠো ধুলো ওপর থেকে ছড়িয়ে তা করা সম্ভব তা কি কারও জানা ছিল? এই বিশেষ কাজটি বছর দশেক আগে ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধের পর করা হয়েছে অজানা অচেনা জায়গায় শত্রুপক্ষের

• ওপর নজরদারির সুবিধের জন্য। এখানেও নজরদারি! আর যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রযুক্তি।

বায়োটেকে যৌথ প্রক্রিয়ার এক সুন্দর উদাহরণ আণবিক যন্ত্র (মলিকিউলার মোটর)। ঠিক ঐ নামেই যুক্তরাষ্ট্রে একটি কোম্পানি খোলা হয়েছে কয়েকবছর আগে। তারা ইতিমধ্যে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে যার নাম রক্ত জেটিগ্রাসী বা ক্লটোসাইট। সত্যিই আণবিক আকারের এই কৃত্রিম ‘জিনিষ’ টি (যন্ত্র বলতে বাধো বাধো ঠেকো) রক্তনালীতে ঢুকিয়ে দিলে সেটি যেখানে যেখানে রক্ত জমাট বেঁধেছে তা খুঁজে নিয়ে সেটিকে তরল করে দেবে। ভেবে দেখুন, হার্ট অ্যাটাকের কি থ্রম্বোসিসের কি দারুণ চিকিৎসা! বক্ষ উন্মোচন করে শল্যচিকিৎসা করতে হলো না, এমনকি সূক্ষ্মতম নালিকা চিকিৎসাও (ল্যাপারোস্কোপি ইত্যাদি) করতে হলো না। শুধু ইঞ্জেকশন করে কিছু ক্লটোসাইট রক্তনালীতে ঢুকিয়ে দিলেই হলো। যে কোনও মোটরের মতই এই যন্ত্ররও শক্তির উৎস দরকার, সেটা পাওয়া যাচ্ছে রক্তের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মারফৎ। এবার বোঝা যাবে কেন ঐ কোম্পানি প্রতি বছর নতুন আইডিয়ার প্রতিযোগিতা আহ্বান করে ও পুরস্কারের ব্যবস্থাও কবে। আইডিয়াগুলি কেবল “অসম্ভব, অকল্পনীয় বা ঐ জাতীয় হওয়া দরকার”!

বায়োটেকের অনেক আলোচনাই বাদ পড়ে গেল। বিশেষ করে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ওষুধ কোম্পানিগুলোর উত্থান, ওষুধ আবিষ্কারের রকমফের এবং এখানে যৌথ প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান ছাপ — এসবের আলোচনা। এই বিষয়ের গুরুত্ব বোঝা যাবে শুধু এই তথ্য থেকেই যে, যে সেলেরা জেনোমিক্সের প্রতিষ্ঠাতা ক্রেগ ভেন্টার জিন খোজার শটগান পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই মানুষের জিন প্রকল্পের প্রথম কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন, সেই সেলেরা জেনোমিক্সেই তাঁর স্থান শীর্ষে নেই আর। তাঁরা মনে কবছেন আজকের পৃথিবীতে উন্নততর মানের ওষুধের আবিষ্কার আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ ব্যাপারে আমরা সবাই তাকিয়ে আছি ২০০৫ সালের দিকে, যখন আন্তর্জাতিক পেটেন্ট আইন ওষুধ সম্বন্ধেও চালু হবে। তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং সংস্কারবর্গ আগে থেকেই এ ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছেন। লক্ষ্য—মানব সেবা ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও উন্নতি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই আলোচনায় প্রযুক্তির প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত। কেবল বিজ্ঞানের প্রসঙ্গেই প্রযুক্তির বিষয় অবতারণা করা হয়েছে, যেখানে যেখানে সেরকম প্রয়োজন হয়েছে। প্রযুক্তি, বিশেষ করে আজকের দিনে, আলাদা আলোচনার দাবি বাখে। তবে একবার প্রযুক্তির প্রসঙ্গ উঠলে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজ ও অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থা, রাজনীতি ইত্যাদি এত বিষয় চলে আসে, ঠিক তাল সামলানো মুশকিল। সময়মত এ বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

আব একটি কথা। বিজ্ঞানের ইতিহাস বলতে আজকে আমরা যা বুঝি, তা টমাস কুনই বলুন কি জোসেফ নিডহামই বলুন, এ বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই কিন্তু বাঙালি প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের “হিন্দু রসায়নের ইতিহাস।” রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন এই বইটির

আগে কিছু ইউরোপীয় বিক্ষিপ্ত রচনা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাগমাটিক দার্শনিক চার্লস পার্স প্রভৃতির প্রবন্ধ ছিল কেবল। পবে অনেক ভাল ভাল বই বার হয়েছে, ডেসমণ্ড বার্নালের “ইতিহাসে বিজ্ঞান” (সায়েন্স ইন হিস্ট্রি) যার খুব সুন্দর একটি উদাহরণ। তবে এ প্রসঙ্গে, বিশেষ করে বার্নালের বইটি উল্লেখ করেই আগে যে কথা বলা হয়েছে তা আরেকবার স্মরণ করা যাক। সরল রাজনৈতিক কি দার্শনিক নীতির চশমা পরে পৃথিবীকে দেখলে একরকম লাগবে, খোলাচোখে দেখলে আরেকরকম। তবে কেউ আপত্তি তুলতেই পাবেন, চোখ খারাপ থাকলেও কি কেউ চশমা পরবে না? ২০/২০ দৃষ্টিশক্তির মাপকাঠি এক্ষেত্রে কে ঠিক করে? যাই হোক, বর্তমান লেখকের আদর্শ হলো ব্রদেলের খাঁচে হিস্টোরিওগ্রাফি—খুঁটিনাটি সুন্দর বিজ্ঞানের ইতিহাস, কোনও ডিটেল বাদ দিলে চলবে না। এই বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে অনেকেই এ কাজে নেমে পড়েছেন, ডিটেলও পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। সেই নিয়ে সাধারণে সহজবোধ্য ভাষায় লেখাও বার হচ্ছে। যার একটি সুন্দর উদাহরণ “কোপেনহাগেন” নাটক। পবমাণু নিয়ে গবেষণা থেকে পরমাণু বোমার যোগসূত্র খুঁটিয়ে দেখা, এবিষয়ে ঐ সময়কার সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানীদের মানসিক দ্বন্দ্ব—এসবের ওপর আলো ফেলার চেষ্টা হয়েছে এই নাটকে। এ ধরনের লেখা ক্রমশ সহজলভ্য হচ্ছে, জনপ্রিয় হচ্ছে, এটাই আশার কথা।

যখন কেবল নীতি নির্ধারক রাজনীতিক, বুঝোত্রাটি নয়, বিজ্ঞানের বিষয় কী হবে, কী হওয়া উচিত তা নিয়ে সাধারণ নাগরিক যখন খোলা মনে জেনেবুঝে সূচিন্তিত অভিমত দিতে পারবেন, তখনই বিজ্ঞানবিষয়ক এ ধরনের রচনা সার্থক হবে।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আলোচনায় মহিলাদের স্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নোবেল পুরস্কার নিয়েও বটে। বিজ্ঞানে, তা সে ভৌত বিজ্ঞানই হোক কি জৈব বিজ্ঞান, গুটিকয়েক মহিলার মাত্র নাম করা যায়। পদার্থ ও রসায়ন উভয় বিষয়েই মাদাম কুবি নোবেল পান, তাঁর মেয়ে পান রসায়নে। অনেক পরে ডেরোথি হজ্জকিন পান রসায়নে মায়োগ্রোবিন অণুর গঠন এক্সরশি দিয়ে বার করার জন্য। এরকম কয়েকটি নাম ছাড়া মহিলাদের নাম পুরস্কারের তালিকায় নেই। মাদাম কুরির জীবনীতেই দেখি তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া এবং তারপর গবেষণা করা দুইই কত শক্ত ছিল মহিলাদের কাছে। না হলে সোফিয়া কোভালেভস্কায়া, এমি নোইথারের মত মহিলারা যে কোনও অবস্থাতে সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের আরও সামনে চলে আসতেন। এদের নাম আমরা জানি ও স্মরণ করি কারণ ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজস্ব চরিত্রবলে এঁরা নিজের কাজ করে গেছেন, স্বাক্ষর রেখে গেছেন নিবন্ধদের। তেমনই অনুমত শ্রেণী, অনুমত দেশের অধিবাসী এঁরা এইসব তালিকা থেকে প্রায় অনুপস্থিত। তবে এখানেও এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন অনেকে। আবদুস সালামের চেষ্টাতেই মূলত তৃতীয় বিশ্বের নাগরিকদের জন্য বিজ্ঞান আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয় ইতালির ত্রিয়েস্তেতে, যেখানে আমাদের দেশ থেকে ত বটেই, এশিয়া আফ্রিকার ছোট ছোট দেশ থেকে অনেকেই ওখানে যাবার, থাকবার ও গবেষণা করার সুযোগ পেতে পারেন এখন, পাচ্ছেনও।

এই রচনায় আরেকটা জিনিষ ঘটেছে। দোষ বলতে পারি, বিশেষত্ব আরো ভাল বোঝাবে ব্যাপারটা। সেটা হলো, প্রথমদিকের আলোচনা, অর্থাৎ রেনেসাঁ ও তার পরবর্তী কিছু সময় পর্যন্ত, যতটা সার্বিক হয়েছে, ঊনবিংশ কি বিংশ শতাব্দীতে এসে ততটা হতে পারেনি। বিশেষীকরণের যুগ তখন শুরু হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, এই সময় থেকে বিজ্ঞানে এত দ্রুত ও এত বড় মাপের পরিবর্তন হতে শুরু করল যে তার সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তনের, যেগুলোও ক্রমবর্ধমান আকারের ছিল, আলোচনা এক পরিসরে ধরানো মুশকিল। কিন্তু যেমন বলা হয়েছে, এই আলোচনা প্রয়োজন। যেমন প্রয়োজন বর্তমান সামগ্রিক চিন্তাধারাস্থলির সঙ্গে বিজ্ঞান চিন্তার (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক) সাযুজ্য তথা বিশেষত্ব দেখানো। যেমন সাহিত্য, দর্শনের বিনির্মাণ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব কি কেবল মাত্র কোনও লেখার (টেক্সট) অর্থ বা অর্থ সমুচ্চয় ও তার (তাদের) তাৎপর্য বোঝাতে প্রয়োজন, না তত্ত্বগতভাবে আমাদের বিশ্বচিত্তার (ওয়ার্ল্ড ভিউ) টুকরো হয়ে যাওয়া, ভেঙে যাওয়ার প্রতিফলন মাত্র? অর্থনীতির মূল যেখানে কেবল ব্যক্তির পুষ্টি, তার উদ্যোগ থেকেই যা হওয়ার কথা, সেখানে জোটবঁধার তত্ত্বের স্থান কোথায়? সব জাগতিক (ও মহাজাগতিক) প্রক্রিয়ার আণবিক কারণ খুঁজতে যাওয়ার মধ্যে কি এই ঝোক লুকিয়ে আছে? বিজ্ঞানীদের (ও প্রযুক্তিবিদদের) কোনও না কোনও সময়ে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আমরা এখানে যা করেছি তা হলো বিশ্বায়নের ভূমির পরিচয়, ব্যাপ্তি নিয়ে নাড়াচাড়া। প্রতিবাদেব ভাবনা তখনি দৃঢ় হবে যখন অবস্থার বিস্তৃতি সম্বন্ধে সচেতন হবো।

বিজ্ঞান, বিশ্বায়ন ও স্ব-সংগঠন

পার্থপ্রতিম রায়

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে মানুষের চিন্তাজগতে ও বিশ্ববীক্ষায় একটা বড়ো রকমের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই পরিবর্তন ষষ্ঠ দশকে এসে একটি নতুন চিন্তা প্রকল্পের রূপ পায়। বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড ও সমাজ সম্পর্কে একটি যান্ত্রিক (mechanistic) ও খণ্ডতাবাদী (reductionist) ধারণা থেকে একটি অভিব্যক্তিবাদী (evolutionary) ও সামগ্রিক (holistic) ধারণায় উত্তরণ আরম্ভ হয়। পরিবর্তনের এই সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে পরিচালনা করেছে বিজ্ঞানের জগতে ঘটে যাওয়া নতুন নতুন সব আবিষ্কার। আজকের বিশ্বায়ন ভাবনা এই নবতম বিশ্ববীক্ষারই ফলশ্রুতি।

পঞ্চদশ শতকের আগে পর্যন্ত বিশ্বের প্রধান প্রধান সভ্যতাগুলোতে ও মূলত ইউরোপে মানুষের বিশ্বচেতনা ছিল প্রকৃতি নির্ভর। প্রকৃতিকে স্তন্যদায়িনী মা হিসেবে দেখা হতো। প্রকৃতির সাথে আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হতো তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল এক ধরনের জৈব (organic) বিশ্ববীক্ষা। আর তার সাথে যুক্ত হয়েছিল খ্রিস্টীয় ধর্মচিন্তা ও নীতিবোধ। এই জৈব বিশ্ববীক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল অ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদ ও চার্চের অনুশাসন। ঊনবিংশ শতকে সেন্ট টমাস আকুইনাস এই দু'য়ের সমন্বয়ে একটি চিন্তাকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন যা ছিল মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী দর্শন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বিজ্ঞানের বেশ কিছু আবিষ্কার এই মধ্যযুগীয় চিন্তাধারাকে জোরালো ধাক্কা দেয়। কোপার্নিকাস, গ্যালিলেও ও নিউটনের হাত ধরে বিজ্ঞানে যে তোলপাড় শুরু হয় তার প্রভাবে এক নতুন চিন্তাকাঠামো গড়ে উঠতে শুরু করে। যার প্রধান স্তম্ভ ছিলেন বেকন ও দেকার্তে।

বেকনীয় পদ্ধতিকে বলা যেতে পারে এমপিরিক্যাল বা অভিজ্ঞতা নির্ভর। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পদ্ধতিকে বলে এমপিরিক্যাল। এরকম বহু পরীক্ষার ফলাফল থেকে আবার একটি সাধারণ সূত্রে পৌঁছানো যায়। একে বলে আরোহী পদ্ধতি (inductive method)। বেকনীয় চিন্তাধারা একদিকে পরীক্ষানির্ভর বা এমপিরিক্যাল ও অন্যদিকে আরোহী বা ইণ্ডাক্টিভ। বেকনীয় ভাবনায় এই বিশ্বপ্রকৃতি ও ব্রহ্মাণ্ড একটি বিরাট যন্ত্র যা পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে চলমান। আমাদের কাজ ঐ নিয়মগুলোকে জানা। বেকনের মতে বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো সেই জ্ঞান যা নিয়মে বাঁধা এই প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। শিল্প ও যন্ত্র অধ্যুষিত আজকের বিশ্বে প্রকৃতির ওপর স্বরদারির কুপ্রভাব আমরা প্রতিদিনই টের পাচ্ছি। কিন্তু ষোড়শ-

সপ্তদশ শতকের পটভূমিতে এই যান্ত্রিক দর্শন ছিল খুবই বৈপ্লবিক ও সময়ের সাথে মানানসই। বেকনীয় যান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষার একদিকে যেমন ছিল অভিজ্ঞতা নির্ভর আরোহী পদ্ধতির প্রয়োগ অন্যদিকে তেমনি ছিল একটি বিশ্লেষণাত্মক (analytical) অবরোহী (deductive) তাত্ত্বিক কাঠামো। এই কাঠামোটির প্রবক্তা ছিলেন রেনে দেকার্তে। কাঠামোটি প্রধানত গাণিতিক। দেকার্তে ছিলেন একজন গণিতজ্ঞ। তাঁর দর্শনে তাই গণিতের প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁর মতে সত্যকে নিশ্চিত রূপে জানার মাধ্যম হলো গণিত। বিজ্ঞান ও গণিত তাঁর কাছে সমার্থক। জাগতিক বস্তুজগত সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

“I admit nothing as true of them (physical objects—লেখক) that is not deduced, with the clarity of a mathematical demonstration, from common notions whose truth we cannot doubt. Because all the phenomena of nature can be explained in this way, I think that no other principles of physics need to be admitted, not are to be desired.” (Daniel Gabor, 1978, ‘Science and Certainty in Descartes’, in Michael Hooker, ed. ‘Descartes’, Johns Hopkins University Press).

কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলেওর আবিষ্কারে যেমন বেকনীয় পরীক্ষানির্ভর পদ্ধতির ছবি দেখতে পাওয়া যায় ঠিক তেমনি ঐ আবিষ্কার সমূহের বিশ্লেষণাত্মক গাণিতিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় নিউটনের গতিবিদ্যায়। যান্ত্রিক দর্শনের যৌক্তিক তত্ত্বসম্মুখকে তাই কার্টেসীয়-নিউটনীয় তাত্ত্বিক কাঠামো বলা যেতে পারে।

বেকন-দেকার্তে-নিউটন প্রবর্তিত যান্ত্রিক দর্শনে বিশ্বচরাচর কেবল যন্ত্রই নয়, সম্পূর্ণরূপে গঠিত একটি যন্ত্র। যে যন্ত্রের কোনও বিকাশ নেই। কোনও এক স্রষ্টা এটিকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে দিয়ে গেছেন। এই যন্ত্রের আকৃতি-প্রকৃতি-নিয়মকানুন আগে যা ছিল পরেও তাই থাকবে। বিশ্বচরাচরের নিয়তি আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই যান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষার পাশাপাশি বিকাশমান (evolutionary) বিশ্বচরাচরের একটি ধারণা আসে। এই ধারণা বলতে শুরু করে যে এই পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড এমন কি প্রাণী ও উদ্ভিদকুল কোনোটিই বিকাশহীন (static) যন্ত্র নয়, বরং প্রতিনিয়ত তার অভিব্যক্তি (evolution) সংঘটিত হচ্ছে। সরল (simple) কাঠামো থেকে সময়ের সাথে বছরের পর বছর ধরে জটিল (complex) কাঠামোব দিকে বিকশিত হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু। এই চিন্তার সপক্ষে প্রমাণ মিলেছিল যখন জীবাশ্ম অনুসন্ধান থেকে ভূবিজ্ঞানীরা ভূতলের গঠন প্রক্রিয়ার বিকাশের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, আর জীববিজ্ঞানীরা পেয়েছিলেন সরল প্রাণী থেকে জটিল প্রাণীদেহে উত্তরণের আভাস।

প্রাচীন দার্শনিকরা উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতকে এমন একটি স্তব-বিন্যস্ত (hierarchical) সংগঠন বলে ভাবতেন যার শিখরে আছেন ঈশ্বর। আর নিচের স্তবগুলিতে পরপর মানুষ ও মনুষ্যতর প্রাণীকুল। এই সংগঠনটি তাদের মতে একটি স্থির সংগঠন, যা সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই একই রকম আছে, কোনও নতুন প্রাণীর বা প্রজাতির সৃষ্টি অথবা বিলুপ্তি মাঝে কখনো হয় নি। বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও প্রাণীজগতের শ্রেণীবিন্যাসের

অন্যতম প্রবক্তা লিনিয়াস লিখেছেন—“We reckon as many species as issued in pairs from the hands of the creator” (quoted in Randal J. H., 1976, The Making of the Modern Mind)। বিভিন্ন প্রজাতি বিষয়ে এই ধারণা Judeo-Christian মতবাদের সাথে মিলে যায় ও নিউটনীয় বিশ্ববীক্ষার সাথে খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু এই ধারণায় সবচাইতে বড়ো আঘাত আসে ঊনবিংশ শতকে জ্ঞা ব্যাপটিস্ট ল্যামার্কের তত্ত্ব থেকে। ল্যামার্ক বলেন, পরিবেশের চাপে দেহ সংগঠন পূর্ববর্তী সরল রূপ থেকে জটিল রূপের দিকে রূপান্তর ঘটায়। অভিব্যক্তি বিষয়ে সবচাইতে প্রামাণ্য তত্ত্ব হাজির করেন চার্লস ডারউইন যিনি তাঁর ‘Origin of Species’ গ্রন্থে অভিব্যক্তির সপক্ষে প্রচুর প্রমাণ দাখিল করেন। শুধু প্রমাণ জোগাড় করাই নয় ডারউইন অভিব্যক্তির কারণও দেখান। প্রাকৃতিক নির্বাচন, যোগ্যতমের বেঁচে থাকা, আকস্মিক মিউটেশন ইত্যাদি তত্ত্বের সাহায্যে তিনি অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করেন। ফলে বিশ্বচরাচরকে যন্ত্র বলে ভাবার বিপরীতে বিকাশমান বিশ্বতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে জন্ম নেয় নতুন এক ধারণা।

বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তার জগতে আমরা তাহলে দুটো ধারা পাচ্ছি। প্রথমটিতে বিশ্বকে সম্পূর্ণ, সুগঠিত, বিকাশহীন যন্ত্র ভাবা হচ্ছে আব দ্বিতীয়টিতে বিশ্বকে অসম্পূর্ণ ও বিকাশমান একটি প্রক্রিয়া মনে করা হচ্ছে। প্রথম ধারণাটিতে বিশ্ব-যন্ত্রকে উপাংশে টুকরো করে বিশ্লেষণ করতে বলা হচ্ছে, কাবণ ঐ ধারণাটি বলে যে খণ্ডকে জানা হলেই ঐ খণ্ড সমন্বয়ে তৈরি সমগ্রকে আপনাআপনি জানা হয়ে যাবে। অতএব প্রথম ধারণাটি খণ্ডতাবাদী। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তাধারায় খণ্ডতাবাদের কোনও জায়গা নেই। সেখানে বিশ্বচরাচর সমগ্র হিসেবেই অভিব্যক্ত। কেবল খণ্ডগুলির গাণিতিক যোগফল সমগ্রের রূপকে ব্যাখ্যা করতে অপারগ। দ্বিতীয় ধারণাটি বিশ্বকে একটি সংগঠন হিসেবে দেখে যে সংগঠনটি একটি বিকাশমান প্রক্রিয়া বই কিছু নয়। খণ্ডে খণ্ডে ভাঙলে ঐ বিকাশের ছবিটা হারিয়ে যায় কারণ খণ্ডগুলির মধ্যে আদানপ্রদানই সংগঠনটির চালিকাশক্তি। জীবিত প্রাণীদের সাথে মৃত প্রাণীদের তফাৎ খণ্ডের বিচারে কোন দিনই নির্ণয় করা সম্ভব নয়—কারণ একই উপাদান দিয়ে দুটি তৈরি। কিন্তু সমগ্রের বিচারে ভাবলে বোঝা যায় যে জীবিত প্রাণীদের যে সংগঠনটি বিরাজমান মৃত প্রাণীদের সেটি অনুপস্থিত। দ্বিতীয় চিন্তাধারাটি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে বিশেষ গুরুত্ব পেতে আরম্ভ কবে। যারা মনে করতেন যে অণু পরমাণুদের জগতটাকে জানা হয়ে গেলেই বিশ্বচরাচর সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে কারণ সব বস্তুই অণু পরমাণু দিয়ে তৈরি, তারা প্রাণ (Life) কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐ চিন্তার অসারতা টেব পান। এটা বোঝা যায় যে, বস্তুজগত কী উপাদান দিয়ে তৈরি সেটা বড়ো কথা নয়। উপাদানগুলি কি ধরনের সমগ্রকে গড়ে তুলছে সেটাই বড়ো কথা। একই উপাদান দিয়ে তৈরি দুটি ভিন্ন বস্তুসমগ্রের অভ্যন্তরে উপাদানগুলি দুটি ভিন্ন ধরনের সংগঠনতন্ত্রের অংশীদার—ফলে তাদের ব্যক্তিত্ব সমগ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্বাধীন ব্যক্তিত্ব তাদের নেই। যান্ত্রিকতাবাদী খণ্ডীকরণের বিপরীতে

বিকাশমান সামগ্রীকরণের দৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞান ও সমাজকে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় এটাই সবচাইতে বড়ো প্যারাডাইম শিফট।

বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার এই নতুন চিন্তাধারাকে সংগঠনতাত্ত্বিক চিন্তাধারা বা Systems View বলা হয়ে থাকে। ‘পারস্পরিক সম্পর্ক’ ও ‘বিকাশমান সমগ্র’ এই দু’য়ের সমন্বয়ে এই চিন্তাধারা এগোয়। আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানে কৃত্রিম বুদ্ধি (artificial intelligence) নির্মাণের পেছনেও এই চিন্তাধারা কাজ করে। সংগঠনতন্ত্র (system) বলতে এখানে সেই সংগঠিত সমগ্রকে বোঝানো হয় যাব গুণাবলী অর্থাৎ আচার আচরণ কখনোই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাজ্য নয়। মৌলিক উপাংশেব দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার বিপরীতে সমগ্র সংগঠনটির গঠন নীতির (principles of organisation) উপর জোব দেওয়া হয় এই তত্ত্বে। প্রকৃতিতে এ ধরনের সংগঠিত সমগ্রের (system or organisation) উদাহরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যে কোনও জীবিত প্রাণী তা সে ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়াই হোক বা মানবদেহ—এই ধরনের একটি organisation বা system। একটি উই টিবির মধ্যে উইপোকাদের সংসাব, মৌচাকের ভিতর মৌমাছিদের দলবদ্ধ জীবনযাপন কিংবা এই বৃহৎ মানব সমাজ—এগুলিকেও একটি system বা সংগঠিত কাঠামো বলে মনে কবা যায়। এই ধরনের প্রতিটি কাঠামোর আচরণগত বৈশিষ্ট্য তার উপাংশগুলিব পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া ও নির্ভরশীলতাব ফসল। এখানে উপাংশগুলিব ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ বলে কিছু থাকাই অসম্ভব কাবণ প্রতিটি অংশই অন্য অংশগুলি দ্বারা সংগঠননীতির নিয়ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত। অতএব, অংশকে বিচার করতে হবে সমগ্র সংগঠনের নিরিখে, সমগ্রকে অংশের নিরিখে কখনোই নয়। সংগঠিত সমগ্রের সাথে কার্টেসীয়-নিউটনীয় যন্ত্রের মৌলিক তফাৎ এই যে নিউটনীয় যন্ত্র একটি নির্মিত কাঠামো কিন্তু ‘সংগঠিত সমগ্র’ সদা নির্মায়মান। নিউটনীয় যন্ত্রে কাঠামোটাই শেষ কথা। কিন্তু সংগঠনের পরিচিতি তার বিকাশের প্রক্রিয়া। যন্ত্রের টুকরোগুলোর স্বাধীনতা নেই—পূর্বনির্ধারিত নিয়মে তারা চলে, কিন্তু সংগঠিত কাঠামোর প্রতিটি অংশ পরিস্থিতি পরিবেশ অনুযায়ী নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিবর্তন করে। যন্ত্রের কাজকর্মের পদ্ধতি রৈখিক (linear) কার্য-কারণ সম্পর্ক এখানে সরলরেখায় চলে। সংগঠিত কাঠামোব কার্যকলাপে কার্যকারণ সম্পর্কটি জটিল। যেমন, অংশ ‘ক’ অংশ ‘খ’ কে প্রভাবিত করে, অংশ ‘খ’ অংশ ‘গ’ কে চালায় আবার ‘ক’ কিভাবে চলবে তা ঠিক কবে দেয় ‘গ’। তাই সংগঠিত কাঠামো বা সংগঠন একটি উন্নত কাঠামো যে কেবল জটিলই নয় সদাপরিবর্তনশীল।

জীবদেহ বা ঐ জাতীয় যে কোনও সংগঠনের অপব এক বৈশিষ্ট্য হলো যে কাঠামোটি স্ব-সংগঠিত (self organised), নিজের কাঠামোব মধ্যেই পারস্পরিক আদান প্রদান ও ক্রিয়াকলাপ এমন ভাবে ঘটে যে নিজেই নিজেকে গড়ে তোলে। এই গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি একটি অসাম্যকালীন (non equilibrium) প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানী ইলিয় প্রিগোজিন এ ব্যাপারে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন বলা যায়। রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি বুঝতে গিয়ে

প্রিগোজিন এই অসাম্যকালীন স্ব-সংগঠনের সত্যটি আবিষ্কার করেন ও গড়ে তোলেন অসাম্যকালীন তাপগতিবিদ্যা বা Nonequilibrium Thermodynamics। তাপগতিবিদ্যা বিষয়টির জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তবে সেই তাপগতিবিদ্যা ছিল সাম্যকালীন তাপগতিবিদ্যা যা জটিল সংগঠনের ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যাতে সক্ষম ছিল না। একটু সবিস্তারে বলা যাক। তাপগতিবিদ্যা হলো স্টীম ইঞ্জিন বা ঐ জাতীয় বিভিন্ন ইঞ্জিনের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত বিজ্ঞান। এটি বলে যে তাপ একপ্রকার এনার্জি যা ব্যবহার করে নানারকম গতির সম্ভার করা যায়। এটি আবার বলে যে তাপ সর্বদা গরম বস্তু থেকে ঠাণ্ডা বস্তুতে যায়। কখনো ঠাণ্ডা বস্তু থেকে গরম বস্তুতে যায় না। অর্থাৎ সময়ের সাথে কোনও একটি ঘটনা ঘটনা একটা নির্দিষ্ট অভিমুখ আছে। এখন প্রশ্ন তাপের এই একমুখী প্রবাহের সাথে বস্তুজগতের সম্পর্ক কি? আমাদের চোখে যতটুকু পড়ে তার ভিত্তিতে বলতে পারি তাপ বস্তুকে বদলে দিতে পারে—বরফকে গলিয়ে জল, জলকে ফুটিয়ে বাষ্পে পরিণত করতে পারে। ম্যাক্সওয়েল ও বোলৎসমান এই ঘটনার সাথে অণুদের (molecules) আচরণকে যুক্ত করে বলেন যে তাপপ্রবাহের সাথে বস্তুর অণুগুলির মধ্যে বিশৃংখলা বাড়ে ও ফলে বস্তুটি সময়ের সাথে বদলে যেতে থাকে। তাপগতিবিদ্যা এভাবে সময়েব অভিমুখের সাথে তাপ প্রবাহকে ও তাপপ্রবাহের সাথে বিশৃংখলা বৃদ্ধিকে যুক্ত করে। তাপগতিবিদ্যা মতে এই প্রবাহ ততক্ষণই চলে যতক্ষণ না তাপমাত্রার সাম্য (thermal equilibrium) অর্জিত হচ্ছে। তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র বলে যে তাপ একপ্রকার শক্তি, তাপক্ষয়ে শক্তির উদ্ভব ও শক্তির ক্ষয়ে তাপের উদ্ভব হয়। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের মতে এই ব্রহ্মাণ্ড এক তাপগতিসাম্যের (thermodynamic equilibrium) দিকে চলেছে। তাপগতিসাম্যের দিকে চলার অর্থ কি? তাপপ্রবাহের ফলে অর্জিত হয় সাম্য ও বৃদ্ধি পায় বিশৃংখলা (disorder)। অতএব সাম্যের দিকে চলার অর্থ বিশৃংখলার দিকে চলা। তাপগতিবিদ্যার আলোকে তাই বলা যায় যে সময়ের অভিমুখ শৃংখলা থেকে বিশৃংখলার দিকে। আবার যেহেতু বিশৃংখলা বৃদ্ধির অর্থ তাপের ক্ষয় তাই বলা যায় যে সময়ের অভিমুখ (arrow of time) তাপের ক্ষয়ের দিকে। তাপগতিবিদ্যার এই সব সিদ্ধান্ত থেকে বিজ্ঞানী Helmholtz ব্রহ্মাণ্ড প্রসঙ্গে একটি ভীষণ নিরাশাজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তিনি বলেন, তাপক্ষয়ের এই ক্রমাগত প্রক্রিয়ার অন্তিম পরিণতি তাপহীনতা যার ফলে বিশ্বচরাচরের সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি একদিন বন্ধ হয়ে যাবে ও বিশ্বের তাপমত্ব ঘটবে। অথচ বিশ্বের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে এই অনুমান সত্য হতে পারে না। কারণ, চার্লস ডারউইন দেখালেন যে জীবজগতে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি প্রক্রিয়া চলেছে শক্তির অবনতির বদলে ঘটছে তার গুণগত উন্নতি, বিশৃংখলার বদলে নতুন নতুন শৃংখলা। একসময়ের প্রাণহীন বিশ্বে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী থেকে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর প্রাণীর উদ্ভব ও বিবর্তন নতুন নতুন শৃংখলার ক্রমবিকাশকেই দেখিয়ে দেয়।

সময়ের এক নিরাশাব্যঞ্জক অভিমুখের সাথে আশাব্যঞ্জক অভিমুখের এই যে বিরোধ, এর সমাধান কী? ইলিয়া প্রিগোজিন ও তাঁর ব্রাসেলস স্কুলের মতে

তাপগতিবিদ্যায় সাম্যের (equilibrium) উপর জোর দেওয়াতেই এই বিপত্তি। তাপপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে সাম্য অর্জিত হয় সত্যি কিন্তু সাম্যে পৌঁছানোর পূর্বকার অসাম্যের দিকেই আমাদের বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারণ অসাম্যকালীন অবস্থাতেই বস্তু জগতের সত্যকে বেশি করে জানা সম্ভব। সাম্যাবস্থা থেকে অসাম্যের দিকে গেলে কী কী ঘটতে পারে দেখা যাক। ধরা যাক একটি জলের গ্লাসকে খুব ধীরে কাত করা হচ্ছে। যতক্ষণ না গ্লাসের মুখ জলের তল অবধি হেলে আসছে ততক্ষণ জলের স্থির অবস্থায় কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। যেই জলের তল গ্লাসের মুখকে স্পর্শ করল অমনি এল এক সংকটকালীন অবস্থা—সাম্যের শেষ সীমা। এবার অতি সামান্য কাত করলেই হঠাৎ করে জলের সব অণুগুলো হড়মুড় করে পড়তে শুরু করবে কারণ সাম্যের শেষ সীমাকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। গ্লাসটাকে যখন হেলানো হচ্ছে তখন জলযুক্ত গ্লাসটা তার সাম্যাবস্থা থেকে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। সাম্যাবস্থা থেকে এই বিচ্যুতি

★ যতক্ষণ কম ততক্ষণ পরিস্থিতির সামান্য পরিবর্তনের ফলাফলও সামান্য। কিন্তু এই বিচ্যুতি বেড়ে যদি সাম্যের সীমায় এসে দাঁড়ায় তখন পরিস্থিতির অতি সামান্য পরিবর্তনই বিরাট পরিবর্তন ঘটাবে। সাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুতির সাথে উৎপন্ন ফলাফলের একটি গাণিতিক সম্পর্ক থাকে। এই বিচ্যুতি যতক্ষণ অল্প ততক্ষণ এই সম্পর্কটি থাকে রৈখিক। অর্থাৎ যতগুণ বাড়ে ফলাফলও ততগুণ বাড়ে। কিন্তু বিচ্যুতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই

↑ সরলরৈখিক সম্পর্ক আর থাকে না—তা হয়ে দাঁড়ায় একটি জটিল অর্থাৎ বহুঘাত বা বক্ররৈখিক সম্পর্ক। অসাম্যের এই এলাকায় গড়ে ওঠা এই সব বক্ররৈখিক সমীকরণের কমপিউটারে করা সমাধানের চিত্ররূপ অতীব সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। অসাম্যাবস্থায় সুন্দর শৃংখলার উদ্ভবের একটি উদাহরণ আলোচনা করা যাক। ধরা যাক, একটি পাত্রে জল গরম করা হচ্ছে। পাত্রের নিচে তাপ দেওয়া হচ্ছে ও তার ফলে প্রথমে তাপ পরিবহনের ফলে জলের নিচের স্তরের সাথে উপরের স্তরগুলির তাপমাত্রার পার্থক্য গড়ে উঠছে।

↑ এই তাপমাত্রার পার্থক্য যতক্ষণ কম ততক্ষণ কোনও পরিচলন (convection) স্রোত ছাড়াই তাপ পরিবহন (conduction) পদ্ধতিতে নিচ থেকে উপরে দিকে প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু তাপমাত্রার পার্থক্য যখন একটা নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করে তখন জল আর স্থির থাকে না, পরিচলন স্রোতের জন্ম হয়। নিচের জল ওপরে যায় ও ওপরের জল নিচে নামে এবং এটা চলতে থাকে। অবাক কবার মত ব্যাপার হলো এই যে, অসাম্যের অবস্থায় এই পরিচলন স্রোত জলের মধ্যে জটিল অথচ সুসংগঠিত একটি ষড়ভুজাকৃতি নক্সার আকার নেয়। যাকে Rayleigh-Benard Pattern বলা হয়।

✓ তাপমাত্রা বাড়ার সাথে বিশৃংখলা বাড়ে—এটা আমরা জানি। অথচ এখানে ঘটল তার ঠিক উল্টো। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে শৃংখলা ও সুসংবদ্ধতা বেড়ে গেল। অসাম্যাবস্থায় তাপগতিবিদ্যার নীতি প্রযোজ্য নয় বলেই এটা হতে পারল। অসাম্যের জগতের অভ্যস্তরে লুকিয়ে আছে এমন অনেক গুঁড় সত্য যা এতকাল পদার্থবিদ্যার চোখে পড়ে নি। শৃংখলা থেকে বিশৃংখলা নয়। বরং বিশৃংখলা থেকে শৃংখলাতে পৌঁছানোর এই প্রাকৃতিক চিত্রটাকে

বুঝতে হলে চাই অসাম্যের চর্চা। ধ্রুপদী বিজ্ঞান বা পরিসংখ্যানে এ জাতীয় ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এতগুলি অণুর অবস্থা পরিবর্তনকে একতালে বাঁধতে হলে চাই অণুগুলোর মধ্যে লুকানো যোগাযোগ। তবেই সুসংবদ্ধ শৃংখলা তৈরির সম্ভাবনা বাড়বে। রসায়ন শাস্ত্রের আত্মঅনুঘটন (self catalysis) এ জাতীয় যোগাযোগের উদাহরণ। জৈব রসায়নে এ জাতীয় অনুঘটকের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। DNA থেকে প্রোটিন তৈরি হয়—আবার সেই প্রোটিনদেরই কেউ কেউ DNA র প্রতিলিপি তৈরিতে সাহায্য করে। একেই বলে স্ব-সংগঠন বা Self Organisation। এখন প্রশ্ন, অসাম্যকালীন স্বসংগঠন প্রক্রিয়ায় যে সব শৃংখলার জন্ম হয় তার স্থায়িত্ব কতটা? Benard Pattern এর উদাহরণে ফিরে যাওয়া যাক। জলের স্তরগুলির মধ্যে পরিচলন স্রোতের ফলে যে বড়ভুজাকৃতি প্যাটার্নের জন্ম হয় তার চেহারা তাপমাত্রার পার্থক্য বৃদ্ধির সাথে ক্রমশ জটিল হতে থাকে, পরিচলন স্রোতে শুরু হয় আলোড়ন ও অবশেষে শৃংখলার সমস্ত চিহ্ন নষ্ট হয়ে গিয়ে বিশৃংখল স্পন্দন শুরু হয়ে যায়। সাম্যকালীন তাপজনিত বিশৃংখলার সাথে এই অসাম্যকালীন বিশৃংখলার একটা তফাৎ আছে। এই বিশৃংখলার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে অণুগুলির একটা সুসংবদ্ধ আচরণ। এত বেশি সংখ্যক সুসংবদ্ধ আকার ও ছন্দের উৎপত্তি হয় এই সময় যে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বিশৃংখলা। কিন্তু সাম্যাবস্থায় তাপজনিত যে বিশৃংখলা তৈরি হয় তাতে কোনও সুগঠিত আকার বা ছন্দের সৃষ্টি হয় না। অসাম্যকালীন এই আপাত বিশৃংখলাকে deterministic chaos বলা হয়। সাম্যকালীন তাপজনিত বিশৃংখলা ও অসাম্যকালীন আপাত বিশৃংখলার মাঝামাঝি যে সব লুকানো আকার গড়ে ওঠে তাদের প্রিগোজিন বলেছেন ‘ক্ষয়িষ্ণু আকার’ বা dissipative structures কারণ শক্তিক্ষয়ের সাথে আকারগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই সব ক্ষয়িষ্ণু আকারের বৈশিষ্ট্য হলো যে পরিবেশের সাথে আদানপ্রদান করে এগুলো টিকে থাকে ও ঐ আদান প্রদানের প্রক্রিয়াতেই তার শক্তিক্ষয় ঘটে। জীবদেহের কোষগুলি এ জাতীয় আকার।

+

বিশ্বজগত প্রসঙ্গে নিউটনীয়-কার্তেসীয় ধারণা বলে যে বর্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যৎ নিহিত থাকে, বর্তমান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানই ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ চিত্র একে দিতে পারে। ফলে অতীত প্রসঙ্গেও একই ভাবে বলা যায় যে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতকে জ্ঞানার পদ্ধতিটাকে উল্টে দিলেই অতীতের খোঁজ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ বর্তমানই মুখ্য। অতীত বা ভবিষ্যৎ গৌণ। এভাবেই নিউটনীয় চিন্তায় ‘সময়’ একটি উভমুখী নির্বীজ (impotent) ধারণা হিসেবে থেকে গেছে। প্রিগোজিন তাই নিউটনীয় সময়কে ‘a forgotten dimension’ বলেছেন। আমাদের দেখা জগত, প্রিগোজিনের ভাবধারা অনুসরণ করেই দেখতে এবং বুঝতে পারছি, এরকম নয়। আমাদের চারপাশে ঘটতে থাকা সমস্ত ঘটনাগুলোর সময়ের সাথে যুক্ত একটা নির্দিষ্ট দিক আছে। যেমন, আমাদের ছোট থেকে বড়ো হওয়া, গাছের পাতা খসে পড়া ও আবার পাতা গজানো, ঝর্ণার জলের উপর থেকে নিচে পড়া—ইত্যাদি।

এর কোনটিই উল্টো দিকে ঘটতে পারে না। সময়ের সাথে ঘটনাগুলো ঘটার একটা নির্দিষ্ট দিক আছে বলে কিন্তু এটা ভাবা ঠিক নয় যে প্রতিটি ঘটনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বানুমান করা সম্ভব। ধরা যাক আমার হাতে ধাক্কা লেগে একটা ফুলদানী পড়ে গেল ও টুকরো টুকরো হয়ে গেল। নিউটনীয় ধারণা বলে যে এই ঘটনাটি পূর্বনির্ধারিত, অর্থাৎ সময়ের সাথে যে ঘটনাটি ঘটবে তা বিশ্বের চলার যান্ত্রিক নিয়মে আগে থেকেই লেখা ছিল। সময় তাই এখানে ভূমিকাহীন। নিউটনীয় ধারণা আরো বলে যে চাইলে ভাঙা টুকরো থেকে ঐ ফুলদানীটিতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব। কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সাথে কি এই নিউটনীয় ধারণা মেলে?

যে কোনও বাস্তব ঘটনা, যেখানে অনেকগুলি বস্তুর পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া জড়িত সেখানেই নিউটনীয় যান্ত্রিক ধারণা একটা স্তরের পর আর প্রযোজ্য নয়। কারণ ঐ ধারণা ক্রিয়াশীল বস্তুগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটিকে বিচার করে। ঘটনাটিকে সমগ্র হিসেবে বিচার করে না। ফলে ঘটনা হিসেবে তার বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে প্রকৃত সত্য জানা হয় না। নিউটনীয় ধারণা একটি স্থানীয় ধারণা (local idea), তাই আন্তঃক্রিয়া নির্ভর সমগ্রকে বুঝতে তা অপারগ। অন্যদিকে ইলিয়া প্রিগোজিনের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্বায়িত বা global দৃষ্টিভঙ্গী হবার ফলে জটিল আন্তঃক্রিয়া নির্ভর সমগ্রকে বুঝতে অনেক বেশি সফল। মানবসমাজ ও অর্থনীতি একটি অতি জটিল ও আন্তঃক্রিয়া নির্ভর সংগঠন। তাই সমাজ ও অর্থনীতিকে বুঝতে কার্টেসীয়-নিউটনীয় চিন্তা থেকে সরে এসে সংগঠনভিত্তিক তত্ত্ব বা Systems Theory কে গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে বিশ্বায়ন ভাবনার উৎস এটাই। আজকের অর্থনীতিতে পরিবেশ ভাবনা কিংবা চিকিৎসা বিজ্ঞানে সমাজ ভাবনার (socio-medicine) অনুপ্রবেশের পেছনেও রয়েছে Systems Theory-র ভূমিকা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নির্দেশে চালিত বর্তমান জটিল বিশ্বে বিশ্বায়ন তাই এক অনিবার্য ঘটনা। এই প্রবন্ধের বিষয় ছিল বিশ্বায়নের সংগঠনে যে প্রযুক্তিদের (মূলত তথ্য প্রযুক্তি, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ও জিন প্রযুক্তি) প্রভাব অনিবার্য তাদের অন্তঃস্থলে যে বিজ্ঞানভাবনা কাজ করে তার পরিচয় পাওয়া, আমরা সেটাই করেছি। বিশ্বায়ন কিভাবে ঐ প্রযুক্তিদের নিয়ে বিস্তার লাভ করেছে এবং কি তার কৌশল ও স্বাভাবিক-প্রতিঘাত সেটি অন্যান্য লেখায় প্রতিভাত হবে।

চিত্তার বিশ্বায়ন

অমিতাভ লাহিড়ী

গত বছরের এগারোই সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী চারটি যাত্রীবাহী বিমান দখল করে তেলভরা বিমানগুলিকেই বিধ্বংসী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। নিউ ইয়র্কের পৃথিবী বিখ্যাত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের গগনচুম্বী যুগ্মসৌধ দুটি বিমানবোমায় ধ্বংসাত্মক, মার্কিন রণনীতির কেন্দ্রস্থল পেটাগনের একাংশ আরেকটি বিমানের আঘাতে ভস্মীভূত। চতুর্থ বিমানটি কোনো শহরে পৌঁছতে পারেনি। ভেঙে পড়েছে পেনসিলভানিয়ার মাঠে। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা কয়েক হাজার। সারা পৃথিবীর অর্থনীতিতেও গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনৈতিক হতাহতের তালিকায় প্রথমেই আসবে বিমান সংস্থাগুলির নাম, এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে আনুমানিক এক লক্ষ কর্মী ছাঁটাই হয়েছে সারা পৃথিবীর সমস্ত বিমান সংস্থাগুলি থেকে। বিশ্বায়নের যুগকাল্টে এতোদিন অনেক ছোটোখাটো দেশের স্বাচ্ছন্দ্য বলি হয়েছে, এগারোই সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসের বিশ্বায়ন শুরু হওয়াতে শক্তিশালী দেশগুলোর অর্থনীতিও আর নিশ্চিত থাকতে পারছে না।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কিছুদিন হলো বিশ্বায়নের জোয়ার লেগেছে। কথটা নতুন, ধারণাটা বুঝা এখনো স্পষ্ট নয়। বিভিন্ন চুক্তিতে সই হচ্ছে, বিভিন্ন দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের চেহারা, এমনকি সামাজিক চেহারাও পাল্টে যাচ্ছে আগাপাশতলা। সব দেশের সব মানুষ যে এই পরিবর্তন সমর্থন করছেন তাও নয়। খোলা বাজার, মুক্ত বাণিজ্য, পণ্যের অনায়াসলভ্যতা ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে, অথবা ‘কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ’⁺ জাতীয় প্রবচনের তলায় বিশ্বায়নের বিরোধিতা ক্রমাগত চাপা পড়ে যাচ্ছে। ঠিক এই সময়ে সন্ত্রাসের বিশ্বায়ন শুরু হওয়াতে অন্য সকলের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বায়ন বিরোধীদের মনোজগতেও বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটবার সম্ভাবনা আছে।

চিত্তার বিশ্বায়ন নিয়ে লেখার কথা ডাবছিলাম অনেকদিন থেকেই। শুরু করার পবিকল্পনা ছিলো সিআইল্‌ এবং জেনোআতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাসভার বিরোধিতার গল্প দিয়ে। এই বিরোধীরা কারা, কীভাবে তারা পরস্পরকে খুঁজে পেলো, শক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কীভাবে তারা গড়ে তুলেছে, কেমনভাবেই বা বিভিন্ন সরকার তাদের প্রতিহত করছে — প্রায় অবিশ্বাস্য কষ্টকল্পনার মতো, কিন্তু গল্প হলেও সত্যি। সেই গল্পে ফিরে যাবো, ফিরে যেতেই হবে, কিন্তু সন্ত্রাসের বিশ্বায়ন আর তার পাশাপাশি শক্তির বিশ্বায়নের কথাও বারবার ঘুরে আসবে। কারণ এগারোই সেপ্টেম্বরে এই গল্পের পটভূমি পাল্টে গেছে। চিন্তা, তথ্য, এবং আলোচনার বিশ্বায়নও এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়।

সবকারি সূত্রে পাওয়া তথ্য কতোটা বিশ্বাসযোগ্য তা আমরা, মানে ভারতীয়রা, সকলেই জানি। দেশের মধ্যে যে কোনো বড়ো দুর্ঘটনা, বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী অথবা সাম্প্রদায়িক ধ্বংসলীলার খবর যখন যে কাগজে বার হয়, তখনই সেখানে সরকারের ঘোষিত হতাহতের সংখ্যার পাশাপাশি বেসরকারি সূত্রে পাওয়া হতাহতের সংখ্যাও ছাপা হয়। কেবল সংখ্যা বা অন্য তথ্যই নয়, খবরের বিশ্লেষণের জন্যেও বেসরকারি বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর করি আমরা। সরকারি তথ্য বা বিশ্লেষণে সব সময়েই ভুল থাকে কিনা সেটা গবেষণার বিষয়, কেবল আলোচনার মাধ্যমে এই প্রত্যয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্যেই বেসরকারি সূত্র এবং বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর করা উচিত। শুধু গণতন্ত্রই বা বলি কেন, যে কোনো সমাজেই মানুষ চেষ্টা করে সরকারি খবরকে বেসরকারি সূত্র থেকে মিলিয়ে নিতে। একটা বিশেষ সমাজ যে তন্ত্রেই চলুক না কেন, ক্ষমতাসীন অল্পসংখ্যক লোক কখনোই সেই সমাজের সমস্ত মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যদি পারতো তাহলে সেই সমাজের মানুষের সঙ্গে ভেড়ার পালের কোনো তফাৎ থাকতো না। সেই তফাৎটা বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই চিন্তাজগতে ক্ষমতাসীন লোকেদের নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে চলার চেষ্টা, সেই লোকগুলো যে তন্ত্রের সাহায্যেই ক্ষমতা পেয়ে থাকুক না কেন।

স্বাধীন গণমাধ্যম না থাকলে গণতন্ত্র দাঁড়াতে পারে না। পৃথিবীর সব দেশেই গণতন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ স্বাধীন গণমাধ্যমের হাত ধরে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও গণমাধ্যম কি সত্যিই স্বাধীন? নাকি সেখানেও ক্ষমতাসীন লোকেদের হাতের পুতুল তারা? আমাদের দেশের গণতন্ত্র অবচীন, দেশেব অধিকাংশ লোক খবরের কাগজ পড়তে পারে না অশিক্ষার কারণে বা পড়ার সুযোগ পায় না অর্থনৈতিক কারণে। অন্যান্য বেসরকারি গণমাধ্যমের প্রচারণাও যথেষ্ট নয়। তাই এখানে আমাদের দেশ সম্বন্ধে আলোচনায় যাচ্ছি না। বরং তাকানো যাক বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে প্রাচীনতম, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। সকলেই বোধহয় বহুবার শুনে থাকবেন যে ওদেশের খবরের কাগজ, রেডিও, দূরদর্শন, সবই বেসরকারি মালিকানাতে। অতএব ওদেশের গণমাধ্যম স্বাধীন, অর্থাৎ তারা স্বাধীনভাবে সবকারি নীতির সমালোচনা কবতে পারে, পরিবর্তন নীতি নিয়ে আলোচনা করতে পারে, সরকারি নীতির বিরুদ্ধে বা পরিবর্তন নীতির পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে পারে, এবং সেইভাবে সরকারকে বাধ্য করতে পারে পথ বদলাতে। গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা দিতে, বা গণতন্ত্র কেমন হওয়া উচিত তার উদাহরণ দিতে প্রায়ই এই আদর্শ তুলে ধরা হয়। এমনকি ক্রমাগত মার্কিন সরকার ও রাষ্ট্রপতিরাও স্বাধীন গণমাধ্যমকে তুলে ধরেন শত্রুদেশের তুলনায় নিজেদের উৎকর্ষ বোঝাতে।

কিন্তু এই হিসেব থেকে দুটো জিনিস বাদ পড়ে গেছে। বেসরকারি মালিকানা মানেই স্বাধীনতা নয়, আর গণমাধ্যম সকলের পড়ার, শোনার বা দেখার জন্যে হলেও সকলের বলাব জন্যে নয়। যে কোনো মাধ্যমেই মালিকানা যার, বক্তব্যের মালিকানাও তার। খবরের কাগজের সম্পাদক যদি কাগজের মালিককে তুলোথোনা করে সম্পাদকীয় লেখেন তাহলে

তাঁর চাকরিটি যাবে। সরকারি খবরের কাগজে সরকারের কড়া সমালোচনা, বা দলীয় মুখপত্রে দলের নির্দিষ্ট মতের বিরোধিতা করাও ফলও একই ধরনের। এমনকি সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমের মধ্যে সূক্ষ্ম সাদৃশ্যও আছে। সরকারি মাধ্যমে সরকারের কোনো কাজ সম্বন্ধে কম উৎসাহ দেখালে সমালোচনা বলে ধরতে হয়, আবার কোনো মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ আমলারা কাজ সম্বন্ধে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস দেখালে সেই প্রতিবেদকের উপরে ওঠার আয়াস ধরা পড়ে। বেসরকারি মালিকানার গণমাধ্যম চলে বড়ো অংশে বিজ্ঞাপনের টাকায়। গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা, সরকারের কাছ থেকেও কিছু বিজ্ঞাপন আসে। গণমাধ্যম যাদের টাকায় বেঁচে আছে, তাদের কতদূর সমালোচনা করতে পারবে তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে যদি এমন হয় যে বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থাগুলির সংখ্যা খুব বেশি নয়, অথবা অল্প কয়েকজন লোক অনেকগুলো সংস্থার মালিক। যদি কোনো প্রতিবেদনে বিরক্ত হয়ে এরা কোনো কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া কমিয়ে দেয় তো সেই কাগজের ক্ষতি। এবং সেই সুযোগে অন্য কাগজ বেশি করে বিজ্ঞাপন পাবে। বেশি বিজ্ঞাপন পেলে বেশি রোজগার, কাগজের দাম কমিয়ে বেশি খবর ছাপা যায়, অর্থাৎ পাঠকের সংখ্যাও বাড়ে। যে কাগজের রোজগার কমে গেলো তার পক্ষে বেশি খবর ছাপাও কঠিন হয়ে পড়লো, পাঠকের সংখ্যাও কমতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত কাগজটা উঠেই গেলো। এই রকম ঝুঁকি নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের চটাতে চায় কে? আমাদের দেশের দুটো উদাহরণ দিলে বোধহয় সহজে মিলিয়ে নেওয়া যাবে। আমাদের দেশে সরকারি নীতির কড়া সমালোচনা করছে কারা? অনেক খবরের কাগজ আছে, দূরদর্শনে অনেক চ্যানেল হয়েছে এখন। সরকারি নীতির সমালোচনা করছে তারাই যারা প্রচুর পরিমাণে বেসরকারি বিজ্ঞাপন পায়। কিন্তু তারা কি তাদের প্রধান প্রধান বিজ্ঞাপনদাতাদের সমালোচনা করছে? একটু খেয়াল করলে দেখবেন সচরাচর কোনো প্রতিবেদনেই কোনো বড়ো বাণিজ্যিক সংস্থার সমালোচনা করা হয় না বা সেই সংস্থাগুলির মালিকদেরও নয়। আরেকটা উদাহরণ দিই—আমাদের একটা বড়ো বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা, আর গণমাধ্যম দূরদর্শনকে আমাদের বাড়িতে যারা পৌঁছে দিচ্ছে তাদের একটা প্রধান সংস্থা, দুটোই একটা ছোট্ট গোষ্ঠীর মালিকানায়। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি বা গ্রাহকদের সমস্যা নিয়ে কোনো আলোচনা কিন্তু দূরদর্শনের কোনো অংশেই প্রায় দেখা যায় না। এরকম উদাহরণ খুঁজলে আরো অনেক পাওয়া যাবে, মার্কিন দেশে আবো বেশি। ব্যক্তিগত বা বেসরকারি মালিকানায় থাকলেই গণমাধ্যম পুরোপুরি স্বাধীন হবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

তবুও কিছু সুবিধা অবশ্যই আছে—সরকার একটাই, আর বেসরকারি মালিকের সংখ্যা অনেক হতে পারে। অনেক মালিকের হাতে গণমাধ্যম থাকলে সকলেই যে একই কথার উপর জোর দিতে চাইবে তা নয়, কাজেই যে খবর এক কাগজের মাঝে কোনো পাতায় লুকিয়ে আছে সেটা অন্য কাগজের প্রথম পাতায় আসতে পারে। মাঝের পাতার কথা বললাম এই জন্য যে খুব কম লোকই কাগজের প্রত্যেকটা পাতার উপর থেকে

নিচে খুঁটিয়ে পড়ে, ফলে প্রথম পাতা ও সম্পাদকীয় এবং চিঠিপত্রের পাতা ছাড়া অন্যান্য পাতার তলার দিকে যে খবর বেরোয় তার পাঠক সংখ্যা কম। কিন্তু তার মানে এই নয় যে খবর বেরোয় না। সারা পৃথিবীতে অনেকগুলো সংবাদসংস্থা আছে, তার কয়েকটা বিভিন্ন দেশের সরকারি সংস্থা, কয়েকটা বেসরকারি। এর মধ্যে বেসরকারি সংস্থাগুলো কিন্তু বিশ্বাপনের টাকায় চলে না, খবর বিক্রি করে চলে। কাজেই কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার দায় তাদের কম বলেই অনুমান করা চলতে পারে। অপরদিকে সরকারি সংবাদসংস্থাগুলো একেই দেশের সরকারি মালিকানায়, কিন্তু সেই দেশগুলো যে সবসময়েই পরস্পরের কথা মেনে নেয় তা তো নয়। কাজেই বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে একই ঘটনার বিভিন্ন প্রতিবেদন পাওয়া যায়, যেগুলো পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে নিলে ছবিটা অনেক সময়ে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এর কয়েকটা উদাহরণ ঘরের কাছেই আছে, কাশ্মীর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে কেবল পাকিস্তানি দূরদর্শনের উপর নির্ভর করলে নিশ্চয়ই পুরো খবর পাওয়া যাবে না, ভারতীয় দূরদর্শনের প্রতিবেদনও দেখা দরকার। কারগিল যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার সারা দেশে পাক দূরদর্শনের প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলো। কাজেই অবশ্যই অতিশয় মূর্খামি, যদি পাক দূরদর্শন মিথ্যা খবর প্রচার করে, তাহলে পাণ্টা প্রচার করে দর্শকের কাছে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যদিও বা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়, প্রচার বন্ধ করে দিলে কিন্তু উল্টো ফল অবশ্যস্বাবী। তখন অনেক বেশি দর্শক ভাবে যে নিশ্চয়ই সরকার আসল খবরগুলো চাপা দিয়ে দিতে চায়, যেগুলো ওরা মানে বিরোধী দল প্রচার করছিলো। কারগিলের যুদ্ধের সময়ে অবশ্য এই নিয়ে খুব বেশি হইচই হয়নি, পাক দূরদর্শনের প্রচার সৎ কি অসৎ, বা তাতে কী প্রচার হতে পারে, তা যেন ভারতীয় নাগরিকেরা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলো। কাজেই প্রচারটা সত্যিই হলো কিনা তাতে বিশেষ কিছু যায় আসেনি।

তবে এটা তো কেবল আমাদের দেশে, বা যে দেশে বাকস্বাধীনতার উপর নানারকম সরকারি খবরদারি আছে, সেই সব দেশেই হওয়া সম্ভব। পশ্চিম দেশগুলোতে, বিশেষ করে মার্কিন দেশে যদি সরকার কোনো সংবাদমাধ্যমকে চাপা দেবার চেষ্টা করে, তাহলে তো ভয়ানক কেলেংকারি হবে, তাই না? আমরা তো বরাবরই জেনে এসেছি যে ওদেশে সংবাদমাধ্যম পুরোপুরি স্বাধীন, তাদের স্বাধীনতায় সরকারি হস্তক্ষেপ তারা নিশ্চয়ই কখনো মেনে নেবে না। এগারোই সেপ্টেম্বরের পর এবং আবার বেশি করে আফগানিস্তানে বোমা ফেলা শুরু হবার পর কিন্তু এই রূপকথার গল্পে দুয়োরানির কাপড়ের মতোই হাজারটা ফুটো চোখে পড়ছে। দশই অক্টোবর মার্কিন দেশের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী শ্রীমতী কণ্ডোলিইজ্জা রাইস ওদেশের দূরদর্শনের প্রধান পাঁচটি চ্যানেল—ABC. CBS. MSNBC. CNN এবং FOX-এর প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠিয়ে বলেন যে ওসামা বিন লাদেন অথবা আল-কয়েদার যে কোনো বিবৃতি যেন কাটছাঁট করে দেখানো হয়। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আরি ফ্লাইপার আরো এককটি উপরে। ইনি এর মধ্যে একবার বলেছিলেন যে ‘মার্কিনদের হিসেব করে কথা বলা উচিত’—রাইসের বৈঠকের পর ইনি

দেশের প্রধান খবরের কাগজগুলোকে ‘অনুরোধ’ করেন যেন তারা ওসামা বা আল-কয়েদার বিবৃতি পুরো না ছাপে। এমন নয় যে সংবাদমাধ্যমগুলো আল-কয়েদাকে মার্কিন সরকারের সমান সময় বা জায়গা দিতে মুখিয়ে ছিলো, বা এমনও নয় যে তারা আল-কয়েদার বক্তব্য কোনোরকম কাটছাঁট না করেই প্রচার করতে উৎসুক ছিলো, সেবকম, কাজ তাদের করা উচিত এমন কথাও বলছে না কেউ। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর সরকারি হস্তক্ষেপ চিন্তার কথা, মার্কিন দেশে আরো বেশি কারণ এই স্বাধীনতাকে সেখানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এগারোই সেপ্টেম্বরের পর ক্রমাগতই মার্কিন সরকার এই স্বাধীনতার গণ্ডি ছোটো কবে আনছে।

আরব এলাকার সবচেয়ে স্বাধীন সংবাদসংস্থা আল-জাজীরার প্রতি মার্কিন সরকারের ব্যবহারও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আল-জাজীরা মোটামুটি স্বাধীন, কাতার রাজ্যে এই সংস্থার প্রধান অফিস। এগারোই সেপ্টেম্বরের পর থেকেই এরা মার্কিন সরকারি বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানের ভিতর থেকে পাওয়া খবর, তালিবান সরকারের বক্তব্য এবং মাঝে মাঝে আল-কয়েদার বক্তব্যও প্রচার করে যাচ্ছিলো। যে কোনো যুদ্ধের আগে বা যুদ্ধের সময়ে বিপক্ষের কথা শোনা নাগরিকদের পক্ষে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের পক্ষে, খুবই জরুরি। তাতে জানা যায় যে যুদ্ধটার সত্যিই দরকার আছে কিনা, বা যুদ্ধের সময়ে নিরীহ অসামরিক লোকদের উপর অমানবিক অত্যাচার চলছে কিনা ইত্যাদি। স্বাধীন সংবাদসংস্থার কর্তব্যও দুই পক্ষের বক্তব্য প্রচার করা। কিন্তু আল-জাজীরার স্বাধীনতা মার্কিন সরকারের পছন্দ হয়নি, যদিও আল-জাজীরা নিয়মিত মার্কিন বিবৃতিও প্রচার করেছে আর আল-কয়েদার বিবৃতির প্রতিবাদ করে মার্কিন সরকার যা যা বলেছে তাও প্রচার করেছে। আফগানিস্তানে বোমা ফেলা শুরু হবার পর, বা তারও কিছুদিন আগে থেকেই, আফগানিস্তানের ভিতরে কী ঘটছে তা কেবল আল-জাজীরার খবরেই জানতে পারছিলাম বাইরের পৃথিবী, অন্যান্য বিদেশি সংবাদসংস্থাগুলোকে আফগানিস্তান থেকে বার করে দিয়েছিলো সে দেশের তালিবান সরকার। মার্কিন সরকার প্রথমে চেষ্টা করে কাতারের আমিরের সাহায্যে আল-জাজীরার মুখ বন্ধ করতে। আবব রাজ্যগুলো সংবাদসংস্থাকে স্বাধীনতা দেবার জন্য বিখ্যাত না হলেও মার্কিন সরকারের প্রচেষ্টা সফল হয়নি, তবে আল-জাজীরাতে মার্কিন সরকারের মুখপাত্রদের আগের চেয়ে বেশি সময় দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে মার্কিন দূরদর্শন সংস্থাগুলো এবং ব্রিটেনের BBC আল-জাজীরার কাছ থেকে আফগানিস্তানের ভিতরের ছবি নিলেও তা অনেক কাটছাঁট করে দেখিয়েছে, ছবির সঙ্গে কথাগুলোও রদবদল কবে নিয়েছে। ছবি বলতে ধ্বংসের ছবি আর মার্কিন বোমার ঘায়ে আফগানিস্তানের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা কতোটা বিপর্যস্ত তার ছবি।

যেমন মার্কিন আক্রমণ হতে পারে জেনে যে লক্ষ লক্ষ আফগান ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আফগান সীমান্তে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে তাদের ছবি। অনাহারে কারণ বোমাবর্ষণ শুরু করার অনেক আগেই মার্কিন সরকার প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর চাপ

দিয়ে তাদের সীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্তানে খাবার ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছে। আর বহু বছরের গৃহযুদ্ধের ফলে আফগানিস্তানের নিজস্ব খাদ্যভাণ্ডার বলতে কিছুই নেই। অথবা আক্রমণের শুরুতে রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি অফিস বোমায় ধ্বংস হওয়া আর সেইসঙ্গে দুজন দারোয়ানের মৃত্যুর খবর। অথবা রেড ক্রসের দুটি খাবারের গুদাম মার্কিন আক্রমণে ধ্বংস হবার ছবি। মার্কিন সরকার নিয়মিতই বলে যাচ্ছে যে তাদের বোমাগুলো অস্থখামার নারায়ণাস্ত্রের মতো বেছে বেছে কেবল অস্ত্রধারী পুরুষকেই আঘাত করে, কিন্তু আল-জাজীরার ক্যামেরায় ধরা পড়েছে মার্কিন বোমার ঘায়ে আফগান গ্রামের শিশুদের বীভৎস মৃত্যু। এই ছবিগুলো দেখা, বা বলা উচিত দেখতে পাওয়ার সুযোগ থাকা, বিশেষ দরকার কয়েকটা কারণে। সরকারি মুখপাত্ররা সত্যি কথা বলছে কিনা সেটা যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকের কাছে খুবই জরুরি প্রশ্ন। যাদেরকে আমরা নির্বাচন করে দেশের সরকারে বসিয়েছি, তারা যদি আমাদের কাছেই মিথ্যে কথা বলে তাহলে তাদের উপর বিশ্বাস রাখা যায় না। তাছাড়া গণতান্ত্রিক দেশের সরকার তো নাগরিকদেরই প্রতিনিধি—যদি তারা কোনো বীভৎস অন্যায় করে তাহলে তার দায় প্রতিটি নাগরিকেরই, যারা নির্বাচনের সময়ে অন্য দলকে পছন্দ করেছিলো তাদেরও। উপরন্তু মার্কিন বোমায় নিরীহ লোক মারা গেলে সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা বেড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। যে শিশুগুলি মারা গেলো, তাদের বাবা কিংবা ভাই বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কি মার্কিন সরকারকে ক্ষমা করতে পারবে কোনোদিন? তাদের কেউ কেউ ভবিষ্যতে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেবে না তো? মার্কিন সরকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান নাম দিয়ে যে যুদ্ধ চালাচ্ছে তাতে যদি নতুন একদল সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেবে এমন সম্ভাবনা থাকে তাহলে মার্কিন নাগরিকেরা সেই যুদ্ধের বিরোধিতাও করতে পারে। এই সমস্ত কারণেই আল-জাজীরার স্বাধীন প্রচার গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের এতো স্বাধীনতা মার্কিন সরকারের পছন্দ হয়নি। শেষ পর্যন্ত আল-জাজীরার কাবুলের অফিস মার্কিন বোমার ঘায়ে ধূলিসাৎ হয়েছে।

আফগানিস্তানের খবর তাহলে পাওয়া যাবে কোথায়? আল-জাজীরার মুখ বন্ধ, তাদের অফিস যন্ত্রপাতিসমেত গুঁড়ো হয়ে যাবার পর তারা মার্কিন সংবাদসংস্থার কাছ থেকে খবর কিনতে বাধ্য হয়েছে। বাকি রইলো মার্কিন সংস্থাগুলো, যারা ইরাকের যুদ্ধের মতো এখানেও মার্কিন সরকারের পছন্দমতো খবরই কেবল প্রচার করছে। কিন্তু এরাই সব নয়। মার্কিন সংস্থাগুলো ছাড়াও, এবং আল-জাজীরা ছাড়াও, আরো কেউ কেউ আফগান যুদ্ধের খবর জোগাড় করছে, এবং তারা সকলেই যে মার্কিন রণকৌশলের সমর্থক, তাও নয়। এটা সত্যি যে প্রথমদিকে কেবল আল-জাজীরাই তালিবান-অধিকৃত এলাকা থেকে খবর পাঠাতে পারছিলো, কিন্তু তারপর আফগান শরণার্থীদের কাছ থেকেও অনেক খবর পাওয়া যাচ্ছে। আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ শুরু হবার অনেক আগে থেকেই কোনো কোনো সাংবাদিক সেদেশের ভিতরে নিয়মিত ঘোরাফেরা করতেন, তালিবান-অধিকৃত এলাকায় তাদের খবর জোগাড় করার একাধিক সূত্রও ছিলো। তারা কিন্তু অনেক খবর বাইরে পাঠাতে পেরেছেন যা সবসময়ে মার্কিন সংস্থাগুলো প্রচার করেনি। এদের

মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবার্ট ফিস্ক—লণ্ডনের ‘দি ইণ্ডিপেন্ডেন্ট’ কাগজের নিজস্ব প্রতিবেদক। ইনি বেশ কয়েকবছর ধরে আফগানিস্তানের খবর নিয়মিত বাইরে পাঠিয়ে যাচ্ছেন, আফগান যুদ্ধের আগে পরে সেদেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশা নিয়ে অনেক লিখেছেন। এর লেখা অন্য জায়গায় প্রায় দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া আছে আফগানিস্তানের বিপ্লবী নারীসংঘ—Revolutionary Association of Women in Afghanistan বা RAWA—১৯৭৭ সালে গঠিত এই সংগঠন তালিবান সরকার আসারও অনেক আগে থেকেই ওদেশের ভিতরের খবর বাইরে পাঠিয়ে যাচ্ছে। কদিন আগে এঁদের একজন ভারতে এলে এখানকার কাগজে এঁদের নাম দেখা গিয়েছিলো, তার আগে নয়। মার্কিন কাগজ দূরদর্শনেও দুই-একবারের বেশি এঁদের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

তাহলে এঁদের কথা কোথায় জানা যাবে? যে বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলাম, তার কথায় ফিরে আসি এবার। গত কয়েকবছরে সারা পৃথিবীতে একটা রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটে চলেছে। এই বিপ্লবের নাম ইন্টারনেট। আজকাল সব জায়গাতেই এর নাম শোনা যাচ্ছে এতো বেশি যে নামটা অপরিচিত নেই, যদিও জিনিসটা ঠিক কী তার ধারণাটা বোধহয় সকলের কাছে সমান স্পষ্ট নয়। ইন্টারনেটের প্রধান পরিচয় প্রকাশমাধ্যম হিসাবে। লেখার কাগজ, টেলিফোন আর দূরদর্শন একসঙ্গে যোগ করে দিলে যা হয় তাই, বা তার চেয়েও কিছু বেশি। টেলিফোনে দুজনের মধ্যে কথা হয়, আজকাল বিশেষ ব্যবস্থা করে কয়েকজন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারে। ইন্টারনেটেও সেটা সম্ভব অনেকটা ওই ফোনের মতোই, যোগাযোগটা তাৎক্ষণিক হতে পারে লিখিত আড্ডার মতো, আবার কিছু সময়সাপেক্ষ চিঠিও হতে পারে, যাকে ই-মেল বলে ডাকেন সকলে। মুখের কথাতেও যোগাযোগ হয়, অবশ্য তা টেলিফোনেরই নামান্তর।

ইন্টারনেটে লিখিত কথা একজন আরেকজনকে পাঠাতে পারে, বা কয়েকজনকে পাঠাতে পারে, আবার এমনও করা যায় যে কোথাও কিছু লিখে রেখে দেওয়া হলো, যে কেউ ইচ্ছে করলে এসে দেখে যেতে পারে। এ যেন দেওয়ালে লেখার মতো, যার খুশি দুমিনিট দাঁড়িয়ে পড়ে গেলো, কেউ হয়তো চোখ বুলিয়েই চলে গেলো, কেউ হয়তো দেওয়ালটাই দেখতে পেলো না। সাধারণ দেওয়ালের সঙ্গে তফাৎটা এই যে ইন্টারনেটে কাউকে সশরীরে কোথাও যেতে হয়না লেখাগুলো পড়ার জন্যে, নিজেই চেয়ার টেবিল না ছেড়েই পৃথিবীর লোকের বক্তব্য পড়ে ফেলা যায়। তবে জানা দরকার কোন লেখা পড়তে হলে কোথায় যেতে হবে। অনেক জায়গায় এমনও ব্যবস্থা আছে যে লেখা পড়ে তার সম্বন্ধে নিজেই মন্তব্যও লিখে দেওয়া যায়, পরে যারা আসবে তারা সেটাও পড়বে। ঠিক যেন দেওয়ালের লেখার নিচে লিখে দেবার মতো। লেখা মানও অনেক সময়ে, বেশির ভাগ সময়ই, দেওয়ালের লেখার মতোই হয়। কিন্তু পত্রিকাধর্মী জায়গাও আছে অনেক, যেখানে এক বা একাধিক সম্পাদক ঠিক করেন কী লেখা বা ছবি তাঁরা বার করবেন। কোনো কোনো জায়গায় সম্পাদকমণ্ডলীকে পাঠকপাঠিকারাই বেছে নেন।

এছাড়াও যে কেউ তাঁর ব্যক্তিগত মতামত নিজের পছন্দমতো জায়গায় লিখে রাখতে পারেন, রাখেনও অনেকে।

- প্রকাশমাধ্যম মানেই যোগাযোগেরও মাধ্যম, ইন্টারনেটে ঢুকে পৃথিবীর বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হতে পারছেন অনেকে। নিজের মতামতও জানিয়ে রাখতে পাবছেন, যে জানতে চায় সে জেনে নিচ্ছে। মতামতের আদানপ্রদানই আলোচনা, বিতর্ক, তাও হচ্ছে। আরেকটা কাজও হচ্ছে, তা হলো ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা। দুবছর আগে মার্কিন দেশের সিআটল্ শহরের বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক বৈঠক হয়। সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষই যে এই চুক্তির পক্ষে ছিলেন তা নয়, বরং বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ এর বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু বড়ো বড়ো বাণিজ্যসংস্থাগুলো, বিশেষ করে বহুজাতিক সংস্থাগুলো পুরোপুরি এই চুক্তির পক্ষে।
- এবং আগেই বলেছি যে বাণিজ্যিক সংবাদমাধ্যম চলে এদের টাকায়, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অথবা এদেরই মালিকানায়, অতএব বিরোধিতার কথা বা তার কারণ সংবাদমাধ্যমে বিশেষ দেখা যায়নি। এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কিছু মানুষ ঠিক কবলেন যে তাঁরা বৈঠকের সময়ে সিআটল্ এবং অন্যান্য শহরে শান্তিপূর্ণ মিছিল বার করবেন। তাহলে বাণিজ্যিক সংবাদমাধ্যমের পক্ষেও অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা সম্ভব হবে না, প্রতিবাদ মিছিল সম্বন্ধে কিছু না কিছু খবর ও আলোচনা বাইরে বেরোবেই। চুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তিগুলো ঠিক কী কী, প্রতিবাদ করা করছেন, তাঁদের কী লাভ, তা নিয়েও আলোচনা নিশ্চয়ই বেরোবে। তাতে দেশের আরো অনেকে সচেতন হবেন ওই চুক্তির কুফলগুলো সম্বন্ধে। তাছাড়াও বিভিন্ন দেশের জনপ্রতিনিধি, আমলা এবং কৃষক-শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা ওই বৈঠকে আসছেন, তাঁরা যদি দেখেন যে মার্কিন দেশ, যে দেশের সরকার পুরোপুরি ওই চুক্তির সমর্থক, সেখানেও অনেক লোক চুক্তির বিরোধিতা করছেন, তাহলে তাঁরা নিজেদের সমর্থন বা নিজেদের দেশের সাধারণ লোকের সমর্থনের কথাটা দ্বিতীয়বার ভেবে দেখতে পারেন।

- এইসব কারণে অল্প কয়েকজন, যারা বিশ্ববাণিজ্যচুক্তির বিরোধী, তাঁরা ইন্টারনেটে www.indymedia.org নামে এক ঠিকানায় নিজেদের মতামত এবং প্রতিবাদ মিছিলের পরিকল্পনা লিখতে থাকেন। উদ্দেশ্য এই যে দেশের অন্যান্য জায়গায় চুক্তির বিরোধী যারা আছেন, তাঁরা খবর পাবেন প্রতিবাদমিছিল কবে হবে বা কেমন হলো। বিভিন্ন খবরের কাগজ বা দেশবিদেশের দূরদর্শনে ওই চুক্তির বিরোধিতা করে কিছু বেরোলে বা প্রতিবাদমিছিল সম্বন্ধে কোনো প্রতিবেদন বেরোলে তাও ওখানে জনসমক্ষে তুলে ধরা যাবে। কিন্তু ফল হলো অভাবিতপূর্ব। ইন্টারনেটে ওই প্রতিবাদমিছিলের পরিকল্পনা দেখে, কবে কীভাবে কোথায় বিক্ষোভ জানানো হবে জানতে পেরে, মার্কিন দেশ ও কানাডা থেকে হাজার হাজার মানুষ এলেন প্রতিবাদে যোগ দিতে। তাঁরা কেউ কাউকে চেনেন না, বিক্ষোভের পরিকল্পনা করেছেন যারা, তাঁদেরকেও চেনেন না। ইন্টারনেটে পড়েছেন বিক্ষোভের কথা, দেখেছেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর বা বিভিন্ন লোকের বিশ্ববাণিজ্য

চুক্তির বিরোধিতা করার বিভিন্ন কারণ। দেখে তাঁরা মনে করেছেন কোনো কোনো মতের সঙ্গে তাদের মত মেলে, তখন সেই মতের প্রবক্তাদের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিয়েছেন। বিক্ষোভের সমস্ত খবরও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছে ইন্টারনেটে, দেশে এবং বিদেশে যাঁরা মিছিলে আসেননি, তাঁরা খবর পেয়েছেন যে বাণিজ্যিক সংবাদমাধ্যমে মিছিলের যতটুকু খবর বেরিয়েছে, যতটুকু ছবি দেখানো হয়েছে, আসলে প্রতিবাদ হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি জোরদার। পরের বছর কানাডায় এবং গত জুন মাসে ইতালিতে আবার বিশ্ববাণিজ্যচুক্তি নিয়ে বৈঠক হয়। সিআটল শহরের প্রতিবাদ মিছিলকে অনেকগুণ ছাপিয়ে গেছে কানাডা ও ইতালির বৈঠকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সেই সঙ্গে ওই একই সময়ে বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদমিছিল বেরিয়েছে বিশ্ববাণিজ্যচুক্তির বিরোধিতা করে। তারও খবর বেরিয়েছে ইন্টারনেটে ওই একই জায়গায়, সারা পৃথিবীর লোক জেনেছে যে বাণিজ্যিক সংবাদমাধ্যমে যতোটা জ্ঞানা যাচ্ছে, চুক্তির বিরোধিতা সারা পৃথিবীতে তার চেয়ে অনেকটা বেশি।

এগারোই সেপ্টেম্বরের পর এবং আফগান যুদ্ধের সময়ে খবর পাওয়ার এবং ঘটনা ও নীতির বিশ্লেষণী আলোচনা পড়ার সবচেয়ে ভালো জায়গা ইন্টারনেট। এগারোই সেপ্টেম্বরের পরই বিভিন্ন সাংবাদিক এবং গবেষক আল-কয়েদা আর ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে প্রাক্তন মার্কিন সরকার ও সি আই এর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে লিখেছেন। আফগানিস্তানে রুশ আক্রমণের সূত্র ধরেই তালিবান গোষ্ঠী ও আল-কয়েদার জন্ম। একসময়ে মার্কিন সরকারের টাকায় এদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে, সি আই এ আর ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা এস এ এস এদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। টাকাপয়সা, অস্ত্রশস্ত্র এদের কাছে পৌঁছেছে মার্কিনদের বন্ধু দেশ পাকিস্তান ও সৌদি আরবের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে। কিছুদিন আগেও কসোভোতে মার্কিনপক্ষে লড়াই করেছে আল-কয়েদার সদস্যরা। অপরদিকে বছর তিনেক আগে আফ্রিকায় দুটো মার্কিন দূতাবাসে বিস্ফোরণে কয়েকশো লোক হতাহত হয়, আর তারপরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজে বোমাবোঝাই নৌকোর ঘায়ে মারা যায় বোলোজান মার্কিন সৈন্য। তখন ওসামা বিন লাদেন ও আল-কয়েদাকে এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করে মার্কিন সরকার। সেই সময়ে ওসামা সুদানে লুকিয়ে আছে এই বকম অনুমান করা হলে সুদান সরকার আল-কয়েদা এবং ওসামা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য মার্কিন সরকারের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলো। মার্কিন সরকার তাতে আমল না দিয়ে সুদানে একটা গুপ্ত তৈরির কারখানা ধ্বংস করে দেয় আর আফগানিস্তানেও কয়েকটা বোমা ফেলে। আল-কয়েদার তাতে কোনোই ক্ষতি হয়নি, কিন্তু অনাবশ্যকভাবে আফগানিস্তান ও সুদানে মার্কিনদেশের উপর অনেক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সুদানের প্রয়োজনীয় গুপ্তধর অর্ধেক তৈরি হতো ওই কারখানায়, আল-কয়েদা বা অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিলো না, মার্কিন সরকারও সেকথা স্বীকার করেছে। আবব এলাকার অন্যান্য দেশেও যে এই অপ্রয়োজনীয় আক্রমণের বিরূপ প্রভাব পড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ সেই সময়ে যদি মার্কিন সরকার সুদান থেকে আল-কয়েদার সদস্যদের তালিকা

নিতে রাজি হতো, তাহলে হয়তো এগারোই সেপ্টেম্বরের ওই ভয়ংকর ঘটনা আদৌ ঘটতে পারতো না। এই খবরগুলো, আরো অনেক সত্যি খবর, বেরিয়েছে কিন্তু খুব কম কাগজে। বিশ্লেষণী আলোচনার মধ্যে যেসব কাগজে বা একটুখানি দেখা গেছে, সেখানেই আরো অনেক লেখায় এই খবরগুলোকে তুচ্ছত্যাচ্ছল্য করে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কোনোরকম প্রমাণ বা বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়েই। অন্যান্য দেশে, এমনকি ব্রিটেনেও খবরগুলো বেরিয়েছে তথ্যসূত্রসহ, মার্কিন দেশের বেশিরভাগ কাগজেই বিশেষ কিছু বেরোয়নি। ইন্টারনেটে তাই মার্কিন দেশের বাসিন্দারা বিদেশি কাগজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথায় কী বেরোলো।

আফগান যুদ্ধের প্রথম থেকেই আফগানিস্তানের দুটো বিরোধী গোষ্ঠীর নাম কাগজে ও দূরদর্শনে সর্বক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তালিবান আর ‘উত্তরের জোট’। এই উত্তরের জোট এতোদিন রুশ এবং ভারতীয় সমর্থন ও সহায়তা পেয়ে এসেছে, মার্কিন সরকারের বিরোধিতা। আজ তারাই মার্কিনপক্ষে লড়াই করে তালিবানদের নৃশংসভাবে মেরে শেষ করছে। নৃশংসতা অবশ্য এই জোটের কাছে নতুন কিছু নয়, তালিবানের আগে এবা কাবুল দখল করে রেখেছিলো কয়েকবছর। কাবুলের ইতিহাসে তার চেয়ে খারাপ সময় বোধহয় কখনোই আসেনি, সেই কবছরের ইতিহাস নারকীয় হত্যার ও গণধর্ষণের ইতিহাস। এই দুই যুগ্মদল দলের বাইরে রয়েছে অসংখ্য সাধারণ মানুষ। আর রয়েছে মেয়েদের সংগঠন RAWA, যাদের নাম আগে একবার করেছি। ইদানীং তাদের নাম দুই-একবার খবরের কাগজে বা দূরদর্শনের পর্দায় দেখা গেলেও তা ওই দুই-একবারের বেশি নয়, আর কদিন আগে পর্যন্ত তো দেখা যায়ইনি। এঁরা কিন্তু সেই ১৯৭৭ সাল থেকে আফগানিস্তানে সক্রিয়। তালিবান শাসনে এঁরা আক্ষরিক অর্থেই প্রাণ হাতে করে গোপনে মেয়েদের স্কুল চালাতেন, দুঃস্থ বিধবাদের সাহায্য করতেন, এমনকি তালিবানের অত্যাচারের ভিডিও তুলে তাঁরাই বাইরে পাঠিয়েছেন। এঁরা কিন্তু উত্তরের জোটের সঙ্গে তালিবানের কোনো মৌলিক পার্থক্য দেখতে পান না। উত্তরের জোট যেসব জায়গায় রাজত্ব করেছে, সেখানেও মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারতো না, চাকরি করতে পারতো না, এমনকি রাস্তায় বেরোতে সাহস পেতো না। এঁদের প্রতিনিধি রাষ্ট্রপুঞ্জ গিয়ে আফগানিস্তানে মেয়েদের দূরবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন, ভারতেও কিছুদিন আগে একজন এসেছিলেন। বন-এর বৈঠকে এঁদের ডাকা হয়নি, আফগানিস্তানের নতুন সরকারেও জায়গা হয়নি এঁদের। কারণ তালিবানরা চলে যাওয়াতে এঁরা উচ্ছ্বসিত হলেও উত্তরের জোট সম্বন্ধে এঁরা পৃথিবীকে বার বার সাবধান কবে দিয়েছেন। আফগানিস্তানে মেয়েদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বাণিজ্যিক সংবাদমাধ্যমের বাইরে কিছু জানতে হলে ইন্টারনেটে এঁদের বাসা www.rawa.org থেকেই শুক কবা যায়।

আফগান যুদ্ধে সাধারণ লোকের ক্ষয়ক্ষতি কতোটা হচ্ছে তা বার করছে অনেকেই। এর মধ্যে রয়েছে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও। যেমন Amnesty International বা Human Rights Watch—ইন্টারনেটে এঁদের বাসা www.amnesty.org

আর www.hrw.org-এ নিয়মিত এদের প্রতিবেদন ও বক্তব্য প্রকাশিত হয়। কেবলমাত্র বর্ণনাই নয়, কেউ যদি আফগান যুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ করতে চান তাহলেও এই সংস্থাগুলোর মাধ্যমে তা করতে পারেন। অথবা এদের দেওয়া তথ্যসহযোগে নিজের দেশের সরকারকে অনুরোধ করতে পারেন যুদ্ধে অংশ না নিতে, বা অসামরিক নাগরিকদের প্রাণরক্ষা করতে, বা বিজয়ীরা যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন না করে তার দিকে নজর রাখতে। এগারোই সেপ্টেম্বরের পর মার্কিন সরকার সন্ত্রাসবাদ দমন করার ব্যাপদেশে কিছু নতুন আইন চালু করেছে। এই আইনগুলো সরকারি গুপ্তচর সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে অস্বাভাবিক ক্ষমতা। কোনো কারণ না দেখিয়ে গ্রেপ্তার করা, বা কোনো প্রমাণ ছাড়াই বহুদিন আটকে রাখা, বা আদালতের কোনো অনুমতি ছাড়াই কারুর ব্যক্তিগত জীবনের উপর নজরদারি করা, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র খুলে দেখা, টেলিফোনে আড়ি পাতা, এগুলো তো ছোটোখাটো ব্যাপার। এছাড়াও এই আইনে কাউকে সন্ত্রাসবাদী সন্দেহ করলে—প্রমাণ ছাড়াই—তাকে আদালতেও নিয়ে যেতে হবে না। কয়েকজন সামরিক অফিসার তার বিচার করবেন, তার উকিল ঠিক করে দেওয়া হবে, নিজের পছন্দমতো উকিল ঠিক করতে দেওয়া হবে না। দণ্ড দেবার সময়ে বিচারকদের সকলে উপস্থিত না থাকলেও চলবে, অর্ধেকের বেশি থাকলেই যথেষ্ট। আর যাঁরা উপস্থিত তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ রাজি হলেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে। অর্থাৎ যদি পাঁচজন বিচারক থাকেন, তাহলে দণ্ড দেবার সময়ে তিনজন থাকলেই চলবে, আর তাঁদের মধ্যে দুজন চাইলেই প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে। খুব বেশি প্রমাণেরও দরকার নেই, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আসামীকে না দেখালেও চলবে, আর যদি তার কাছে থেকে কোনোরকম স্বীকারোক্তি বার করে নেওয়া সম্ভব হয় তবে আর বিশেষ কিছু প্রমাণ না থাকলেও চলবে। মার্কিনদেশের সামরিক আদালতেও কিন্তু এইভাবে কাজ হয় না, সেখানে সাধারণ নাগরিক আদালতের ফৌজদারি মামলার প্রমাণ, উকিল আর বিচারসংক্রান্ত আইনগুলো মেনে চলতে হয়। বিচারের নামে এই ধরনের প্রহসন হতো মধ্যযুগের ইউরোপে, সেখানে ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা অত্যাচার করে স্বীকারোক্তি বার করে নিয়ে বিভিন্ন লোককে শয়তানের অনুচর বলে ঘোষণা করে প্রাণদণ্ড দিতো। শোনা যায় আরো অল্পদিন আগে স্তালিনের রাশিয়া বা হিটলারের জার্মানিতেও ‘রুশিয়ার’দের এইরকম প্রহসনে প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হতো। কিন্তু গণতন্ত্র আর ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারক ও বাহক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো বরাবরই এই ধরনের বর্বরতার বিরোধিতা করে এসেছে, তাই না?

কথাটা অবশ্য পুরোপুরি সত্যি নয়, মার্কিন সরকার অনেক দেশেই বর্বরতা সম্বন্ধে চূপ করে থেকেছে, অত্যাচারী সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখেছে, তাদেরকে টাকাকড়ি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্যও করেছে। ইরানে শা-এর ভয়াবহ গোপন পুলিশবাহিনী সাতাককে একসময় সি আই এর লোকেরা অত্যাচারের প্রশিক্ষণও দিয়ে এসেছিলো। মার্কিন সরকার কোনো অত্যাচারী সরকারের বিরোধিতা করেছে তখনই যখন বিরোধিতা করার অন্য

কোনো অর্থনৈতিক কারণ দেখা গেছে। যেমন আরব এলাকার সবচেয়ে বর্বর রাজ্য সৌদি আরব, যা কিনা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নারীস্বাধীনতার অভাবের দিক দিয়ে একমাত্র তালিবান শাসনের সঙ্গেই তুলনীয়, তার সঙ্গে মার্কিন সরকারের বন্ধুত্ব আটুট। অপরদিকে ইরাকের অত্যাচারী শাসক সাদ্দাম হুসেন যখন নিজের দেশের কুর্দ জাতির উপর রাসায়নিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করে হাজার লোক মারছিলো তখন সে মার্কিন সরকারের প্রিয়পাত্র ছিলো, কিন্তু যেই সে কুয়েতের তেলের দিকে হাত বাড়ালো অমনি সে আধুনিক যুগের হিটলার হয়ে গেলো। তা সত্ত্বেও, ইরাকের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ শুরু হবার বছর দুয়েক পরেও সাদ্দাম হুসেনের সৈন্য কুর্দদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার চালিয়েছে। মার্কিন সরকার কিছু বলেনি, সেই আক্রমণ আটকানোরও চেষ্টা করেনি, যদিও তারা তখন তা অনায়াসেই করতে পারতো। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানেই মার্কিন সরকার নয়। তিরিশ কোটি মানুষ ওদেশের বাসিন্দা, তার মধ্যে খুব কম লোকই সরকারের সমস্ত নীতিকে নির্বিচারে সমর্থন করে। গণতন্ত্রে সেটাই স্বাভাবিক, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু প্রথম থেকেই সংবিধানভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তাই সেখানকার মানুষও নিজেদের চিন্তার স্বাধীনতা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ওয়াকিবহাল। মার্কিন সরকারের বৈদেশিক নীতির কথা ওদেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে পৌঁছায় খবরের কাগজ আর দূরদর্শনের মাধ্যমে, আর এই সংবাদমাধ্যম দুটো যাদের হাতে তারাই ওই নীতির থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পায়। কাজেই ওদেশের বেশিরভাগ লোকের কাছেই মার্কিন বিদেশনীতি বা অন্যদেশে তার প্রভাব সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ছবি পৌঁছায় না। যেমন ভারত সম্বন্ধে ওদেশের প্রধান খবরের কাগজগুলো বা দূরদর্শনে যে ছবি তুলে ধরা হয়, তাতে প্রায়ই নানারকম ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়, সেটা ওদেশে বসবাসকারী ভারতীয় মাঝেই জানেন। এখনো মাঝেমাঝেই কলকাতার খবরের কাগজে চিঠি বেরোয়, বিদেশে বসে কেউ ভারত বা কলকাতা সম্বন্ধে যে ধারণা তৈরি করেছিলেন, এখানে বেড়াতে এসে তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যদি অভ্যন্তরীণ নীতি পাণ্টে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা করে, তাকে চাপা দেওয়া সহজ নয়। ওদেশের বেশিরভাগ লোকই নিজেদের ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্বন্ধে মোটামুটি সচেতন, ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর নজর রাখার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীও আছে। তারা কেউই ছেড়ে কথা বলবে না।

বলছেও না। নতুন মার্কিন আইন নিয়ে অনেকেই উদ্ভিগ্ন, ডানদিক-বামদিক দুদিকের লোকই এর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছেন। বাণিজ্যিক মাধ্যমে তাঁদের কারো কারো কথা বেরোচ্ছে ঠিকই, কিন্তু অনেকেই আছেন যাদের মতামত বাণিজ্যিক মাধ্যমে জায়গা পায় না, এই উপলক্ষেও পাচ্ছে না। তাছাড়া যঁা বা এমনিতে নীরব দর্শক, তাঁদেরও অনেকে নতুন আইন দেখে উচ্চকিত হয়ে আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের মতামত জানতে চাইছেন যেমন অনেকে, তেমনি অনেকে আবার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হওয়ার ভয়ংকর কুফলের ছবি তুলে ধরেছেন। মার্কিন সমাজে গণতন্ত্র এবং মানুষের স্বাধীনতা, বিশেষ করে চিন্তার স্বাধীনতা, বরাবরই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে।

এই ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনাও অনেক হয়েছে ওদেশে, এখনো হয়। অন্যান্য দেশেও এই ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনার সময়ে মার্কিন সমাজ বা আইন থেকে উদাহরণ দেওয়া প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন সরকারের দেখাদেখি অন্যান্য অনেক দেশের সরকারই এখন এমন সব নতুন নতুন আইন চালু করার চেষ্টা করছে যাতে সেসব দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর প্রবল আঘাত পড়বে। যেমন আমাদের দেশের পোটো আইন, যা নাকি সন্ত্রাসবাদ দমন করবে বলে শোনা যাচ্ছে। এর আগের টাডা আইনে সত্তর হাজার লোককে বিনা বিচারে আটকে রেখে, অত্যাচার করে, বিন্দুমাত্র প্রমাণ না পাওয়াতে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছে, সন্ত্রাসবাদীরা দিবা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। পোটোতে আরো বেশি লোককে আরো বেশিদিন আটকে রাখা যাবে, সন্ত্রাসবাদীদের কিছু হবে কিনা তাই নিয়ে গভীর সন্দেহ আছে।

বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন লোক এই ধরনের প্রশ্ন তুলছেন তাঁদের সরকার সম্বন্ধে। সন্ত্রাসবাদ দমনের অছিলায় দণ্ডপানি সরকার কীভাবে নিজের হাতে অস্বাভাবিক ক্ষমতা তুলে নিচ্ছে তা নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র চিন্তার স্বাধীনতা, সরকারি নীতিব ও কাজের সমালোচনা করা স্বাধীনতা। নতুন নতুন আইনের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে এই উদ্বেগ সকলের মনেই দেখা দিয়েছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশেই এই ধরনের আইনের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়েছে, আর যেহেতু মার্কিন আইনের উদাহরণ দিচ্ছে অন্য সব সরকার, তাই মার্কিন দেশে এই ধরনের আইনগুলোর বিরোধিতা কতদূর গড়ায় তা দেখার জন্যে তাকিয়ে আছে সব দেশের মানুষ। সমালোচনা এবং দমননীতির বিরোধিতার সংগঠনে ইন্টারনেট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, আরো নেবে। মার্কিন দেশে গণতন্ত্র এবং চিন্তার স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা নোআম চম্‌স্কির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কয়েকটি সংগঠন কাজ করছে, তাদের আলোচনার প্রধান জায়গা www.lbbs.org—ইন্টারনেটে Z পত্রিকার বাসা। বিভিন্ন দেশের শান্তিকামী ও গণতান্ত্রিক সংগঠনের সঙ্গে এদের যোগাযোগ আছে, তাদের বক্তব্য এবং তাই নিয়ে আলোচনাও এখানে পাওয়া যায়। শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সংগঠনও ওদেশে আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে হয়, কীভাবে তা আগেই বলেছি। এছাড়াও বিষয় ধরে আলোচনার একটা বিরাট জায়গা ইউজনেট—বহুরদশেক আগেও ‘নেট’ বলতে লোকে একেই বোঝাতো। ইউজনেট যেন আদি ও অকৃত্রিম বাথরুমের দেয়াল, প্রায় যে যা খুশি তাই লিখে যেতে পারে। যে কোনো বিষয় নিয়েই এখানে আলোচনা চলতে পারে, সেই আলোচনার কোনো মাথামুণ্ড থাকারও প্রয়োজন নেই। এই আলোচনাগুলোর বেশিরভাগই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয় না স্বাভাবিক কারণেই, কিন্তু এগুলোরও দাম আছে। একে তো সকলকে নির্বাধে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়, আর কোনো আলোচনাই কাকুর মনে কোনো ছাপ ফেলবে না একথা ভাবলে তো কোনো কথাই বলা বা শোনা সম্ভব নয়। ইউজনেট আমাদের দেশে একেবারেই প্রচার পায়নি, যদিও পশ্চিমের দেশগুলোতে সমস্ত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি

বেসরকারি ইন্টারনেট সংস্রুতেও তা পৌছয়। আমাদের দেশ থেকে ইউজনেটে ঢুকতে হলে groups.google.com দিয়ে ঢুকতে হবে। পুরোপুরি গণতান্ত্রিক আলোচনা কীরকম হতে পারে তা ইউজনেটে ঢুকলে খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়, যদিও সকলের সহ্য হয় না।

গণতন্ত্র ধারণা হিসাবে অনেকদিনের পুরনো, শুনেছি প্রাচীন ভারতে ‘গণবাজ্য’ ছিলো কিছু। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের ধারণার বিবর্তন হয়েছে, ক্ষমতা মাঝে মাঝেই অল্প লোকের হাতে চলে গেছে সমস্ত দেশেই। যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের চেহারাও পাল্টাচ্ছে। যতোদিন কেবলমাত্র খবরের কাগজ, বেতার ও দূরদর্শন ছিলো, ততোদিন সাংবাদিক, সম্পাদক, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ইত্যাদি অল্প লোকের কথাই পৌছাতো সাধারণ মানুষের কাছে, উজানের স্রোত ছিলো না। ইন্টারনেট অল্প খরচের সহজলভ্য মাধ্যম, তাব সাহায্যে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক আলোচনা এবং বিশ্লেষণে অংশ নিতে পারছেন, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলোতে। ফলে তাঁরা ক্রমাগতই চাইছেন রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে অংশ নিতে, এবং প্রয়োজনে তাঁরা শাস্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য এবং দাবি-দাওয়া জোর গলায় ঘোষণা করছেন। এই দেশগুলোতে গণতন্ত্রের চেহারা গণমাধ্যমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পাল্টেছে, ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময়ে শাস্তি আন্দোলন সংগঠিত হতে অনেক সময় লেগেছিলো, এখন মার্কিন সরকার যে কোনো বড়ো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে মার্কিনদেশে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায়। গণতন্ত্রের চেহারা আরো পাল্টাবে, সাধারণ লোকের হাতে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করাব ক্ষমতা এনে দিয়েছে ইন্টারনেট, তার ফলে পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে শুরু হয়ে কোনো চিন্তা বা আলোচনা ছড়িয়ে যেতে পারছে বাকি পৃথিবীতে। চিন্তার বিশ্বায়নের ফলে গণতন্ত্রেরও বিশ্বায়ন হবে, যদিও তা একদিনে হবে না, আর তার জন্য প্রয়োজন হবে পৃথিবীর মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার। ইন্টারনেট কেবল একটা মাধ্যম, গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয় মানুষের ভিতর থেকে, তার জন্য কেবল ইন্টারনেট বা অন্য কোনো মাধ্যমের উপর নির্ভর করলে চলবে না।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন : বিজ্ঞান ও বিপ্লব

পাঠিক বসু

মানুষ শাস্তিতে জীবন কাটিয়েছে কাটাচ্ছেও, কেউ কারো ক্ষতি না করে অথবা কম ক্ষতি করে দিন কাটাচ্ছে কাটিয়েছেও—এরকম শাস্তি স্থির জীবন থেকে থাকলেও ইতিহাসের পাতায় আসতে গেলে একধরনের ভাঙচুরের মুখোমুখি হতে হয়। যুদ্ধ বাধে, পরাজিতদের দাস বানানো হয়, অন্যদেশের ওপর জুলুম বসে, রাজসূয় যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ বসে—শাস্তি জীবন বারবার ব্যাহত হয়। যে এপি একটি আমাদের নিতাসাথী, মহাভারত, তার কাহিনী কৌশলেও দেখি ভাঙচুর। তাই, শাস্তি নিরুদ্ধিগ জীবন যেমন সত্য, তেমন সত্য আর রূঢ় বাস্তব হলো দখলদারির জীবন। সম্ভবত সেদিকটার প্রাবল্য লক্ষ করে ডারুইনের survival of the fittest প্রকল্পটি ভাবুকবর্গ মানতে চান।

দখলদারির এই সুদীর্ঘ ইতিহাসটা, এক যোদ্ধাদল কর্তৃক অন্যদলের সংঘাত, এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নতুনদিকে, আধুনিক পর্বে, মোড় নেয় যখন অতলান্তিক যুরোপ দখল করে আমেরিকা ; শুধু দখল করা নয়, মার্কিন ইণ্ডিয়ানদের মেরুদণ্ড গুঁড়ো করে দেয়া হয়। দখল হয় অতঃপর অস্ট্রেলিয়া তাসমানিয়া নিউজিল্যান্ড। এই দখলে, ইতিপূর্বকার দখল থেকে, কিছু গুণগত ফারাক আছে—উদ্দেশ্য আগের মতই, কিন্তু দেশ দখল করে সে দেশের বাসিন্দাদের নিশ্চিহ্ন করার কৌশলটা নতুন, দাস করা নয়, নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। এই দখলকে আমরা সাম্রাজ্যবাদের প্রথম স্তর হিসেবে দেখি, সম্ভব কারণে কেউ বলতেই পারেন এটি সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের প্রথম স্তর।

দ্বিতীয় স্তরটি হলো আফ্রিকা এশিয়ায় দখলদারি। আফ্রিকার মানুষকে দাস করে এনে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করার কুকর্মে লাগানো এবং আফ্রিকার প্রাকৃতিক ঔদ্যর্ঘ্যে ধাবা দেয়া। ধাবা পড়ল এশিয়া উপমহাদেশেও, বৃহত্তর ভারত ব্রিটিশ শৃঙ্খলায় বদ্ধ হলো, চিন বৃন্দ হয়ে রইল আফিম ইত্যাদি। আর জয় করলে লাভক্ষতির প্রশ্নটা তো আসে ; একটা মোটাদাগের হিসেব পাচ্ছি, ১৮০০ সালে সারা বিশ্বে ধনী ও দরিদ্রের অনুপাত ছিল ১ : ২, ২০০০ সালে তা হয়ে যায় ১ : ৬০ এ। পনেরো ভাগ মানুষের হাতে ক্ষমতার সর্বস্ব, আরো পঞ্চাশ ভাগ তাব ফল ভোগ করে, বাকি পঁয়ত্রিশ ভাগ সম্পূর্ণভাবে এসবের বাইরে, খরাবন্যামারীর প্রকোপে।

মানুষের ইতিহাসকে বিবর্তনকে যদি দখলদারির বিবর্তন বলে না দেখি তাহলে ঐ হিসেবটা মেলে না, বিজ্ঞান বলি কি সভ্যতা বলি কি সংস্কৃতি বলি—যাই বলি, তা

যতই মানবিক হয়ে ওঠার গর্ব করুক, তলে তলে সে এই কুকর্মের সাথী, নাহলে ১ : ২ এর অনুপাত ১ : ৬০ হতে পারে না।

৭-

দখল ব্যাপারটা প্রবৃত্তিদত্ত—সব প্রাণীই তার নিজস্ব একটা কোণ বজায় রাখে, সেই কোণে কেউ এলে সে ভয় পায় ভয় দেখায়, সংঘাত হয়, কেউ জেতে কেউ হারে—এই ঘটনা। মানুষের বেলা দখলের একটা আলাদা মাত্রা এসেছে, সে দখল নিয়ে রীতিমত ভাবে কালচার করে সায়েন্স করে। দেখতে দেখতে কালচাবে সায়েন্সে দখল করাটা ঢুকে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়—অজান্তে ব্যাপারটা ঘটে যায়। যে বিজ্ঞান $E=mc^2$ করে প্রকৃতির মন বুঝতে চায় সে তাব অজান্তেই বিধ্বংসের বীজ বুনে ফেলে, বারবার একথা বলা দরকার ভাবা দরকার।

৮- দখলটা হলো মূলত প্রাকৃতিক শক্তি নিয়ে। ‘মৃত’ শক্তিই প্রধানত, যথা তেল কয়লা এবং সেটি দখল করতে তারা স্থানীয় মানুষকে প্রয়োজনে নিশ্চিহ্ন করেছে জীবজন্তুদের শেষ করে ফেলেছে। উদ্দেশ্য একটাই : সাম্রাজ্য বাড়িয়ে চলা, দখল অটুট রাখা। বিশ্বায়ন হলো দখলের সাম্প্রতিকতম অধ্যায়, এখানে দখল শুধু ‘মৃত’ শক্তি নিয়ে নয়, জীবিত এবং অতিক্ষুদ্র অথচ অতিশক্তিমান ‘বিষয়’ নিয়ে, যা কখনো স্থান কখনো ইলেকট্রন কখনো জিন, সবসময়ই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্র...এই নিয়ে। ধীরে ধীরে আমরা সেই বিষয়ে প্রবেশ করব।

২

দখলদারি এবার নতুনদিকে মোড় নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী বিজ্ঞানের তৃতীয় পদক্ষেপ বলা যায় একে। আর্থসামাজিক উদ্দেশ্য একই : বাজারকে বাড়িয়ে যাওয়া আবার নিয়ন্ত্রণে রাখা, প্রাকৃতিক সম্পদরাজিকে ছিনতাই করা, শ্রমী মানুষের শ্রমশক্তিকে শুষে নেয়া—ব্যাপারটা একই, আগের মতন। তফাতটা হলো, শোষণের কর্তৃত্ব করছে প্রধানত তিনটি অঞ্চল—পশ্চিম যুরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান। যখনতখন যে কোন দেশে গণতন্ত্র মানবাধিকার রক্ষা কিংবা টেররিসমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগির তুলে তারা সৈন্যরণসজ্জার প্যাঁচে যে কোন দেশকে ফেলে দিতে পারে, সবদেশেই গুপ্তা গোপ্তা পোষে তারা, এক গুপ্তা বাড়াবাড়ি করলে অন্য গুপ্তা দিয়ে দমন করার চেষ্টাও করে তারা এবং এক কাজটা তারা একচেটে করার একটা জায়গা পেয়ে গেছে, কারণ সোভিয়েত তন্ত্রের পতন। তবু একটা বিরোধী শক্তি থাকলে সাম্রাজ্যবাদী দখলদারদের সঙ্গে যোঝা যেত হয়ত, এখন সেটা নেই।

হ্যাঁ, এটা গুপ্তগি বলা চলে। ব্যাপারটা গুপ্তগিই। কিন্তু মজা হচ্ছে, চোখ বাঙানো টেবিল চাপড়ানো কি সেনাপুলিশসমবাস্ত্র হলো শেষ অবস্থার সম্বল, সাধারণ অবস্থায় তারা অনায়াস দখলদারি ঘটিয়ে চলেছে স্রেফ টেবিল চাপড়ে এবং অন্ধের মারপ্যাঁচ করে। এটাই মুখ্য পথ।

পথটি দেখা দরকার।

মহৎ একটা অঙ্কের খেলায় আমরা গরীব হয়ে যাই আর ট্রায়ো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং পশ্চিম যুরোপ) দেশ বড়লোক হয়ে যায়। বিশ্বায়ন পর্বে, যদিচ অস্বীকার এমন যে গ্লোবাল কোঅপারেশন, তবু তা ভারি চমকপ্রদ পথে উল্টে যায়, আমরা গরীব হই ওরা বড়লোক হয়। এর জন্য একটা গাদাবন্দুকও লাগে না। লাগে শুধু একটু টেবিল চাপড়ানো। আমার বাড়িতে বাসন মাজা কাপড় কাচা জল তোলার জন্য লোক দরকার, আমি লোকের খোঁজ করলাম, একজন এল, কি কি কাজ শুনে বলল, তিনশো টাকা লাগবে। আমি হাঁক ছাড়লাম, সে কি হে, ও বাড়িতে যে ঝি কাজ করে সে এই এই কাজ করে পায় দুশো টাকা আর তুমি চাইছ তিনশো, দেখ, সাফ কথা, দুশো পচিশের এক পয়সা বেশি দিতে পারব না। এবার স্ত্রের দাপটের লড়াই, যে ভাল টেবিল চাপড়াবে তার জিত। ঠিক এটাই ঘটে, ধরা যাক, টাকা-ডলারের বিনিময় মূল্য নির্ধারণে, কোন অর্থনীতিবিদই সঠিক বলতে পারেন না কিসের ভিত্তিতে এটি নিত্যদিন নামাওঠা করে এবং এরই এক খোঁচায় আমরা গরীব হয়ে যাই, ডলার বড়লোক হয়ে যায়।

আমি নিঃসঙ্কোচে একটা উদ্ধৃতি ব্যবহার করছি—‘লেন-দেনের মাধ্যমে আমাদের দেশ কিভাবে লুপ্ত হচ্ছে তার একটা উদাহরণ হচ্ছে ‘মুক্ত বাজারে’—অর্থাৎ জি-৭ দেশের পুঁজিপতিদের কর্তৃত্বে থাকা বিদেশি লেন-দেনের বাজারে—চাহিদা ও যোগানের কারচুপির মাধ্যমে টাকা এবং ডলারের বিনিময় মূল্যের মাপকাঠি আমাদের দিক থেকে একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর অবস্থায় নিয়ে আসা। এই ‘মুক্ত বাজারের’ বিনিময় মূল্যের পাশাপাশি আর একটা বিনিময় মূল্যের হিসাব বিশ্ব-ব্যাঙ্ক নিজেই প্রকাশ করে। এই বিনিময় মূল্যের ভিত্তি হচ্ছে ডলারের তুলনায় অন্য সব মুদ্রার ‘ক্রয়ক্ষমতার’ তুলনা—purchasing power parity বা PPP। এর ভিত্তি হচ্ছে, এক ডলার দিয়ে আমেরিকায় যে জিনিষ কেনা যায়, সেই জিনিষের দাম ভারতীয় টাকায় ভারতে কত? এবং এইভাবে ডলার এবং টাকার যা সত্যিকারের বিনিময় মূল্য হওয়া উচিত বা পি.পি.পি. মূল্য—তার সঙ্গে জি-৭ এর কর্তৃত্বে চলা ‘মুক্ত বাজারে’ ডলারের মূল্যের সম্পর্ক কি? ১৯৯৭ সালের যে হিসাব বিশ্বব্যাঙ্কের ‘বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট, ১৯৯৮-৯৯’ এ প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখতে পাই ‘খোলা বাজারের’ ১ ডলার=৪.২৩ পি. পি. ডলার। এই হিসাবে, ১৯৯৭-৯৮ সালে ‘খোলা বাজারে’ যখন ১ ডলার পাবার জন্য আমাদের দিতে হতো ৩৭.১৬ টাকা বা ঐ দামের ভারতীয় দ্রব্য, তখন ঐ দ্রব্যের গড়পড়তা দাম আমেরিকাতে হচ্ছে ৪.২৩ ডলার। অর্থাৎ সত্যিকারের বিনিময় মূল্যের হিসাবে ভারতীয় ৩৭.১৬ টাকার জিনিষের বিনিময়ে আমাদের পাওয়া উচিত ছিল ৪.২৩ ডলার। এই তথ্য এবং তত্ত্বকথা মনে রেখে আমরা যদি ১৯৯৭-৯৮ সালে আমাদের রপ্তানি থেকে পাওয়া আয়ের দিকে তাকাই তা হলে ঐ ‘মুক্ত বাজারের’ মাধ্যমে কিভাবে আমাদের লুপ্ত করা হচ্ছে তা বুঝতে পারব।

‘১৯৯৭-৯৮ সালে রপ্তানি থেকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছিল ৩,৪৮৫ কোটি ডলার। ঐ বছর খোলা বাজারে ১ ডলার=৩৭.১৬ টাকা। তাই ঐ ডলার

পাবার জন্য আমাদের ৩৪৮৫ x ৩৭.১৬ বা ১২৯,৫০০ কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় দ্রব্য বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল। পি.পি.পি. হিসাবে ঐ পরিমাণ দ্রব্যের আমেরিকাতে দাম হচ্ছে ৩,৪৮৫ x ৪.২৩ = ১৪,৭৪১ কোটি ডলার। অর্থাৎ আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া ‘মুক্ত বাজারে’ শুধুমাত্র রপ্তানির মাধ্যমে আমাদের সত্যিকারের মূল্যে বিনিময় হলে যা পাওয়া যেত (১৪,৭৪১ কোটি ডলার) তার থেকে আমরা (১৪,৭৪১-৩,৪৮৫) বা ১১২৫৬ কোটি ডলার কম পেলাম। রপ্তানির মাধ্যমে এক বছরে ঐ লুঠের তাৎপর্য বুঝতে গেলে মনে রাখতে হবে যে ঐ বছর, ১৯৯৭-৯৮ সালে—

- ☆ আমাদের বৈদেশিক লেন-দেনে মোট চলতি ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৬৪৭ কোটি ডলার বা ঐ লুঠের মাত্র ৫.৭৫% ;
- ☆ আমাদের মোট বৈদেশিক দেনা ছিল ৯,৪৪০ কোটি ডলার বা ঐ এক বছরের লুঠের থেকেও অন্তত ১৬% কম।

স্বরণ রাখা দরকার যে প্রধানত ঐ বৈদেশিক লেন-দেনে চলতি ঘাটতি মোটাবার জনাই আমরা বিদেশি পুঞ্জির দ্বারস্থ হতে বাধ্য হই এবং ঐ বাধ্যতার সুযোগ নিয়েই তারা আমাদের উপর তাদের কর্তৃত্ব থাকা ‘মুক্ত বাজার’ চাপিয়ে দিতে সমর্থ হয়। (সূত্র—ড. ইউনুসের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প : অজিত নারায়ণ বসু : শ্রয়ণ : জুলাই-ডিসেম্বর ২০০১)।

৩

নোয়াম চমস্কি তো রীতিমত ক্রুদ্ধ যখন দেখেন ভারতের অর্থনৈতিক ফাইল লোকসভায় ঢোকার আগে আই এম এফ অফিস ওয়াশিংটন হয়ে আসছে (World Orders, Old and New : N Chomsky : 1994)। এ যদি দখলদারি না হয় ক্রীতদাসত্ব না হয় তাহলে কি? তত্ত্ববিদ অবশ্য তর্ক তুলবেন। এম আই টি’র অর্থনীতিজ্ঞ, এক দু বছরের মধ্যেই নোবেল পাবেন এমন সম্ভাবনাময়, পল ক্রুগম্যান যেমন, দেখালেন, the point is that third world countries aren’t poor because their export workers earn low wages ; it’s the other way around. Because the countries are poor, even what looks to us as bad jobs at bad wages are almost always much better than the alternatives [মূল লেখা : New York Times. Apr 22, 2001 ; তার্কিক উপস্থাপন : Monthly Review, Indian Edition, Jun 2001]—এও এক ন্যায্য কথা বলেন ক্রুগম্যান,—বহুজাতিক সংস্থারা আমাদের দেশে আসছে, কাজ জোগাচ্ছে এবং মাইনে যত কমই হোক (বর্ধিষ্ণু দেশের তুলনায়) আমাদের অদৃষ্টে যখন দূর্ভিক্ষ আবহাওয়ার বাঁধা সেক্ষেত্রে ঐ বদান্যতা কম তো নয়ই বরং বেশি। তাই বহুজাতিকের দখলদারিতে মাথা নোয়ানো মঙ্গলের, তাদের মর্জিতে চলা মঙ্গলের, আর যেদিকে গেলে মঙ্গল তার দাওয়াই বাতলেছেন ঐ হবু নোবেল লরিয়েট : Third world countries desperately need their export industries They can’t have those export industries unless

they are allowed to sell goods produced under conditions that Westerners find appalling, by worker's who receive low wages—যে দুটি বিষয়ে সম্যক দৃষ্টি আশা করা উচিত একজন দীক্ষিত মানুষের, ক্রুগম্যান তাতে পিছিয়ে রয়েছেন। প্রথম বিষয়টি হলো, পাশ্চাত্যের রুচি ও চাহিদার শেষ নেই এবং নিত্য তা বদলাচ্ছে—এই নিত্যনতুন মজির তালে তাল মেলাতে অক্ষম তৃতীয় দুনিয়ার গরীব দেশগুলো ফলে ধনীদেব ওপর নির্ভরশীল শিল্পবাণিজ্যে স্থিতি আসে না, লক আউট ক্লোসার নয়ত মন্দ ব্যবসা, কন্সট্রাক্ট না পাওয়া ফলত শ্রমিকের কর্মচ্যুতি এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। দেয়ু মোটর জেনারেল মোটরস দ্বারা ক্রীত হলে মালিকবর্গের কিছু আসে যায় না, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের কর্মীদের আসে যায়, তারা কর্মচ্যুত হয়, যা ঘটছে অ্যাংগোসাডার উৎপাদন প্রক্রিয়ায়। ক্রুগম্যান ঠিক জানেন না যে তৃতীয় বিশ্বে সেফটি নেট বলে কিছু নেই, যা আছে তা হলো লক আউট, কারখানার শ্রমিকদের পরিবারের অকস্মাৎ খাদে পড়ে যাওয়া : তার সন্তান আগামীকাল থেকে দুধ না খেয়ে থাকতে অভ্যস্ত হবে, খিদের কান্না চাপতে শিখবে, তার বউ কাজের লোক কি রান্নার লোক হতে পথে নামবে আর তার একমাত্র যোগ্যতা চা বানানো অথবা ধারে বিস্মা চালানো। এ হলো বক্তির চিত্র। আর রাষ্ট্রের? ১৯৯৯ সালের ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস স্ট্যাটিস্টিকস ইয়ারবুক (দ্বিতীয় পর্ব) পুস্তিকায় আই এম এফ দেখাচ্ছে ক্যাবা কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদ দিয়ে যে পশ্চিমা গোলাধ্বনি দৃশ্য হয় অর্থাৎ যাকে লাতিন আমেরিকা বলে চিনি তাদের সবটা মিলিয়ে ১৯৯৮ সালের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট হলো ৯০ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা আর ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ—এই তিন ভূখণ্ড মিলে ঘাটতির মান ৯৮ সালে ৯০ বিলিয়ন ডলার। আর এটা এক বছরের সমস্যা নয়—বছর বছর ধরে এই চলছে। অর্থনীতির পণ্ডিত তর্ক জুড়বেন—আমেরিকাও তো ঘাটতি বাজেটে চলে, তাহলে লাতিন আমেরিকার যা দশা যুক্তরাষ্ট্রেরও তাই। না, ব্যাখ্যাটা ভুল। একদল ব্যবসায় ডলার ঢালছে, ঢেলে ঘাটতি ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট রাখছে ; তার ডলারে ঘাটতি দেখানো মানে অন্য দেশ থেকে পুঞ্জির আগমন। সেখানে, দরিদ্র দেশের যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে ঘাটতি তার পরিণাম অন্যরকম। তারা পেসো কি রিয়েল কি সুক্রি (আমরা যেমন টাকা নয়, ডলার দিয়ে ঋণ শোধ করতে বাধ্য থাকি এবং আর টাকা ডলারের বিনিময় মূল্যে ফারাক বরাবব আমাদের শ্রমশক্তি বিদেশি ডলারে সঞ্চিত হয়) দিয়ে তো ঋণ শোধ করতে পারে না, ঐসব মুদ্রা টাকার মতই আন্তর্জাতিক অর্থ নয়—ক্ষমতালী অর্থেরা হলো ডলার, ইউরো বা ইয়েন। যারা বহুজাতিক সংস্থা যাবা বিভিন্ন দেশে অর্থ লগ্নী করছে কাজ করছে তারা ঐ ঐ মুদ্রা মারফতই অর্থ ফেরৎ পেতে চায়। তাহলে ঘাটতিতে থাকা দরিদ্র দেশগুলোর করার কি কি পথ থাকে? তারা এই দেনা শুধতে ফের ডলার বা ইয়েন বা ইউরো ধার করে—আর সেটা কত ভয়াবহ তার নমুনা পাই ঐ একই পরিসংখ্যানে—৯০ বিলিয়ন ডলার ঘাটতির মধ্যে ৫৪ বিলিয়ন হলো ‘ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম’ খাতে যা আর কিছুই নয়, ঋণ শুধতে নতুন ধার নেবার ব্যাপার এবং সেটা

হলো ৯০ এ ৫৪ অর্থাৎ ষাট শতাংশ। পাঁচ বলে একেই, এ যদি দখলদারি না হয় তাহলে কি?

আমরা এবার সহজ অঙ্ক ছেড়ে সহজ পদক্ষেপে ঢুকে পড়ব মূল আলোচনায়। এই যে দখল এই যে পাঁচ এই যে আমাদের শ্রমপ্রাণমন শুষে অধুনা ধূলিসাৎ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে অঙ্কের আঁকিবুকি কি টেবিল চাপরানি—এর ইতিহাসটা একটু অসভ্য ভাষায় লিখে ফেলেছি, এবার তাকে সুসংস্কৃতিক ভাষায় প্রকাশ করব—উদ্দেশ্য একটাই : শেষমেষ ব্যাপারটা তো দখলই আর এই দখলে WTC ধূলিসাৎ হলেও (সহস্র নিরীহ প্রাণ চলে গেলেও) শোষণ কিছুমাত্র কমবে না, হিংসা দিয়ে হিংসাকেই বাড়িয়ে ফেলা হয়, পাঁচ মিলিয়ন আফগান উদ্ধাস্ত খোলা আকাশেব নিচে বাস করছে খাদ্যপথ্য পাচ্ছে না—এ কিসের লাভ কিসের ক্ষতি। হিংসা কোনই নির্মাণ আনতে পারে না। কি সেই নির্মাণাত্মক যা পারবে নিজেকে আত্মসচেতন করে ধনীকে জানাতে যে ‘ধনী যে তোর দুঃখ ধনে’—সেটাই অনুসন্ধান করব।

৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। ইত্যাকার বলশালী রাষ্ট্রেরা সব বেশিকম ক্ষতিগ্রস্ত, একমাত্র অল্প আঁচড় খাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুযোগ পেয়েছে বড়দাশ হবার—১৯৪৯এ প্রেসিডেন্ট ট্রুমান নিলেন মার্কিন শাসনযন্ত্র, বিবৃতি দিলেন—We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. The old imperialism—exploitation for foreign profit—has no place in our plans. What we envisage is a program of development based on the concepts of fair dealing.

রাতারাতি আমরা হয়ে গেলাম underdeveloped বা অনুন্নত। আমাদের উন্নত করার ভাবনা প্রোপাগান্ডা শুরু হলো সেই থেকে—এবং এবার ভূখণ্ডের অন্য পার থেকে, আমেরিকা থেকে। প্রোপাগান্ডা শব্দটা ব্যবহার করলাম কারণ ‘অনুন্নত’ যদি থাকতামই তাহলে ব্রিটিশ এসে নিল কি? লুঠল কি? কোনটা? ব্রিটিশ এসে যথেষ্ট লুঠতরাজে যদি বা আমাদের ‘অনুন্নত’ কবে ফেলেছিল ধনসম্পদঅর্থের, তারা শেষ করে দিয়েছিল আমাদের ‘মন’ ভেঙে দিয়ে, যা ছিল আমাদের শান্তি আনন্দ আশ্রয় নিশ্চিন্তি তার সবটা সাম্রাজ্যগ্রাসী লালসার পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল। এটা কমবেশি তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্রই দৃশ্য, ব্যতিক্রম চিন জাপান (তারা ‘মন’কে হারায়নি বলেই ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিল)। তো উন্নয়নটা কিরকম? দখলদারদের পরিকল্পনা কি রকম? জাপানের উদাহরণটি না দিয়ে থাকতে পারছি না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বস্ত জাপানকে ‘উন্নত’ করার প্রথম মার্কিন দাওয়াই হলো বম্ব শেলের লাগাতার অর্ডার দেয়া। বম্ব শেলের দরকার কোথায় ছিল? নির্বিশেষ কমুনিজম ঠেকাতে আব সবিশেষ কোরিয়াকে জঙ্গ করতে অর্থাৎ ‘অনুন্নত’ করতে। এই ছোট এবং ভয়াবহ উদাহরণটি এক আশ্চর্য ফর্মুলার প্রতাপবিশেষ ;

ফর্মুলাটি হলো : খ'কে অসুস্থ করলাম, ক'কে চিকিৎসা করতে বললাম, ক' তাই করল, বিনিময়ে সেবাসাহায্য পেল, তা'বেতে এল, জন্ম হলো খ'ও, যদি সে আমার বশ্যতায় এল তো তাকে উন্নত করতে এবার গ'কে রুগ্ন করলাম। ঠাণ্ডা যুদ্ধের এই হলো নীতি। দখলদারির এ এক দুরন্ত ফর্মুলা সভ্য বেশে।

আরেকদিক, সেটা গাল ফুলিয়ে বলার দিক, সেটা এবার দেখি। তাহলো উন্নত করার বৈধ ফর্মুলা : উৎপাদনে এসো, উৎপাদন করো উন্নতি আনো। রাতারাতি GNP আর GDP'র অঙ্কে জর্জব হয়ে উঠল অর্থনীতিশাস্ত্রশাস্ত্র। ফর্মুলাটি আকর্ষণীয়—তুমি অনুন্নত, তোমার খাবার নেই নিরাপত্তা নেই, ঠিক আছে, তোমাকে শিল্পের আওতায় আনছি, তুমি উৎপাদন করো, পণ্য বানাও, বিক্রি করো, নিজে না যদি বেচতে পারো তো আমাদের বেচো, আমরা ন্যায্য দাম দিয়েই তা নেব, তুমিও খেয়েপেরে বাঁচবে।

এই ফর্মুলাতেই অনুন্নত তৃতীয় বিশ্ব উন্নত দেশদের থেকে যন্ত্রশিল্পবুদ্ধির সহায়তা নিয়ে নিজ নিজ দেশে যা যা ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তাদের উৎপাদন তথা পণ্য প্রস্তুতিতে মগ্ন হলো। সে ভারি সুখের সময়। আমি চটকল অঞ্চলের ছেলে, সকাল ছটার ভোঁয়ের স্মৃতি সদাজাগরক, একজন দুজন কখনো দলে দলে শ্রমিক পা বাড়াত মিলের দিকে, হুগুয় হুগুয় তারা মজুরি পেত, গমগমিয়ে মিল চলত, তাকে কেন্দ্র করে রেল লরি ট্রাক, স্কুল কলেজ হাসপাতাল ক্লাব, চা পান বিড়ি তেলেডাঙ্গা ও মুদির দোকান—নৈহাটি থেকে পেনেটি সর্বত্র একই দৃশ্য, জমজমটি একটা কর্মযজ্ঞ যেন চতুর্দিকে। কাজ না পাওয়াটা কোন ব্যাপারই নয়। আর তারপর একের পর এক ক্রোজার, কর্মচ্যুতি, রাজনৈতিক দাদাদের নির্মম নির্বোধ রণনীতি ছাড়খাড় করে দিল সেই সুখ। ঘটনাটা তৃতীয় বিশ্ব জুড়েই ঘটল। কমবেশি পর্বে। এবার সেদিকে তাকানো যাক।

উন্নয়নের ফর্মুলা ছিল : শিল্প স্থাপন কর, কাঁচা মাল তোল, উৎপাদন কর, বেশি বেশি পণ্য বানাও আর বাজাবে বেচ—তাহলে শ্রমিক কাজ পাবে, আয় হবে আয় বাড়বে, ভোগ করতে পারবে, ফলে সমৃদ্ধি ঘটবে সবার জীবনে। তিন দিক দিয়ে এই ফর্মুলা আকর্ষণীয় হলো। মোটামুটিভাবে আমরা ষাট, আশি এবং ২০০০ সাল ধরে এই সঙ্কটকে চিহ্নিত করব। এবং দেখব বুদ্ধিমান পুঁজিবাদ কিভাবে সংকট স্পেকুলেট করে পথ পাণ্টে নিচ্ছে।

ষাট সালের গোড়ার দিকেই ধরা পড়ে বেধডক এই উৎপাদনের জন্য যা একান্ত প্রয়োজনীয় সেই কাঁচামালের বেপারোয়া উৎপাদন মা-প্রকৃতিকে নিংবে নিচ্ছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছে, প্রাণী-মানুষ-সহায়ক-জীবচক্র বিমিত হতে শুরু করেছে—সাম্রাজ্যবাদ এই সংকটকে সামাল দিতে উন্নততর প্রযুক্তি বসন করতে লাগল যাতে করে ইত্যাকার মোটা দাগের মা-প্রকৃতিকে খনন সূক্ষ্মভাবে সাবা যায। তাতে আবে গভীর হয়ে উঠল সংকট। এখনকাব একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কম্পিউটার এক উন্নততম প্রযুক্তির ফল, ঘবে ঘরে এটি সমাদৃতও। যে তথ্য বইয়ের পাতায় লিখে রাখলে পাতার ওজন হতো এক টন, সেই তথ্য মাত্র দশ কেজি ওজনের যন্ত্র ধবে রেখেছে—তাতে করে এ

তো বলা যেতেই পারে কাগজের ‘অপচয়’ প্রচুর কমেছে। যার মানে এই হবে যে মা-প্রকৃতির বৃক্ষসন্তানেরা দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে। এবং একেবারেই ভুল এই মনে হওয়া।
 + কম্পিউটার গেরস্থালী সরঞ্জাম হবার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের ব্যবহার বেড়েছে চারগুণ—একই তথ্য যা একটা বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকত তাকে অস্তুত চাব-ছ’ বার ডাউনলোড করাব ফলে এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রে সূক্ষ্ম কাগজের প্রয়োজন থাকার ফলে কাগজের ব্যবসা চারগুণ বেড়েছে মা-প্রকৃতির অবস্থা অনুমেয়। সাম্রাজ্যবাদ এ সমস্যারও সমাধান করতে তৎপর। সে জিন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ‘টেস্টিটিউবে’ গাছ বানাবে (এভাবেই এবং এসব কাজের জন্যই ডলিদের আগমন—ডলিরা এসেছে ভোগী মানুষের যথেষ্ট মাংসানী হাবা জন্য, ভোগী মানুষের হৃদযন্ত্র কি কিডনি কি লিভার অকেজো হলে তা পাল্টে দেবার জন্য), যাব পরিণাম আরো ভয়াবহ, কিন্তু বাণিজ্যের নিগড়ে বাঁধা আমাদের ওদের ছকের বাইরে যাবার পথ নেই। আরেকটা উদাহরণ দিই। ওজোন স্তর খয়ে গেছে
 + (যাতে পৃথিবীতে মানুষ বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে) শুধুমাত্র বেধড়ক রকেট উৎক্ষেপণের জন্য—রকেট এত নিষ্ক্ষেপিত হয়েছে কারণ পৃথিবীতে বেড় দিয়ে উপগ্রহ বসাবার জন্য, উপগ্রহ বসিয়ে আমরা সোহেল ইথোপিয়া কি কালাহান্দির দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে পারি নি, বন্ধ হয়ে যাওয়া চটকল মজুরদের রিক্রা ঠেলতে তাদের মেয়ে বউদের ঝি বেশ্যা বানাতে বাচ্চাদের সমাজবিরোধী সংসর্গে পড়াটা ঠেকাতে পারি নি, উপগ্রহ পাঠিয়েছি প্রধানত নজরদারি করার জন্য দখলদারি করার জন্য।

আশির মাঝ সময়ে টলমল করে উঠল দখলদার দুটো গোষ্ঠীর একের সিংহাসন। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে যুদ্ধ অর্থনীতি ও যুদ্ধান্ত উৎপাদনযন্ত্র সারা বিশ্ব জুড়ে সংগঠিত হচ্ছিল, তাতে হঠাৎ ছেদ পড়ল। সোভিয়েত রাশিয়া তার দখল বজায় রাখতে পারল না, দেশের মানুষের মুক্তির অদম্য ইচ্ছার চাপে সে ফেটে গেল (আমরা চোখের সামনে দুটি ধ্বংস দেখলাম : মুক্তিকামী মানুষের অহিংস চাপে সোভিয়েত পতন ;
 + কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলায় সিদ্ধহস্ত মার্কিন দেশটির একটা কাঁটার খোঁচায় অস্তুত একদিনের জন্য পতন)। এর ইমপ্যাক্ট হলো : যুদ্ধবাজ উৎপাদন যন্ত্র ব্যাঘাত পেল, রাশিয়ার দুর্দশার পুনরায় শুরু, আমেরিকা ইরাকের ঘাড়ে বোমা ফেলে সংকটটা তখনকার মত সামলে দিল। কিন্তু বুদ্ধিমান মহল তো জানে যে এভাবে সামলানো যায় না, যুদ্ধবাজ উৎপাদন যন্ত্র থেকে সরতে হলে অন্য পথে সরতে হবে, উন্নততর প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দখলদারি বজায় রাখার মহড়া শুরু হলো। শুরু হলো পণ্যোৎপাদন থেকে তথ্যোৎপাদনে সরে আসা। তারই রেশ ধরে, দু’হাজারে শুনতে পেলাম নতুন রব, নতুন ফর্মুলা : তথ্যই সব, তথ্যই পুঁজি, তথ্যই ব্যবসা এবং তথ্যের বিশ্বায়ন। এব আগে তারা অবাধ বাণিজ্যের পথ বন্ধ কবে রেখেছিল, শর্তসাপেক্ষ পুঁজি ও শিল্প অনুমত দেশে পাঠাচ্ছিল, এবার তারা মন্দার গন্ধ পেয়ে ঢালাও বাণিজ্যের জিগির তুলল। Free market তত্ত্বটি আশি সালেব, ২০০০ সালে তাই কপ নিল বিশ্বায়নের বনবনানিতে। আসলে ষাট থেকে যে সংকট মোচনের ভাবনা তার চূড়ান্তিকরণ এটাই। মূল সমস্যাটা সমস্যা হয়েই রয়েছে

বরং তার মাত্রা বেড়েছে বেশিরকম—অতি ভোগ অতি উৎপাদন। লোভ ব্যাপারটা মানবচরিত্রে সম্পৃক্ত, এটি ইনস্টিংচুয়াল না অন্য কিছু তার তর্কে না গিয়ে বলা যায় মানুষ সুখ পেতে ভালবাসে, সে আরাম চায়। আর আরামের কোন উচ্চসীমা নেই এবং যার হাতে আরাম পাবার অস্ত্র রয়েছে সে যদি পরিচালক হয় নেতা হয় সে আরামেরই পুনরাবৃত্তি পুনরাবিকার চাইবে, সে বা তারা ঐ সুখভোগী জীবন-অর্থনীতি-উৎপাদন প্রক্রিয়া আনবে। এতে তার সুখ বাড়বে, সঙ্গত কারণে সে দাবি করতেই পারে তারই টাকা তারই বুদ্ধি তারই যখন সব তখন আরামের জীবনটা তার প্রাপ্য কেন হবে না। আর এতে করে যে একা তার সুখ তা কেন, চুইয়ে পড়া এই সুখের ভাগীদার কি আমরা নই, যে সুখকেন্দ্রের যত কাছে তার তত কিন্তু আমরা কিসে কম। এভাবেই অতিভোগ ও অতি উৎপাদনকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা আর ভাবনা চিন্তার জন্ম। এবং এটা বেশি দিনেরও নয়। নক্ষত্রের বয়সের তুলনায় তো গতদিনের ঘটনা বলা চলে। এই তো সেদিনও, অষ্টাদশ শতকের শেষে আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা বিস্মিত হতো যে (যুরোপীয়) আগন্তুক অতিথিরা কেমনধারার মানুষ যারা জমি ভূসম্পদ ‘কিনতে’ চায়—জমি ভূসম্পদ বেচাকেনা মানুষ করবে কি করে ওসব যে মা-প্রকৃতির। এমনি ‘অসভ্য’ ‘মূর্খ’ ধারণাগুলোর শিক্ষিতায়ন সেদিন থেকে গুছিয়ে শুরু করা হলো। দেখতে দেখতে আমরা ভোগের উৎপাদন এবং তার শিক্ষা চিন্তায় বাঁধা পড়ে গেলাম।

৫

শিক্ষার পর্বপরম্পরা সম্বন্ধটি একটু গুছিয়ে নিই এবার। আমাদের আলোচ্য বিষয় : বিশ্বায়ন, বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং বিপ্লব। আমরা দেখছি দৃশ্য অথবা অদৃশ্য যেটাই হোক কোন একধরনের জোরালো দখলনীতি যুদ্ধবাজ মানসিকতায় বিশ্ব এক্রান্ত, এ বিশ্বটা এভাবেই ভাবা হচ্ছে যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্রমঘামক্ষুধা জীবনাকাক্ষা শুয়ে নিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোগবাসনায় দিন কাটাতে পারে—নাহলে ১ : ২ এর মাত্রা আজ ১ : ৬০ হতে পারে না।

এই যে সভ্যতা তৈরি করা হয়েছে, এর বিপরীতধর্মী যে সভ্যতাব কথা জানি যাকে পল্লীসভ্যতা বলে গাঙ্কি বুঝতে চেয়েছেন, তার সম্বন্ধে যতই সাধু রব উঠুক সেটির মধ্যে যে ঘোলাজল বইত যে স্ট্যাগনেশনের দুর্গন্ধ গুলিয়ে উঠত তা নিজ ভাঙনেই ভেঙে গেছে। যতই তাতে আদর্শসমতাশাস্তি ছিল বলে দাবি করা হোক না কেন, তাব নিজ নিজ মৃত্যু প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছে তার অভ্যন্তরের সদস্যরা সেই জীবনযাত্রাকে উন্নত কবতে পারে নি। তুলনামূলক বিচারে বলা যাবে, এই ধনতান্ত্রিক সভ্যতাব যদিবা জোর পড়ে লোভ ভোগ ও তা পাবার প্রতিযোগিতায়। এই গতিটা যদি এই সভ্যতাব চলার কারণ হয় তাহলে ঐ সভ্যতা অর্থাৎ পল্লীসভ্যতার পতনের কাবণ হবে : লোভ ভোগ ঈর্ষা। দুটোকে বিশ্লেষণ করলে দেখছি, মানুষের মনে আসলে রয়েছে হিংস্র একাকীত্ব, সে অপরাপর প্রাণীর মতই একা হতে পেছপা হয় না, যুথবদ্ধতা বা যুথমনস্কতা হলো তার

শিক্ষা বা দীক্ষা, ওটি ঘষেমেজে তৈরি করা, আসলে সে অন্যপ্রাণীর মতই একা, স্বার্থে বা প্রয়োজনে গোষ্ঠীবদ্ধ। ফলে সে যা গড়ে, বিনিময়ে তার প্রভু হতে চায়; তাব ভালবাসা একটা অহং হয়ে ওঠে, যাকে সে ভালবাসে তাকে সে অধীন করে রাখতে তৎপর থাকে, এই অধীনতাচাক সংকেতটি সে অপর পক্ষ থেকে না পেলে ক্রোধী হয় ঘৃণাতুর হয়, এমনকি প্রয়োজনে সম্পর্ক ধ্বংস করতে তার বাধে না। এটাই তার বিশিষ্ট স্বভাব।

পল্লীসভাতায় অথবা অতিপরিচিত গণ্ডিতে এটা অতটা এক্সপোসড হয় না, হতে পারে না, আর কিছু থাক বা না থাক চক্ষুলজ্জা বলেও একটা ব্যাপার থাকে। ফলে হিংসাব প্রোজেকশন চট করে ধরা পড়ে না, যদিও শরৎচন্দ্রের লেখালেখি অনুসন্ধান করলে দেখতে পাই এর বন্য উপস্থিতি। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে হিংসা লোভ লালসা সবার অগোচরে মার্জিত ভাবেই লালিত হয়—আমার কন্যার স্তন আমি দেখব না (তুলনীয় পল্লীতন্ত্র) কিন্তু ফ্যাশন চ্যানেলে যারা নিত্য প্রদর্শিত হয় তারা আমার কন্যাসমা হলে কি হবে তাদের স্তন নিত্য আমি লালসাক্ষুদ্র চোখ নিয়ে নিত্য দেখতে পারি। এই সভ্যতায় ঐ আক্রে গেছে খসে, আমি সবার অগোচরে চলে আসতে পেরেছি, অদৃশ্য হতে পেরেছি, আমার গোপনীয়তা যথেষ্ট পোক্ত, আমি অনায়াসে ভোগী হতে পাবি কারণ আমি একা সবাই একা এবং আমি ও সবাই অদৃশ্য, অদৃশ্য যেন রেশমের মত ফিনফিনে অস্তিত্বমান।

এখানে প্রাণী মানুষের টিকে থাকার জন্য যা যা ভাবনা থাকা সম্ভব তাই হয়, এই সভ্যতার ভাবনা এমনি ধারার (ঐ সভ্যতা অর্থাৎ পল্লীসভ্যতা নিয়ে পরে বলব)—প্রাণী তার প্রাণশক্তি বজায় রাখার জন্য যা যা করতে পারে তাই তাই করা যায় যেমন, যোগ্যতম হবার লড়াই (প্রতিযোগিতা—যা আমরা বাচ্চাবয়স থেকে শিশুদের মধ্যে গোঁথে দিয়েছি) এর মহড়া দেয়া হয়, তার যথেষ্ট লোভ ও ভোগ করার অধিকার রয়েছে, সীমাহীন লোভভোগ করার অধিকারই তার রয়েছে, আর সেদিকটা মাথায় রেখে বিজ্ঞান সংস্কৃতি শিল্প উৎপাদন অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি সবকিছুকে সাজানো হয় (যারা যত সভ্য যত উন্নত তাদের তত শোষণ হবার অত্যাচারী হবার প্রভু হবার দাস বানাবার ইতিহাস প্রথা পাঠ রয়েছে)। যেহেতু এটা প্রাণী মানুষের একান্ত আপন ঘটনা, তাই যায় যায় রব উঠলেও এ সভ্যতা টিকে থাকে, যদি না এরা নিজেদের ধ্বংস করে ফেলে অথবা এদেরই আচরিত কোন প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য নড়ে গিয়ে (যথা মারণ ভাইরাস) মা-প্রকৃতি এদের উৎখাত করে মারে—ততদিন এটা টিকে থাকবে।

তাই মানবচরিত্রেব একান্ত নিজস্ব এইসব লোভভোগ, প্রয়োজনে একা হতে পিছপা না হতে পারার জেদ—এসবের সঙ্গে সমতা বেখে যে সমাজব্যবস্থা তৈরি হয়, হয়ে উঠেছে ও সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে মূল জীব পড়ছে আরামের ওপব, আরামটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিষ্পন্ন করার ওপর। এই অংশটি আগে স্বচ্ছ করে নিই।

সারাদিন আমরা সাধারণভাবে যা কাজকর্ম করি যতটুকু হাত পা নেড়ে পবিশ্রম করি তাতে ন্যূনতম আশি ওয়াট শক্তি, যদি সঠিক উদ্ধার কবতে পারি, তৈরি হয়। শুধু পা—তার ইঁটাচলা ওঠাবসা মারফৎ এক ওয়াট শক্তি উৎপন্ন হবে। বিজ্ঞান এই

সহজে উৎপাদিত অথচ বেমালুম অপচয়িত শক্তিটা উদ্ধারে নেমেছে, ঐ শক্তি দিয়ে তারা জুতোতে রাখা মাইক্রোপ্রসেসর চালু করার পরিকল্পনা করছে, জুতোতে রাখা কম্পিউটার মানুষটির সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন সম্বন্ধে সজাগ থাকবে—ভাবনাটা এমন।

এমন ভাবনা প্রতিটি প্রযুক্তিভিত্তিক আবিষ্কার ও ব্যবহারের পেছনে রয়েছে—তাই একে বলছি, আরামকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিষ্পন্ন করার পথ। এটাই মূল চালিকাশক্তি। আমরা কত সহজে কত কম পবিশ্রমে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভোগ করব এবং আমরা বলতে সমগ্র মানবজাতি নয়, যার ক্ষমতা আছে তার মর্জিতে চলব।

এই মর্জিমক্ষিক ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিকে নজর দিতে হয়। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে দিন চলে যায় ঠিকই কিন্তু লোভ তো মেটে না তাই মোটা কাপড় ভাতকে সূক্ষ্ম করার দিকে সুন্দর করার দিকে আরামদায়ক অথচ শক্তপোক্ত করার দিকে যেতে হয়। এবং প্রযুক্তি তাতে এক পায়ে খাড়া। সেই নির্দিষ্টমানে মোটা কাপড়কে সুন্দর মোলায়েম অথচ টেকসই কাপড়ে আনার অবস্থায় আনতে না আনতেই আরেকটু অন্যভাবে কাপড়টি আকর্ষণীয় করার কথা ভাবা হয়—প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবে যেমনটি হয়ে থাকে, ক'এর থেকে আরেকটু ভাল কোয়ালিটির শার্ট খ' কম দামে বেচতে পারলে বাজার খ'এর দিকে ঝোঁকে—তাই সবসময়ই একটা গতি একটা নতুনত্ব চলে আসে। যা অদৃশ্য হয়ে পিছু পিছু আসতে থাকে তা হলো একটা পরাজয়—কারোর পিছু হটা, এটাই মারাত্মক ব্যাক হোল হয়ে ওঠে।

গতিটি যেমন নতুন নতুন ধরনের উৎপাদন করতে থাকে তেমনি বেশি বেশি উৎপাদন করতে থাকে—যত দ্রুত যত বেশি মাত্রায় বাজার ধরা যাবে বাজারে পণ্যটি ছেয়ে ফেলা যাবে ততই লাভ এবং অনিবার্য সত্য যেহেতু এও যে ভোগের বাসনা কখনো এক জায়গায় থেমে থাকবে না তাই যত তাড়াতাড়ি বাজারে একটা দ্রব্য বেচে যত তাড়াতাড়ি তা নিঃশেষ করে নতুন একটা পণ্য বাজারে আনা যাচ্ছে, অন্যের তৈরি পণ্য বাজারে আসার আগে—বোঝা যাচ্ছে, এটি তাড়া করে সব প্রভুকেই, তাই অতি উৎপাদন ও নতুন নতুন উৎপাদন (প্রধানত দুটো দিকে এই উৎপাদন ঘটে—অস্ত্র নির্মাণে এবং ভোগ্যপণ্য নির্মাণে) হয়ে পড়ে ধনতন্ত্রের বিশিষ্টতা। এটি অনবদ্য গতিতেই বাজার দখল করতে উদ্যত হয়, চেষ্টা করে বিশ্ববাজার ধরতে, বিশ্বায়ন তাই নতুন শব্দ হলেও সাম্রাজ্য বিস্তারেরই ছল।

প্রশ্ন করব, উৎপাদন করবে কে? এবং কি থেকে উৎপাদন হবে? প্রকৃতি যা সাজিয়ে রেখেছে তার দখল নিয়ে মানুষকে দিয়ে উৎপাদন হবে—এটা শুধু। কিন্তু কখনোই এ পথে বাজার চলবে না। মানুষের চেয়ে যদি যন্ত্রের ক্ষমতা বেশি কবে ফেলা হয় এবং নিখুঁত করা হয়—তাই, প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে ধনতন্ত্র এগোতে থাকে। প্রযুক্তি মানুষকে হটিয়ে দেয়, রাজার এঁটো করে দেয়। এবং প্রযুক্তি অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে অবিশ্বাস্য সংখ্যায় ও গুণগত নতুনত্ব নিয়ে উৎপাদন করে—ফলে একটা সময় আসতে

পারে যখন দ্রব্য প্রচুর, একই সংখ্যার লোক বহুমাত্রায় ভোগ করে চলে এবং প্রকৃতি অবসন্ন নির্বিকার দোহনে ক্লান্ত। ছয়ের দশকের ভাবকেরা প্রকৃতির এই মনোবিকলনটি চিহ্নিত করেছিল, আটের দশক ধনতন্ত্রের বাজার সঙ্কোচনের ইঙ্গিত দিয়েছিল। ইঙ্গিতগুলো দারুণ কাজ কবে। এদিকটাও ভাবা দরকার। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা দাবি করে তারা মতপ্রকাশে স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্রকে মূল্য দেয়, আসলে তারা মূল্য দেয় অথবা পরিমাপ করে বিপদসংকেতকে, তা যে কর্নার থেকেই আসুক না কেন। ছ' দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন প্রকৃতিদূষণের কথা উঠল, সঙ্গে সঙ্গে তারা সচেতন হলো, পলিউশন'এর নামটা তারাই তারপর থেকে বেশিবেশি প্রয়োগ করতে লাগল এবং তাদের প্রযুক্তি ও দ্রব্য যে পলিউশন-ফ্রি এটার প্রোপাগান্ডা তুলে ব্যবসা চৌকণ বাড়িয়ে বসল। অনুরূপ উদাহরণ দিই অর্থনীতির ক্ষেত্রে। Future of Capitalism বই লিখে বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠেছেন লেপ্টার থুরো, এম আই টি'র এই গুণী মানুষটি মোমেন্টামের অঙ্ক কষে দেখান যে ষাট সাল থেকেই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের ভরবেগটি ওপরে তো ওঠেই নি বরং নিচে নেমেছে। বেড়েছে তাই উন্নত দেশেই কর্মচ্যুতি বেকারি, সঙ্গে সঙ্গে যা যা দেহমনরাষ্ট্রের বৈকল্য সম্ভব তাও। এটি পাঠ করলে ধনতন্ত্রবিরোধী মেধাবানেরা উল্লসিত হতে পারেন উৎফুল্ল হতে পারেন এই ভেবে যে ধনতন্ত্র মুখ খুঁড়ে পড়বে নিজেরই ক্ষয়ে—কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই তা হয় না, ঐ একই বইতে থুরো দুর্ধর্ষ কয়েকটা স্পেকুলেট করেন, যথা...In the twenty first centuries, brainpower and imagination, invention, and the organization of new technologies are the key strategic ingredients, যেমন, টেকনোলজি সেদিকেই যাচ্ছে যাতে পণ্যের মূল্য কমে যাবে, ১৯৭০ থেকে ৯০এর মধ্যে বহুবিধ প্রকৃতিজাত দ্রব্যের মূল্য ষাট ভাগ কমেছে, ২০২০র মধ্যে আরও ষাট ভাগ কমে যাবে—ফলে, যেসব রাষ্ট্র তাদের প্রকৃতিজাত দ্রব্যের দক্ষিণে বিভবান হয়েছিল তারা গরীব হবে যাবে, পক্ষান্তরে...today, knowledge and skills now stand alone as the only source of comparative advantage। অর্থাৎ পতনের যেমন ইঙ্গিত স্পষ্ট উত্থানের পথও তেমনি : দ্রুত গতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান উন্নততর প্রযুক্তি-জ্ঞান-তথ্য ইত্যাদির সনাক্তকরণ ও ব্যবহারযোগ্যতা নিয়ে গবেষণায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশ্বায়ন এরই প্রতিফলন।

এখনি প্রশ্ন উঠতে পারে আহামরি কি রয়েছে বিশ্বায়নে। রয়েছে প্রয়োজনীয় দখলদারি মনোবৃত্তি—১. যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশ্বকে একটা নেট ওয়ার্কে আনা ; ২. কোনটায় কে বেশি আর কোনটায় কে কম এবং কার কোনটা চাহিদা এটা দ্রুততার সঙ্গে গোচরে আনা ; ৩. যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন—এই রত্নটি বিশ্বের অব্যুত নিযুত তথ্য ঘেঁটে বার করে নেয়া। তর্ক উঠতে পারে এতে যে আমেরিকা বা জাপানের লাভ তা কেন তৃতীয় বিশ্বও তো একই নেট ওয়ার্ক-অধীন, তাই ভালোকে এক্সপ্লয়েট করে আমরাও গুছিয়ে নিতে পারি।

তর্কটি পরে বিবেচ্য হোক।

৬

অতি ভোগ অতি উৎপাদনমুখী কবলতায় প্রকৃতি যেমন কলুষিত হচ্ছে, যার ফলে, প্রকৃতিই তো আমাদের মা এবং প্রাণদাত্রী শুধু নয়, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ প্রাণশক্তি আমরা প্রকৃতি থেকেই পাই, ফলে প্রকৃতির ক্ষতি হওয়া মানে সমগ্র মানবজীবনের ক্ষতি আর এই ক্ষতি, ঘুরিয়ে বললে, যুদ্ধ অস্থিরতার মতোই, পূঁজিবাদী প্রৈতিতে কৃত্রিম বেগ আনে। সহজ কথা, অসুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক-প্যাথলজিক্যাল টেস্ট-নার্সিং হোম-ওষুধপত্র — এভাবে একটা স্বাস্থ্যব্যবসা যেমন চলতে থাকে, এটি যেমন ঘটে, তেমনি পূঁজিবাদী সমাজেও বেগ আসে আবার এতে গতিরুদ্ধ হবার সংকটও থাকে। যেমন, অতি উৎপাদন বজায় রাখতে হলে উৎপাদনের সূক্ষ্মতা আনতে হলে প্রযুক্তির অবিরাম প্রয়োগ দরকার, যাব ফলে কর্মচ্যুতি ও নিতানতুন কাজের চঙ পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে একদল মানুষের নিচে ছিটকে পড়াটি সত্য হয়ে যায়। উৎপাদন হচ্ছে অথচ শ্রমিক নেই, থাকলেও অল্প—তাহলে বাকি মানুষের কি ভবিষ্যৎ? অধ্যাপক অজিত নারায়ণ বসুর হিসেব মত এই কমহীন অলস মানুষের শ্রমশক্তি কাজে লাগিয়ে এই সভ্যতার সমানই সম্পদ সৃষ্টি করা যায়, অর্থাৎ মুনাফার উগ্র আতিশয্যে আমবা ততটাই অপচয় করে ফেলছি। এ ছাড়া সংকটের আরেক বড় দিক হলো : অতি উৎপাদন বজায় রাখতে পূঁজিপতিরা শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের অপেক্ষায় বসে থাকে না, রাসায়নিক সম্পদ সৃষ্টি করে এবং তা দিয়ে তারা প্রাকৃতিক সম্পদকে দ্রুত বাড়াতে বাধ্য কবে [HYV বা GM খাদ্যদ্রব্য যেমন] নাহয় প্রকৃতিজ্ঞাত দ্রব্যের বিকল্পে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে (অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের মত)—এর সঙ্গে বাজারে সচলতা আনার জন্য one use throw মানসিকতাটি চালু রাখা হয়, ফলে অতি মাত্রায় রাসায়নিক দ্রব্যের ওপর নির্ভরতা এসে যায় এবং এই রাসায়নিক অর্গানো দ্রব্যগুলির আণবিক সাঁজো বোজিন-চক্র থাকে বলে তাদের পাই-ইলেকট্রন চক্রবৃহৎ জীবদেহের জিনসজ্জার হাইড্রোজেন বান্ধনে ব্যাঘাত ঘটায় বেশি, অর্থাৎ শারীরিক বিযক্রিয়া ঘটায় বেশি।

অর্থাৎ মূল যে উদ্দেশ্য যা নিয়ে এই গতিবাদী সভ্যতার জন্ম অথবা সভ্যতায় গতিসৃষ্টি সেটা অর্থাৎ লাগামছাড়া লোভভোগ যতদিন থেকে যাবে ততদিন এই গতি ঘর্ষণের বলে একদল মানুষকে নিচে নামিয়ে যাবে, অসুস্থ অসুখী করে যাবে। এই লোভভোগ নিয়ে কথা বলতে গেলে দেখেছি আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক বন্ধুরা যুক্তির বদলে যেন আবেগের আতিশয্যই টেব পেয়ে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন, এর বিকল্পে, আমি একটা তথ্য দিচ্ছি যাতে আমার আবেগের যুক্তিটা স্বচ্ছ হয়ে যেতে পারে। মার্কিন দেশে ক্যানসারে আক্রান্ত এবং মৃত মানুষের ওপর নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রমাণ করিয়ে দিয়েছে—যদি ভাগ ক্যানসার আক্রমণের মূল কারণ হলো ধূমপান এবং 'ভুল' খাদ্যাভ্যাস যেখানে জন্মগত কারণে, বেগডানো জিন বইবার কারণে, ক্যানসার হবার মাত্রা মাত্র পাঁচ ভাগ। ভুল খাদ্যাভ্যাস বলতে কি বুঝি? অতি প্রোটিন, চর্ড়া স্নেহ দ্রব্য, কম আঁশযুক্ত খাবার, অ্যালকোহল, স্নেহবিষদ্রব্য অর্থাৎ চিনি ও নুন (এরা নাহলে খাবার

লোভনীয় হবে কি করে) এবং রাসায়নিক সার-ব্যবহৃত খাদ্য ব্যবহার। মার্কিন দেশে এ ধরনের তথ্য অমিল না হবার কারণে বলতে সুবিধে হচ্ছে, ব্যাপারটা এও যে তৃতীয় বিশ্বের আমবা একই ভাবে ‘শিক্ষিত’ হচ্ছে ও এই এই ভাবেই খাচ্ছি, ফলে শিক্ষিত ও ধনী (আমাদের ভাষায় : লোভী এবং ভোগী) মানুষের পরিণতি এই হতে বাধ্য এবং যারা বঞ্চিত যারা ক্ষুধার্ত (আমি তাদের মুখ থেকে দুধ কেড়ে এনে তা দিয়ে চকলেট আইসক্রিম ছানার মিষ্টি বানিয়ে যেমন নিজেকে বিপন্ন করলাম চড়া প্রোটিন চড়া ফ্যাট খাবার খেয়ে, তেমনি ঐ নিরন্ন মানুষদের একান্ত প্রয়োজনীয় দুধ কেড়ে নিয়ে) তাকেও অপুষ্টিতে থাকতে বাধ্য কবলাম—আর কবে বুঝবে এই নিষ্ঠুর অঙ্ক?

এভাবেই মৃত্যুর একটা গতি আসে বিপন্নতার একটা গতি আসে। এভাবেই একটা অতি বলশালী অন্ধকার-শক্তি সম্বিষ্ট হয়—অশিক্ষা অপুষ্টি হাহাকার মানুষকে দুটো অপশন দেয়। হয় মরো নাহয় বাঁচার তাগিদে অন্ধকার জগতের ডাকে সাড়া দাও। এই ধনগর্বী রাষ্ট্রেরা, এরা স্বার্থে বন্ধু স্বার্থে শত্রু, ফলে এরা একে অন্যের বিরুদ্ধে ধ্বংসের জন্য উদগ্রীব ও বিজ্ঞাননির্ভর গবেষণাই এক্ষেত্রে করে থাকে—যথেষ্ট শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক চপেট এরা হ্যাকিং-এ (মাইক্রোসফটস’এর উত্থানের ইতিহাস পাঠ করে আমার এই মনে হয়েছে যে বিল গেটস একজন সাকশেশনফুল হাকার) মদত দিতে থাকে, আর অন্যান্য ধনী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-গোষ্ঠীকে ঠেকাতে ড্রাগলর্ড, অয়েল লর্ড, তথা মাফিয়াতন্ত্রের জন্ম দিয়ে থাকে (সম্প্রতি জানছি মাফিয়াতন্ত্র তথা অন্ধকার সভ্যতা নাকি অর্থবাজারে চল্লিশভাগে থাকা বসিয়েছে, WTC ধ্বংস তো তারই নিদর্শন)। এই অন্ধকার বাহিনীতে যদি নিচতলার নিঃস্ব মানুষ বাঁচার তাগিদে ভিড় জমায যা প্রাণীবই বিশেষত্ব—অবাক কেন হবে?

দরদীম্ন এসময় ব্যথাতুর হয়ে পড়েন। মৃত্যু অন্ধকার পাপ যদি এতই নিকটতর অভিযান হয়ে থাকে তাহলে হাসি আনন্দ গানের অর্থ কি, এমন নৈরাশ্য, চিন্তার প্রায় শুরু থেকেই, বিশেষত যুরোপে, চলে এসেছে এবং দস্তয়েভস্কি হসার্ল হাইডেগাব সার্তের হাতে পড়ে তার সর্বগ্রাসী রূপ, সর্বোপরি যে মানুষটা হাসছে গাইছে তার মনেরই কন্দরে ঘাপটি মেরে রয়েছে এক বিষধর সাপ, এমনটা, প্রতিভাত হয়েছে। এ এক দিক। কিন্তু আমাদের ভাবনা হবে অন্যরকম। আমাদের গান্ধি আছেন রবীন্দ্রনাথ আছেন। এটাই আমাদের জোর। এই জোব নিয়ে সভ্য এবং অসভ্য এই দুনিয়ায় আমরা একথা বুঝব যে মৃত্যু যখন এতই নিবিড় ও সহজ তাহলে একে মিছে ভয়, বরং এসো নির্মাণে নামি। বিজ্ঞানী বন্ধুদের বলব এটা একটা ভাবের কথা ঠিকই কিন্তু ভুলো আবেগের নয়। ভয়াবহ মৃত্যু-নিশ্চিত-ব্যাদি (প্রধানত ক্যানসারাক্রান্ত মানুষদের নিয়ে এই মনোসমীক্ষা করা হয়েছে) যখন কারোকে চেপে ধরে, দেখা গেছে, মৃত্যু নিশ্চিত জানাব পরপরই তার একটা নৈরাশ্য আসে এবং সেটা স্বল্প সময় পবে উবে যায় (প্রকৃতি মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি কবেছেন), সে নিশ্চিত মৃত্যুর ডাক শোনার পর নির্মাণে নামে, নামতে চায়, পাহাড়ে চড়ার মত কঠিন কাজও সে করে থাকে।

৭

আটের দশক থেকে দখলদারির নতুন মোড় ঘটে। নেপথ্য কারণগুলো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বড় কারণ অথবা শক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়া বাকি, সেটাই এবার f জানব। আটের দশক থেকে হঠাৎই সাম্রাজ্যবাদীরা, মূলত ট্রায়ো অঞ্চলের একটু ছড়িয়ে বললে G7 দেশেরা, মুক্ত দুনিয়ায় বাণিজ্য এবং দুনিয়ার লাক্ষিত নিপীড়িত মানুষের কাজ-খাদ্য-মুক্তির প্রচার শুরু করে (পল ক্রুগম্যানের যুক্তিটি আগেই জেনেছি)। এর অর্থনীতিগত কারণ হচ্ছে—১। এতদিন আগলে রাখা পুঁজি শিল্পকে একটু নিশ্চিন্ত মনে (নিশ্চিন্তি এত কেন?) তৃতীয় বিষে ঢালা, ঢেলে একটা জোয়াবের সৃষ্টি করা, ২। একটা বড় আকারের বাজার তৈরি করা, ৩। বাজারটি বেশ জটিল বহুতলসমৃদ্ধ এবং তেমন করেই নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা অর্জন—ক' দেশের কাঁচামাল আসবে খ' দেশে, তৈরি হবে পণ্য, গ' দেশে তা বিক্রি হবে, ঘ' দেশে জমা হবে মুনাফা—এরকম জটিল ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা পাবার পরপবই খোলা বাজারের জিগির ওঠে। আর সেটাই আমাদের নিয়ে যাবে সবচেয়ে বড় কারণ, প্রধান কারণ, মুখ্য চালিকাশক্তির দিকে।

আটের দশকেই টের পাওয়া যাচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদ পণ্যোৎপাদন ছেড়ে তথ্যোৎপাদনে ঢুকছে। পণ্য প্রস্তুত করবে অন্য অন্য দেশ, তারা কাজ করবে তথ্যের ওপর, তথ্যই জ্ঞান তথ্যই ক্ষমতা তথ্যই শক্তি এবং সবচেয়ে বড় কথা তথ্যই হলো প্রকৃত নিয়ন্ত্রণযন্ত্র। এটি সাম্রাজ্যবাদের আপাতত সর্বোচ্চ আবিষ্কার—তথ্যের কর্তৃত্ব। আর এর প্রথম প্রয়োগ ছ'এর দশকে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ দেশে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু করল। এই অন্তর্জালটির প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির নামপরিচয় জানলে বুঝতে পারব বিজ্ঞান-গবেষণা-বাণিজ্য-ক্ষমতাচক্রের সংযোগ চিত্রটি : এপাশে হাওয়াই যুনিভার্সিটি, ওপাশে যুনিভার্সিটি কলেক্স, লণ্ডন ; মাঝখানে বিজ্ঞানচর্চার স্বপ্ন পাঠস্থান সব মহল যথা ক্যালিফোর্নিয়া যুনিভার্সিটি, উঠা যুনিভার্সিটি, ইলিনয় হারভার্ড এম আই টি, এবং একই সূতোয় নাসা অস্ত্র গবেষণা কেন্দ্র (Arms Research Center), গ্লোবাল ওয়েদার সেন্টার, ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স, রাইট প্যাটারসন এয়ারফোর্স বেস, ফোর্ট বেলভয়ের—অর্থাৎ ?

অর্থাৎ অস্বীকার করার উপায় নেই বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত বয়েছে রণনীতি বাণিজ্য ও নিয়ন্ত্রণ—ঘনিষ্ঠভাবে।

যখন দেখা গেল তথ্যের ওপর কর্তৃত্ব করা যায় এবং সে কাজ করে মুনাফা লোটা যায় তখন সাম্রাজ্যবাদ পণ্যোৎপাদনকে অন্য দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে জ্ঞানভাণ্ডারটি নিজেব তাবেতে আনতে চাইল। এই তথ্যভিত্তিক ব্যবসা ও দখলদারি নিখুঁত রাখতে 'স্বাধীন' অন্তর্জাল ব্যবস্থা চালু হলো যা আর কিছুই নয়, স্বাধীনভাবে নিজের প্রভুত্ব নিয়ে ঘোরাফেরা। আমার বিজ্ঞানীবন্ধুরা আপত্তি করবেন ঠিকই কিন্তু সত্যি এও যে ইন্টারনেট মারফৎ আমি যতটা সমৃদ্ধ হচ্ছি ততটাই সমৃদ্ধ হচ্ছে ক্ষমতামালী মহলও। মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের দ্বারা ব্যবহৃত সফটওয়্যার হলো

প্রোপ্রাইটরি—যা বিক্রি হয় না, নতুনভাবে ব্যবহার করা যায় না, যা ‘লাইসেন্সড’—এই সফটওয়্যার ব্যবহার করলে যেমন নিজের কাজ মেটে তেমন নিজের কাজ অন্তর্জাল বেয়ে মাইক্রোসফটের ঘরে চলে যায়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সফটওয়্যার সিস্টেমে ‘কাজ’ করতে গিয়ে বিতর্কটি সামনে এনে ফেলেছে। সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতবর্গের প্রশ্ন, লাইনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের ফ্রি-সফটওয়্যার বাজারে থাকা সত্ত্বেও সরকার কেন বেশি দাম দিয়ে মাইক্রোসফটের কাছে নতিস্বীকার করল, বিশেষত এই দেশ এই রাজ্য গরীব এবং সরকারের গোপনীয়তা যেখানে অর্গলমুক্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে (প্রাধিকানযোগ্য আলোচনা করেছেন তাপস রায় The Statesman পত্রিকার 18 Aug 2001 এবং 16 Dec 2001 সংখ্যায়)। ব্যাপারটা শুধুমাত্র তথ্য বাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তথ্য তত্ত্বাবধায়ও—তাই, বাবারও বাবা থাকে, সিয়াপেটাগনে, মুসলিম নয়, যুরোপীয় যুববৃন্দ কখনোসখনো হাক করে ঢুকে পড়ে।

তথ্য বাণিজ্যে রপ্ত হতে না হতে তাবা, পুঁজিবাদ, মুক্তবাজার এবং পুঁজি শিল্প নিয়ে তৃতীয় বিশ্বে ঢুকে পড়তে দ্বিধা করল না—৮৩ সালে ক্যানক্যান শীর্ষ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট রেগান দাওয়াই দিলেন—an open international investment system responding to market forces provides the best and most efficient mechanism to promote global economic development.

বিশ্বায়নের এই হলো সূত্রপাত, সাম্রাজ্য বিস্তারেরই অনিবার্য ধাপ। বারবার বিয় হয় তাদের দখলদারি বারবার তারা বুদ্ধি খাটিয়ে হুমকি দিয়ে টেবিল চাপড়ে বিশ্বের অপরাপর মহলকে শঙ্কিত করে চকিতে নিজের বাঁচার ওষুধ বার করে নেয়। এবারের সুবিধা এরকম—১। পাল্লা দেবার মত আরেকটি দেশ ছিল যা জনতার চাপে ফ্যাসিস্তন্ত্র ভাঙতে বাধ্য হয়েছে, ফলে সে হটে গেছে, মার্কিন দাদাগিরি এখন অবাধ, ২। তথ্যভিত্তিক প্রযুক্তিতে অসাধারণ সফলতা, যার ফলে সারা বিশ্ব এক ছাতার তলায় এবং এক যন্ত্রে চলমান হতে থাকে।

৮

কেন বলা হচ্ছে বিশ্বায়ন অপ্রতিরোধ্য তা এবার স্পষ্ট হবে। বিশ্বায়ন অপ্রতিরোধ্য কারণ বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও মানুষের মননশীলতার সুচারু সংগঠন অত্যন্ত যৌক্তিক ভাবে পথ রচে চলেছে। তাকে রোধ কবা যাবে না তাকে কাজে লাগাতে পারলে একধবনের অগ্রসরতা হবেই কারণ বিজ্ঞান এগোবারই পরিকল্পনা, এই এগোনায় যদি বৃহত্তর কিছু পিছু হটা ঘটে তাহলে তা রোধ করার কাজটি বিজ্ঞানই করবে। তাই বলছি, সভ্যতার এভাবে চলে যাওয়া অনিবার্য। যদিও অন্যভাবে ভাবার অন্যবিজ্ঞানে ব্রতী হবার যুক্তিও আমাদের আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাথারা মার্কিন মুলুকে মিলেছিল। ওখানেই প্রথম আবিস্কৃত হলো ছোট’র মধ্যে অসীম ক্ষমতা সঞ্চিত রয়েছে। ভাবনা চলল কিভাবে,

কোন প্রযুক্তিতে, সেটা বার করা যায়। আমরা আণবিক বোমা ফাটিয়ে দিলাম, তারপর বছরের তিনশো চৌষাট্টি দিন বোমা বানাবার নতুন নতুন কায়দা করছি এবং একটা দিন নীরবতা পালন করছি। ছোট'র মধ্যে বিপুল শক্তির চলাচল আমাদের নিশ্চিত করতে থাকে। রিচার্ড ফেনম্যান তো আবে বোমারোয়া—একটাই ইলেকট্রন নাকি দেশকালের 'ওপার' থেকে এসে এপারের এই বিপুল মহাবিশ্ব গড়ছে এমন আঁক কষলেন এবং একটা ইলেকট্রন দিয়ে তিনি কি কি করতে পারেন তার হিসেব দিলেন সাইফাই খাঁচে। অতীত বিশ্বয়ের ব্যাপার—আজ যে ন্যানোটেকনোলজিতে বিজ্ঞান পটু হতে চলেছে তার ভিত্তিপ্রস্তর ফেনম্যানের ঐ সাইফাই থেকেই। ব্যাপারটা এই চলছিল যে, বিশ্বের সেরা মাথারা বীজের কেন, কোথায় এবং কি ভাবে মহীকর হবার সম্ভাবনা তা নিয়ে ঝড় বইয়ে দিচ্ছিলেন আর সেই বিজ্ঞানীদের নিরুদ্ভিন্ন নিশ্চিত জীবনযাত্রা যে সভ্যতা নিশ্চিত করছে সে ঐ অবদানের ফায়দা নেবে না তাই কি হয়?

আমরা $e=mc^2$ পেলাম, যুদ্ধবাজ অর্থনীতির গতিটা সাম্রাজ্যবাদ নতুন ভাবে নিশ্চিত করে ফেলল। আমরা পৌছলাম কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডিনামিক্সে—যার তৎক্ষণাৎ দুটো ব্যবহারযোগ্য প্রবণতা দেখা দিল। সেমিকন্ডাক্টারে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ঢুকিয়ে তাকে খুঁটিয়ে 'তথ্যভিজ্ঞ' করা যায়, জীবেরও চূড়ান্ত পর্যায়ে কিছু জৈবাণু রয়েছে, তার মর্ম কোয়ান্টাম ভাষ্যমতে কি—সেটা ভাবা শুরু হলো। এবং এই কোয়ান্টাম কনসেপ্ট দিয়েই দু'দুটো বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটল—কম্পিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তি, জীবন তথা জেনেটিক প্রযুক্তি; যার ফলাফল এই বিশ্বায়নে স্পষ্ট অথবা যাকে নিয়ে চলতে চাইলে এই বিশ্বায়ন আসবেই। এটা হবেই। বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ এবং ওদের পরিচালকচক্র দৃশ্যমান এই বিশাল জগতের কেন্দ্রস্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'বিষয়টি'র হৃদিশ পেয়েছে, প্রযুক্তিকে সেভাবে ইকুইপ করেছে যাতে বিষয়টি 'তুলে' আনা যায় এবং নিজস্ব প্রকোষ্ঠে 'স্টেট টিউবে' লালনপালন করা যায়। প্রাকৃতিক দূষণ? প্রকৃতিকে বাদ দিয়েই সেই সেই প্রাকৃতিক দ্রব্য তারা উৎপন্ন করতে পারবে। তাতে সমস্যা আসবে, আসতেই পারে তা, ক্যানসার হবে এইডস হবে আবার গবেষণা হবে দাওয়াই আসবে ব্যবসা হবে—বিজ্ঞানবাণিজ্য এভাবে চলেবে। বাজারের সমস্যা? পুঞ্জি শিল্প তৃতীয় বিশ্বে ঢালাও না দিয়ে রেহাই নেই আবার ঢালাও দেবার বিপদও আছে যদি তৃতীয় দুনিয়া তা তৈরি করে ফেলে—সমস্যার উত্তরও দিল বিজ্ঞান, মাইক্রোচিপস, যা মূল চালক, তার উৎপাদনটা নিজ দেশে আগলে রেখে লাইসেন্সড সফটওয়্যারে সাজিয়ে ফেলে দাও কম্পিউটার যত অলিতে গলিতে—সারা বিশ্বের খবর আমার কাছে আসবে, আমার খবর, ক্লিৎ কদাচিৎ হ্যাঁকিং বাদ দিলে, ওদের কাছে পৌঁছবে না। আর মূল কংকৌশল—দৃষ্টান্ত দিই, মোটবলার পাওয়ার PC 620তে একটা পোস্টেজ স্ট্যাম্পের আকারে ছোট মাইক্রোপ্রসেসরে ৭০ লক্ষ ট্রানজিস্টর সিলিকন চিপসে—সাজানো রয়েছে—তো কে পারবে একে নকল করতে? যে প্রযুক্তি এটি করবে তা সিলিকন ভ্যালিতেই রাখা। এটি হাতে বাধি, বাকি সব দিয়ে দিই—ক্ষতি কি? এবং নিশ্চিত লাভ কারণ বিজ্ঞান বিশেষভাবে এই বাণিজ্যের জ্ঞান ও কৌশলের মদতদাতা।

তাই লোভ ভোগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন মানুষের একান্ত নিজের বলে তাকে কাজে লাগানো যায় তেমনি মানুষ যে যুক্তিজ্ঞানে মানুষ যে যুক্তিজ্ঞানে সে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্দেশে * বার্তা প্রেরণ করে ঈশ্বরের 'মন' বুঝতে চায় সেই যুক্তিজ্ঞানটি কাজে লাগিয়েই ধনীসম্প্রদায় নিশ্চিতভাবে তাদের অবস্থান অটুট রাখতে পারে। তাদের চলটাই চলা / অথবা বলব, তাদের চলার একটা যুক্তি আছে একটা সত্য আছে।

৯

এবং এও আমরা বিজ্ঞানচর্চা করতে করতেই শিখেছি সত্য একটা নয়, সত্য আপেক্ষিক ও একাধিক। প্রকৃতি এই মজাটি আমাদের সাথে খেলেন বলে জীবন এত যন্ত্রণার মধ্যে মধুর ও আনন্দের—যে সত্যে আমরা ধ্বংস হই পাশাপাশি আরো কিছু সত্য থাকে যাতে আমরা পুনরায় গড়ি, যন্ত্রণা পাই বলেই গান গাই নাচি, ব্যথাকে ভোলার জন্য নয় ব্যথার সত্যটা অতঃপর উপেক্ষিত হয়ে যায় আনন্দ আর আনন্দের সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান থেকে আমরা এও শিখেছি।

তাই সত্যকে বোঝার জন্য, যেহেতু সত্য আপেক্ষিক তাই, একটা সম্যক দৃষ্টির অভ্যাস করতে হয়। বিশ্বায়ন কেন অপ্রতিরোধ্য তা যেমন দেখলাম তেমনি এও দেখছি : বিশ্বের ১৫ শতাংশ মানুষ প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সর্বময় কর্তা এবং তার ফল ভোগ করছে কমবেশি আরো ৫০ ভাগ লোক, যে যত কাছে তার প্রাপ্তি তত, যে দূরে তার কম ; বাকি ৩৫ ভাগ একেবারে এর বাইরে। এই মানুষগুলোর ভবিষ্যৎ কি? বিজ্ঞান কি এদের কথা ভাববে না?

ভাববে। তাকে ভাবতে হবে, তাকে পথ নির্মাণ করতে হবে। তার আগ্রাসী আক্রমণ যতটা সত্য তার আনন্দ বসাস্বাদন ততটা—এটা মনে রেখে কাজ করতে হবে। মনে রাখতেই হবে, বিজ্ঞান বিজ্ঞান-অস্ত্র হয়ে ওঠার ঢের আগে থেকে প্রকৃতিই আমাদের খাওয়া পরা জুগিয়েছে—এই প্রকৃতিকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় এবং এখনো অফুরন্ত (যদিও বিস্ময়কর হলেও যাবার অবস্থা এসেছে) রোদ হাওয়া জলকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মুখে অন্ন মনে শান্তি যে আনা যায় তা তো বাপু চরখা আন্দোলন করে দেখাতে চেয়েছিলেন তরুণ ভারত সংঘ করে দেখাচ্ছে। তরুণ ভারতের সফল পরীক্ষার পর বাপুর পথকে একটু পাল্টে যদি আমরা এইভাবে ভাবা শুরু করি যে সবার ঘরে অন্তত চারটে টব থাকুক, চারটে টবে ফলুক ফল সজ্জি, তারা ডেকে আনবে পাখি প্রজাপতি...সেখান থেকে প্রাণের সুস্থ চর্চা...গীতার সেই অসাধারণ শ্লোক আমাদের উষ্ণ করুক—কর্ম থেকেই জগতের চাকা চলেছে, এ জন্যেই কর্ম করণীয় ; দেখা যাচ্ছে, অন্ন থেকে প্রাণীর জন্ম হচ্ছে, অন্ন আসছে মেঘ থেকে, মেঘ যন্ত্র থেকে আর যন্ত্র উৎপন্ন হচ্ছে কর্ম থেকে।

এই ছোট ছোট যন্ত্রগুলোই বিপ্লব, এরাই বিজ্ঞান। এইভাবে বিজ্ঞানকে মাটির কাছে নিয়ে আসার নাম বিপ্লব। বিপ্লব নিয়ে এতদিন যা যা পরীক্ষা হয়েছে ইতিহাসের পাতায় তা যতটাই স্থান নিয়ে থাক, সে নিয়ে বিতর্ক আলোচনা সবই হোক—আজকের এই

মাটির কাছে যেতে চাওয়া প্রকৃতিনৈমিত্তিক বিপ্লব যে একান্ত প্রয়োজন ও সম্ভব তা বোঝা দরকার। পর্য্যবসিদ্ধি আর পর্য্যবসিদ্ধির আকাশপাতাল ব্যবধান মূনাফার দখলদারিকে আরো বাড়াবে বই কমাবে না, দখল একদিকে অন্যদিকে প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে দখলের নীতিতে, ব্যবহৃত কবতে করতে ক্রমশ মানুষকে না-দাম করে ফেলা, ফলে বাজারে সংকট, সন্ত্রাস, যুদ্ধ ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ—তো বিপুল এই প্রাণের রক্তমাংস মাথা ভোগে আমরা কি আনন্দের দিন কাটাতে?

এখনো মাটি রয়েছে, জল রয়েছে, বুক ভরে শ্বাস নেবার মত বায়ু রয়েছে : এই বাঁচা নিশ্চিত করার যে আন্দোলন সেটাই শুরু করা যাক। তরুণ ভারত সজ্জের জলজমিজলাদি দিয়ে শুরু করা যাক, চারটে টব দিয়ে শুরু করা যাক, বৃষ্টির জল ধরে রেখে তার ব্যবহার দিয়ে শুরু করা যাক। এখানে দলের প্রশ্ন উঠবে, গোষ্ঠীর প্রশ্ন উঠবে, নেতা ও জনতার সম্বন্ধ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে—উঠুক, ক্ষতি নেই, প্রথমেই যে কাজ করা যায়, নির্ভর ও সাহসের সঙ্গে, তা হলো—নিজেকে এই পরীক্ষায় প্রথমে আনা, আমি একা, আর কেউ নেই, এভাবেই শুরু করা যাক। ফল শুভ হলে, চিরদিনই তা হয়েছে, এক এক কবে মানুষ জমায়েত হয়, আর মা-প্রকৃতি তো সবার জন্যই সমান স্নেহপ্রবণ।

বিশ্বায়নের রকমফের—কী এবং কেন

অরুণ মজুমদার

‘গ্লোবলাইজেশন’ কথাটিকে বাংলায় ‘বিশ্বায়ন’ বলা হয়। এ নিয়ে দেশেবিদেশে অর্থনীতিবিদদের বা এমনকি সাধারণ শিক্ষিত সংস্কৃতিবিদদের মধ্যে কথাটির অর্থনীতিগত ব্যঞ্জনাই বেশি স্পষ্ট হয়। অর্থনীতিবিদদের কাছে কথাটির ইংগিত মোটামুটি তিনটি শব্দের মহিমায় সুরেলা হয়ে ওঠে—(১) অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, (২) শ্রম নৈপুণ্য, (৩) বাজার। অতি সম্প্রতি আরো অনেক বিষয়ে (অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও) বিশ্বায়নের কথা উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটো দিক বলা যেতে পারে। ধর্মীয় কাবণে হিংসা ও সন্ত্রাসেব বিশ্বায়ন, নৈতিক শূন্যতা—দুর্নীতি এবং মিথ্যাচারের বিশ্বায়ন। কিন্তু বর্তমান লেখক শুধু অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে এখানে বলছেন।

সাধারণভাবে গ্লোবলাইজেশন বা বিশ্বায়ন নিয়ে শিক্ষিত ও একটু আধটু রাজনৈতিক নেতা বা ইউনিয়নের নেতাদের কাছ থেকে শুনে ও খবরের কাগজ পড়ে সাধারণভাবে ঐ বিষয়ে একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে ১৯৯১ সালে অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতীয় অর্থনীতিতে এমন একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসতে চলেছেন যা ভবিষ্যতে দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে তা বলতে না পারা গেলেও এটুকু ঠিকই বোঝা যায় যে ভারতের সামনের কয়েক বৎসর বেশ অর্থনৈতিক দুর্দিনেই কাটবে।

সাধারণের ধারণা যখন কুয়াশায় ঢাকা, বিশ্বায়ন বিরোধীদের মধ্যে বিশ্বায়ন মানে ভারতবর্ষের সব কিছু মার্কিনীদের দখলে থাকা আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক-এব দখলে যাওয়া বলে, বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা ভারতীয় শিল্প, কৃষ্টি ও পরিষেবা ক্ষেত্র বাহুগ্রাসে পড়ছে বলে প্রচার কবেন। এ প্রচারের সারমর্ম শিক্ষিত ও পরিশীলিত মনের কাছে ধোঁয়াটে। অথচ যাবা বিশ্বায়নেব পক্ষে বলেন তারা যখন সরকারি প্রতিষ্ঠানের গোলমাল, চৌর্যবৃত্তি, কাজের সময় কর্মীর দেখা পান না বা দেখা পেলেও ফাইল খুঁজে পান না তখন চটজলদি মাথা না খাটিয়েই সরকারি সংস্থার বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আসবেন। সরকারের পক্ষ থেকে বা সরকারি অর্থনীতিবিদদের তরফে তখন প্রচার অন্য সুরে। ভারতে পবিকল্পিত অর্থনীতির মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, এখন ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং সংস্থার ভূমিকা হচ্ছে মুখ্য। বাজেটে এতটা বেভিনিউ এবং ফিসক্যাল ঘাটতির কারণ কী? একদিকে সাদা হাতী অর্থাৎ সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাগুলোর মোটা মাইনের কর্মচারীগুলোকে পোষা; অন্যদিকে কৃষি থেকে কর আসবে নামমাত্র, কিন্তু ভবতুকি দিতে হবে কৃষিতে. বিদ্যুৎ খরচ কবে ছল তোলা হলে, বিদেশি সাব প্রয়োগ করলে,

এমনকি উৎপাদিত দ্রব্য আবার যখন ফুড করপোরেশন সরকারি দরে কিনবে তখন, ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি কোন বিরুদ্ধবাদী প্রশ্ন করতেন, মিলিটারি ও সমরাস্ত্র বা কাশ্মীরে দিনে কুড়ি কোটি টাকা যে খরচ হয় সেটার জন্য বাজেট ডেফিসিট হয় কিনা অথবা আর্থিক বোমার গবেষণা বা পর পব নানা নামের ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন তো সরকারি আয় নিয়ে আসে না তখন অর্থনীতিবিদ কেইনসের বক্তব্য উপস্থাপিত হবে :

The most important agenda of the state relate not to those activities which private individual are already fulfilling, but to those functions which fall outside the sphere of the individual, to those decisions which are made by no one if the state does not make them.^১

পক্ষে বিপক্ষে তখন গ্লোবলাইজেশন বা বিশ্বায়নের কতকগুলো ভয় জাগানো বা ভক্তি তোলানো বিশিষ্ট নীতির কথাই শোনা গেছে।

আসলে যেটা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে বিশ্বায়ন নিয়ে বিতর্কটাকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা। এ কাজ মূলত অর্থনীতিবিদদের কাজ। অর্থনীতিশাস্ত্রের এবং অর্থনৈতিক স্তরগুলোর ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা রয়েছে, তাদেরই কাজ।^২

১

দুটো কথা পবিত্কার বলা প্রয়োজন।

প্রথম কথা—অর্থনৈতিক গ্লোবলাইজেশনের প্রবণতা অতীত ইতিহাসে এর আগেও বহুবার দেখা গেছে। ইতিহাসে যে কয়েকবার এ ধরনের বিশ্বায়নের চেষ্টা হয়েছে, তার প্রতিটিই কোন না কোন শক্তি বা গোষ্ঠীর সংকীর্ণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে।

১ J M. Keynes, *Essays in Persuasion* (London 1951). p. 317.

২ এ ব্যাপাবে অনেক অর্থনীতিবিদের বক্তব্য শিশুর সারল্যে ভরা। আসলে অর্থশাস্ত্রের অনেক পণ্ডিতই অর্থনীতি শাস্ত্রকে সমাজ-নিরপেক্ষ চাহিদা ও যোগানের বিশুদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক হাতিয়ার বলে মনে করেন। ফলে অর্থনীতিশাস্ত্রকে ঐ হাতিয়ারেব বিজ্ঞান মনে কবেন। অথচ ঐ বিজ্ঞান অনেক বিষয়কে একটি বিশেষ আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বলে ভাবতে পারে না। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় সম্পদ, পরিসম্পদ, বাজার, প্রতিযোগিতা বিষয়গুলোকে সামাজিক সম্পর্ক নিরপেক্ষ বিষয় বলে মনে কবে। যেমন মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ যে শ্রম ছাড়া সৃষ্ট হতে পারে না বা পরিসম্পদ থেকে আয় করতে গেলে মনুষ্যশ্রম (শারীরিক বা মানসিক) যে অনিবার্য অনেক অর্থনীতিবিদের লেখা পড়ে তা মনে হয় না। বাজার এসেছে মানুষের মধ্যে বস্তু পণ্যের বিনিময় যখন মুদ্রাব্যবহারের মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক রূপ লাভ করেছে। প্রতিযোগিতা আসে যখন একই লক্ষ্যে বহু ভোগকারী বা যোগানদাতা পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। মনুষ্যসমাজের অন্তর্গত স্তরে বাজার ও প্রতিযোগিতা ছিল না। ভবিষ্যতে থাকবেই এমন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। অর্থনীতি শাস্ত্রে সততাব উৎকর্ষতা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থানের সঙ্গে জড়িত, তাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাচুর্য মূল্যবোধ অনেক অর্থনীতিবিদকে প্রভাবিত কবে। তারা মনে করেন ধনতন্ত্র প্রণালী অক্ষয় ও অস্তহীন।

দ্বিতীয় কথা—যে গ্লোবলাইজেশন বা বিশ্বায়ন সম্পর্কে এখানে আলোচনা হচ্ছে, তা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জটিল চরিত্রের পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করছে।

* ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস ভারতভূমি আবিষ্কার করার জন্য তাঁর অটলান্টিক সমুদ্র যাত্রায় নেমে আবিষ্কার করেছিলেন ‘নতুন পৃথিবী’ যার নাম আমেরিকা। পরবর্তীকালে অনুমিত হয় যে ঐ আমেরিকায় যারা আদিবাসী (যাদের ঐতিহাসিকেরা ‘আমেরি ইন্ডিয়ান’ নামে অভিহিত করেন) ছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ কোটির মত। অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপের লোকসংখ্যার (১৫০০ সালে) চেয়ে তিন কোটি বেশি। ১৫০০ সালের আগে থেকেই প্রথমে ইংল্যান্ডবাসীরা যেতে আরম্ভ করেন, তখন ইংল্যান্ড শুধু নয় ইউরোপে একদিকে জন্মের হার বেড়েছিল, অন্যদিকে মৃত্যু হার কমে গিয়েছিল। পরের একশত বছরে ইউরোপে লোকসংখ্যা এতটাই বেড়ে গেল এবং ইউরোপের বিভিন্ন জাতির লোকজন বসবাসের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় যেতে আরম্ভ করল যে আদিবাসী আমেরিগুিয়ানদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ লেগে গেল। গোটা ষোড়শ শতাব্দীর আমেরিকার ইতিহাস হলো আমেরিগুিয়ানদের ইউরোপীয়দের দ্বারা গণহত্যা, আমেরিগুিয়ানরা যত নিজেদের বাসস্থান উত্তর আমেরিকা ছেড়ে দক্ষিণের জঙ্গলে গিয়ে থাকছিল, সেখানে নানা মহামারীর আক্রমণে আদিবাসীরা মরে যেতে লাগলো। এভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে তাদের সংখ্যা ফরাসী ঐতিহাসিক ব্রডেলের মতে দশ কোটি থেকে নেমে এক কোটিতে এসে ল্যাটিন অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। তার পরেই এলো পর্তুগীজ ও স্পেনের ল্যাটিন আমেরিকা দখল এবং আদিবাসীদের গণহত্যা করে ওদের জমি ও সম্পদ লুণ্ঠন করে ব্রাজিল, পেরু, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে বসবাস করতে থাকা।^৩

ঐতিহাসিক ব্রডেল বলেন, “নতুন পৃথিবীর সোনা ও রূপো পেয়ে ইউরোপ নিজে যতটুকু খেয়ে বাঁচতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি ও বিচিত্র খাবার দিয়েছে, ওর যা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশি বিনিয়োগ করতে পেরেছে।” ইউরোপীয়দের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে গায়ের জোরে আদিবাসীদের উৎখাত করে তাদের জমি নিয়ে নিজেরা চাষ না করে আদিবাসীদের দিয়ে চাষ করিয়ে তারপর তাদের প্রয়োজনবোধে হয় না খাইয়ে নতুবা সোজাসুজি নৃশংসভাবে হত্যা করে ফেলে দেওয়ার কাহিনী শুনে চার্লস ডারউইন নাকি লিখেছিলেন, “(পৃথিবীর) যেখানেই ইউরোপীয়রা গিয়েছে, মৃত্যু সেখানেই আদিবাসীদের পেছনে ধাওয়া করেছে।”^৪

৩ Fernand Braudel কে উদ্ধৃত করেছেন Immanuel Wallerstein, *The Modern World System* (New York 1974). পৃ. ১২৬-২৮।

৪ “Wherever [in the world] the European has trod, death seems to pursue the aboriginal”

Charles Darwin, *The Voyage of the Beagle* (The Garden City, N. Y., Double Day noted from J. B. Foster, *The Vulnerable Planet* (MRP, N Y 1994) p. 13.

এই হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম শ্রোবালাইজেশনের প্রারম্ভ কাহিনী। এ কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে আছে আরো অনেক মর্মস্পর্শ কাহিনী। ইউরোপ থেকে ঐ বিশ্বায়নের ঢেউ আটলান্টিক অতিক্রম করে আমেরিকা সেখান থেকে ল্যাটিন আমেরিকা, তারপর কানাডা প্রাকৃতিক সম্পদের সৌন্দর্যময় দেশ সব। তারপর ষোড়শ শতাব্দী থেকে খাদ্য সম্পদের সন্ধানে ইউরোপ থেকে আবার সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে বেরিয়ে গেল পরপর পর্তুগাল স্পেন। এবার ভাস্কো ডা গামার পথ ধবে। উত্তমাশা অস্ট্রেলীপ থেকে এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলোর উপকূল বেয়ে বেয়ে। ইউরোপ পেল ভুট্টা, আলু, আরো অনেক সবজি আমেরিকা থেকে; ল্যাটিন আমেরিকা থেকে পেল কফি, চিনি; এশিয়ায় পেল চা, মশলা; আফ্রিকায় পেলো হীরে জহরত; ক্যালিফোর্নিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং মেক্সিকো দিল সোনা ও রূপো; আফ্রিকায় পেলো মানুষ দাস যাদের আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে জ্যাম্বু ধরে নিয়ে জাহাজের পাটাতনে বন্দী করে বিক্রয়ার্থে পর্তুগীজ নাবিকরা নিয়ে আসতো দক্ষিণ আমেরিকার কৃষিপ্রধান ল্যাটিফান্ডিয়ায়। তারপর ইংরেজরা সমুদ্রশক্তিতে পর্তুগীজদের হটিয়ে দিয়ে আটলান্টিকের দাস ব্যবসায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা কবলো। পশ্চিম ইউরোপের শক্তিশ্রম দেশের প্রতিভূরা ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দু ধরনের উপনিবেশ গড়ে প্রথম স্তরে বিশ্বায়ন সম্পূর্ণ করলো। প্রথম গণহত্যা ও লুণ্ঠনের সাহায্যে স্বৈরাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন, তারপর ঐ উপনিবেশের প্রভুত্ব নিয়ে ইউরোপীয় রাজশক্তিগুলোর মধ্যে যুদ্ধ এবং বিজয়ীর উপনিবেশ শোষণের অধিকার। দ্বিতীয় বণিকের ভূমিকায় ইউরোপীয়রা প্রবেশ করে তারপর নতুনদেশের অভ্যন্তরস্থ রাজনৈতিক গোলমালের অবকাশে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে উপনিবেশ স্থাপন করা। এগুলো কৃষ্ণাঙ্গ ইউরোপীয় উপনিবেশ নামে পরিচিত।

অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি ঐ বিশ্বায়নের কাজ ছিল পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশের শিল্পসমৃদ্ধি গড়ে তোলা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দু চারটে স্বৈরাঙ্গপ্রধান উপনিবেশ ইউরোপীয় মাতৃভূমির শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইউরোপীয় শাসন ও শোষণের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো, আবার ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ ইউরোপীয় মাতৃভূমির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে প্রথমে ইউরোপীয় ব্রিটেন, পরে আমেরিকার পরোক্ষ শাসন মেনে নিল।

প্রথম বিশ্বায়ন ছিল প্রথমে ইউরোপীয় শক্তিশালী দেশ কর্তৃক দুর্বল দেশ অধিকার করে সম্পদ লুণ্ঠন করা অথবা বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের তাগিদে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশে উপনিবেশ স্থাপন কবা। ঐ বিশ্বায়নের যুগেই ইউরোপের পশ্চিম অংশে শিল্পপুঞ্জির প্রসার ঘটে। ঐ বিশ্বায়নের পরেই আবস্ত হয় ব্রিটেনে (বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে) শিল্পবিপ্লব। কাল ১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। আর্থসামাজিক পবিবর্তনের গতি সময় দিয়ে নিখুঁত পরিমাপ কবা যায় না।

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ব্রিটেন ছিল বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রে সবচেয়ে সমৃদ্ধ কারণ বাণিজ্যিক মুনাফা প্রায় একশ বৎসর আমেরিকা উপনিবেশ থেকে ব্রিটেন আহরণ করেছে। তাছাড়া গোটা ইউরোপের বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল ব্রিটেনের বন্দর। আটলান্টিক দাস ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা সংগ্রহের পাশাপাশি বিশ্বায়নের দ্বারা সংগৃহীত সোনাকুপা ও হীরে জ্বরত ব্রিটেনে সঞ্চিত হয়েছিল সর্বাধিক।

২

বাণিজ্যিক-ধনতন্ত্রের কাল শেষ হলো ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্বে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে উৎপাদনকেন্দ্রিক পুঁজিবাদ কৃষিতে চলে এল। প্রায় পাশাপাশি ব্রিটেনের শহরগুলোর মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টারে গড়ে উঠল বয়নশিল্প। তখনই বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আডম স্মিথ বাণিজ্যবাদের সংকীর্ণতা থেকে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক উদ্যোগ এবং অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা মুক্তি দিতে চাইলেন উৎপাদনের স্বার্থে। বাদ্বীয় ভূমিকার সঙ্গে ব্যক্তির উৎপাদনশীল সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরলেন :

“The third and the last duty of the sovereign or commonwealth is that of erecting and maintaining those public institutions and those public works which, though may in the highest degree advantageous to a great society, are however of such a nature that the profit could never repay the expense to any individual or small number of individuals and which therefore cannot be expected that any individual or small number of individuals should erect or maintain” *

পুঁজির উৎপাদনকেন্দ্রিক প্রবণতা যখন ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের মধ্যমণি, তখনো পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশ যেমন ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়ম, অষ্ট্রিয়া, ইতালি, জার্মানিতে তখনো শিল্প পুঁজিই ভালোভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করেনি। ফলে ঐ সকল দেশে শিল্প নির্মাণে তখন ব্রিটিশ পুঁজি ব্যস্ত, ব্রিটেনের নিজস্ব রপ্তানি বাণিজ্যে শুধু বস্ত্র নয়, শিল্পদ্রব্য তখন গুরুত্বপূর্ণ পণ্য।

ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবকে কেন্দ্র করে গোটা ইউরোপে তখন নতুন ধরনের বিশ্বায়ন শুরু হয়েছিল। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ তখন কোন না কোন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের অধীন কৃষিপ্রধান উপনিবেশ। ফলে দ্বিতীয় পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ছিল খুবই সীমিত অর্থাৎ পুঁজিবাদের পশ্চিম ইউরোপীয়করণ। যেটা বাস্তবে ঘটেছিল তা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশ্বায়ন বাস্তবে পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদকে কাঁচামাল, খনিজ ও বনজ দ্রব্য এবং খাদ্যের জন্য গম, লম্বা আঁশের তুলো (বস্ত্রের জন্য) ইত্যাদি দিয়েছে। অর্থনীতিবিদ

ফ্র্যাংকের ভাষায় পশ্চিম ইউরোপে পূজিবাদী শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়েছে উপনিবেশগুলো অর্থনৈতিক দিক থেকে হতসর্বস্ব হয়ে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে নিষ্কিণ্ড হয়েছে বলে। পূজিবাদের সামগ্রিক চেহারা উন্নয়নের প্রদীপ যতই প্রশস্ত হবে, তার ঠিক নিচেই অন্ধকার অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে।

তাই পূজিবাদী বিশ্বায়নকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর যে কয়টি দেশে পূজিবাদী শিল্পোন্নয়নে অগ্রগতি ঘটেছে (পশ্চিম ইউরোপ ছাড়া এশিয়ায় একমাত্র জাপান এবং আমেরিকা মহাদেশে আমেরিকার যুক্তরাজ্য) তার বিশ্বায়ন অবিচ্ছিন্ন অংশ হচ্ছে হতসর্বস্ব ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ছন্নছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলো।

তবে এই পূজিবাদী বিশ্বায়নের কেন্দ্রে ছিল ব্রিটেন। যেহেতু প্রথম পর্যায়ে বিশ্বায়নের কাল থেকে ব্রিটেন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেছে, দ্বিতীয় পর্যায়ের পূজিবাদী বিশ্বায়নের কালে প্রধানতম কেন্দ্র হিসেবে ব্রিটিশ পুঞ্জির অন্যতম মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় শিল্পোন্নত পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো ও আমেরিকা। জাপান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে শিল্প পুঞ্জিতে প্রাধান্য লাভ করে। আর আমরা যে সময়ের ব্রিটেন নিয়ে আলোচনা করছি, তা প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ব্রিটেনের জাতীয় মুদ্রা পাউণ্ড স্টার্লিং তখন স্বর্ণমানের (Gold Standard) ওপর দাঁড়িয়ে, অর্থাৎ স্টার্লিং মুদ্রা ও তার ভগ্নাংশ ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ব্যাংক অব ইংল্যান্ড) সোনা রূপান্তর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং স্বর্ণমুদ্রা গলিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে বাধানিষেধও তুলে নেওয়া আছে। এসব ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ দশক থেকে।

ব্রিটেন শিল্পবিপ্লব ও ঐশ্বর্যময় বাণিজ্যকেন্দ্র হওয়ায় পশ্চিম ইউরোপের সকল দেশই নিজ নিজ দেশের শিল্পোৎপাদনের জন্য ব্রিটেন থেকে একদিকে যেমন কারিগর, এঞ্জিনিয়ারিং পরিষেবা এবং মেশিন আমদানি করতে চাইতো, অন্যদিকে ব্রিটেনে তেমন দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে কৃষিপণ্য, জার্মানি থেকে কয়লা, ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলো থেকে ফল, ফুল এবং বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য ইত্যাদি, স্পেন ও ইতালি থেকে এবং অন্যান্য সুদূর দেশ থেকেও প্রচুর রপ্তানি হতো। প্রতি দেশেরই ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অর্থাৎ ব্রিটেন থেকে আমদানির চেয়ে রপ্তানি অধিক করার চেষ্টা থাকতো। পশ্চিম যুরোপীয় দেশ ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত করতে চেষ্টা করতো। কারণ তাকে পাউণ্ড স্টার্লিং পাওয়া যেত এবং পাউণ্ড স্টার্লিং দিয়ে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক) থেকে সমান মূল্যের সোনা ঐ দেশ লাভ করত।

সোনার সঙ্গে যখন তখন বিনিময় যোগ্য বলে ব্রিটেনের জাতীয় মুদ্রা পাউণ্ড স্টার্লিং বা তার ভগ্নাংশের আন্তর্জাতিক চাহিদা বেড়ে গেল। ব্রিটেনের স্বর্ণ মানে প্রবেশ ও স্টার্লিং এর বাণিজ্যিক মাধ্যম হিসাবে আন্তর্জাতিক আস্থা বৃদ্ধি কয়েক দশকের মধ্যেই ক্যালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় সোনার খনি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এতদিন যে সকল দেশ সোনা ও রূপো দুটোর উপরেই জাতীয় মুদ্রার মান স্থির করেছিল (ইংরেজিতে একে

bimetallic standard বলা হয়), তারা স্বর্ণ মানে প্রবেশ করল। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকা ও ফ্রান্স, ফ্রান্সোপ্রুশিয়ান যুদ্ধ পরবর্তী জার্মানি, বেলজিয়ম, ইতালি ও সুইজারল্যান্ড যাদের জাতীয় মুদ্রা ফ্রান্সের দ্বিমাত্রিক ধাতুমান অর্থাৎ সোনা ও রূপোর মানের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। সদলবলে সকল পুঞ্জিবাদী শিল্পোন্নত দেশের স্বর্ণমান বা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে প্রবেশের কারণ সোনার খনি আবিষ্কারের সঙ্গে সোনার আপেক্ষিক মূল্য হ্রাস ও একই সঙ্গে রূপোর দাম বৃদ্ধি এবং বাজার থেকে উধাও হওয়া। ফলে সকল শিল্পোন্নত পুঞ্জিবাদী দেশ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে প্রবেশ করল।

এ অবস্থা এসেছিল ১৮৮০ সাল নাগাদ। তখন ব্রিটেনের রপ্তানি কমে গেছে, আমেরিকা ও ফরাসি দেশ ইতিমধ্যে শিল্পে বেশ এগিয়ে গেছে। জার্মানিও জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। ব্রিটেনের শিল্পজ পণ্যের আন্তর্জাতিক চাহিদা যেমন কমেছে, তার কৃষিজ পণ্য ও কাঁচামালের চাহিদাও বেড়েছে। ঐ সময়ে আমেরিকা ও ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে গেছে। তারা বাণিজ্য উদ্ধৃত্ত বাবদ ব্রিটিশ স্টার্লিং সোনার বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করত। বস্তুত, ১৮৮০ সাল থেকে ১৯১৩ সাল অবধি ব্রিটেনে বাণিজ্য ঘাটতি হলে ব্রিটিশ জাতীয় মুদ্রা স্টার্লিং দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘাটতির দাম দিত। অথচ অন্যান্য দেশ বিশেষ করে ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও বেলজিয়াম এতটাই পরিসেবা পণ্য ব্রিটেন থেকে আমদানি করত যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি ঐ দেশগুলোর ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি হতো, ফলে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড-এর ব্যবস্থা অনুযায়ী বাণিজ্য ঘাটতির দামে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে সোনা রপ্তানি করে দিতে হতো। এছাড়া যেহেতু স্বর্ণমান বা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড-এর অধীন দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক মজুত সোনা অলস রেখে দেওয়ার চেয়ে ব্রিটিশ আর্থিক পরিসম্পদে খাটানো হলে সুদ অর্জন করা যেত সেভাবে অনেক দেশ সোনার রপ্তানি করে ব্রিটেন থেকে স্টার্লিং সুদ অর্জন করতো।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য যা প্রতিভাত হচ্ছে তা হলো এই শিল্প সমৃদ্ধি ও বাণিজ্য সমৃদ্ধি ছাড়াও ব্রিটেন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড-এর অধীন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো ও আমেরিকার তুলনায় আর্থিক ক্ষমতা আধিপত্যে অনেকখানি শক্তিশালী ছিল বলেই তার জাতীয় মুদ্রা স্টার্লিং আন্তর্জাতিক পণ্য ক্রয়ে ব্রিটেন ব্যবহার করতে পেরেছে এবং স্টার্লিং সোনার বিকল্প হিসেবে আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে বাণিজ্যে সহকারী দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত রাখতে পেরেছে। এ সুবিধা ব্রিটেনের বাণিজ্য সহকারী দেশগুলোর আর কোন জাতীয় মুদ্রার ছিল না। যদিও গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড-এর নিয়মানুযায়ী উক্ত প্রতিটি দেশের মুদ্রাই নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনার সঙ্গে বিনিময় যোগ্য ছিল।

তাহলে ব্রিটিশ স্টার্লিং আন্তর্জাতিক বাজারে রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে কী এমন সুবিধা পেত যা অন্যান্য দেশের জাতীয় মুদ্রা পেত না? সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল এই যে স্টার্লিং মুদ্রা ইউরোপীয় দেশগুলো ও আমেরিকায় যে কোন পরিমাণ জিনিস কিনতে পাবতো অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ঋণ যত খুশি করতে পারতো। জাতীয় মুদ্রা হয়েও পাউন্ড স্টার্লিং

হয়ে গিয়েছিল আন্তর্জাতিক পণ্য বাজারে তরল মুদ্রা (liquid money)। সোনা ব্যাংক অব ইংলণ্ডের কত জমা ছিল ষ্টার্লিং নোট ছাপানোর সময় সেটা খেয়াল না রাখলেও চলতো।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের ষ্টার্লিং কাহিনীর বিষয়ে আর্থার লুইস লিখেছিলেন :

The Bank of England kept very little gold (in relation to money supply)—some say because gold yielded no interest while others are more charitable. Whatever the reason, the consequence was that the Bank was forced to react to slight losses of gold, changing the bank rate on incredible number of times per year [so as to attract gold from other countries for purchasing British financial assets]. *

এ অবস্থায় আঘাত পড়লো বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবার জন্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড-এর নিয়ম অগ্রাহ্য কবে সকল দেশই মুদ্রা ছাপাতে আরম্ভ করলো। অন্যদিকে প্রতিটি দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুদ্রা ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো। এর ফলে বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে যে স্থির বিনিময় হার ছিল, তা বাজারের চাহিদা যোগানব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে আরম্ভ করল। বিশেষ করে হঠাৎ মুদ্রা মূল্য হ্রাস করে কোন দেশ যদি নিজের জিনিষ বেশি সম্ভব করে রপ্তানি বাড়াতে চাইত বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ তার জাতীয় মুদ্রামূল্য অধিকতর হ্রাস করে প্রতিশোধ নিত। সোনার বিনিময়ে অনেকগুলো জাতীয় মুদ্রাকে এভাবে আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে রাখবার এ ব্যবস্থাকে ‘স্বর্ণ বিনিময় মান’ (Gold Exchange Standard) ব্যবস্থা বলা হয়। এ ব্যবস্থার সঙ্গে পূর্বতন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড-এর মামুলি তফাত এটুকুই যে আগে মাত্র পাউণ্ড ষ্টার্লিং পরিগণিত হতো আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে, এখন অনেক দেশের জাতীয় মুদ্রা সোনার বিনিময়ে আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতে প্রতিশ্রুতি দিল। এর ইংগিত একটাই সেটা হচ্ছে পাউণ্ড ষ্টার্লিং ও অন্যান্য দেশের জাতীয় মুদ্রার মধ্যে আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে গেল, অর্থাৎ অন্যান্য দেশ ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আধিপত্য স্বীকার করতে চাইছিল না। শুধু তাই নয়, বিংশ শতাব্দীর বিশ শতকের প্রারম্ভেই অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে জানায় যে তাদের কাছে প্রচুর ষ্টার্লিং মজুত রয়েছে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড জানায় যে ঐ ষ্টার্লিং সোনাতে বদল করা যাবে। বঙ্গত ১৯২৫ সালে সত্যি সত্যিই ব্রিটেন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড’এ ফিরে গেল এবং পুরনো হারে (আউস সোনার মূল্য ৩৫ পাউণ্ড ষ্টার্লিং) অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী হারে, ষ্টার্লিং সোনাতে রূপান্তরিত দিল। কিন্তু ১৯২৬ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ফ্রান্স ও আমেরিকা ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য

উপর্যুপরি উদ্ভূত অর্জন করেছিল এবং ১৯৩০ সালে ব্যাংক অব ফ্রান্স তার জমা ষ্টার্লিং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের কাছে ফেরত দিয়ে সোনা দাবি করে বসলো। পাশাপাশি আমেরিকা প্রতি বছরেই বাণিজ্য উদ্ভূত খাতে পাওয়া ষ্টার্লিং সোনায় বদলে নিয়ে যাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৩১ সালে ব্রিটেন স্থায়ীভাবে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড থেকে বেরিয়ে গেল। ষ্টার্লিং-এর মুদ্রামূল্য হ্রাস পেয়ে এক আউন্স সোনার দাম ৩৮ পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এ নেমে গেল।

এর পরবর্তী সময়টা ছিল বিশ্বায়নধর্মী ইউরোপীয় পুঁজিবাদের অদৃষ্টপূর্ব সংকট যজ্ঞা। তিরিশেব অর্থনৈতিক সংকটে গোটা পশ্চিম ইউরোপ আক্রান্ত। বেকারত্ব বাড়ছে বিনিয়োগ বন্ধ, পণ্যের বাজারে চাহিদা সংকট, ব্যবসায় মন্দাভাব গগনচুম্বী। ঠিক ঐসময়ে বিভিন্ন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশেব কেন্দ্রীয় ব্যাংক সোনায় বদলানোর জন্য অপেক্ষমান প্রচুর মজুত ষ্টার্লিং নিয়ে আকস্মিক ছানতে পাবল ব্রিটেন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড থেকে বেরিয়ে গেছে; তাদের পক্ষেও একই পথ অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। আমেরিকা ১৯৩১ সালে ডলারের মুদ্রামূল্য হ্রাস কবে আবার পবেব বছর গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে ফিরে এল। ফিরে এল ফ্রান্স ও ইতালি। যাবা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে ফিরে এল, তাদের কাজ হয়ে দাঁড়াল মুদ্রামূল্য হ্রাস করে অর্থাৎ দেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মূল্য কমিয়ে (আরেকটি দেশের রপ্তানিযোগ্য একই পণ্যের মূল্যের তুলনায়) বিদেশে রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা করা।

তাহলে ১৯১৪-১৯৩১ সাল বরং পরবর্তী সময়ে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এবং গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ডের অনুপস্থিতির সুযোগে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে বাণিজ্য-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে পুঁজিবাদী দেশগুলো আধিপত্যভিলাষী শক্তিমান পুঁজিবাদী দেশের নেতৃত্ব ছাড়া চলতে পারে না এবং শক্তিমান পুঁজিবাদী দেশ কর্তৃক অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশ থেকে উদ্ভূত চুরিতে শোষণদের আপত্তি ততুটা নেই, যতটা আছে অধিপতি না থাকার কারণে পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা ও বাণিজ্য যুদ্ধ। ব্রিটিশ পুঁজিবাদের আধিপত্য বতদিন ছিল, ততদিন পাউণ্ড ষ্টার্লিংকে আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রার সম্মান ও সুযোগ দিতে অন্য পুঁজিবাদী দেশগুলো আপত্তি করেনি, ষ্টার্লিং রিজার্ভ মুদ্রা হওয়ায় ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রাধান্য ও প্রভুসুলভ তঞ্চকতার সুযোগ ব্রিটেন পেয়েছিল এবং অন্যান্য দেশের পুঁজিবাদ তা মেনে নিয়েছিল। কেন? একটি বিশেষ কারণে। আমেরিকা ছাড়া পশ্চিম ইউরোপের আধিপত্যবাদী ব্রিটেনের তো অনেক বৃহৎ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছিলই অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেরও যেমন ফ্রান্স নেদারল্যান্ডস বেলজিয়ামেরও উপনিবেশ ছিল পৃথিবী জুড়ে। পুঁজিবাদী দেশগুলোব এজন্যই একটা আধিপত্যবাদী নেতৃত্ব প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশ্বায়নের দুটো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ—উৎপাদনশীল পুঁজিবাদের বিস্তার এবং কৃষিপ্রধান অনগ্রসর অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিক শোষণ পুঁজিবাদকে তীব্র সংকটে নিয়ে গেল। যে দেশের পুঁজিপতিদের ঔপনিবেশিক বাজার খুবই সংকীর্ণ তাদের সড়ে

(যেমন ইউরোপের জার্মানি ইতালি ও অস্ট্রিয়া) যে সকল দেশের পুঞ্জপতিবৃন্দ উপনিবেশের সম্রাট কাঁচামাল, মনুষ্যশ্রম এবং পণ্যবাজারের সুবিধা আয়ত্তে ছিল তাদের লেগে গেল মহাযুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

৩

অর্থনীতিবিদ সুইজি ক্রিশ্বে দশকের সংকটে বিশ্বস্ত ইউরোপীয় অর্থনীতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমার আঘাতে কী পরিমাণ মৃতপ্রায় এবং আমেরিকার অর্থনীতি যুদ্ধের ছোঁয়া লেগে কি রকম টগবগিয়ে এগিয়ে গেল তার একটি ছবি তুলে ধরেছেন :

'The Great Depression [from 1931-39] was new in the history of capitalism. A whole decade in which there was no growth at all, the Capital Accumulation Process came to a halt in the United States, by then the leading capitalist country, unemployment reached 25 per cent of the labour force in 1933...there followed a recession within the depression. Joblessness shot up to 19 percent in 1938, and the decade seemed destined to end with not only the economy but the whole society in a profound crisis...

What brought this period to a close of course was the second world war. ...The depression never ended, it just merged into the war economy. In the five years 1939-1944, the country's Gross National Product increased by some 75 percent and unemployment practically disappeared.'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় যখন মিত্র দেশগুলোর মধ্যেই বাণিজ্যযুদ্ধ চলছিল, তখন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ কেইনস আন্তর্জাতিক পণ্য (পরিবেশাপণ্য এবং বস্তু পণ্য) বাণিজ্যে নিযুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিনিময়ের ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের বাণিজ্য উদ্ভূত বা ঘটতির মূল্য কিভাবে হিসাব ও মীমাংসা করা হবে সে ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। ঐটি কেইনস পরিকল্পনা (Keynes Plan) নামে খ্যাত। পরিকল্পনার চারটি ধারা উল্লেখ করা যেতে পারে :

প্রথম, আন্তর্জাতিক বেচাকেনায় সোনা অথবা কোন দেশের জাতীয় মুদ্রা (তা ঐ দেশ যতই অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক দিক থেকে শক্তিশালী হোক না কেন) ব্যবহার করা চলবে না।

দ্বিতীয়, জাতীয় মুদ্রা নিরপেক্ষ এবং যে কোন মূল্যবান ধাতু নিরপেক্ষ একধরনের আলাদা জাতের স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে (যাব স্বর্ণমূল্য নির্দিষ্ট থাকবে) রপ্তানিকৃত বা আমদানিকৃত ক্রীত পণ্যের মূল্যায়ন করে কোন দেশের বাণিজ্য উদ্ভূত-বাণিজ্য-ঘটতি হিসেব করা হবে।

৭ P. M. Sweezy, *The Triumph of Finance Capital* (A collection of articles from Monthly Review) (MRP, NY, 1998), p. 248.

আন্তর্জাতিক মুদ্রার নাম হবে ‘ব্যাংকর’ (Bancor)। এর একমাত্র উদ্দেশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যজনিত দেনা পাওনার হিসেব সৃষ্টভাবে পারস্পরিক মীমাংসার উপকরণ হিসেবে কাজ করা। অর্থনৈতিক পরিভাষায় international clearance-এর জন্য clearing instruments হিসেবে কাজ করা।

তৃতীয়, সোনা দিয়ে ‘ব্যাংকর’ কেনা যাবে, কিন্তু ‘ব্যাংকর’ দিয়ে সোনা কেনা যাবে না।

চতুর্থ, কোন দেশ বারংবার বাণিজ্য ঘাটতি বা বাণিজ্য উদ্বৃত্ত করলে যথাক্রমে ঘাটতির বেলায় ব্যাংকর ধার করা যাবে আন্তর্জাতিক ব্যাংকর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। তার বেশি ধার হলে সুদ দিতে হবে অনেক। উল্টোদিকে উদ্বৃত্ত দিয়ে ব্যাংকর মজুত করা যাবে, কিন্তু বেশি মজুত হলে সংরক্ষণ ব্যয় বহন করতে হবে। কোন দেশ তার জাতীয় মুদ্রার সঙ্গে অন্য কোন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার সাধারণভাবে স্থির রাখবে, যদি পরিবর্তন করতে হয় আন্তর্জাতিক ব্যাংকর পরিচালন কর্তৃপক্ষের সম্মতি পেলে তবেই করবে।

উপরে বর্ণিত কেইনস পরিকল্পনা পুঁজিপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে রচিত হয়নি। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদগণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পণ্য বাণিজ্যে যে সকল সমস্যা অতীতে দেখা দিয়েছে ও ভবিষ্যতে যে সকল সমস্যা দেখা দিতে পারে বিশেষ করে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা প্রবর্তনের প্রয়োজনবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ প্রস্তাব করেছিলেন। বস্তুত পরিকল্পনাটি আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও প্রয়োজনীয় সেজন্যই কেইনস পরিকল্পনা এতটা আলোচিত হলো।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ছিল আমেরিকার অর্থনীতির পক্ষে আশীর্বাদ। অন্যদিকে ইউরোপীয় অর্থনীতির পরিকাঠামো অনেকটাই বিধ্বস্ত। অনেক দেশেই অসামরিক উৎপাদন, বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে, দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যেও অসাধারণ বেকারত্ব, যানবাহন যোগাযোগ ব্যবস্থা রাস্তাঘাট বিধ্বস্ত। বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো। আর এশিয়ায় জাপান। এ অবস্থায় পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোয় এবং জাপানে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর পুনর্গঠনে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে মূলধনের সমস্যা। ফলে ঐ দেশগুলো হয়ে গেল মহাযুদ্ধে সমরাস্ত্র বিক্রয়ের মুনাফা এবং যুদ্ধের কল্যাণে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির বহুমুখী বিকাশে সমৃদ্ধ মার্কিন পুঁজির মৃগয়া ক্ষেত্র। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল ছিল ইউরোপ এবং এশিয়ার জাপানে মার্শাল পরিকল্পনার নামে আমেরিকান পুঁজির ঘাঁটি নির্মাণের প্রারম্ভিক পদক্ষেপ।

১৯৪৪-৪৫ সালেই আমেরিকার পুঁজি যুদ্ধ চলাকালীনই ইউনাইটেড নেশনস্-এর সংগঠিত করা ব উদ্যোগ নেবার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং পুনর্গঠন এবং উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (সংক্ষেপে বিশ্বব্যাংক) সংগঠিত করার দিকে সচেষ্ট হয়। অর্থনীতিবিদ কেইনসের পরিকল্পনাটি মুনাফা ও বিনিয়োগের অপরিমেয় সুযোগ

ব্যবহারের স্বার্থে পুঁজিবাদী জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান করে। ব্রিটন উডসে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিশ্বব্যাংক গড়ে ওঠে একদিকে অর্থভাণ্ডারের সাহায্যে ডলারের আধিপত্য বাড়ানো ও অন্যদিকে বিশ্ব ব্যাংকের মারফত ডলার পুঁজিকে উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের জন্য ইউরোপ ও তৃতীয় বিশ্বের বাজারে ডলার ঋণ (অর্থনীতির পরিভাষায় rentseeking capital) হিসেবে বিনিয়োগের জন্য।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশ এবং এশিয়ার একমাত্র উন্নত পুঁজিবাদের দেশ (অথচ মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত) জাপানকে পরিকাঠামো তৈরি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য মার্শাল পরিকল্পনার ১৭ মিলিয়ন ডলার আমেরিকা চড়া সুদের হারে ঋণ দেয়। ঐ ডলারের শতকরা আশি ভাগ আমেরিকা থেকে পণ্য আমদানি করতেই খরচ হয়ে যায়। আমেরিকার পুঁজিপতিবাই অধিকাংশ পুনর্গঠনের বরাত পায়। এর পরিণামে ইউরোপ ও জাপানে ডলারের চাহিদা বাড়ে, কারণ একনাগাড়ে কয়েক বৎসর আমেরিকা কারেন্ট হিসেবে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হয়। ব্রিটন উডস এর চুক্তি যা কেইনস প্রস্তাবিত নিবপেক্ষ আন্তর্জাতিক মুদ্রা না গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ডলারকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে স্থির কবে, তবে ব্রিটেনের ষ্টার্লিং-এর মত (প্রথম মহাযুদ্ধের আগে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড-এর অধীনেই আগে ছিল) ডলারকে সোনার মূল্যে নির্দিষ্ট করে। সোনার এক আউন্সের দাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যা ছিল তাই বইল অর্থাৎ ৩৫ ডলাব, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ঐ দামই রাখল। তবে অর্থভাণ্ডারের ব্যবস্থা অনুযায়ী ডলার মুদ্রা যদিও ৩৫ ডলার ১ আউন্স সোনার সঙ্গে রূপান্তরযোগ্য অন্য যে কোনো জাতীয় মুদ্রাকে ডলারের সঙ্গে একটা বিনিময় হার রাখতে হবে। এভাবে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ডলার মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করল। রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ডলারকে স্থাপন করার কয়েক বৎসরের মধ্যেই গোটা ইউরোপে ডলার দুর্ভিক্ষ বা ডলার দুস্প্রাপ্যতা দেখা দিল। একদিকে আমেরিকার বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (মার্শাল পরিকল্পনাব পরিণাম), অন্যদিকে সব দেশকেই আন্তর্জাতিক কেনা বেচার জন্য তরল ডলারের চাহিদা বেড়ে যাওয়াই ছিল ডলার দুস্প্রাপ্যতার কারণ। এই অবকাশে আমেরিকান পুঁজি সোজাসুজি বিদেশি বিনিয়োগ ১৯৪৫-৪৬ সালের ৭.২ বিলিয়ন থেকে ১৯৬১ সালে ৩৪.৭ বিলিয়ন, ১৯৭১ সালে ৮৬.০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়ে গেল। আমেরিকান ডলার এতই সোজাসুজি বিনিয়োগের জন্য বাইরে এসেছিল যে তার অধিকাংশ (শতকরা ৬৫ ভাগ) গেল পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশে এবং এশিয়ার জাপানে। আর দান খয়রাতের জন্য বাকি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয়।

ব্রিটন উডস-এর চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন IMF সদস্য দেশের নিজেদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক দেনা পাওনার মাধ্যম হবে প্রতি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ডলার মুদ্রার রিজার্ভ অনুসারে। কিন্তু ১৯৬৫ সাল থেকেই আমেরিকা এবং ইউরোপের অনেক ব্যাংক (কমার্শিয়াল ব্যাংক) যে কোন প্রার্থীকেই নিজেরাই বিনিয়োগ করার জন্য প্রচুর ডলাব ঋণ দিতে আরম্ভ করলো। এভাবেই ইউরোডলারের জন্ম হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে

১৯৮২ সালের মধ্যে আমেরিকার বাইরে ডলার ঋণ প্রতি বছর শতকরা ২৬ হারে বেড়ে বেড়ে ইউরোপের সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মোট ডলার বাণিজ্যের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যেতে থাকে।

বস্তুত ১৯৪৯-৫০ সালের ডলার দুপ্রাপ্যতার ১৯৬৫-১৯৭৩ সাল নাগাদ ইউরোপে শুধু কেন এমনকি তদানীন্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের (সোভিয়েট এবং পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকগণ ধনতান্ত্রিক দেশের মুদ্রা নিজেদের জাতীয় মুদ্রা বদলে পেতেন না)। রাস্তায় কালোবাজারিরাও বিদেশি দেশে ডলার বেচতে বা কিনতে চাইত, এতটাই ডলার মুদ্রা ইউরোপে জমে গিয়েছিল। ১৯৪৯-৫০এ ডলার দুপ্রাপ্যতার অর্থ ছিল আমেরিকা থেকে ইউরোপে পুনর্গঠনের জন্য বস্তুপণ্য ও পরিসেবা পণ্য যাচ্ছিল বলেই মার্শাল পরিকল্পনার ডলারগুলো বহুলাংশেই আমেরিকায় ফিরে যেত, সে কারণেই তখন ইউরোপে ডলার মুদ্রা দুপ্রাপ্য হয়ে ছিল। যেটুকু ডলার থেকে যেত, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর ভল্টে রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে বন্দি হয়ে যেত। একদিকে ইউরোপীয় অর্থনীতি ১৯৬০ সালের মধ্যেই চাঙা হয়ে উঠে, বিভিন্ন দেশে পুঁজিপতিগণও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পর থেকে ঠাণ্ডাযুদ্ধ তীব্র হওয়ায় আমেরিকা কর্তৃক ইউরোপে অনেক সামরিক ঘাঁটি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রকে (বিশেষত নাটোভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে) সামরিক সাহায্যের উপহার দিতে থাকায় ইউরোপীয় পুঁজির সঙ্গে ডলার মুদ্রার সববরাহ ইউরোপে বেড়ে যায়। আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থাগুলোও ডলার ঋণ করে ইউরোপ থেকে বস্তুপণ্য ও পরিসেবা পণ্য কিনে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়। অর্থাৎ ডলার আধিক্য ইউরোপ থেকে আমেরিকায় দ্রব্য সামগ্রী ও পরিসেবা পাঠানোর উপায় হয়ে দাঁড়ায়।

একজন অর্থনীতিবিদ ঐ সময়কার আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের ডলারকে রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে গণ্য করে আমেরিকা পশ্চিম ইউরোপ শোষণে কিভাবে সাহায্য করেছে তা ব্যাখ্যা কবতে গিয়ে বলেন :

“This privilege of shopping around the world by simply accumulating monetary liabilities abroad could be (and was) exercised by the United States in the name of providing the world with enough international liquidity (i.e., dollars) under the Bretton Woods arrangements.”^৮

কিন্তু রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় কোন জাতীয় মুদ্রাই বেশিদিন নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে অসমর্থ হয়ে যায়। ডলারের আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে যোগান এত অধিক হয়ে গিয়েছিল এবং আমেরিকার বাইরে কমার্শিয়াল ব্যাংকিংগুলোর দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডলার মুদ্রায় বিনিয়োগ ঋণ দেওয়া (আমেরিকার অভাবের যে সুদ দিতে হয় তার চেয়ে কম সুদের হারে) হচ্ছিল—এসকল কারণে ডলার মুদ্রার সোনায় রূপান্তরযোগ্যতা নিয়ে আন্তর্জাতিক আস্থা হ্রাস পেতে আরম্ভ করলো। এর ফলে অনেক

৮ Amit Bhaduri, *Macroeconomics—The Dynamics of Commodity Production*. (Macmillan. 1986), p. 160

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার দিয়ে অন্যান্য মুদ্রা বা সোনা কিনল। আমেরিকাও ডলারের সোনায় রূপান্তরযোগ্যতা নিয়ে কোন পদক্ষেপ নিতে পারলো না। অর্থাৎ সোনা দিয়ে বাজার থেকে ডলার কিনতে রাজি হলো না। এ অবস্থায় ডলারের আসল দাম নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে ফটিকাবাদী অনেকখানি বেড়ে গেল। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ডলারকে রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে কমিয়ে ফেলল।

যে দুটো দেশ আমেরিকার অস্ত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সব চেয়ে বেশি ঘায়েল হয়ে আবার যুদ্ধের পরে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছিল, তারা খুবই ডলার কিনতে আরম্ভ করলো (পশ্চিম জার্মানি ডলার রিজার্ভ ৭০-৭১ সালের মধ্যে ৬ থেকে ১২ বিলিয়ন ডলার, জাপান ২.৪ বিলিয়ন থেকে ১২.৭ বিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে দিল)। কারণটা সম্পূর্ণ মার্ক ও ইয়েন মুদ্রা তথা পশ্চিমজার্মানি ও জাপানের আমেরিকার সঙ্গে বৃহৎ বাণিজ্য-উদ্ভূত স্বার্থে। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ প্রধানত ফ্রান্সের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি দেশের মুদ্রা একত্রে মুদ্রা বাজারে ডলার মুদ্রার সঙ্গে একত্রে চাহিদা সবববাহের লড়াইতে নেমে তাদের সম্ভব ডলার আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে দিল। এটা ১৯৭১ সালের ঘটনা। ১৯৭১ সালের অগস্টে আমেরিকা নিজেই ব্রেটন উডস চুক্তির সমাপ্তি ঘোষণা করে ডলারের সঙ্গে সোনার রূপান্তরের চুক্তি নাকচ করল। জাপান, কানাডা ও সুইজারল্যান্ড তাদের জাতীয় মুদ্রাকে স্বাধীনভাবে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে চাহিদা যোগানের স্রোতে ভাসিয়ে দিল। শুধু তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশ ডলারের সঙ্গে তাদের জাতীয় মুদ্রাকে যুক্ত রেখে দিল। আবার কিছু অনুন্নত দেশ ফ্রাংক ও ষ্টার্লিং এর সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত রইল। যে যেখানেই যুক্ত থাকুক প্রত্যেক জাতীয় মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক পণ্য বাজারে বস্তু পণ্য ও পরিসেবা পণ্য রপ্তানির শক্তি দ্বারা তার চাহিদামূল্য বৃদ্ধি করার ব্যবস্থায় বাধ্য হতে হলো। এখানে ধনীদেশগুলোর নিজেদের মধ্যে একদিকে, অন্যদিকে ধনী দেশ ও অনুন্নত গরীব দেশের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনা তৈরি করলো। অর্থাৎ উরুগুয়ে রাউণ্ড ও ডাঙ্কেল খসড়া তথা ওয়াল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরি হলো ১৯৭৫-৭৬ সালে।

ডলার মুদ্রা ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল অবধি বিশ্বঅর্থনীতিতে আধিপত্য করে যে পরিবর্তন এনেছে, তার সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুড়ী বলেন,

An asymmetry developed between the 'real' and financial weight of the country [USA] in the world economy. For instance, on a rough estimate (relating to 1983) the United States contributed about 25 per cent of the gross product of the world and about 38 per cent of the OECD total, while its trading weight was only 13 per cent of world exports and about 15 per cent of world imports of primary products. In contrast to these weights in real terms, 75 to 80 per cent of all international loans were denominated in dollars, some 55 per cent of world trade was invoiced in dollars, over 90 per cent of world trade

in oil is denominated in dollars and the central banks around the world hold about 75 per cent of their foreign currency reserves in dollars. Such marked disproportionality between the 'real' and financial weights becomes breeding ground for conflict between supranational financial and national interests.^৯

৪

আশির দশকে এসে আমেরিকান অর্থনীতি শুধু নয়, সকল পুঁজিবাদের উন্নত অর্থনীতি যেমন জাপান, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও ব্রিটেন সকলের জাতীয় আয় উৎপাদনের বার্ষিক হার সত্তরের দশকের তুলনায়ও বেশ কমে গেছে^{১০}। ১৯৯৩ সালের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বলছে :

“বাজারপ্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং উন্নয়নের সংগঠন (Organisation for Economic Cooperation and Development অর্থাৎ OECD দেশগুলো) তার হিসেবে বলেছে যে আশি দশক কর্মপ্রার্থী বেকারের সংখ্যা শতকরা ৬ ভাগের বেশি ছিল, নব্বুই দশকের গোড়ার দিকে শতকরা ৬.৯ ভাগে পৌঁছেছে। এর অর্থ নব্বুই দশক ঐ উন্নত দেশগুলোকে নতুন ৩০ লক্ষ বেকার সৃষ্টি করবে। এব মধ্যে ইউরোপ এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকায় বেকারত্ব বৃদ্ধির সংখ্যা গড়ে প্রতি ১০০ জনে ৩৩ জন।” শিল্পোন্নত দেশে বেকার সমস্যা বাড়লে বাজারে সামগ্রিক পণ্য চাহিদা কমে যায়, চাহিদা হ্রাস পেলে উৎপাদন বিনিয়োগে ভাঁটা পড়ে, বাণিজ্যও হ্রাস পেতে থাকে। অর্থনীতিবিদ জি. টি কুরিয়েন জানান,

According to World bank data, world trade which grew at an average annual rate of 6.5 per cent in the 1950s, 8.3 per cent in the 1960s, and 5.2 per cent in the 1970s, came down to 4.0 per cent in 1980s. The extent of world trade came to be much more among rich countries of the 'North', much by among poor countries themselves it was least between rich and poor countries. (North-South trade)^{১১}

পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত দেশগুলোয় সত্তর দশক থেকে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করছিল। মার্কিন দেশে ও ব্রিটেনে মূল্যস্তর বৃদ্ধি তাদের ব্যালান্স অব পেমেণ্টসে ষাটটি বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। আমেরিকার বেলায় ক্যাপিটাল ও কারেন্ট একাউন্টে, ব্রিটেনের বেলায় শুধু কারেন্ট একাউন্টে। অভ্যন্তরস্থ সকল শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে আশির দশকের তুলনায়

৯ তদেব, পৃ ১৬৪

১০ আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ১৯৮৬ এবং ১৯৯১ সালের বিপোর্ট দৃষ্টব্য।

১১ C T Kurian Global Capitalism and The Indian Economy (Orient longman 1994)

নব্বুই-এর দশক, নব্বুই দশকের তুলনায় একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্রমবর্ধমান দক্ষ শ্রমিকের বেকারত্ব বাড়ছে, অর্থনৈতিক মন্দাভাব তীব্রতর হচ্ছে, পরিসেবাবাহী পণ্য কিছু কিছু নিশ্চয়ই বেড়েছে, কিন্তু বস্তু পণ্য উৎপাদন হ্রাস না পেলেও অত্যন্ত ধীরগতিতে বাড়ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে ক্রমশ কমছে তা আগেই উল্লেখ করেছি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজি যদি করপোরেট সংস্থা থেকে বহুজাতিক সংস্থায় উত্তরণ করে, তাহলে তার মুনাফার জন্য তো নতুন ক্ষেত্র আসবে না, বড়জোর বাজারে মুক্ত বাণিজ্য অধিক সংকুচিত হয়ে একচেটিয়া বা অলিগোপলির কাছে আত্মসমর্পণ করে তাতে হয়তো মুনাফার প্রাস্তিক বৃদ্ধি ঘটাবে, অর্থনীতির মন্দা পুঁজিবাদকে যেখানে চ্যালেঞ্জ করছে, তার তো কোন হেরফের ঘটছে না। তদুপরি আশি নব্বুইর দশক থেকে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় মুদ্রা সববরাহ কমিয়ে সভাপতি রেগান ব্যাংক রেট বাড়িয়ে দিয়েছেন। অর্থের রাশ টেনে ধরায় বেশি সুদের লোভে আমেরিকার ডলার মুদ্রা বহির্বিষ্ম থেকে আমেরিকামুখী হয়েছে। কিন্তু মুদ্রাসংকটের প্রকোপে বিনিয়োগ আমেরিকার অর্থনীতিতে মন্দাভাবকে আরো বেশি বাড়ছে। শুধু আমেরিকা নয়, আমেরিকা থেকে ঐ মন্দাভাব অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

পুঁজির প্রয়োজন মুনাফার। শুধু মুনাফাব। শিল্প নয়, কর্মসংস্থান নয়, বিনিয়োগ নয়, উৎপাদন নয়, বাণিজ্য নয়। ঐ মুনাফার জন্যই করপোরেট পুঁজি, বা বহুজাতিক সংস্থার পুঁজি আশির দশক থেকেই মুদ্রাকে, সবকারি স্বর্ণ সিকিউরিটি বা বস্তুকে পণ্য করেছে বিনিয়োগের জন্য, মুনাফা অর্জনের জন্য।

আশির দশকের পৃথিবীর প্রবণতা লগুনের 'ইকনমিষ্ট' তাব সার্ভে থেকে তুলে ধরেছে—

- ক) ১৯৮০ সালে আন্তর্জাতিক ব্যাংক ধারের পরিমাণ ছিল ৩২.৪ বিলিয়ন ডলার। ১৯৯১ সালে এটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৭.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। ১৯৮০ সালের অঙ্কটি ছিল OECD সদস্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪ ভাগ, ১৯৯১ সালের অঙ্কটি হয়ে দাঁড়াল শতকরা ৪৪ ভাগ
- খ) ১৯৮২ সালে যত আন্তর্জাতিক বণ্ট সেগুলো ডাঙানোর পর মূল্য দাঁড়াত ২৫৯ বিলিয়ন ডলার। ১৯৯১ সালে তা হয়ে দাঁড়ায় ১.৬৫ ট্রিলিয়ন ডলার
- গ) ১৯৭০ সালে বিদেশিদের কাছে যে পরিমাণ আমেরিকান সিকিউরিটি নিয়ে লেনদেন হয়েছিল তাব মূল্য আমেরিকার মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩ ভাগ, ১৯৮০ সালে তা হয়ে দাঁড়ায় ৯ ভাগ, ১৯৯০ সালে তা হয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৯৩ ভাগ। পশ্চিম জার্মানিতে অনুরূপ শতকরা ভাগগুলো ছিল যথাক্রমে ৩ ভাগ, ৮ ভাগ এবং ৫৮ ভাগ, আর জাপানে শতকরা ২ ভাগ (১৯৭৫), ৭ ভাগ এবং ১১৯ ভাগ

ঘ) ১৯৯১ সালে দৈনিক মুদ্রা ব্যবসায় নিয়ে ৯০০ বিলিয়ন ডলার লেনদেন হয়

ঙ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যত বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হয়ে থাকে ১৯৭০ সালের তুলনায় ১৯৮০ সালে তিনগুণ বেড়েছে, ১৯৯০ সালে তার মূল্য হয়ে দাঁড়ায় ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলার।^{১২}

ইকনমিস্ট পত্রিকা মনে করে, আজ থেকে কুড়ি বৎসর পরে আশির দশককে আন্তর্জাতিক ঋণ সংকটের শুরু বলে অথবা ডলারে স্বর্গে ওঠা আর নরকে পতন, অথবা রেগান অর্থশাস্ত্র ও অর্থবাদের (of 'monetarism') শুরু না বলে বলবে যে ১৯৮০ সাল এমন একটি প্রোবাল অর্থনৈতিক অর্ডারের সূচনা করেছে, যেখানে সকল জাতীয় আর্থিক বাজার লুপ্ত হয়ে এখন বিশ্ব পুঞ্জির বাজারের বোধন করেছে।^{১৩} বিশ্বপুঞ্জিবাদের তাই বাহন হিসেবে ফাটকাবাজ খাজনামুখী প্রবণতা আশির দশক থেকে শক্তিশালী হয়ে গেল। কিন্তু এই প্রবণতা মুক্তি পেল দুভাবে: একটি হলো বহুমুখী আন্তর্জাতিক করপোরেশনের মাধ্যমে, অন্যটি হলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের রসদ প্রথম বিশ্বের দেশগুলোয় নিয়ে আসা।

বহুজাতিক করপোরেশনের যে অংশ পণ্য উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত তারা বিভিন্ন দেশে পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন অংশ ভাগ করে ব্যয় বা ক্যাপিটাল বা রপ্তানি/আমদানি কর এড়ানোর জন্য। এই অর্থে আজকাল আমেরিকান বা জার্মান বা ডাচ বহুজাতিক করপোরেশন কথাটি খাটে না। জাতীয় পুঞ্জিবাদ বিলুপ্তপ্রায়, হয়তো একমাত্র তৃতীয় বিশ্বে এখনো টিকে রয়েছে। এই জাতীয় পুঞ্জিবাদের অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্যই প্রথম প্রয়োজন বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় পুঞ্জিকে বিলোপ করে দেওয়া। বাজার ও প্রতিযোগিতাকে পণ্য উৎপাদনের উৎকর্ষের নির্ণায়ক বলে বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন ঋণের শর্ত হিসেবে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারও চাব কোন সদস্য রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘাটতির জন্য বিদেশি মুদ্রা ঋণ চাইলে রপ্তানি বাড়ানোর জন্য যে সকল অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন যেমন জাতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস, ব্যাংক রেট হ্রাস করা ইত্যাদি। বাণিজ্য ঘাটতির আসল কারণ অন্যত্র, সেটা হচ্ছে উন্নত পুঞ্জিবাদের দেশগুলোর মন্দা অবস্থার জন্য চাহিদা হ্রাস ও তৃতীয় বিশ্বের রপ্তানিদ্রব্যের মূল্য হ্রাস। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের শর্তাবলী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানায়ে নিয়ে আসা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভরতুকি তুলে দেওয়া, ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করা, বিদেশি বিনিয়োগকারীর সংস্থা থেকে ঋণগ্রহণ পুরোটাই চলে যেতে চাইলে তার সুযোগ দেওয়া, সর্বোপরি ঋণগ্রহীতা দেশের বাজেটে ফিসকাল ডেফিসিট না থাকা ইত্যাদি।

১২ The Economist (সেপ্টেম্বর, ১৯৯২)

১৩ এ, সি টি কুবিয়নের বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়বিশ্বে বিশ্বায়নের ডাকে সে সকল দেশই সাড়া দিয়েছে, যাদের রপ্তানীর চেয়ে আমদানি বেশি, বিরাট কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে একদল স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত (জনসংখ্যার শতকরা .০৫ ভাগও নয়) ভোগ্য দ্রব্যের ক্রেতা। বিদেশি বহুজাতিক করপোরেশনের হরেকরকম শিল্পজ্ঞ ভোগ্যপণ্য এবং পরিসেবাপণ্যের এরা ক্রেতা। পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ লোক থাকেন তৃতীয় বিশ্বে। ঐ তিনভাগ লোকের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন লোকও (তৃতীয় বিশ্বের মোট জনসংখ্যার .০২ এরও কম) যদি বহুজাতিক করপোরেশনগুলোর সরবরাহ কর ভোগ্যপণ্যের এক দশমাংশও কিনতে পারেন, তাতে করপোরেশনের মুনাফা গগনচুম্বী হতে বাধ্য। সুতরাং তৃতীয়বিশ্বকে বিশ্বায়নের আওতায় আনতে পারলে বিশ্বপুঞ্জির লক্ষ্মীলাভ নিশ্চিত।

বিশ্বায়নের দীক্ষায় পরিশীলিত অর্থনীতিবিদগণ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা বিশ্বব্যাংকের বেতনভুক ভূতা হয়ে গেলে মাথায় শুধু অর্থ জেঁকে বসে, নীতি মাথা থেকে চলে যায়। চলে যায় দুটো কারণে। অর্থনীতির উজ্জ্বল ছাত্র হিসেবে সামান্য বেতন থেকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও নিউইয়র্কের অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাংকের বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর মোটা মাইনের চাকুরির পরে দেশি সবকারের উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ হবার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলে। শেষজীবনে কর্মমুক্ত মোটা জাতীয় মুদ্রার পেনশন, অল্প আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্য হওয়া হলো উপরি পাওনা। যে হারে তৃতীয় বিশ্ব আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাংকের কাছে অর্থনীতিবিদদের মস্তিষ্ক ভাড়া খাটায় তা নিঃসন্দেহে প্রথম বিশ্বের অর্থনীতিবিদদের তুলনায় বেশি। প্রথম বিশ্বের অর্থনীতিবিদরা আজকার জেনোয়ায়, নিউইয়র্কের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যথাক্রমে বিশ্বায়ন বিরোধী শোভাযাত্রা, বিতর্ক সভা করে। কেউ কেউ বলেন যদি কোন স্বাগ্রার্থী দেশ এশিয়ায় চিনের মতো বহুজাতিক শিল্প করপোরেশনকে দিয়ে শুধু উৎপাদনশীল বিনিয়োগে যোগ দিতে বাধ্য করে, তাহলে বিশ্বায়ন থেকে সুফল লাভের সম্ভাবন থাকে।^{১৪} এ বিষয়ে বিবৃত আলোচনায় যাওয়ার পরিসর এখানে নেই। বিশ্বায়ন পুঞ্জিবাদের ঘাড়ে বসে নেই, বর্তমান পুঞ্জিবাদের পরিণামগত স্তরই বিশ্বায়নকে সৃষ্টি করেছে নিজস্ব প্রয়োজনে।

বিশ্বায়নের প্রয়োজন কী? মুনাফার যোগান দেওয়া কাকে? সর্বোপরি বহুজাতিক করপোরেশনের পুঞ্জি কে। গরীব দেশগুলোর উৎপাদনযন্ত্রের ধারে কাছে বহুজাতিক করপোরেশনের পুঞ্জি যাবে না। কাবণ ঐ দেশগুলোর শতকরা ৯৯.০৫ ভাগ লোক

১৪ এ প্রসঙ্গে অমিত ভাদুড়ী ও দীপক নাথারের বিশ্বায়নের অন্যতম সবলীকরণের জন্য ব্যবহৃত প্রবাদ মনে পড়ে। প্রবাদটি এরকম ‘স্বর্গের দরজা যে চাবি দিয়ে খোলা যায়, নবকেব দরজাও তা দিয়ে খোলা যাবে’। একথা এমন একটি বিষয় নিয়ে যা পৃথিবীর নয়। তাই বিশ্বায়নের যে ঐতিহাসিক বাস্তব প্রেক্ষাপট রয়েছে, তাতে প্রবাদটি প্রযোজ্য নয়।

অমিত ভাদুড়ী এবং দীপক নাথার, *The Intelligent Person's Guide to Liberalization* (Penguin 1996). See Chapter 6, pp 159-189

বহুজাতিক করপোরেশনের পণ্য কিনবে না। কিনতে চাইবেনা বলে নয়, কেনার ক্ষমতা নেই। কিন্তু গরীব দেশে চাষিরা ডাকঘরে ক্ষুদ্র সঞ্চয় করে, বীমা করে, বড় চাষিরা ব্যাংকে টাকা রাখে, শহরে চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তরা বীমা করে, সরকারি বণ্ড সিকিউরিটি কেনে, সুদিনের স্বপ্ন দেখে পিটার ড্রাকার, বহুজাতিক সংস্থার বিষয়ে যিনি একজন বিশেষজ্ঞ, তিনি বলেন,

Ninety percent or more of the transnational economy's financial transactions do not serve what economists would consider an economic function. They serve purely financial functions. These money flows have their own rationale of course. But they are in large part political rationalities, anticipation of government decisions as to central bank interest rates or foreign exchange rates, taxes, government deficits and government borrowing a political risk assessment.*

ড্রাকারের অভিজ্ঞতা হচ্ছে বহুজাতিক সংস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বিশেষ করে সরকারি আর্থিকনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা কবে চলা, কারণ ১৯৮০ সালের পর থেকে অর্থের চালাচালি থেকে মুনাফা আহরণের প্রবণতা ব্যাংকিং ক্ষেত্র থেকে অন্যত্র বিশেষ করে সিকিউরিটি বাজারে, বণ্ডের বাজারে, শেয়ার বাজারে চলে গেছে, যেখানে ফটকাবাজী থেকে আকস্মিক লাভ করা যায়। যেহেতু বিভিন্ন দেশের সিকিউরিটি মূল্য বিভিন্ন মুদ্রায় ধরা হয় এবং বিভিন্ন মুদ্রা অর্থাৎ জাতীয় মুদ্রার মূল্যও আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে ওঠা নামা করে, ঐ ওঠানামার মধ্যে দিয়ে পুঁজি মুনাফা করে। যে মুদ্রার দাম বাড়ার প্রবণতা বা সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় ঐ মুদ্রা অধিক কিনে রাখলে দাম বাড়ার পরে মুদ্রা বেচে দিয়ে লাভ করা যায়। একইভাবে সরকারি সিকিউরিটি বণ্ড, অন্যান্য বহুজাতিক সংস্থার শেয়ার চালাচালি করে ফটকা মুনাফা করে।

বহুজাতিক আর্থিক করপোরেশনের কার্যাবলী এদিক থেকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিশ্বব্যাংকের মত সুদনির্ভর ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের বেপরোয়া কাজ কর্মকেও ছাড়িয়ে গেছে। যে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার চেয়ে ওরা অধিক শক্তিশালী অথচ রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালিয়ে নেবার ব্যয়ভার বহন করতে হয়না। বহুজাতিক আর্থিক করপোরেশনগুলো আশি ও নব্বুই শতকে ব্যাংকিং ব্যবসা ছেড়ে কেন সিকিউরিটি এবং মুদ্রা বাণিজ্যের বাজারে ক্রমশ অধিক ঝুঁকে পড়েছে, তার কারণ হিসেবে United Conference বলেছে

“...Costs of financial operation (i.e. lack of financial autonomy, growing financial instability, no neutral international monetary authority etc) being collective are anonymous in their incidence, whereas the benefits accrue to particular economic agents (particularly international financial and nonfinancial institutions and rentiers). Political pressures

by the latter for financial opening therefore does not meet significant resistance”^{১৬}

এটাই হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়ন।

ডলার নোট ছাপিয়ে গোটা বিশ্বকে মার্কিন পুঁজিবাদ তার ছত্রছায়ায় রাখতে চেয়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কেইনস পরিকল্পনা বাতিল করলো। তারপর পুঁজিবাদ যখন ওয়াশিংটনকে অমান্য করে পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানে নিজস্ব পুঁজিবাদের চাহিদার পথে এগুতে গেল তখনই পঞ্চাশ, ষাট দশকের পুঁজিবাদের সুখী পরিবারে অদৃষ্টপূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও উৎপাদন শক্তি বিস্ফোরণে শুরু হলো বিশ্ব পুঁজিবাদের গতিপথ পরিবর্তন—এক জাতীয় পুঁজিবাদের অধীন করপোরেট সংস্থা আরেক জাতীয় পুঁজিবাদের সংস্থার সঙ্গে বা বিশেষ পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত আরেক জাতীয় পুঁজিব সঙ্গে একত্র হয়ে বহুজাতিক উৎপাদন সংস্থা বা করপোরেশন গড়ার দিকে এগিয়ে গেলো। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল কাঁচামালের উৎস এবং পণ্য বাজারে একচেটিয়া প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা। সত্তর দশকে বহুজাতিক সংস্থার জীবনে অধিকতর বৈচিত্র্য এলো, বিভিন্ন পণ্যের বিশ্ববাজার দখলে এলো। কিন্তু এতে পুঁজির ক্ষুধা বেড়ে গেল। ডলার আশ্রিত পুঁজিবাদ চাপে পড়ে ডলারের অভিভাবক কবলো মার্কিন বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে। আশির দশক থেকে পণ্য বাজারে মন্দা দেখা দিল, ডলারের মূল্যও আন্তর্জাতিক বাজারে মার্ক ও ইয়েনের কাছে পড়ে যেতে আরম্ভ করলো। তখনই বিশ্বে উন্নত পুঁজিবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় পুঁজিবাদকে অতিক্রম করে সেকুলার বিশ্বপুঁজি, আমেরিকান বা জার্মান বা ডাচ বা জাপানি পণ্যকেন্দ্রিক অবয়ব ছেড়ে জাতির উল্লেখ না রেখে হয়ে গেল কাণ্ডজে মালটিন্যাশানাল। অধ্যাপক কুরিয়েনের ভাষায় আশির দশকের বহুজাতিক সংস্থার কাজ হয়ে উঠলো।

‘The hectic movement of capital from country to country and from centre to centre was more evidence of speculative activities than any well considered investment decisions of standard type. ‘We will make a hop step and a jump to wherever we can make profits’ remarked the president of an MNC.’^{১৭}

উক্ত নতুন জাতের বহুজাতিক করপোরেশন মসৃণভাবে রাতারাতি পুঁজি উড়ে যাবার স্বার্থেই অবাধ বাণিজ্যের কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। অর্থনীতির পরিভাষায় দুধবনের পুঁজি বিনিয়োগের কথা আগে শোনা যেত—(১) পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, (২) পুঁজির উড়নচণ্ডী বিনিয়োগ। ইংরেজিতে বলা হয়, প্রথমটি Direct Capital Investment, দ্বিতীয়টি Portfolio Investment। আশির ও নব্বুই-এব দশকে দ্বিতীয় ধরনের পুঁজিই

১৬ UNCTAD. Trade and Development Report (Washington 1990) p 112.

১৭ C. T. Kurien. উল্লিখিত পৃ. ৬৪—১৯৯১ সালে প্রকাশিত Robert B Reich-এব The Wake of Nations (p 121) থেকে অধ্যাপক কুরিয়েন নতুন ধরনের MNC President-এব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

রবাট রেইখ-এর বক্তব্য অনুযায়ী আধুনিক বহুজাতিক সংস্থাগুলো ব্যবহার করে। যেখানে বহুজাতিক সংস্থাগুলো নিজেদের পণ্যের ব্যাপারে captive market লালন করতে চায়, তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের কাছে অবাধ বাণিজ্য, ডি রেগুলেশন বা বিনিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা ও বাজারিকরণের কথা বলেন, উদ্দেশ্য তৃতীয় বিশ্বের রসদ উন্নত বহুজাতিক সংস্থা যাতে বিনাবাধায় আত্মসাৎ করতে পারে, তার পথ খুলে রাখার ব্যবস্থা করা। বিশ্বায়ন তাই সোজাসুজি রাষ্ট্রশক্তিকে অর্থনীতি থেকে হাত সরিয়ে নিতে বলে। অপরদিকে তৃতীয় বিশ্বের কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে পণ্য প্রতিযোগিতার কথা বলে। এর ফলে উন্নত দেশের দ্রব্য তৃতীয় বিশ্বের কৃষি পণ্য বা শিল্প পণ্যকে ছাপিয়ে শতকরা ৩৫ জন ভোগকাবীর সেবা করে দেশে এমন সমৃদ্ধি আনবে যাতে ৯৯.০৫ জনকে ধীরে ধীরে বিশ্বায়নের রথের তলায় পিষে ফেলতে পারবে।

বিশ্বায়নের রথের তলায় ২/১ বৎসর আগে পূর্ব এশিয়ার লোকেরা যেতে গিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধেই চলে গিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বায়নের শিকাব হয়েছে। তার আগে হয়েছিল মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা এবং আরো অনেকে। বিশ্বায়নের পুঁজি কখনো করে না কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বিদেশি পুঁজি প্রত্যক্ষ স্বাধীন উৎপাদনশীল বিনিয়োগে যায় না, এরা ঝুলন্ত বনস্পতির মতো থাকে, প্রয়োজন মতো স্বভূমিতে ঐ বনস্পতিকে পুঁজির সংস্থা নিয়ে যায়।

বিশ্বায়ন ও সন্ত্রাসবাদ : এক সংক্ষিপ্ত আন্তঃসম্পর্ক

দুর্বাঙ্গা রফিক

বিগত কতগুলি বছরজুড়ে পৃথিবীর আর্থসামাজিক জীবনে বিশ্বায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে যদিও তার পরোক্ষ ব্যাপ্তি দেখা যায় কয়েকশো বছর ধরে ব্যস্ত। বিশ্বায়ন পৃথিবীতে এক অবাধ বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে যেখানে পুঁজির সঞ্চালন সম্মানরূপে নিয়ন্ত্রণহীন যা অবশ্যই বিশ্বায়নের সরকারি প্রবক্তারা দেখতে চান, দেখাতে চান। আবার ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে W.T.C এর বৃহৎ আকৃতিব স্থাপত্যদ্বয়ের পতনের পর সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের মুখ্য আলোচনার বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বিশ্বায়নের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক কীরূপ তা এই প্রবন্ধাকারের আলোচনাব বিষয়। বিশ্বায়ন এক দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভীক্ষা, এর শুরু আছে কিন্তু শেষ কোথায় হবে, আদৌ হবে কিনা কেউ তা বলতে পারে না। সন্ত্রাসবাদের নানা রূপ আছে—তা কেন্দ্রীভূত হয় কখনও ভাষাকে কেন্দ্র করে, কখনও বা ধর্মকে ঘিরে, মানুষের গায়ের রং কখনও এর বিষয় হয়। সন্ত্রাসের রূপ ও ভয়াবহতা এক এক সময়ে এক এক অঞ্চলে ভিন্ন থেকে ভিন্নতর।

আধুনিক বিশ্বায়নের আগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনীতি তার নিজস্ব ক্ষেত্রে সবসময় সীমাবদ্ধ ছিল তা কিন্তু নয়। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে বিশ্বায়নের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা হলো “বসুধৈব কুটুম্বকম” অর্থাৎ বিশ্বায়ন যে হঠাৎ করে শুরু হয়েছে তা কিন্তু নয়। অর্থনীতির থেকেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। তাই পৃথিবীতে কোন বিশুদ্ধ মৌলিক ভাষা, ধর্ম নেই, সবার মধ্যে সবার অলক্ষ্যে এক মিশ্রণ ঘটে গেছে। আমরা কেউই খাঁটি তা বলতে পারি না। এই পবিত্রক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বায়নের কথা আলোচনা কবতে হবে। এই বিশ্বায়ন অবশ্যই পশ্চিমের বিশ্বায়ন, পশ্চিমি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ। আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের এই অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ তাকে কেন্দ্র করে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তন—এই সমস্ত প্রক্রিয়ার এক কক্ষু বিচরণই বিশ্বায়ন নামে খ্যাত। গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় শক্তিগুলি রেনেসাঁ অর্জিত স্তানের সাহায্যে প্রযুক্তি ও কৃৎকৌশল অধিক ভাবে অর্জন করে এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকা মহাদেশদ্বয়'এর বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে, তা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের আলোচনার অংশ অবশ্যই সেই অবস্থা নয়। সমগ্র রচনাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় আলোচনার সুবিধার জন্য।

(ক) বিশ্বায়ন ও “কৃষ্ণগহ্বর”—

গত কয়েক দশক জুড়ে বিশ্ব জুড়ে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীভবন ঘটছে বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। এই কেন্দ্রীভূত প্রক্রিয়ার উদগীরণ আমরা অনুভব করি, প্রত্যক্ষ করি নব্বই-এর দশকে বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের মধ্য দিয়ে। এই বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ক্ষমতা গঠনের চেষ্টা করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন U.N.O, IMF, WB এবং সাম্প্রতিককালে W.T.O এর মাধ্যমে। তাদের এই কার্যে সহায়তা করে পশ্চিম দেশগুলো। গত কয়েক দশক জুড়ে বিশ্বের শেয়ারবাজারগুলিতে নানাভাবে ফটিকা কারবারের ফলে তৈরি ফটিকা লগ্নী পুঞ্জ যে তৃতীয় ও প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন শেয়ার বাজারে খেলে বেড়ায় সেই পুঞ্জকে আরও সম্প্রসারিত ও উদ্বৃত্ত করতে। এই লগ্নী পুঞ্জের দুটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল আমরা দেখতে পাই—(১) পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাঙ্ক, (২) ক্যাবিবিয়ন দ্বীপপুঞ্জ, ভারত ও দঃ প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জসমূহ যারা পৃথিবীর স্বচ্ছল পর্যটকদের অন্যতম আত্মনা হিসেবেও খ্যাত। এই লগ্নী পুঞ্জ উৎপাদন ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সম্প্রসারণে সবসময় খুশি নয় সে চায় আরও বেশি লাভ কবতে। এই ভাবে লগ্নীপুঞ্জের ক্ষেত্রকে আবও সংগঠিত কবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি ও আন্তর্জাতিক ফটিকা কারবারীদের জোট। এই আরও লাভের আশা বিশ্বব্যাপী “কৃষ্ণগহ্বর” বা কালোবাজারকে, যার পূর্বে একটি উজ্জ্বল অস্তিত্ব ছিল, তাকে আরও জ্বালান্যমান করে তোলে। ফটিকামনস্ক এই পুঞ্জের এক বড় অংশ বিনিয়োগ করা হয় কৃষ্ণগহ্বর বা Black Market-এর বিভিন্ন পূর্ব নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, যেমন—

- (১) বিশ্বব্যাপী পপি চাষের ক্ষেত্রগুলিতে যেখানে মারিজুয়ানা হেরোইন প্রভৃতি মাদক তৈরি করা হয় অর্থাৎ মাদক শিল্পে
- (২) পর্নোগ্রাফিক চলচ্চিত্র শিল্পে
- (৩) Flesh Trade এর ক্ষেত্রে
- (৪) পৃথিবীর কতকগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলে Sex Tourism এর প্রসার ঘটাতে
- (৫) মুদ্রা বাজারের ফটিকায়।

এইসব ক্ষেত্র থেকে প্রচুর লাভও হয়। সেই লাভের নির্যাস পুনরায় ফিরে আসে বিশ্ব অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রে। পুরো প্রক্রিয়াটি চলে রাষ্ট্রসমর্থিত ও গঠিত আইনি আবরণের আড়ালে যা সহজে প্রকাশ্যমান নয়। বিশ্বের এই ক্রমশ কেন্দ্রীভূত আইনি অর্থনীতি ও কালো অর্থনীতির সংযোগকে আরো শক্তিশালী করে সম্ভ্রাসবাদ যা বিশ্বায়নের অপবিহার্য অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে একটু পূর্বকালে ফেরা যাক।

(খ) সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিক অর্থনীতির উন্মেষ—

যদি গত কয়েক শতকের সাম্রাজ্যবাদের বিশেষত ইউরোপীয় ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের দিকে তাকানো যায় তাহলে তার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

- (১) উপনিবেশগুলিতে তীব্র অর্থনৈতিক শোষণনীতির মাধ্যমে কাঁচামাল সংগ্রহ
- (২) এই কাঁচামালের সাহায্যে নিজ দেশে শিল্পোন্নয়ন ও শিল্পজাত দ্রব্যের উপনিবেশের বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা
- (৩) উপনিবেশগুলির শ্রমশক্তিকে মুদ্রাবিনিময় ব্যবস্থার কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সুলভ করে তোলা নিজের শিল্পোন্নয়নের উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়ার জন্য
- (৪) সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র কাঠামোতে সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামরিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা যা পরে পূর্বতন উপনিবেশগুলোতে অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে

(৫) ভূকৌশল নীতির প্রয়োগ বা Geo Strategic Approach এর নীতি।

চতুর্থ ও পঞ্চম বিষয় বাদে বাকি বিষয়গুলো যথেষ্টভাবে আলোচিত। এই সকল রাষ্ট্রের সাধারণ অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে সামরিক অর্থনীতি সম্প্রসারিত হয় উপযুক্ত প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশলগত উন্নয়ন ও গোপনীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে। একইভাবে পূর্বতন উপনিবেশে অস্ত্র বিক্রির টাকা জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। এই সামরিক অর্থনীতি এখনও বিদ্যমান। তবে পশ্চিম দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে চীন, উত্তরকোরিয়া ও রাশিয়া এতে দক্ষ। পঞ্চম বিষয়টি অর্থাৎ Geo Strategic Approach এর নানা তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন করা হয় যা শ্রয়ণ পত্রিকায় পূর্বে আলোচিত হয়েছে। একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা বিভাগসমূহের সৃষ্টি যাদের নিজস্ব (১) সামরিক অর্থনীতি, (২) কালো অর্থনীতি (৩) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও গবেষণা ব্যবস্থা (৪) Dualistic approach আছে যা একাধারে রাষ্ট্রের সামরিক কর্তৃত্ব ও সেই রাষ্ট্রের ঔরসে জন্মানো বহুজাতিক কোম্পানির অর্থনৈতিক সম্প্রসারণকে সহায়তা করে তার নিজস্ব কূটনৈতিক কর্তৃত্বের সাহায্যে। দুটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়—

(১) U.S.A এর C.I.A গোয়েন্দা সংস্থা, পেন্টাগন ও সিক্রেট সার্ভিস নিয়ে একটি গোপন সংস্থা গড়া হয়েছে যা রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটা কর্তৃত্বশালী রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। যাকে মাইকেল প্যারেন্টি “সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে” গ্রন্থে আলফা ৮৪ নামে চিহ্নিত করেছেন। যারা দ্রুত তাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

(২) সবাই ইস্রায়েলের বহিঃদেশীয় গোয়েন্দা বিভাগ মোসাদের নাম শুনেছেন। তারা তাদের বন্ধুপ্রতিম C.I.A এর মত অধিকৃত প্যালেস্টাইনে আশির দশকে “হামাস” নামে এক জঙ্গী ইসলামিক সংগঠন গড়ে তোলে প্যালেস্টাইনের ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীনতাপ্রার্থীদের বিকল্প হিসেবে যা আজকে এক মহীকূহে রূপান্তরিত। নব্বইএর দশকে এক সিংহলী অফিসার কমান্ডো ট্রেনিং এর ব্যাপারে ইস্রায়েলে গিয়ে লক্ষ্য কবেন যে তাদের সঙ্গে নাম ভাড়িয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে একদল তামিল জঙ্গী (L.T.T.E-এর) এবং তা মোসাদ কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। এই গোয়েন্দা সংস্থাগুলি পূর্বতন উপনিবেশ ও তৃতীয় বিশ্বের

দেশগুলিতে একই সঙ্গে সরকার ও সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এটাই তাদের Dualistic Approach। এর পেছনে আছে কালো অর্থনীতির বিপুল লাভের হাতছানি। পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে বিশ্বায়ন ও সন্ত্রাসবাদের সম্পর্কের গভীরতার দিকে তাকালে।

(গ) বিশ্বায়ন ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে সম্পর্ক—

এতক্ষণ আলোচনার মধ্য দিয়ে কতকগুলি জিনিস পরিষ্কার হয়—

- (১) রাষ্ট্রের শক্তিশালী সামরিক অর্থনীতি রাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কৃৎকৌশলগত উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পেট্যাগন ও CIA এর বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তথ্যপ্রযুক্তি, GIS ও GPS নামক উন্নত কৃৎকৌশলের সৃষ্টি করেছে।
- (২) সামরিক অর্থনীতি প্রসারিত ব্যাপক যুদ্ধসৃষ্টির মধ্য দিয়ে অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে।
- (৩) উন্নত গোয়েন্দাবিভাগই এই সম্প্রসারণকে আরো শক্তিশালী করে রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়ে।
- (৪) এই সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক প্রসারিত করতে হাত বাড়ায় কৃষ্ণ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের কথা আগেই বলা হয়েছে।
- (৫) সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হলে তাতে হাওলাব মত বিভিন্ন বে-আইনি পদ্ধতির সাহায্যে টাকা ঢালতে এগিয়ে আছে ফাটকামনস্ক লগ্নী পুঁজি।

এইভাবে বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ বর্তমানে একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বের সংবাদমাধ্যম প্রায় সম্পূর্ণরূপে ফাটকামনস্ক বহুজাতিক পুঁজির অন্তর্গত যাদের দ্বারা এই সত্য কখনই উদঘাটিত হবে না। তবে সন্ত্রাসবাদীদের নেতাকে কায়দা করে Hero সাজানো হবে। যেমন বিন লাদেনকে বলা হচ্ছে “Islamic Che”। কিন্তু লাদেনকে তৈরি করেছে এই বিশ্বব্যবস্থা। তা খুবই নিম্ন স্তরে বলা যায়। সন্ত্রাসীদের এই ধরনের Publicity করা হয় কৃষ্ণ অর্থনীতিতে তাদের বাজারদর বাড়ানোর জন্য। তাতে লাভ বিশ্বায়নের অন্তর্গত সবারই। পৃথিবীর সমস্ত ধরনের রাষ্ট্রীয় এবং প্রায় সবধরনের রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদ যত বেশি হবে তত বিশ্বায়ন তথা বহুজাতিক পুঁজি সম্প্রসারিত হবে ও উদ্ভূত হবে। আমেরিকাতে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা ও আফগানযুদ্ধ সবই বহুজাতিক পুঁজির সম্প্রসারণের আকাঙ্ক্ষা থেকে আগত। এই ধরনের যুদ্ধ ও সন্ত্রাস যত হবে তত বিশ্বায়ন লাভজনক হবে। এই কারণে বিশ্বায়ন পছন্দ করে সেই সকল রাষ্ট্রকে যেখানে

(১) একদলীয়/মৌলবাদী শাসনব্যবস্থা থাকবে।

(২) অথবা রাষ্ট্রটি জাতি, ধর্ম, জাত প্রভৃতির মধ্যে সংঘাত নিয়ে দীর্ঘ থাকবে যাতে সেখানে সন্ত্রাসবাদী অর্থনীতি লাভজনক হয়।

(৩) সন্ত্রাসে পূর্ণ রাষ্ট্রে দ্রুত হস্তক্ষেপের সুবিধা লুটতে আসে উন্নতধরনের সামরিক কৃৎকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে যা মানুষ ইরাক, যুগোস্লাভিয়া ও আফগানিস্তানে দেখেছে। এতে করে MNCগুলোর সামরিক অর্থনীতিই শক্তিশালী হয়।

(৪) যেখানে রাষ্ট্র পিতৃসুলভ অভিভাবকের দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত সেখানে তৃণমূল স্তরে স্বেচ্ছাসেবীদের প্রাধান্য আছে যা নতুন ধরনের রাজনৈতিক কাঠামো গঠন করে বহুজাতিক পুঞ্জির আধিপত্যের জন্য। আমাদের ঘরের পাশের দেশ বাংলাদেশে ধারাবাহিক রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা জামাত-ই-ইসলামী তৈরি করে, সারা বাংলাদেশকে সাহসী করে তোলে এই শ্লোগান দিতে “অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, ইসলাম করবে সমাধান”। এই সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে আসে ইসলামিক N.G.O.গুলো ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু মানুষের মন বিধিয়ে যায়। Civil Society ধীরে ধীরে ভেঙে যায়। কিন্তু বহুজাতিক পুঞ্জি খুশি হয়। খুশি হয় মানুষদের প্রতিবাদশক্তি না থাকার জন্য। বিশ্বায়ন ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে লুক্কায়িত লাভজনক সম্পর্ক সারা বিশ্বব্যাপী সুদৃঢ় হয়েছে শ্রেণীগত বিন্যাসের পরিবর্তন ও গণতন্ত্রের সংকটের জন্য। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করা যাক—

(১) সারা পৃথিবী জুড়ে মার্কসবর্ণিত শ্রেণীবিন্যাস আর নেই। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন জাতির, বর্ণের, ধর্মের বিভিন্ন স্তরযুক্ত কাঠামোর অন্তর্গত মধ্যবিস্ত। যাদের শ্রেণী উত্তরণের লিস্ট প্রচণ্ড যার থেকে সৃষ্টি হয় ভোগবাদের আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি যা বিশ্বায়নের উলঙ্গ চালিকাশক্তি।

(২) এই শ্রেণী উত্তরণের জন্য তাদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব বর্তমান যা ধর্মীয়, জাতিগত, বর্ণগত ও ভাষাগত বৈরিতার জন্ম দেয়, তার থেকে তৈরি হয় সন্ত্রাসবাদ।

(৩) পৃথিবীর বেশকিছু গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো দ্বিদলীয় হয়ে পড়েছে, যেখানে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে Civil Society এর পরিবর্তে বহুজাতিক পুঞ্জির মদতপুষ্ট Plutocracy শক্তিশালী হয়েছে। যার ফলে সেখানে মানুষ হয়ে পড়ছে হতাশ, পরম্পরের থেকে, সমাজ থেকে এবং রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন। মানসিক-বিচ্ছিন্নতা প্রতিবাদক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। বহুজাতিক পুঞ্জিকে করে তুলেছে আধিপত্যশালী ও বিশ্বায়নকে প্রতিরোধহীন।

(ঘ) অপ্রতিরোধ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ—

এই অপ্রতিরোধ্য বিশ্বব্যবস্থা ও তার সন্ত্রাসবাদী কাঠামো—এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যে একেবারেই নেই তা নয়। তা অনেকটা কেন্দ্রীভূত হয়েছে পরিবেশকে ঘিরে, মেক্সিকোর চিয়াপাস আন্দোলন, কলম্বিয়ার FARC আন্দোলন পরিবেশের উপর নির্ভরশীল প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদের আন্দোলন অনেকটা লাল সবুজ প্রান্তিক প্রতিরোধ মাত্র। তাতে মধ্যবিস্ত মানুষদের অস্তিত্ব নেই। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ,

প্রতিরোধ সবই হচ্ছে কিন্তু তা হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরণের জন্য, শ্রেণী বিলোপের জন্য নয়। পরিবেশ রক্ষা, স্থানীয় ভূবৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতি, মুক্ত মন, ধর্মীয় মুক্তি বা Liberation Theology, ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রান্তিক মানবের প্রতিবোধ, বিকল্প যৌনতার প্রকাশের আবেগ, বিভিন্ন স্তরের মধ্যবিত্তের মধ্যে সামাজিক ঐক্য ও একটি বিকেন্দ্রীভূত বহুদলীয় বহুত্ববাদী গণতন্ত্র হয়ত এই অপ্রতিরোধ্য বিশ্বব্যবস্থার বিকল্প ভবিষ্যত গড়ে তুলবে।

গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা সূত্র

- ১) শ্রয়ণ, মে-জুন, ১৯৯৮ সংখ্যা
- ২) শ্রয়ণ, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৯৯ সংখ্যা
- ৩) শ্রয়ণ, জুলাই-আগস্ট, ১৯৯৯ সংখ্যা

৪) “১৩ নম্বরে পাঁচ বছর”—সাদত আলী আখন্দ—এই গ্রন্থে বৃটিশ আমলে I.B.তে ভারপ্রাপ্ত এই গোয়েন্দা অফিসারটি দেখিয়েছেন কিভাবে ব্রিটিশ I.B বিপ্লবীদের মধ্যে চর চুকিয়ে এবং ছোট গুপ্ত সমিতি গঠন করে তিরিশের দশকে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ব্যর্থ করে দেয়, এটি Dualistic Approach এর যথার্থ ভারতীয় উদাহরণ।

বিশ্বায়ন ও ম্যানেজমেন্ট : কিছু প্রশ্ন

বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে পৃথিবী ক্রমশই ছোট হয়ে যাচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী সুমাখের এই ক্রমস্ফীকৃত পৃথিবীর নাম দিয়েছেন গ্লোবাল ভিলেজ।

কিন্তু গ্রামেরও পাড়া থাকে। অন্য ধরনের পাড়ার কথা বাদ দিলেও প্রতিটি গ্রামেই দুটি পাড়া বর্তমান—ধনী পাড়া আর গরিব পাড়া। স্বভাবতই এদের ভেতরকার আদান প্রদান অসম। বাণিজ্যিক বা অন্য যে কোন কারণই হোক, ধনী পাড়ার থেকে গরিব পাড়ায় যাওয়াটা সব সময়েই অর্থকরী সম্পর্কিত। নিজ নিজ স্বার্থে গরিব পাড়ার কেউ কেউ হয়তো সেটা সাগ্রহে বরণ করতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে গরিব পাড়ার পক্ষে সেটা মঙ্গলের কী না সেটাই বিবেচ্য।

বিশ্বায়নের নামে ধনী দেশগুলির বাণিজ্যসংস্থাগুলির আমাদের দেশে আগমন বেশ বেড়ে গেছে। আমাদের দেশের সরকার সহ অনেকেই এটাকে বরণীয় বলে বিবেচনা করছেন। সামগ্রিকভাবে এটা দেশের পক্ষে ভাল কি না তা নিয়েও বিতর্কের অন্ত নেই।

বাণিজ্যিক কি অবাণিজ্যিক—যে কোন সংস্থাই কোন না কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়। সেই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্টের কাজ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গতিগুলি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের স্থপতি বা শেয়ারের মালিকদের উদ্দেশ্যকে যথাসম্ভব সফল করে তোলা। কোনো প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্টের কার্যপদ্ধতি বা কর্মকাণ্ড বিচার করতে গেলে সেটা প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের নিরিখেই করতে হবে। বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাদের ম্যানেজমেন্টের নীতিবোধ ও সার্বিকভাবে ভারতীয় সমাজের ওপর তাদের সম্ভাব্য প্রভাব ইত্যাদি নিয়েই এই নিবন্ধে আলোচনা করা হবে।

সরোকিন ও সাংস্কৃতিক তরঙ্গ

যে কোন সমাজের, সেটা পশ্চিমেরই হোক কি পূর্বেরই হোক, সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তনের তরঙ্গ তার মূল্যবোধের তরঙ্গায়িত ভাবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। অনেকেই এই সংস্কৃতিবোধের পরিবর্তনকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবি সভ্যতার উত্থান পতনের মধ্যে এই রঙ্গভঙ্গের হৃদিস খুঁজেছেন।

১ Toynbee Arnold : A study of History · 1977 : Oxford University Press, New York.

১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমাজতত্ত্ববিদ পিটিরিম সোরোকিন চার খণ্ডে প্রকাশিত এক অসামান্য আলোচনায় এই সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তনের আলোচনা করেছেন^২। আমাদের সহায়ক হবে বলে সোরোকিনের বিশ্লেষণ একটু আলোচনা করা প্রয়োজনবোধ করছি।

সোরোকিনেব ভাষ্যমতে তিনটি প্রধান মূল্যবোধের উত্থান ও পতনই সংস্কৃতির সমস্ত বাহ্যিকরূপে প্রতিফলিত হয়। এই তিনটি মূল্যবোধের তিনি নাম দিয়েছেন—Sensate, Ideational ও Idealistic।

সেনসেট মূল্যবোধ অনুসারে একমাত্র বিষয়বস্তুই অস্তিম বাস্তব এবং কোন আধ্যাত্মিক প্রকাশ এই বিষয়বস্তুরই এক অন্য প্রকাশ মাত্র। এই তত্ত্ব অনুসারে সব নীতিবোধই আপেক্ষিক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধিই সব রকম জ্ঞান ও সত্যের উৎস।

আইডিয়েসনাল মূল্যবোধ কিন্তু একেবারে অন্যরকম। এই তত্ত্ব অনুসারে সত্যিকারের বাস্তব বস্তুজগতের উর্ধ্ব আধ্যাত্মিক অঞ্চলে অধিষ্ঠিত। এই মতানুযায়ী অস্তঃস্থলের অভিজ্ঞতা মাঝেমাঝেই জ্ঞানার্জন করা যায়। এই তত্ত্ব সুবিচার, সত্য ও সৌন্দর্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত অতিমানবিক পর্যায়েব নীতিবোধে বিশ্বাসী। সোরোকিন আবও উল্লেখ করেছেন যে এ ধরনের নীতিবোধের সংজ্ঞা হিন্দু, বৌদ্ধ এবং তাও সংস্কৃতিতে পাওয়া যাবে।

সোরোকিনেব মতে সেনসেট ও আইডিয়েসনাল সংস্কৃতির এই তরঙ্গ ছন্দ ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একটি মধ্যবর্তী সমন্বয়ী অবস্থার সৃষ্টি কবে—সেটাই আইডিয়ালিস্টিক অবস্থা যেটি এই দুটি মূল্যবোধের একটি সমন্বয়পূর্ণ মিশ্রণ। আইডিয়ালিস্টিক বিশ্বাস অনুযায়ী সত্যিকারের বাস্তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত বোধ দুইই এক সর্বাত্মক ঐক্যের মধ্যে সহাবস্থান করে। ফলে আইডিয়ালিস্টিক সংস্কৃতির সময় সেনসেট ও আইডিয়েসনাল দুয়ের উন্নততম ও মহত্তম রূপ একসঙ্গে বিকশিত হয়ে শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমন্বয় মিশ্রণ ও নীতিবোধের চরমতম প্রকাশ ঘটায়।

সোরোকিনের মতে ইউরোপের রেনেসাঁর সময়ই ছিল সাংস্কৃতিক গতিবিজ্ঞানের আইডিয়ালিস্টিক যুগ। আস্তে আস্তে সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেটি সেনসেট যুগ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং দেকার্তে ও নিউটনের মূল্যবোধ এবং শিল্পবিজ্ঞানের পরিস্ফুটন ঘটে। বর্তমানে আমবা আবার সেনসেট যুগের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি।

এই পরিত্রাঙ্কিতে শিল্পবাণিজ্যের জন্ম ও বিকাশের ইতিহাস ও তাদের মূল্যবোধের সূত্র নিয়ে কিছুটা আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে বলেই মনে হয়।

২ Sorokin Pitrim (1937-41) : Social and Cultural Dynamics (4 vols) American Book Company, New York.

শিল্প বাণিজ্যের জন্ম ও ইতিহাস

ক্যালিফোর্নিয়া (বার্কেলে) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ক্যারোলিন মার্চেন্ট এই আলোচনার যৌক্তিকতা নিয়ে যা বলেছেন সেটা এখানে উল্লেখ করছি।^৩

“বর্তমান পরিবেশ সংকট ও তার সঙ্গে বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির যোগাযোগ সম্বন্ধ অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের চিন্তাজগতের গঠনকে নতুনভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং যে বিজ্ঞান বাস্তবকে একটা জাগ্রত সত্তা হিসেবে না দেখে একটি যান্ত্রিক বস্তু হিসেবে দেখে প্রকৃতি ও নারীজগতের ওপর আধিপত্যকে প্রাধান্য দিয়েছে সেটির নতুন করে মূল্যায়ন করতে হবে এবং আমাদের চিন্তাজগতের এই বিশেষ বিকাশে এর প্রতিষ্ঠাতা রেনে দেকার্তে, হব্‌স্‌, নিউটন’এর ব্রিস্টিয় দর্শনের ব্যাখ্যাকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।”

পুনর্জন্মবাদের অস্বীকৃতি, প্রাণী ও ভূজগতের মানবকেন্দ্রিকতা এবং সে জন্য প্রকৃতিকে আপন প্রয়োজনমত ব্যবহারের ঈশ্বরদত্ত অধিকার এই তিনটি ভিত্তি প্রস্তরের ওপর ব্রিস্টিয় ধর্মবিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে।

মানবকেন্দ্রিকতা সম্বন্ধে জেনেসিস (১.২৮) উল্লেখ করা যেতে পারে—“ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি করে সারা পৃথিবী ভরে ফেল। জগৎকে পদানত কর। সমুদ্রের যত মাছ, আকাশের যত পাখি এবং যে সব জীব পৃথিবীপৃষ্ঠে বসবাস করে, সবার ওপর নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত কর।”

বেকন ও দেকার্তে এই মানবকেন্দ্রিয়তাকে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তির ওপর দাঁড় করালেন। এ সম্বন্ধে বেকনের ভাষা বেশ আক্রমণাত্মক। তাঁর মতে—“প্রকৃতিকে শিকারের জন্য যত্র তত্র তাড়া করতে হবে।”^৪ “বন্দী করে দাসেব মত ব্যবহার করতে হবে।” “তাকে বস্ত্র আঁটুনিতে বাঁধতে হবে।” বিজ্ঞানের কাজই হলো “অত্যাচার করে প্রকৃতিব গুণগুণকে গ্রাস করা।”

পুরাকালে মানুষ প্রকৃতিকে যে ভাবে প্রতিপালক মা হিসেবে কল্পনা করতে অভ্যস্ত ছিল বেকনের দর্শন অনুযায়ী তার রূপ আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে লাগল। এ ভাবে যে বিবর্তনের সূত্রপাত ঘটল, দেকার্তের আমলে সেটির পুরো রূপ প্রকাশ পেল। দেকার্তের মতে পৃথিবী একটা যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এর কোন অভীষ্ট লক্ষ্য, জীবন বা আধ্যাত্মিকতা নেই। প্রকৃতি কতকগুলি যান্ত্রিক নিয়মানুযায়ী জড়বস্তুর অবস্থান ও চলাচলকে বেঁধে দিয়েছে এবং এই নিয়মগুলি দিয়েই সব কিছু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বিশ্বপ্রকৃতিকে একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখার এই কার্তেজিয় দৃষ্টিভঙ্গী মানুষকে প্রকৃতির ব্যবহার ও শোষণ করার বৈজ্ঞানিক যুক্তি জোগায় এবং এটাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের দৃষ্টিভঙ্গীর মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। দেকার্তে ও বেকনের মতের সঙ্গে

৩ Merchant Carolyn (1980) “The Death of Nature.” Harper & Row, New York.

৪ Bacon Francis “De Augmentis Scientiarum” and “Novam Organum.”

মত মিলিয়ে বলেন যে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করে মানুষ “প্রকৃতির প্রভু ও স্বত্বাধিকারী হয়ে যেতে পারে।”*

← পৃথিবী ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক থেকে যন্ত্রভিত্তিক এই প্রত্যয়ের তাবতম্যের প্রগাঢ়তা কতটা সুদূরপ্রসারী সেটা অনুধাবন করতে হলে আমাদের ক্যারোলিন মার্চেটের ভ্রাম্যঙ্গ সাহায্য নিতে হবে।*

“জীবন্ত ও প্রতিপালিকা মা হিসেবে পৃথিবী ও প্রকৃতির ভাবমূর্তি মানুষের ওপর একটা সাংস্কৃতিক সংযমের অনুভূতি সৃষ্টি করে তার কাজকর্মকে কিছুটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে রাখতে সাহায্য করত। কেউ সাধারণত মাকে হত্যা করে না বা তার অন্ত্রাদি খুঁড়তে শুরু করে না বা তার অঙ্গহানি ঘটায় না। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীকে জীবন্ত ও অনুভূতিশীল মনে করা হত, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর ওপর কোন ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকারক কাজকে মানুষের স্বাভাবিক নীতিবোধবিরোধী কাজ হিসেবে মনে করা যেত।”

পাশাপাশি দেকার্তে প্রকৃতিকে দুটি স্বাধীন এবং আলাদা অঞ্চল হিসেবে দেখেছেন : একটি মনের জগৎ অর্থাৎ চিন্তাশক্তি বিশিষ্ট অঞ্চল আর অন্যটি বস্তুর জগৎ, অর্থাৎ বর্ষিত অঞ্চল। এ দুটির মধ্যে অবশ্যই তিনি মনকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

দেকার্তের এই তত্ত্বের অর্থ কিন্তু সুদূর প্রসারী। মন ও বস্তুর ভেতবে বিভাজনের ফল হিসেবে মানুষের মস্তিষ্ক ও হাত পা ইত্যাদি প্রত্যঙ্গের তারতম্য ও মনকে উঁচুতে স্থান দেওয়ায় শিল্প ক্ষেত্রে কায়িক পরিশ্রমের তুলনায় মস্তিষ্ককে বেশি মূল্য দেওয়া হলো এবং শ্রমিক ও ম্যানেজমেন্টের বিভাজন ঘটানো হলো।

প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্যের পাশাপাশি পৃথিবীকে একটি প্রাণহীন যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করা—এই দুই মিলিয়ে যে যন্ত্রবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটল সেটির উদ্দেশ্য হলো নিয়ন্ত্রণ, যন্ত্রনির্ভর বিপুল উৎপাদন, সীমাহীন ক্রমোন্নতির স্বপ্নদর্শক কেন্দ্রীভূত ম্যানেজমেন্ট।

← পাশাপাশি প্রায় একই সময়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সোশাল ডারউইনিস্টদের আবির্ভাব ও বিকাশ। এদের বিশ্বাস “সংসারে সফলতমরাই বাঁচবে।” এই তত্ত্বের ফলে সমাজে সকলেরই বাঁচবার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যেতে হবে। এদের প্রভাবে প্রতিযোগিতাই অর্থনীতির চালিকাশক্তি এবং আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বাণিজ্যজগতের আদর্শ হয়ে দাঁড়াল।

এ সর্বের ফলে শিল্প বিপ্লবের পব বাণিজ্য সংস্থাগুলির কার্যপদ্ধতিই দাঁড়াল নিজেদের সমস্ত সঙ্গতি ব্যবহার করে আক্রমণাত্মক প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে নিজেদের বাড়িয়ে তোলা। ফলে শ্রমিক ও ম্যানেজমেন্টের পক্ষে ব্যক্তিগত পরিচয় ভুলে গিয়ে কোম্পানির পরিচয়কে নিজের বলে মনে নেওয়া আবশ্যিক হয়ে উঠল।

* cited in Sorokin Pitirim (1937-41) “Social and Cultural Dynamics.” op cit.

৬ cited in Kuhn Thomas S (1978) “The Structure of Scientific Revolution.” University of Chicago Press, Chicago.

দেকার্তের দর্শনকে নিউটন নানাভাবে গণিতনির্ভর রূপ দিলেন। বিশেষ করে তাঁর গতিসংক্রান্ত আইনগুলি বাণিজ্য সংস্থাগুলির জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য পথ প্রদর্শক হয়ে উঠল। নিউটনের সূত্র—দুটি গতিশীল জড়পদার্থের পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগলে, অপেক্ষাকৃত কম ভরসম্পন্ন পদার্থটি বেশি দূবে সরে যাবে—বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে যত দ্রুত সম্ভব ভর সঞ্চয়ে অনুপ্রাণিত কবল। এক কথায়, যে নতুন মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত করল তার নাম গ্রোথ এথিক বা নিজেদের বাড়িয়ে তোলার নীতি। তার জন্য অনুসৃত পদ্ধতিগুলির মধ্যে বাণিজ্য মারফৎ আপন সংস্থার ভর বৃদ্ধিই ছিল না—মাৎস্যন্যায় অবলম্বন করে ছোট বড় প্রতিযোগী অপ্রতিযোগী শিল্প বাণিজ্য সংস্থাকে আত্মসাৎও ছিল।

পশ্চিমের শিল্পবাণিজ্যের জীবনদর্শনের ওপর বোধহয় সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল হব্‌সের তত্ত্ব।^১ হব্‌সের তত্ত্বকে সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়—

“যদি দুজন মানুষ এমন একটি জিনিষ যাচঞা করে যেটা দুটুকরো করা যায় না এবং দুজনকেই একসঙ্গে ভোগ করতে দেওয়া যায় না, তাহলে তারা দুজন পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠবে এবং একে অপরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। এ ভাবেই পরস্পরের সম্বন্ধে ভীতি সঞ্চারিত হয়। যদি একজন একটি গাছ লাগায়, জমি চাষ করে কি একটি পছন্দসই জায়গা দখল করে, অপবজন তাকে আক্রমণের চেষ্টা করবে, শুধু তার অর্জিত সম্পত্তি নিয়ে নেওয়ার জন্যই নয়, তার স্বাধীনতা, এমন কি তার জীবন পর্যন্ত হরণ করে নেওয়ার জন্যও। দুজনের যে ভিতবে সে কিন্তু সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকবে, কখন সে নিজে আক্রান্ত হয়। সহজভাবে বলতে গেলে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর এবং পরস্পরের শত্রু, সবসময়ে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লিপ্ত। সব সময়ে ভীতি সঙ্কল্প।”

শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কাঁচামাল ও বাজারের সন্ধানে দেশে দেশে তারা তাদের প্রলোভনের হাত বাড়াতে শুরু করল এবং নিজ নিজ দেশের সরকার প্রত্যক্ষভাবে তাদের সহায়তা করতে লাগল। এ ভাবেই দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা ও এশিয়াতে পশ্চিমী দেশগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের সূত্রপাত। এই উপনিবেশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে রোডেশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সিসিল রোড্‌সের একটি উক্তিই ভাল ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।^২

“আমাদের এমন সব দেশ খুঁজে বার করতে হবে যেখান থেকে আমরা সহজেই কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারি এবং সে জন্য সেই সব উপনিবেশে সহজেই সম্ভায় পাওয়া যায় এমন মজুব ব্যবহার করতে পারি। পাশাপাশি আমাদের শিল্প সংস্থাগুলিতে উৎপন্ন বেসামি, যা ঘরের বাজারে বিক্রি হবে না সহজেই এই উপনিবেশগুলিতে জোর করে বিক্রির ব্যবস্থা কবতে পারি।”

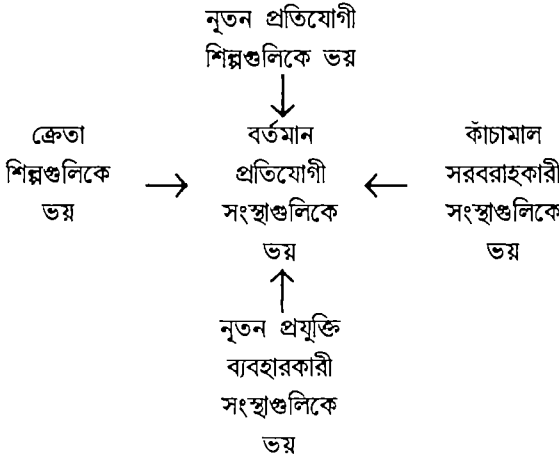
১ Hobbes Thomas “Leviathan”. Collier Books, New York, 1962

২ Cited in Dumant Rand Cohen N “The Growth of Hunger” Marion Boyes. London, 1950

ইতিহাসের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি। আগে যেখানে পদ্ধতিটি ছিল সামরিক, এখন সেটা অর্থনৈতিক। তার অস্ত্র বিশ্বব্যাঙ্ক ; আই, এম, এফ, এবং ডব্লিউ. টি, ও ; আন্তর্জাতিক পেটেন্ট আইন ; আর পদাতিক বাহিনী বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থাগুলি।

বাণিজ্যসংস্থার বর্তমান কৌশলের একটি মডেল

এখনকার বাণিজ্য সংস্থার মানসিকতা ও কৌশল হার্ভার্ডের মাইকেল পোর্টারের কমপিটিটিভ স্ট্রাটেজি সংক্রান্ত একটি মডেলে খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।*



সংস্থাটিকে পাঁচটি প্রত্যক্ষ সূত্রের ভীতির সম্মুখীন হয়ে চলতে হয়—

* যে সমস্ত প্রতিযোগী নূতন সংস্থা এই শিল্পে প্রবেশ করতে চায় সীমিত বাজারে তারা এলে প্রতিযোগিতায় তীব্রতা বেড়ে যাবে।

* এখনকার ক্রেতা শিল্পগুলির থেকে—

ক) অবস্থার ওপব নির্ভর করে ক্রেতা সংস্থাটি কেনার জন্য নূতন শর্ত আবেদন করতে পারে।

খ) শিল্প ক্ষেত্রটি আকর্ষণীয় মনে করলে ক্রেতা সংস্থাটি নিজেই শিল্পসম্ভাব তৈরি করতে শুরু করতে পারে।

কাঁচা মাল সরবরাহকারী সংস্থাগুলির থেকে—

ক) কোন কোন অবস্থায় সরবরাহকারী সংস্থাটি সরবরাহের জন্য প্রতিকূল শর্ত আরোপ করতে পারে।

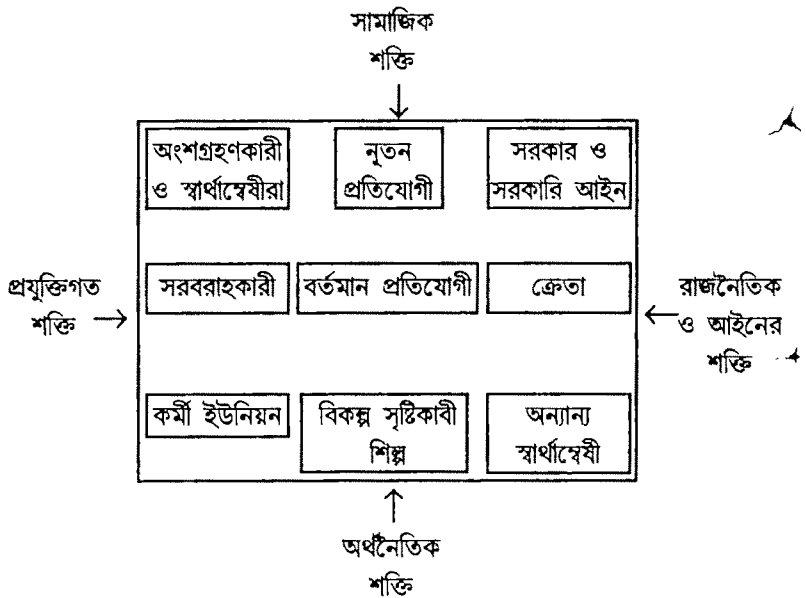
খ) শিল্পক্ষেত্রটি আকর্ষণীয় মনে করলে সরবরাহকারী সংস্থাটি নিজেই শিল্প সম্ভারটি তৈরি করতে শুরু করতে পারে।

- * নূতন প্রযুক্তিকৃত বিকল্প শিল্পসম্ভার থেকে—
কেন না বিকল্প সম্ভারটি প্রযুক্তির দিক থেকে, গুণে, ব্যবহারের সুবিধায় বা দামে সংস্থাটির শিল্পসম্ভারের থেকে আকর্ষণীয় হতে পারে।
- * বর্তমান প্রতিযোগী সংস্থাগুলির থেকে—কেন না সেখানে সবাই একটি সীমিত বাজারের অংশ নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে।

সংস্থাটির কৌশলই তাই এই ভয়গুলির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে লড়াই করা। সেখানে প্রায়ই নীতিবোধের কোন মূল্য থাকে না।

আরও বিস্তারিতভাবে দেখতে গেলে যে প্রতিযোগিতার পরিবেশে সংস্থাটিকে কাজ করতে হয়, সেটি আবণ্ড ব্যাপক। নিচের ছবিটিতে তাব একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।^{১০}

—শিল্পের প্রতিযোগিতাভিত্তিক পরিবেশ—



আগেই উল্লেখ করা পাঁচটি প্রত্যক্ষ ভীতি ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত ভীতি ও স্বার্থের আবহাওয়ার মধ্যে সংস্থাটিকে কাজ করতে হয় তাদের উল্লেখ নিচে করা হলো—

- * সামাজিক পরিবেশ—সেটা অনুকূল হতে পারে। উভয়বল হতে পারে। প্রতিকূল হতে পারে।

- * যে প্রযুক্তি পরিবেশে সংস্থাটি কাজ করছে তার পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি।
- * যে অর্থনৈতিক পরিবেশে সংস্থাটি কাজ করছে সেটি এবং তৎক্ষণাত আর্থিক অবস্থা সংস্থাটির ফলাফলের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে।
- * রাজনৈতিক ও আইনের পরিবেশ সংস্থাটির কার্যকারিতা ও ফলাফলকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারে।
- * অংশগ্রহণকারী ও স্বার্থাশ্রেণীরা—এদের মধ্যে আছেন শেয়ার ক্রেতারা, আর্থিক সংস্থা, ম্যানেজমেন্ট ও অন্যান্য কর্মচারী।
- * শ্রমিক ইউনিয়ন।
- * সরকার ও সরকারি আইন—সেগুলি অনুকূল হতে পারে, উভয়বল হতে পারে, প্রতিকূল হতে পারে।
- * অন্যান্য স্বার্থাশ্রেণীর সমষ্টি—এদের মধ্যে আছে স্থানীয় লোকজন, মিউনিসিপালিটি অথবা ঐ জাতীয় স্থানীয় সংস্থা।

এদের কয়েকটির সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা করার হয়তো প্রয়োজন আছে।

একজন প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যদি নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হয় তাহলে আক্রমণাত্মক ; যদি প্রতিপক্ষকে বেশি শক্তিশালী মনে হয় তাহলে আত্মরক্ষাত্মক ; আবার অনেকসময় ভিন্নমুখকারি (ডিফ্লেক্টিভ) যেমন সরকার ও সরকারি আইনের ক্ষেত্রে সংস্থাগুলির চেষ্টা হয়—

- * নিজেদের কার্যপদ্ধতি ঠিক ততটুকুই পরিবর্তন করা যাতে সরকার বা সরকারি আইনের ন্যূনতম শর্ত প্রত্যক্ষভাবে লঙ্ঘন না করা হয়।
- * এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সরকারের ওপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করা যাতে সংস্থাটি বা শিল্পটির অনুকূলে আইনগুলি পরিবর্তিত করা যায়।

শিল্প বা সংস্থার অনুকূল ট্যাক্সের আইন, শ্রম আইন ইত্যাদি পরিবর্তনের জন্য এ ধরনের প্রভাব বিস্তারেই এই পদ্ধতিব উদাহরণ পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞাপনের তথাকথিত উদ্দেশ্য শিল্প সম্ভারটির সম্বন্ধে সম্ভাব্য গ্রাহকদের অবহিত করা। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে গোপন প্ররোচক হিসেবে অহেতুক চাহিদা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা হয়। কোন সম্ভার বাজারে সার্থকভাবে চালু করার উপায় হলো প্রথমে এর বিজ্ঞাপন এমনভাবে দেওয়া যাতে সম্ভাব্য গ্রাহকদের অহং'এ সুরসুরি লাগে এবং এটি কেনার ব্যাপারে উপযুক্ত মানসিকতার সৃষ্টি হয়। এরপর তার মনে জিনিষটিকে প্রয়োজনীয় ও পরিশেষে অপরিহার্য জিনিষ হিসেবে চিহ্নিত করা। জিনিষটি যদি সম্ভাব্য গ্রাহকের আর্থিক সাধ্যের বাইরে হয়, তাহলে কিস্তিতে দাম পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা—এবং কিস্তিকে আকর্ষণীয় করার জন্য সুদের হার এমনকি শূন্য পর্যন্ত নামিয়ে আনা।

পদ্ধতিটিকে আরও সূচারুভাবে চালাবার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য সংস্থাগুলি ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে ট্রাঙ্কজিক অ্যালায়ান্স মারফৎ ক্রেডিট কার্ড প্রথা চালু করেছে। গাড়ি, রেফ্রিজারেটর,

ওয়াশিং মেশিন, টেলিভিশন, মাইক্রোওয়েভ উনুন ইত্যাদি বাণিজ্য সত্তার ক্ষেত্রের কথা চিন্তা করলেই এই ব্যাখ্যার সারকথা বোঝা যাবে।

যে কোন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ওপরে উল্লিখিত বিভিন্ন শক্তির উপস্থিতিতে আগেই বলা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ও প্রয়োজন মত সমঝোতা করে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাপৃত থাকে। বলাই বাহুল্য এই উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানটির লাভ বৃদ্ধি।

মাইকেল ফ্রিডম্যানের তত্ত্ব

কিছুদিন আগে ম্যানেজমেন্ট শিক্ষায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ মিশ্রণ নিয়ে কলকাতায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা নিয়ে আমেরিকার অধ্যাপক এণ্ডারলে যে বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন সেটা একটু আলোচনা করা সমীচীন হবে।^{১১}

এণ্ডারলের মতে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নৈতিক চরিত্র এবং তার ম্যানেজমেন্টের নীতিবোধ তিনটি মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়—

- ক) সংস্থাটির উদ্দেশ্য ও পরিচয়
- খ) সংস্থার কর্মীদের ভূমিকা
- গ) বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক।

একটু বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করছি।

উদ্দেশ্য ও পরিচয় কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হ্যাণ্ডির উল্লেখ করতে হয়।^{১২}

“উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান আমার কাছে সর্বত্র বিরাজমান বলে মনে হয়। বিশ্বায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বহু বহুজাতিক সংস্থাগুলির অবশ্যই উদ্দেশ্য আছে। বিভিন্ন ধরনের সংস্থা এই বিশ্বায়ন পদ্ধতিতে জড়িয়ে আছে এবং তাদের কার্যকলাপ, প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে। সে অবস্থায় কী করে এই সব বাণিজ্যসংস্থার উদ্দেশ্যের প্রশ্নটা পরিহার করা সম্ভব?”

দ্বিতীয় প্রশ্নটি বেয়াল করলে দেখা যাবে বাণিজ্যসংস্থা মাত্রই জনতা নিয়ে কাজ করে এবং তাদের নানাভাবে আকৃষ্ট বা প্রভাবান্বিত করে। প্রতিষ্ঠানের লোকদের বলা হয় “রিসোর্স বা সঙ্গতি”, “আর্সেট বা মণিসম্পদ” “ষ্টকহোল্ডার বা ঝুঁকির অংশগ্রহণকারী,” এবং এ ধরনের অন্যান্য কোন ভাবে তাদের চরিত্র বর্ণনা করা হয়। এক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের নীতিবোধের মূল্যায়ন হবে প্রতিষ্ঠানের লোকদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করা হয় সেটির পর্যালোচনা করে। সেই ব্যবহার একান্তই যান্ত্রিক হতে পারে। অর্থাৎ একান্তই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের একটি যন্ত্র হিসেবে, প্রয়োজন হলে তাদের

^{১১} Enderle Georges. “Management Ethos in the West What can it offer to the East ?” A plenary paper at the conference on “Blending the Best of the East and the West in Management Education” Calcutta, 2001.

^{১২} Handy C. “The Hungry Spirit : Beyond Capitalism A Quest for purpose in the Modern World” Broadway Books, New York, 1998

নিজস্ব উদ্দেশ্য ও সম্মানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। অথবা এমনভাবে যে তাদের কুশলতা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ব্যবহার করে কিন্তু সেখানেই থেমে না থেকে মানুষ এবং ব্যক্তি হিসেবে তাদের সম্মান জানাবার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। মনে হয়, এই তারতম্য ম্যানেজমেন্টের নীতিবোধ বিচারের জন্য অবশ্য প্রয়োজন।

ম্যানেজমেন্টের নীতিবোধ ব্যাখ্যা ও বিচারে তৃতীয় যে প্রশ্নটি মূল্যবান সেটি হলো, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে বাস্তবকে দেখে, ব্যাখ্যা করে এবং সৃষ্টি কবে—সেটা প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস ও পরিচয়ের ক্ষেত্রেই হোক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক কার্যকারিতার ক্ষেত্রেই হোক, প্রতিষ্ঠান কর্মীদের আচরণ এবং ব্যবহার পদ্ধতির মধ্যেই হোক, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন বাজার সৃষ্টি, আইনানুগ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা, বাধানিষেধ, বিভিন্ন ক্রেতাগোষ্ঠী ও অন্যান্য বেসরকারি গোষ্ঠীর প্রত্যাশা ইত্যাদির মধ্যে হোক। ম্যানেজমেন্টের নীতিবোধ এই সব বাস্তবের সম্মুখীন হতে অস্বীকার করতে পারে, বাস্তবকে দমন বা বিকৃত করতে পারে, অথবা খোলাখুলি যোগাযোগ পদ্ধতি অবলম্বন করে একটা সহজ আলোচনার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানটি যদি বাস্তবকে একমাত্র আর্থিক পরিমাপেই বিচার করে, অথবা নিজের মূনাফাকেই এক একমাত্র বিচার কাঠি হিসেবে ভাবে, তাহলে প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবের অনেকগুলি দিকই বিবেচনার থেকে বাদ দেবে, ফলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবহার ও সাফল্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং সে জনাই ম্যানেজমেন্টের নীতিবোধ তাদের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বিবেচনা না করলে বোঝা যায় না। অথচ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময়েই সমাজকে একটা কালো বাস্তব হিসেবে দেখে যেটায় সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমাজের বিভিন্ন দিক—যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজ সাংস্কৃতিক এদের মধ্যে তারতম্য খোঁজা হয় না। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ককে একটা গতানুগতিক ছক ও মাপে ফেলা হয়। সমাজের এই বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সম্পর্কের তারতম্যের যে একটা মূল্যবান প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা খেয়াল করা হয় না। অথচ এই তারতম্য যত অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট হয় ততই সমাজে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা ও দায়িত্ব অস্বুট থেকে যাবে এবং ম্যানেজমেন্টের নীতিবোধ ততই ভাবালু ও ফাঁকা শোনাবে। এই জন্য সমাজ ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিবেচনা ও চিন্তা আরও বাস্তবধর্মী হওয়া দরকার। বিভিন্ন সামাজিক আবহাওয়া ও পরিস্থিতিতে কাজ করে বলে একথা বিশেষ করে সংস্থাগুলির পক্ষে যথেষ্ট প্রযোজ্য।

সাংগঠনিক ও নিয়মানুগ দিক থেকে ম্যানেজমেন্টের নীতিবোধ সম্বন্ধে চিন্তা করলে এক বিচিত্র ছবি ফুটে ওঠে। বাণিজ্য সংস্থাগুলি, সেখানে যারা কাজ করে তাদের ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা না কবে বিনিময়যোগ্য ও প্রতিস্থাপনযোগ্য সম্পত্তি হিসেবে দেখে, যেন তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক কোন মূল্য নেই। এই ধরনের ব্যবহার ও চিন্তাধারাকে অবশ্যই প্রশ্ন করা যেতে পারে—সেটা শুধুমাত্র নৈতিক দিক থেকেই নয়—সাধারণ ধারণার দিক থেকেও বটে। প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাভাবিক নিয়ে যদি বলবার সুযোগ না দেওয়া হয়

তাহলে ম্যানেজমেন্ট কীভাবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং প্রয়োজনের সংঘাত তার নীতিবোধ দিয়ে সামলাবে? এ সম্বন্ধে হ্যাণ্ডির মত খুব সুন্দর ও যুক্তিসঙ্গত। তাঁর কথায়, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের জীবনে একটা অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা করি। বস্তুতঃ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নিজস্ব লক্ষ্য সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে। প্রত্যেক ব্যক্তি বা সমষ্টিরই নিজস্ব সম্ভা আছে যেটা কৃষ্টিগত প্রভাবে গড়ে ওঠে এবং সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে সম্পূর্ণ পরাভূত না হয়ে আপন অধিকারে নিজেকে প্রকাশ করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য সংস্থা সম্বন্ধে মিলটন ফ্রিডম্যানের প্রস্তাবিত মডেলটি পরীক্ষা করা যাক।

এই মডেলে ক্যাপিটালিজম-এর মূল তত্ত্বকে গ্রহণ ও ভিত্তি করে তার একটি কার্যকরী রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। পশ্চিমে উদ্ভূত এই মডেল বিশ্বায়নের সুযোগ নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত এই মডেল সাধারণভাবে সব বহুজাতিক সংস্থার ধ্যান ধারণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি ও কাজের নিয়মাবলির মূল কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্য সংস্থাগুলিও এই মডেলকেই অনুকরণ ও অনুসরণ করছে।

মডেলটি বেশ সহজ ও শক্তিশালী। এতে ম্যানেজারকে একজন এজেন্ট বা অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে গণনা করা হয়। ম্যানেজার তার প্রধান—অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডারদের নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করবে। স্বাভাবিকই প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারই চাইবে তার শেয়ারের মূল্য বাড়াতে। যদি ম্যানেজার তার বিচারবুদ্ধির অধিকার প্রয়োগ করে অন্য কোন উদ্দেশ্য পূরণে ব্রতী হয়—যেমন কোন “সামাজিক” উদ্দেশ্য তাহলে সে তার পেশাগত কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটাবে। এই নীতি অনুযায়ী দক্ষতার সঙ্গে শেয়ার হোল্ডারের শেয়ারের মূল্য বাড়াবার জন্য যে কোন কার্যপদ্ধতি অবলম্বন, যে কোন সঙ্গতি বা সংস্থানের ব্যবহার যে কোন কর্মকুশলতা অবলম্বন করা যেতে পারে। ম্যানেজারের কর্তব্য এভাবে খুব পরিষ্কারভাবে বলার পর এই সর্বব্যাপ্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন জিনিষের ব্যবহারই অনুমোদিত। শুধুমাত্র বস্তুগত সংস্থানই নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধও। আরও বড় কথা, নীতিবোধের প্রসঙ্গটি একেবারেই অনুচ্চারিত।

একটু বিচার করলেই দেখা যাবে, এন্ডারলে প্রস্তাবিত তিনটি বিচারের মাপকাঠিতে এই মডেল একেবারেই ব্যর্থ। যেমন—বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচার করলে দেখা যাবে সংস্থাটিকে কল্পনা করা হয়েছে আইনি দায়িত্ব পূরণ করার জন্য একটি আইনি সংগঠন—সামাজিক দায়িত্বপালনের জন্য গঠিত নীতিবোধসম্পন্ন একটি সামাজিক বা অর্থনৈতিক সংগঠন হিসেবে নয়। ফলে এর ম্যানেজমেন্টের নীতিবোধ করপোরেশনটিকে একটি সামাজিক সংগঠন হিসেবে দেখতে অপারগ। ম্যানেজমেন্টের কর্তব্য এখানে একমাত্র টাকা করা এবং সেজন্য সবকিছু সঙ্গতিই ব্যবহার করতে হবে। ফলে মানুষের সঙ্গে ব্যবহারও যাত্রিণ এবং “বাস্তবের” সঙ্গে সম্পর্ক এই সর্বগ্রাসী উদ্দেশ্যকেই অনুসরণ

করবে। বহু দেশের বহু বাণিজ্যিক সংস্থার ক্ষেত্রেই পুনর্গঠন, অধিগ্রহণ, অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদিতেই দেখা যাবে, একমাত্র লাভের প্রতি কেন্দ্রীভূত দৃষ্টি শুধুমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। অতি সম্প্রতি এনরন ও আমাদের দেশে ইউ, এস,—৬৪ ই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এ ছাড়া, মডেলটিতে “সমাজ” সম্বন্ধে যে ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে, সেটা একান্তই অবাস্তব। এখানে মানুষের কাজকে দুটি মূল ভাগে ভাগ করা হয়েছে—“বাণিজ্য” ও “রাজনীতি”। সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এই দিকগুলির সম্পর্ক কিছুই বিবেচনা করা হয় নি। এ ছাড়া আরও বলা হয়েছে যে বাণিজ্য ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেখতে হবে। বাণিজ্যিক ক্রেতাদের কাছে এটা খুব আকর্ষণীয় প্রস্তাব হলেও এ দুটিকে সম্পূর্ণ আলাদা করা একেবারেই অসম্ভব। কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে এদের দুজনের যৌথ দায়। ট্যাক্স নীতি, অতিরিক্ত কর্মের সূচনা, অথবা কর্মীদের সংখ্যা কমানো, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটানো—এ সবই উদাহরণ মাত্র।

আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রের আলোচনা করলে মডেলে উল্লেখ নেই যেমন, ব্যবসার কোন কর্মকর্তার কথা বিবেচনা করার সময় তার পেশাগত উৎকর্ষতার দিকটাই বিবেচনা করা হয়। নিজস্ব মতামতবিশিষ্ট একজন বেসরকারি ব্যক্তি হিসেবে তাকে ভাবাই যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির এই অপরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব ও কাজে জড়িত অন্যান্য লোকদের সম্বন্ধেও খাটে। মোট কথা মডেলটি সংস্থার ও সংস্থার কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত মানুষদের দৃষ্ট, এবং এই সব চরিত্রের পেছনকার সত্যকে নিজের গন্তীতে আবদ্ধ করতে অপারগ এবং এই অপারগতা ম্যানেজমেন্টের নীতিবোধের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে।

এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে লাভস্পৃহাসর্বশ্র, প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তি আজকের বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে এক নীতিহীনতার দিকে এগিয়ে দিয়েছে এবং এই দিক সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে এক সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। আজকের সমাজের যে নীতিহীন চেহারা, তার মূল সূত্র এখানেই পাওয়া যাবে।

খুব কম কথায় বলা যায়, বাজারত্যাগিত অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থার মূলমন্ত্র লোভ। ব্যবসায়ী লোভ যত সম্ভব মুনাফা করার প্রতি, আর অন্য সবার লোভ জীবনের তথাকথিত মান উন্নয়নের জন্য যাবতীয় বাজারি সামগ্রীর প্রতি। নিজ স্বার্থে ব্যবসায়ীরা দ্বিতীয় লোভকে উসকে দেওয়ার জন্য বিস্তারিত থেকে আরম্ভ করে ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির প্রবর্তন করে চলেছে। উভয়েরই এই লোভ যখন সীমা ছাড়িয়ে যেতে চায়, তখনই নীতিবোধ মূল্যবোধ হয় তার প্রথম শিকার। পৃথিবীব্যাপী আমরা এখন সেই পর্যায়ে পৌঁছে গেছি।

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা পৃথিবীর সব শিল্প বাণিজ্যসংস্থা বিশেষ করে বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্য আমাদের দেশের ছবি ও সমস্যাটা একটু আলাদা। বিশ্বায়ন ও তার ভালমন্দ চিন্তা করার আগে সেগুলি সম্বন্ধে একটু অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সরকারি বেসরকারি নির্বিশেষে শিল্প বাণিজ্য

সংস্থাপনলিতে ছাঁটাইয়ের মরশুম শুরু হয়ে গেছে। এবং সে ছাঁটাই একজন দুজন নয়—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। বাজারে নূতন বিনিয়োগের ফলে অনেক নূতন কর্মসংস্থান হচ্ছে এমন একটা ছবি উপস্থিত করা বোঝা প্রায়শই করা হয়। কিন্তু ছাঁটাই ও নূতন কর্মসংস্থানের যোগ বিনিয়োগের নিট ফল কী তা কখনও প্রকাশ করা হচ্ছে না। অনুমান করা অনায়াস নয় যে এই নিট ফল কর্মসংস্থানের অভাবে দিকেই ঝুঁকছে।

স্মরণ রাখতে হবে যে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বেকার ভাতা, ইনসিওরেন্স ও অন্যান্য পদ্ধতি মারফৎ লোকের চাকরি যাওয়া মানে তার অম্মাভাব নয়, আমাদের দেশে কিন্তু তাই। ছাঁটাইয়ের মোলায়েম রূপ দেওয়ার জন্য গোল্ডেন হ্যাণ্ডশেক বলে একটা কথা খুব চালু হয়েছে অর্থাৎ এককালীন কিছু টাকা হাতে দিয়ে কাজের থেকে বিদায় দেওয়া। এই মন্দার বাজারে সেই টাকা কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করে নিজের জন্য বিকল্প সংস্থান করা হবে এটা নিশ্চয়ই বিশেষ কেউ আশা করে না। সেই টাকা বরঞ্চ বিভিন্ন আর্থিক সংস্থায় জমা রেখে প্রাপ্ত সুদে কিছুটা সুবাহা হবে এই আশা করাটাই বাস্তব। সরকার কিন্তু একদিকে সুদের হার ক্রমশ কমিয়ে অন্যদিকে সরকারি আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ইউনিট ট্রাস্টের টাকা নয়ছয় করতে দিয়ে সে দিক দিয়েও এই বিশ্বায়নের ফলস্বরূপ বেকারদের নূতন করে মানসিক ও আর্থিক আঘাত হানবার ব্যবস্থা করেছে। বস্তুত এই ক্রমবর্ধমান বেকারি সামাজিক অবক্ষয়ের আর একটা দিক, অপরাধ জগতের রমরমা তার জন্য অনেকাংশেই দায়ী একথা বলার অপেক্ষা থাকা উচিত নয়।

এই ব্যাপারে শিল্প বাণিজ্যের নীতিবোধ কতটা দায়ী, সেটা বোধহয় অভিকল্পনাকারীর ব্যবহৃত কথাগুলি দিয়ে বললেই ভাল হবে।^{১০}

“এই বাণিজ্য প্রধার” সম্ভবত নিষ্ঠুরতম দিক এই যে আর পাঁচটা জিনিসের মত শ্রমও এখানে একটি পণ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। এক বস্তা আলু বিক্রি না হলে বিক্রেতার কপালে বড়জোর চিল্লের ভাঁজ পড়ে। কিন্তু একজন শ্রমিক তার চাকরি হারালে পরিবারে নেমে আসে চরম সংকট। এটা শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ও মানসিক সংকটও বটে। এক বস্তা আলুর সঙ্গে একজন মানুষের যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে, এখনকার ব্যবসা বাণিজ্যের জগৎ সেটা মান্য করে না।” ব্যাপারটা সুস্থ নীতিবোধের পরিপন্থী সন্দেহ নেই।

গোল্ডেন হ্যাণ্ডশেক পদ্ধতি ব্যবহার করে বরখাস্তের আঘাতটাকে কিছুটা মোলায়েম করার প্রচেষ্টার কথা আগেই বলেছি। মোলায়েম নয়, বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা—যার একটি উদাহরণ দিলে বোধ হয় অনায়াস হবে না। সম্প্রতি বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান বিশেষত উন্নতমনস্কের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শেয়ারড্‌ ভ্যালু বলে একটি তত্ত্ব খুব চালু হয়েছে। তত্ত্বটির অস্তিত্বহীন অর্থ—প্রতিষ্ঠানটি চালাবার মধ্য দিয়ে যে মূল্যবান সম্পদের সৃষ্টি হবে, সেটা মালিক আর শ্রমিকবা বন্টন করে নেবে।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বটিকে নিষ্ঠুরতার সামিল বলে মনে হয়। প্রতিষ্ঠানের সুদিনে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় সেটি পুরোপুরি মালিকরাই নিয়ে নেয়। (মিলটন

১৩ অভিন্নরূপ সরকার, “বাজার অর্থনীতিতে ঝুঁকি বাড়বেই যেমন এদেশে বাড়ছে,” আনন্দবাজার পত্রিকা—১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০০২।

ফ্রিডম্যানের মডেল থেকেই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের এই দর্শন পরিস্ফুট। সুদিন না থাকলে সম্পদের মূল্য হ্রাসের পুরো দায়টাই বহন করতে হয় শ্রমিকদের ছাঁটাই মারফৎ জীবিকার

৮. বিনিময়ে।

বিশ্বায়নের যুগে ম্যানেজমেন্টের বিশেষ দিকগুলির মধ্যে মানব সম্পদ ম্যানেজমেন্ট বা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট উত্তরোত্তর প্রাধান্য পাচ্ছে। এই দিকে যারা বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে চান শেয়ার ভ্যালু তত্ত্ব তাদের কার্যক্ষেত্রে ব্যবহারের যন্ত্রগুলির অন্যতম। কিছুদিন আগে প্রগতিশীল মালিকরা মানবসম্পদ ম্যানেজমেন্টের বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীদের কোন বিশেষ গুণটির ওপর বেশি মূল্য আরোপ করেন সে সম্বন্ধে একটি নিরীক্ষা করা হয়েছিল। উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জনই সুষ্ঠুভাবে ভি, আর, এস (ভলান্টারি রিটায়াবমেন্ট স্কিম) চালু করার ক্ষমতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।^{১৪} কাগজে আমরা প্রায়ই দেখি দুটি প্রতিষ্ঠানের মিলে যাওয়ার বা merger-এর খবর। এর যুক্তি হিসেবে খুব কম সময়েই মুনাফা বাড়ানো, কর্মকৃশলতা বাড়ানোর উল্লেখ থাকে—সব সময়েই উল্লেখ থাকে ফলে কর্মী সংখ্যা কতজন কমবে। শেয়ারড ভ্যালু তত্ত্বের অসারতার আব বোধ হয় যুক্তির প্রয়োজন নেই।

বিশ্বায়ন বাজারতড়িত অর্থনীতির প্রকৃষ্টতম অবস্থা। মানুষের নিকৃষ্টতম রিপুবোধ হলো লোভ। বাজারতড়িত অর্থনীতিতে বাণিজ্য সংস্থার মালিকদের লোভ লাভ বাড়ানোর দিকে আর অন্যান্য সবাব লোভ বৈষয়িক সম্পদ ও জিনিষপত্র ভোগের দিকে। নিজ স্বার্থেই মালিকদের কাজ এই ভোগসম্পৃহাকে বাড়িয়ে দেওয়া। তার জন্য বিজ্ঞাপনকে ব্যবহার, সীমিত আয়েব মধ্যে ভোগসম্পৃহা পুরোপুরি পূরণ করা যায় না বলে ক্রেডিট কার্ডের প্রবর্তন ইত্যাদি। বেকাবি, ধনী দরিদ্রের আয় ও জীবনের মানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফালাক এই সব কিছুই মধ্য দিয়ে অপসূয়মান নৈতিক মূল্যবোধ এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক বিকৃতি, কলুষতা, ঘৃষ, অপরাধ ইত্যাদি। বিশ্বায়নের এই ফল দিন দিন বেড়েই ৯. যাবে। মালিকদের এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণই ম্যানেজমেন্টের কাজ। তাদের আদর্শহীনতা তাই ক্রমবর্ধমান হবে। এবার জাপানি প্রথায় যাওয়া যাক।

জাপানি ম্যানেজমেন্ট তত্ত্ব ও তার বিবর্তন

জাপানি ম্যানেজমেন্ট তত্ত্ব অনুধাবন কবতে হলে কয়েকশো বছরের জাপানি ইতিহাস একটু পর্যালোচনা কবতে হবে। টোকুগাওয়া পোগানেট যুগের স্বপ্নময় বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ১৮৬৮ এ মেইজি যুগে যখন জাপান পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করল, তখন জাপানের শিল্প বাণিজ্য একটা মূল দর্শনকেই অবলম্বন কবে—“ওয়া কান ইয়োহু সাই” অর্থাৎ পশ্চিমি শিল্প বিজ্ঞানের সঙ্গে জাপানি দৃষ্টিভঙ্গির মিলন। এর থেকেই “উচ্চি” (আমরা) আর “সোটো” (ওরা) চিন্তার উৎপত্তি। আমরা বলতে জাপান আর ওরা বলতে বাকি পৃথিবী। এই পরিবারতত্ত্বের থেকেই জাপানি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের

এক একটি পরিবার বলে ভাবতে শুরু করে। ফলস্বরূপ সারা জীবনের জন্য চাকুরি, সম্মতি সম্ভূত সিদ্ধান্ত, প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকেই উচ্চতর পদে উন্নয়ন, TQM, কোয়ালিটি সার্কেল ইত্যাদি জাপানি ম্যানেজমেন্ট দর্শনের অঙ্গ হিসেবে গড়ে ওঠে। *

এই দর্শন মাৎসুমিটার মূল্যবোধ ব্যাখ্যার ভেতর দিয়ে ট্যানার, প্যাস্কাল ও অ্যাথোস বেশ স্বাচ্ছন্দ্যভাবে প্রকাশ করেছেন।^{১৫} ৷

মাৎসুমিটার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের মূল সূত্রগুলি দেখা যাক—

- ১। শিল্পের মারফৎ জাতির সেবা।
- ২। ন্যায়বিচারশীলতা।
- ৩। সমন্বয় ও সহযোগিতা।
- ৪। উন্নতাবস্থার জন্য চেষ্টা।
- ৫। সৌজন্যবোধ ও নম্রতা।
- ৬। বিন্যাস ও অঙ্গীভূত হওয়া।
- ৭। কৃতজ্ঞতাবোধ।

মাৎসুমিটা প্রতিষ্ঠানের একজন ডিরেক্টরের ভাষায় বলতে হয়, মাৎসুমিটা দর্শন আমাদের জাপানি স্বাতন্ত্র্যবোধ বিস্মৃমাত্র না কমিয়ে পশ্চিমি উৎকর্ষতার সঙ্গে পাল্লা দিতে সমর্থ করেছে। মাৎসুমিটার দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বোধহয় পশ্চিমি জাতীয়তাবোধের সঙ্গে পূর্বের আধ্যাত্মিকবোধের সমন্বয় ঘটানো। প্যাস্কাল ও অ্যাথোস আবার লিখছেন, পশ্চিমি ও জাপানি ম্যানেজমেন্টের মূল পার্থক্য এই যে জাপানিরা যেখানে, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সামাজিক আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে ব্যবহার করতে অনেক বেশি পাবঙ্গম, পশ্চিমিরা সেখানে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছ গঠন এবং সংগঠন পরিচালনার নিয়ম কানূনের ওপর নির্ভর করেছে।

আউটি তাব “থিয়োরি জি” বইটিতে আমেরিকান ও জাপানি ম্যানেজমেন্টের মূল তারতম্যগুলি এভাবে দেখিয়েছেন—

জাপানি প্রতিষ্ঠান	আমেরিকান প্রতিষ্ঠান
সারাজীবনের জন্য চাকুরি	অল্প সময়ের জন্য চাকুরি
স্বল্পগতিতে কার্যকারিতার বিচাব ও উচ্চতর পদে উন্নয়ন	দ্রুতগতিতে কার্যকারিতার বিচাব ও উচ্চতর পদে উন্নয়ন
চাকুরি জীবনে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ওপর কম জোর	চাকুরিজীবনে বিশেষজ্ঞ হওয়াব ওপর জোর
অন্তর্নিহিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	স্পষ্টভাষিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
সমবেত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা	ঐকিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা
সমবেত দায়িত্ব	ঐকিক দায়িত্ব
সামগ্রিক উদ্বেগ	আংশিক উদ্বেগ

এছাড়াও আউটির মতে কতকগুলি সমাজ-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জাপানের সাফল্য সহায়ক হয়েছে। এদের মধ্যে আছে—

* পারস্পরিক বিশ্বাস

* নিগূঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

জাপানে ম্যানেজার-শ্রমিক সম্পর্কটা সামন্ততান্ত্রিক উঁচু-নিচু সম্পর্ক নয়। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানগত পদাধিকারের ওপরই একমাত্র সেটা নির্ভরশীল না। জাপানি শিল্পনেতাকে তাদের শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে ভাল করে চেনে এবং উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত জায়গায় বসাবার ব্যবস্থা করে, আমলাতান্ত্রিক বা পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে নয়।

* জাপানের সামাজিক জীবনে অন্তরঙ্গতা। ফলে ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে জাপানি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রেও সত্যিকারের পারস্পরিক যত্ন ও সহায়তার মনোভাব আনতে পেরেছে। আউটির মতে একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে, আমেরিকার শতকরা ৪০ জন তাদের প্রতিবেশীদের চেনেন না—তাদের সম্বন্ধে উদাসীন। জাপানে কিন্তু ঠিক উল্টো।

* অনুগত জাপানি শ্রমিকরা একদিনের জন্য হরতাল করলেও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যবোধে তারা সেদিনের না হওয়া কাজ অন্যদিন অতিরিক্ত কাজ করে পুষিয়ে দেয়।

পিটার ড্রাকার^{১৬} জাপানি প্রতিষ্ঠান তেঁসিবার কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন “জাপানিরা স্বীকার করে যে তাদের শিল্পনেতাদের ওপর দুটি দাবি সব সময়ে কাজ করে। প্রথমত প্রতিষ্ঠানগত পদ কোন বিশেষ অধিকার দেয় না। দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত সততার মূল্য।

জাপানের অর্থপতনের সূচনা ও সম্ভাব্য কারণ

- নিউজ উইক পত্রিকা^{১৭} জাপান সম্বন্ধে একটি মূল প্রবন্ধে লিখেছে, “১৯৮০র যুগে জাপানকে মনে হতো একটি অতি বলবান আর্থিক শক্তি যাকে থামানো অসাধ্য। ১৯৯০র যুগে সেই শক্তি যেন কমে গেছে—তার আর্থিক অবস্থায় পশ্চাদপসরণের হাওয়া, তার শেয়ার বাজারের একান্ত দুরবস্থা তার যন্ত্রকুশলতাও পিছু হঠছে।”

এই পশ্চাদপসরণের কারণ অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে।

“এটি একটি সাহায্যের ডাক” নামে একটি অনুসন্ধানের পর নিহন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুটোমু উমেজাওয়া লিখেছেন^{১৮}—

“যুদ্ধোত্তর জাপানের শিল্প বাণিজ্যিক উন্নতিতে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারেরও ক্ষতি করে সবচেয়ে বেশি আত্মনিয়োগ করেছে সেই ৪০ থেকে ৫০ বছরের জাপানিরাই সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণা ভোগ করছে। অনেকেই গত কয়েক বছরে টোকিওতে

১৬ Drucker Peter “Managing for the Future.”

১৭ Newsweek “The System has crashed”. December 13, 1993.

১৮ Readers’ Digest—January 1987

গড়িয়ে ওঠা মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ভীড় জমাচ্ছে। ৩৫ থেকে ৫৯ বছর বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা ১৯৭৫ এ ৪৪২৯ থেকে ১৯৮৪ এ ৮৯৫১ এ এসে দাঁড়িয়েছে।”

জাপানের প্রোডাক্টিভিটি সেন্টারের মানসিক স্বাস্থ্যের আর এণ্ড ডি সেন্টারের ডিরেক্টর হিবোয়া কুবোটা লিখছেন^{১৯}

“অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টার ধাপ পেরিয়ে যাওয়ার পর জাপানি শ্রমিকরা এখন একরকম উদ্দেশ্যহীনতায় ভুগছে।” তিনি আরও লিখছেন, “অনেক স্ত্রীরাই ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত স্কুলে দেওয়ার জন্য বাড়িতে থেকে গেছে। ফলে আনুমানিক ১,৪০,০০০ জন স্বামী নিজেদের পরিবারের থেকে আলাদা থেকেছে। এরা যখন নিজেদের পবিবারে ফিরে যায় ক্রমশ বৃহত্তর সংখ্যক স্ত্রীরা এদের উপদ্রব বলে মনে করে। ক্রমশ বৃহত্তর সংখ্যার স্ত্রীরা স্বামীর অবসর প্রাপ্তির টাকা পাওয়ার পরই বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে নিচ্ছে।”

ক্রমবর্ধমান অল্পবয়সি জাপানিরাই মনে করছে এক জীবনে সুখ পেতে হলে তাদের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির মুনাকাধর্মী বন্ধু আটুনির থেকে বেরিয়ে এসে অন্যতর জীবনের পথ খুঁজে নিতে হবে। জাপানের একটি বিখ্যাত ব্যাঙ্কে ১১ বছর দিনে ১৪ ঘণ্টা কাজ করার পর হারমো লিখছেন^{২০}

“জাপানি ম্যানেজমেন্ট প্রত্যেক কর্মচারির নিজস্বতাকে লোপ করতে বাধ্য করে এবং প্রত্যেককে ম্যানেজমেন্টের কল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীতে পরিণত করে। তাঁর মতে, “ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সাদা কলারের পিয়নে পরিণত করা হয় এবং কোম্পানির পশুসম্পত্তির অঙ্গীভূত করা হয়।” বস্তুত এই পশুসম্পত্তি কথিত শ্রমিকরা সারা জীবনের কর্মক্ষম সময়টা প্রতিষ্ঠানের পেছনে ব্যয় করে যেভাবে প্রতিষ্ঠানের রোবোটে পরিণত হয় সেটাকে বর্ণনা করার জন্য জাপানি প্রচার মাধ্যমের সাম্প্রতিক সৃষ্টি।

এই বিপজ্জনক অবস্থা অন্যত্রও ছড়িয়েছে। টাইম পত্রিকার খবর অনুযায়ী (মে ১১, ১৯৯২) জাপানে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে নতুন এইডস বোগীর সংখ্যা ২৫০৭ বেড়ে গেছে। প্রতি পাঁচজনে একজন জাপানি পুরুষ বিবাহ বহির্ভূত জীবন যাপন করে।

মে ১৭, ১৯৯১ এর রয়টারের বিপোর্টে প্রকাশ, যে জাপানের মিনিস্ট্র অব হেলথের প্রথম প্রকাশিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ৪৪ বছরের বেশী বয়স্ক বেতনভোগী জাপানিদের শতকরা ৪২ জন অনিদ্রা, শ্বাশুচাপ, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি এক বা একাধিক মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। সম্প্রতি জাপান অতিরিক্ত কাজের ফলে মৃত্যুর একটি নতুন নামকরণ করেছে—“কবোসি”।

১৯ Haruo Yakota “A diary of a misfit banker on duty” Quoted in Times of India, Delhi 2 5 92

২০ Times of India, May 19, 1992

মাৎসুমিটার কথা আগেই লিখেছি। এই ধরনের অধোগতির সম্ভাবনা মাৎসুমিটা আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন সেটা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে করি। “বাইরের বন্ধুদের উদার সহায়তা ও জাপানিদের অধ্যবসায়ের ফলে জাপান সেই দুঃসহ বছরগুলির থেকে অদ্ভুত দ্রুততার সঙ্গে বেরিয়ে উঠেছে। আমরা বৈষয়িক সমৃদ্ধি বর্জন করেছি। কিন্তু অলসভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তির অবক্ষয় ঘটেছে যুবকদের মধ্যে কর্তব্যে অবহেলায়। আর আত্মহত্যার ঘটনা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ সভ্য সমাজে কীভাবে চলবে সেটা যেন ভুলে গেছে। এখন ব্যক্তিগত লাভের জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে নিমগ্ন করে যারা সমাজে সহজেই তারা যোগ দেয়।

আর সমাজ মূল্যবোধের অভাবজনিত বিশৃঙ্খলা ও হিংস্রতার কুফলে ভোগে। অনেকভাবেই এই সমস্যাগুলির সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই নিজ নিজ বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত তারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে। আরও বেশি বেশি লোক যদি এই ভবিষ্যতের স্বপ্নের ওপর বিশ্বাস রাখত এবং সর্বাঙ্গকরণে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করত। তাহলে আমাদের সমাজে ভারসাম্য ফিরে আসত। কাজ আরও ফলপ্রসূ ও সৃজনশীল হতো, এবং আমাদের জীবন আরও বসবাসের যোগ্য হতো।”

মাৎসুমিটারের সঙ্গে মোটামুটি একমত হলেও জাপানের এই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে আমি অন্য একটি বিবর্তনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে চাই।

আর্থসামাজিক বিশিষ্ট মূল্যবোধের ফল হিসেবে জাপানের যুদ্ধোত্তর যুগের লক্ষণীয় উন্নতির কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এই সাফল্যই কিন্তু জাপানিদের মানসিকতার একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা ঘটালো। উত্তরোত্তর লাভের ও বিশ্বের বাজার দখল করার সর্বগ্রাসী লোভ জাপানের বিশিষ্ট আর্থসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আধ্যাত্মিকতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ফলে যে বিবর্তনমূলক পরিণতিগুলি জাপানি জীবনে ঘটল সেগুলি আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি বাণিজ্য সংস্থার ছবি অনুসন্ধান করলেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।^{২১}

শিল্পপ্রযুক্তির গুণমান ক্রমাগত উন্নত করার জন্য জাপানি সংস্থা MITI (মিনিস্ট্রি অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রি)র অবদানের কথা অনেকেই জানেন। MITIর এক পদ্ধতি ছিল কোন শিল্পক্ষেত্রে জাপানি সংস্থাগুলি যত্নবৃত্ত দ্রুততার সঙ্গে গুণমানের উন্নতি না ঘটালে সেই শিল্পকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করে দেওয়া।

ভারি শিল্প (হেভি আর্থমুভিং ইকুইপমেন্ট) এর বাজারে জাপানের অগ্রণী সংস্থা কোমাৎসু। গুণমানের উন্নতির ব্যাপারে কোমাৎসু যথেষ্ট তৎপরতা না দেখালে MITI ১৯৬০ তে এই শিল্প আন্তর্জাতিকভাবে অগ্রণী সংস্থা আমেরিকার ক্যাটারপিলারকে যুগ্ম

প্রচেষ্টা মারফৎ জাপানের বাজারে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়। ক্যাটারপিলার সঙ্গে সঙ্গে ৫০ : ৫০ যুগ্ম প্রচেষ্টা হিসেবে মিৎসুবিশির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাপানি বাজারে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে। সেই সময়ে কোমাৎসুর যন্ত্রগুলির গুণমানের পরিমাপ ক্যাটারপিলারের আনুমানিক ষাট শতাংশ। কোমাৎসু সে সময় বাজার রাখেবার জন্য যুদ্ধ কালীন তৎপরতায় নিজেদের যন্ত্রের গুণমান ক্যাটারপিলারের সমপরিমাণ (অর্থবা তার থেকেও ভাল করার ব্যবস্থা করে) সে জন্য যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থাগুলি কোমাৎসু অবলম্বন করেছিল সেগুলি তৎকালীন অন্যান্য জাপানি সংস্থাব সমগোষ্ঠীয়।

একবার ক্যাটারপিলারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর কিন্তু কোমাৎসুর দৃষ্টিভঙ্গী পালটে গেল। ক্রমে তাদের নতুন গোষ্ঠীগত যুদ্ধনাদ হলো “মারু ক্যাটারপিলার” অর্থাৎ ক্যাটারপিলারকে কুপাকাত কর। এবং সেজন্য প্রয়োগবোধে জাপানের জাতিগত মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দেওয়া হলো বলাই বাহুল্য।

একটি বিকল্প মডেল

পশ্চিম দুনিয়ার বাণিজ্য সংস্থা এবং ফলে ম্যানেজমেন্টের জীবনদর্শন আমরা মোটামুটি বিস্মৃতভাবে আলোচনা করেছি। এক কথায় তাদের জীবন দর্শন দুটি মূল ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যত সম্ভব বৈষয়িক সম্পদ অপহরণ ও সঞ্চয় এবং প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার পিছনে মূল চালিকা হবসীয় দর্শন। আমাদের দেশের বাণিজ্য সংস্থাগুলিও একই জীবনদর্শন জেনে নিয়েছে। এর যে ফল তাও আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি।

আমার বিশ্বাস সেন্সেট কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিম্নগামী গড়ালিকার থেকে আমাদের সমাজ, বাণিজ্যসংস্থা, ম্যানেজমেন্টের মুক্তি পেতে হলে জীবনদর্শনের আমূল পরিবর্তন দরকার। সেই পরিবর্তিত জীবন দর্শনে—

* বিষয়বস্তুর কোন সম্পদকে অধিকতর মূল্য দিতে হবে।

* জীবনের মান বা স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং এর চাইতে জীবনের গুণ বা কোয়ালিটি অব লাইফকে বেশি মূল্য দিতে হবে।

এই ধরনের জীবনদর্শন সম্বলিত দুটি ম্যানেজমেন্ট মডেল আমি প্রস্তাব করছি।

১। প্রথম মডেলটি দুটি মূল ভিত্তি প্রস্তরের ওপর গড়ে উঠেছে :

ক) লোক সমুত্তত সুখীনা ভবন্ত

(সমস্ত বিশ্ব সুখী হোক)

খ) তৈত্তীরিয় উপনিষদের পঞ্চকোষ (জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায় উত্তরণের পাঁচটি সোপান—

অন্নময় কোষ (বিষয়)

প্রাণময় কোষ (জীবনের প্রাণশক্তি)

মনোময় কোষ (মনেব জগৎ)

বিশ্বজ্ঞানময় কোষ (বিজ্ঞানের জগৎ)

আনন্দময় কোষ (মধুর আনন্দ, নির্ভীকের আনন্দ, মমতার আনন্দ),
অবিনশ্বর আত্মা)

২) স্বামী বিবেকানন্দ প্রস্তাবিত ফলিত বেদান্ত।

প্রথম মডেল—

এর দুটি ভিত্তিপ্রস্তরের প্রথমটিতে সংস্থার সবাইকে সুখী করার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে : সংস্থাটির মালিক, ম্যানেজমেন্ট, কর্মচারিরা, গ্রাহক ও বৃহত্তর সমাজের সবাইকে। সহজেই দেখা যাবে যে এটা হব্বসের মতের পরিপন্থী। ফলে সংস্থাটির কর্মধাবাও একেবারেই অন্যরকম হবে।

দ্বিতীয় ভিত্তিপ্রস্তরে মানসিক ও নৈতিকভাবে উন্নততর বাসনা প্রকাশ পাচ্ছে, ফলে সংস্থাটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র লাভে পরিসীমিত না হয়ে উন্নততর কোন উদ্দেশ্যে থাকবে। লাভের লক্ষ্য অবশ্যই থাকবে কিন্তু সেটি অন্য কোন উন্নততর উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের অস্ত্র হিসেবেই। সেই উদ্দেশ্যই প্রতিষ্ঠানটিতে জড়িত সবাইকে হব্বসীয় সম্পর্কের বন্ধনমুক্ত করবে।

মডেলটিতে সক্রিয় কববার জন্য কাঠামোগত কতকগুলি দিকে নজর রাখতে হবে।

যেমন,

* প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের মধ্যে এমন কিছু থাকবে যা শুধুমাত্র লাভ করার থেকে মহান।

* প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা বা মূল কর্মকর্তাকে চিত্তাকর্ষক চরিত্রের হতে হবে। তিনি শুধু প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সমর্পিত প্রাণই হবেন না, তার এই প্রতিশ্রুতি তার কাজকর্মে প্রতিভাত হতে হবে।

* প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্যসমূহ এক কর্মাধ্যক্ষের থেকে অন্য এক কর্মাধ্যক্ষের কাছে পরিবর্তনের সময় আরও সাজানো গোছানো হতে পারে কিন্তু তার মূল সূরটিকে কোন মতেই পরিবর্তিত করা চলবে না। এই ধরনের পরিবর্তন সংস্থাটির নৈতিক অবনতির সূচনার ইঙ্গিত বহন করে। এই ধরনের নৈতিক অবনতি বা মৃত্যুর থেকে বাস্তবিক মৃত্যুও অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

* যে সমস্ত কর্মীরা সংস্থাটিতে কাজ করবেন তারা প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুত থাকবেন। যদি তাদের কারোর এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতদ্বৈত থাকে তাহলে তার পক্ষে প্রতিষ্ঠানটি ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন হবে।

* সংস্থার উদ্দেশ্যকে অপরিবর্তিত রাখার পব দৈনন্দিন কাজের জন্য কর্মসিদ্ধান্তগুলি যথাসম্ভব সকলের মত নিয়ে করা হবে।

* সংস্থায় যারা অর্থ সরবরাহ করে সহায়তা করবেন, সংস্থা থেকে তাদের

প্রতিদান লাভের প্রত্যাশা সংস্থার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এক কথায় তারা সংস্থাটির উদ্দেশ্য সাধনের মধ্যেই তাদের মূলধন বিনিয়োগের উপযুক্ত প্রতিদান খুঁজে পাবেন।

* সংস্থাটির গঠন এমন হতে হবে যে ম্যানেজমেন্টের পরিবর্তনে কার্যক্রমের বা উদ্দেশ্যের ওপরে কোন অনিষ্টকর প্রভাব না ফেলে।

দ্বিতীয় মডেল—

দ্বিতীয় মডেলটি স্বামী বিবেকানন্দের ফলিত বেদান্ততত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষাতেই ফলিত বেদান্তের ব্যাখ্যা দেওয়া যাক।

বিভিন্ন উপনিষদ আলোচনা করলে দেখা যায় যে বেদান্তদর্শন কেবলমাত্র বনে বসে ধ্যানের মারফৎ সৃষ্টি হয় নি। যে তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কের থেকে এর শ্রেষ্ঠ অংশগুলি নিঃসৃত হয়েছে তারা কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাপনে ব্যস্ত থাকতেন। লক্ষ লক্ষ লোকের শাসনভার যার হাতে এমন রাজার থেকে ব্যস্ত কাউকে কল্পনা করা শক্ত অথচ এই রাজাদের অনেকেই কিন্তু গভীর চিন্তাশীল মস্তিষ্কের মালিক ছিলেন। এই সব থেকেই মনে হয় যে তাদের চিন্তাধারার ফলিত রূপটাই প্রথম।

এরপর যখন আমরা বেদান্তের শ্রেষ্ঠ টিকা ভগবত গীতাতে আসি—মজার কথা এটি লেখা হয়েছিল এক বিরাট গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় যেখানে কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে দর্শনের ব্যাখ্যা করেন এবং এর প্রতি পাতায় যে তত্ত্ব উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে সেটি প্রগাঢ় কর্মতত্ত্ব এবং এই কর্মতত্ত্বের মধ্যেই অপার প্রশান্তি। এটাই কর্মতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যা, এটা অর্জন করাই বেদান্তের উদ্দেশ্য।

কিছু না করাকে আমরা যেভাবে বুঝি তার আর এক নাম নিষ্ক্রিয়তা। সেটা কিছুতেই আমাদের অর্জিষ্ট হতে পারে না। যদি তাই হতো, তাহলে আমাদের চারপাশে যে দেয়াল সেটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান হতো যেটা নিষ্ক্রিয়। মাটির টিপি, গাছের গুড়ি, পৃথিবীর পরম জ্ঞানীদের অন্যতম হতো, ওরা নিষ্ক্রিয়। আর নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে প্রচণ্ড আবেগ জুড়ে দিলেই সেটা কর্ম হয় না। সত্যিকারের যে কর্ম বেদান্তের লক্ষ্য, সেটা অপার প্রশান্তির সঙ্গে যুক্ত। সেই প্রশান্তিকে এলোমেলো করা যায় না। মনের ভারসাম্য, যেটা যা কিছু ঘটুক, কোনদিনই অশাস্ত করা যায় না। নিজেদের জীবন থেকে আমরা এও বুঝেছি যে এধরনের জীবনদর্শনই কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে ফলদায়ক।^{২২}

তিনি এও বলছেন :

উপনিষদের প্রতি পাতা আমাকে বলে “বল অর্জন কর।” আমার জীবনে এই মহৎ শিক্ষা আমি উপনিষদের থেকে পেয়েছি। সবাইকে আমি সে কথাই বলি, বলবান হও—দুর্বল হয়ো না। অনেকেই বলে মানুষের মধ্যে কি দুর্বলতা নেই? উপনিষদ উত্তরে বলে, আছে কিন্তু আরও দুর্বলতা দিয়ে কি দুর্বলতাকে ঢাকা যাবে? তুমি কি মলিনতা

দিয়ে মলিনতাকে ধুয়ে ফেলতে চাও? উপনিষদ সে জ্ঞানই বলে, দাঁড়াও, শক্ত হও। পৃথিবীর এটাই একমাত্র সাহিত্য যেখানে তুমি “অভী” কথাটা পাবে। পৃথিবীর আর কোন ধর্মগ্রন্থে তুমি এই বিশেষণটা মানুষ কি ভগবান কারো ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে দেখবে না। অভী—নির্ভীকতা, শারীরিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। ঋগ্বেদেই উপনিষদের মূল বাণী।^{২৭}

বিবেকানন্দ বলছেন, ‘আগে উপনিষদের গুঢ় তত্ত্ব একমাত্র সন্ন্যাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা এই রহস্যকে সঙ্গে নিয়েই বনে যেতেন। শঙ্কর একটু দয়ালু হয়ে বললেন, গৃহস্থরাও উপনিষদ অধ্যয়ন করতে পারে, এতে তাদের ক্ষতি হবে না—ভালই হবে। তবু যে ধারণা প্রচলিত ছিল সেটা এই যে উপনিষদ গৃহত্যাগী বনবাসীদের জন্য... অথচ বেদ বেদান্তের যে একমাত্র প্রামাণ্য ব্যাখ্যা গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ করে গেছেন সেটা কিন্তু সবার জন্য, জীবনের যে কোন বৃত্তির লোকই সেখান থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

বেদান্তের ধ্যানধারণাগুলি ছড়িয়ে পড়া দরকার, সেগুলি বনে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। গুহার থেকে বেরিয়ে সেগুলি বিচারালয়ে, ধর্মস্থানে, দরিদ্রদের মধ্যে, জেলেদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে হবে। উপনিষদের বাণী প্রত্যেক পুরুষ, নারী, শিশুকে ডাকে। তাতে ডয়ের কী আছে? একজন জেলে কীভাবে উপনিষদের ভাবকে গ্রহণ করবে? বেদান্তেই সেই পথ দেখানো আছে। সেই পথ সীমাহীনতার মধ্যে। ধর্ম সীমাহীন, কেউ তার বাইরে যেতে পারে না। আত্মরিকভাবে তুমি যা করবে তোমার তাতেই মঙ্গল। সামান্য কাজও ভালভাবে করলে চমৎকার ফল পাওয়া যায় কাজেই প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যমত কাজ করুক। জেলের যদি সেই আত্মা থাকে, সে ভাল জেলে হবে। ছাত্রের যদি সেই আত্মা থাকে, সে ভাল ছাত্র হবে; কোন আইনজ্ঞের যদি সেই আত্মা থাকে, সে আরও ভাল আইনজ্ঞ হবে।...^{২৮}

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে এখনকার যুগে মূল বেদান্তের ধ্যানধারণাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছু কিছু সংযোজন প্রয়োজন। যেমন অদ্বৈত বেদান্ত, যেখানে এককে সত্য এবং বহুকে মায়া বলে ব্যাখ্যা করেছে। বিবেকানন্দ সেখানে বলছেন, ‘শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও আমি এর সঙ্গে যোগ করেছি যে বহু এবং এক একই মনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানসিক অবস্থার দৃশ্যের পরিচায়ক মাত্র।’ এজন্যই “সর্বত্র খলু ইদং ব্রহ্ম” (ছান্দোগ্য উপনিষদ—ব্রহ্ম সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত), “ঈশ বাস্য ইদম্ সর্বত্রম্” (ঈশোপনিষদ) (যা কিছুই অস্তিত্ব আছে সবার ওপরে ব্রহ্মের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব বর্তমান) এগুলির থেকেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রেরণার উৎস হলো সাধু ও পাপী, সবার মধ্যেই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ রূপ দেখতে পাওয়া। ফলিত বেদান্তে তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাণী —“পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব” এর সঙ্গে ওরা

যোগ করলেন “দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব, পাপীদেবো ভব, তাপীদেবো ভব।”

এই সম্প্রসারিত তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাণীই আমাদের দ্বিতীয় মডেল।

আমরা মনে করি মডেল দুটি যথেষ্ট বাস্তবসম্ভব এবং সেটা দেখাবার জন্য কিছু উদাহরণের প্রস্তাবনা আমাদের আছে কিন্তু তার আগে মডেল দুটি নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

দুটি মডেলেই জীবনদর্শনের আমূল পরিবর্তনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। নিবন্ধের প্রসঙ্গেই আমরা সেনসেট সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছি। দেকার্তে, বেকন, নিউটন হবসের দর্শনের আওতায় বেড়ে ওঠা পশ্চিমি বাণিজ্য সংস্থাগুলির যে ভাবধারা আমরা আজ দেখছি সেখানে আর্থিক সমৃদ্ধির সূত্র হিসেবে বৈষয়িক লাভকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের মডেল দুটিরই অর্ন্তীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আর্থিক সমৃদ্ধির থেকে উচ্চতর কোন লক্ষ্য। প্রতিযোগিতার কথা সেখানে অনুপস্থিত। এবং একে অন্যকে শত্রু ভাবারও কোন ইঙ্গিত বা নির্দেশ সেখানে নেই। ফলে মডেল দুটিই পারবে দেকার্তে হবসীয় বেড়াজালের থেকে মুক্ত করতে।

বর্তমান আলোচনায় একমাত্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেই শুধু আমরা ম্যানেজমেন্টের অস্তিত্ব ও প্রয়োজন অনুভব করেছি। একটু চিন্তা করলেই কিন্তু দেখা যাবে যে ফলিত যে কোন সংস্থাতেই সূষ্ঠ ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সংস্থা, বৈচিত্র্য সূষ্ঠ ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অবাণিজ্যিক সংস্থাই বাণিজ্য সংস্থার থেকে প্রাধান্য পাবে ও পাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় মডেলটিতে আমরা শুধু জীবনদর্শন ও অর্ন্তীষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। সূষ্ঠ পরিচালনার জন্য কাঠামোগত যে শর্তগুলি আমরা প্রথম মডেলটির ক্ষেত্রে আলোচনা করেছি দ্বিতীয় মডেলটিতেও সেগুলি প্রযোজ্য।

এবারে তিনটি উদাহরণ দিয়ে আমরা বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগ-যোগ্যতা দেখাবার চেষ্টা করব—

- * আমূল।
- * বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক।
- * রামকৃষ্ণ মিশন।

আমূল ^{২৫}

দুটি কো-অপারেটিভের যুগল প্রচেষ্টায় দিনে শ-দুয়েক লিটার দুধ বিক্রি করে গুজরাটের আনন্দে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল কুরিয়েনের উদ্বুদ্ধ নেতৃত্ব ও পরিচালনা মারফৎ আজ সেটা খয়রা জেলা জুড়ে দিনে দশ লক্ষ লিটার দুধ নিয়ে কারবার করছে। আজ আমূল বোধহয় সারা পৃথিবীতে না হলেও ভাবতবর্ষে সবচেয়ে বড় কো-অপারেটিভ। খয়রার—

এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গুজরাটের অন্যত্র একই ধরনের কো-অপারেটিভ গড়ে উঠেছে। সবগুলো মিলিয়ে এখন গুজরাটে কো-অপারেটিভ দুধ বিক্রয় ফেডারেশন সৃষ্টি হয়েছে।

লক্ষ্য করতে হবে, আমূল কো-অপারেটিভ তৈরি করার সময় যথাসম্ভব লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় নি। এর প্রতিষ্ঠাতা কুরিয়েনের ভাষায় এটি করা হয়েছিল একটি সমদর্শী ও ন্যায় বিচারপূর্ণ সমাজসৃষ্টির কল্পনা নিয়ে যেটা সব ভারতবর্ষের স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। এটি ছিল একটি স্বপ্নের বাস্তবরূপ যেখানে গ্রামের বাসিন্দারা নিজ চেষ্টার মধ্য দিয়ে তাদের শহরবাসী ভাইবোনদের সমান জীবনের গুণমান ভোগ করতে পারবে।

এই কো-অপারেটিভের অংশীদাররা এই স্বপ্নের অংশীদার হিসেবেই কো-অপারেটিভে যোগ দেয়, নিজ নিজ দুধ সরবরাহ করে কো-অপারেটিভের সঙ্গতি জোগায়।

কুরিয়েনের অবসরগ্রহণের পরে কিন্তু আমলাতন্ত্রের হাতে কো-অপারেটিভের কর্তৃত্ব চলে যায় এবং প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য আস্তে আস্তে বদলাতে শুরু করে। লাভের অংশ যদিও কো-অপারেটিভের সভ্যরাই পাচ্ছেন কিন্তু আমূল ধীরে ধীরে অন্যান্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মত হয়ে যাচ্ছে। এখন আমূল বিদেশ থেকে আমদানি করা সূর্যমুখী তেল প্যাক করে নিজেদের নামে বিক্রি করে। উপযুক্ত গুণমান নির্ণায়ক ব্যবস্থার প্রবর্তন না করেই আমূল লাইসেন্সগ্রহণকারীদের প্যাক করা সরষের তেল নিজেদের নামে বিক্রি করতে শুরু করেছিল। সেই তেলে ভেজাল ধরা পড়ায় আমূলের যে দুর্নাম হয়েছিল সরষের তেলের ক্ষেত্রে সেই দুর্নাম আমূল আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

শুরুতে আমূল প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি নিয়ে বাজারে আসে নি। আজ আমূল পিজ্জা (pizza) বানাতে শুরু করেছে এবং বাজারের কত অংশ দখল করবে সেটা তাদের পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। এক কথায় আপন আদর্শ ছেড়ে অন্যান্য বাজারত্যাগিত সংস্থার সমগোত্রীয় হয়ে উঠছে। ফলে ক্রমে ক্রমে আদর্শগত ও নীতিবোধের পতনের দিকে চলে গেলে আমরা আশ্চর্য হব না।

এই ছোট বিবরণ থেকে যে কয়েকটি কথা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে সেগুলো উল্লেখ করা যাক—

- * আমূল শুরু হয়েছিল মুনাকার থেকে মহত্তর লক্ষ্য ও স্বপ্ন নিয়ে।
- * এর প্রতিষ্ঠাতা নেতা সেই স্বপ্ন ও লক্ষ্যের সমভাগী ছিলেন।
- * এর অংশীদারবাও একই লক্ষ্যের অংশীদার।
- * প্রতিষ্ঠানটি ন্যায় ও নীতিবোধের আদর্শ নিয়ে বিশ্বায়কর ভাবে বেড়ে ওঠে।
- * ম্যানেজমেন্ট আমলাতন্ত্রের হাতে যাওয়ার পর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্রম পরিবর্তন হতে শুরু কবে এবং আস্তে আস্তে লাভই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।
- * নীতিবোধের মানেরও ক্রমাবনতি শুরু হয়।

বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ৯৯

অর্থনীতির অধ্যাপক মহম্মদ ইউনুস নিজ জামিনে ব্যাঙ্কের থেকে ১০,০০০ টাকা ধার নিয়ে অতি দরিদ্র গ্রামবাসীদের কোন জামিন ছাড়াই স্বনির্ভর হতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু করেন। তার উদ্দেশ্য লাভ করা ছিল না! দুটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে সংস্থাটি চালু করা হয়।

১) দরিদ্রতম ২০% বাংলাদেশিকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে আনা।

২) মেয়েদের স্বনির্ভর সম্মানিত জীবন যাপনে সাহায্য করা।

ঋণীদের ব্যাঙ্কটির কাজের ব্যাপারে আকর্ষণ দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য—

* ঋণীরা ঋণ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের অংশীদার হয়ে যান

* ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থাটি এমন করা হয়েছে যাতে ঋণ প্রাপকের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যত ঋণ গ্রহীতারা মিলে—

* ভবিষ্যত ঋণ গ্রহীতাকে বাছাই করে

* সময় মত ঋণ উদ্ধার নিশ্চিত করে।

ব্যাঙ্কের ঋণ উদ্ধার বরাবর শতকরা ৯৮ ভাগের ওপরে রয়েছে। লক্ষ করতে হবে যে, জামিন রেখে ঋণ দেওয়া সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ উদ্ধারের পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগের কাছাকাছি।

ব্যাঙ্কটির সুদের হার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি থেকে সামান্য বেশি। বিস্ময়কর ক্রমোন্নতি সত্ত্বেও ব্যাঙ্কটির কোনদিন মূলধনের অভাব হয় নি। ব্যাঙ্কটির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহানুভূতি সম্পন্ন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা শর্তহীনভাবে ব্যাঙ্কটিকে টাকা দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কও অর্থ সাহায্য করতে উৎসুক ছিল, কোন শর্তাধীনে টাকা নিতে ইউনুস অস্বীকার করেন।

১৯৮৩ তে শুরু করে ১৯৯৪এ ব্যাঙ্কটির ১০৪৫ শাখা, ৫৭ জেলায় ৩৪,৯১৩টি গ্রামে কাজ করে। ব্যাঙ্কটির ঋণীর সংখ্যা ২০ লক্ষ; এর মধ্যে শতকরা ৯৪ জন মহিলা। ব্যাঙ্কটি ৪৬১৪ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে দিয়েছে, ঋণ উসুলের হার বরাবর শতকরা ৯৮ ভাগের ওপরে রয়েছে। বাড়ি তৈরি করার জন্য ২,৯৫,০০০ জনকে ঋণ দিয়েছে। অর্ভাষ্ট ঋণীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে এনেছে, বাকিদেরও কয়েক বছরের মধ্যেই দারিদ্র্যসীমার ওপরে নেওয়ার আশা রাখে।

দরিদ্র বাংলাদেশিদের মধ্যে এই ব্যাঙ্কের প্রভাব অসামান্য।

এখানেও দেখা যাচ্ছে—

* ব্যাঙ্কটির উদ্দেশ্য যথাসম্ভব লাভ করা নয় তার চেয়ে অনেক মহত্তর।

* ব্যাঙ্কটির প্রতিষ্ঠাতা একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

* ঋণীরা সঙ্গে সঙ্গে অংশীদার হওয়ার ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমমর্মী।

- * যথাসময়ে ঋণ শোধ ও ঋণ নেওয়ার উদ্দেশ্যকে সফল করার মধ্য দিয়ে তাদের নীতিবোধের প্রকাশ ঘটছে।
- * অন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ব্যাঙ্কটির উদ্দেশ্য নয়।
- * মূলধন সরবরাহকারীরা ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই টাকা দিয়েছে, অন্য কোন শর্তে নয়।

রামকৃষ্ণ মিশন ২৭

স্বামী বিবেকানন্দের জ্যোতির্ময় প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিবেকানন্দের ফলিত বেদান্তেই নির্ণীত—পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব, দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব, পাপিদেবো ভব, তাপীদেবো ভব।

এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করে, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন সাধারণত দূরধিগম্য অঞ্চলে উপজাতিদের উন্নতিমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দীর্ঘস্থায়ী ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত।

১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের দেশে বিদেশে ১৩৪টি শাখা ছিল। ১৯৯৩-৯৪তে ১৪টি হাসপাতালের ২,০৪৯ টি বেডে ৬৯,১৭৫জন হাসপাতালে ভর্তি-রোগী ও ২১,৫৩,৭৪৪জন বাইরের রোগীর চিকিৎসা হয়, ২৭টি ভ্রাম্যমান ডিসপেনসারিতে প্রধানত গ্রামীণ ও উপজাতিপ্রধান এলাকার ২৭,২৯,২৫৭টি রোগীর চিকিৎসা হয় ৪টি। চোখের ক্যাম্পে ৬৩৬জন রোগীর বিনা খরচে ছানির অপারেশন করা হয়; কয়েকটি মেডিক্যাল ক্যাম্পে ৭০০০ রোগীর চিকিৎসা হয়; ৫টি শিক্ষাকেন্দ্রে ৪৫২জন নার্সকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

আশ্রমের অধীনে ৫টি ডিগ্রি কলেজ, ৫টি শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর জন্য কলেজ, ১৮৭টি স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট ৩১৯টি প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৬৫০৩টি প্রথাবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই সবগুলি মিলিয়ে ২,০৭,৪০৫জন ছাত্র (১,২৭,০৪১ ছেলে; ৩,৮০,৪১৪ মেয়ে) শিক্ষা লাভ করছে। শুধু শিক্ষাকেন্দ্রেই ১৯৯৩-৯৪ মিশনের ব্যয় হয়েছিল ৩৪.৪২ কোটি টাকা।

এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে এই বিরাট বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সৃষ্ট সম্পাদনের জন্য যে সংগঠন ও জনবলের প্রয়োজন তাদের অর্থকরী অনুপ্রেরণা জোগানো বোধহয় অসম্ভব। এই সব কাজই প্রায় করেন মিশনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত স্বেচ্ছাসেবক। তাদের ব্যক্তিগত আত্মসম্মানবোধ তাই শুধু অব্যাহত আছে তাই নয়, প্রতিষ্ঠানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও উন্নত হয়েছে এবং উচ্চ মান ও নীতিবোধের সঙ্গে কাজ করতে সহায়তা করেছে।

২৭ Swami Jitatmananda, "Indian Ethos in Management", Shri Ramakrishna Ashrama, Rajkot, 2000.

এই বিরাট কর্মকাণ্ডের পুরোটাই দানের ওপর নির্ভরশীল, অর্থের অভাবের জন্য মিশনের কাজ ব্যাহত হয়েছে বলে শোনা যায় নি। এই দান যাঁরা করেন, মিশনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই করেন। বিনিময়ে তাঁদের প্রত্যাশা কাজ আরও এগিয়ে চলুক।

পরিবর্তনের পথ প্রদর্শক

বিশ্বায়নের পথ ধবে দেশি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির চেহারা আমরা দেখেছি। বাজারত্যাগিত অর্থনীতির প্রভাবে সমাজের সর্বাসীন নৈতিক অবনতিও আমাদের অদেখা নয়। তা সত্ত্বেও দেশের বাণিজ্য সংস্থাগুলির থেকে শুরু করে সরকার ও অন্যান্য স্বার্থস্বার্থীরা নিজ নিজ স্বার্থে বিশ্বায়নের সহায়তা করতেই ব্যস্ত তাতে দেশের ও দেশের সাধারণ মানুষদের যত ক্ষতিই হোক না কেন। অনেকেই মনে করেন বিশ্বায়নের ফলে অনেক উন্নতমানের দৈনন্দিন বিলাসদ্রব্য বাজারে এসেছে এবং এগুলো জীবনের মান উন্নয়নে সাহায্য করেছে। বহু উন্নতমানের যন্ত্রকৌশলসমৃদ্ধ জিনিষপত্র বাজারে এসেছে ঠিকই, তবে এ প্রসঙ্গে পশ্চিম সভ্যতার সম্বন্ধে ডেনিস গ্যাবরের উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। “বস্তুগত দিক দিয়ে আমাদের বর্তমান সভ্যতা অত্যন্তচর্যকর সফল যন্ত্রকৌশলকের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে প্রায় শূন্যতা।”^{২৮} বর্তমান সভ্যতার এই সংকটের একমাত্র সমাধান হতে পারে আর্থ সামাজিক পট পরিবর্তন মারফৎ। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সেনসেট সংস্কৃতির পটপরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস আর্থসামাজিক ক্ষেত্রেও এই পটপরিবর্তন আসবে।

কিন্তু সেই পরিবর্তন নিজের থেকে আসবে না তার জন্য বহু পথ প্রদর্শক বা এজেন্টের দরকার। সাধারণভাবে মনে হতে পারে এই পথপ্রদর্শক বা পরিবর্তনের বাহক দেশের বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট স্কুল থেকে পাশ করা ছাত্রদের মধ্য থেকেই আসবে। আমরা কিন্তু তা মনে করি না। এই স্কুলগুলি পুরোপুরিই হবসীয় চিন্তাধারার জালে আবদ্ধ। এদের পাঠক্রমে নীতিবোধের স্থান নেই বললেই চলে। পাশ করা ছাত্ররা কত টাকা মাইনের চাকরি পেল সেটাই এদের শিক্ষাদানের সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি। কোন বিকল্প চিন্তাধারা বা নৈতিক আদর্শ এদের কাছ থেকে আশা করা একান্তই অবাস্তব।

আমাদের আশা ও বিশ্বাস এন, জি, ও’ দের থেকে। যে কোন সমস্যাই হোক, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এন, জি, ও’র প্রস্তাব সবসময়েই যথেষ্ট উচ্চাঙ্গভিত্তিক। বিশ্বায়নের খারাপ দিকটাও এন জি ও’ দের নজরে এসেছে। সিয়াটেলের সভা থেকে শুরু করে ধনী দেশ ও বাণিজ্যসংস্থার আন্তর্জাতিক সভাগুলিকে উত্তরোত্তর এন জি ও’ দের প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং পরিশেষে কানাডাতে পুলিশ ও সৈনিক প্রহরা বৈধিত চার দেয়ালের মাঝখানে নিজ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করতে হয়েছে।

এন. জি. ও’র স্বভাবতই আদর্শবাদী, তাদের নীতিবোধও সাধারণত প্রবল। পৃথিবী

জুড়েই তাদের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। তাদের কাছ থেকেই পরিবর্তনের পথ পাবার আশা অলীক বা অন্যায্য নয়।

পরিশেষে একটি কথা দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই। আমাদের কল্পনার আদর্শ সমাজ, প্রতিযোগিতাহীন সমাজ। অনেকেই এই প্রতিযোগিতাহীন সমাজের কল্পনা অসম্ভব বলবেন। আমরা কিন্তু বলব, আমাদের কল্পনা আদর্শবাদী সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবানুগ। এই প্রসঙ্গে আমি বারম্যানের থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে চাই।^{২৯}

“মানুষের ইতিহাসের নিরানব্বই শতাংশেরও বেশি সময় পৃথিবী জাদুমুগ্ধ ছিল এবং মানুষ নিজেকে ধরিত্রীর অংশ হিসেবে ভেবে এসেছে। মাত্র চারশো বছরে এই চিন্তা ধারার আমূল পরিবর্তন ও বাতিল করা মানব অভিজ্ঞতা ঐ নিরবচ্ছিন্নতাকে বিঘ্নিত করেছে এবং মানুষের আত্মার অখণ্ডতাকে বিনষ্ট করেছে।”

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও ঠিক একই চিন্তাধারা প্রযোজ্য।

২৯ Burman Morris, “The Re-enchantment of the Lord”, Cornell University Press, New York, 1981.

বিশ্বায়ন : বিজ্ঞান ও কৌশল

বিশ্বায়ন সম্বন্ধে বিশ্বনাথগিরিকের কথা । সন্দীপ ঠাকুর
সম্ভাব্য সংকটে সমাজ । আনন্দমোহন কর
বিশ্বায়ন : অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ । স্বতন্ত্রত মুখোপাধ্যায়
বিশ্বায়ন ও পরিবেশ । রথীন মন্তুমদার
বিশ্বায়ন কি বিশ্বহিতায় । অরুণ মুখোপাধ্যায়
ভূবনীকরণ, জীবনযাত্রার মান । পার্থপ্রতিম মণ্ডল
খাদ্য, অখাদ্য, অনাহার ও বিশ্বায়ন । সৌরভ ঘোষ
বিশ্বায়ন, উন্নয়ন ও উচ্ছেদ । অভিজিৎ গুহ
বিশ্বায়ন কলাম বিকেন্দ্রীকরণ । অজিত নারায়ণ বসু

দ্বিতীয়

বিশ্বায়ন সম্বন্ধে বিশ্বনাগরিকের কথা

সন্দীপ ঠাকুর

বেশ কিছুদিন হলো কানে আসে আই টি সম্বন্ধে নানা কথা, বিশ্বায়ন সম্পর্কীয় কত কথা। ভাবিয়ে তোলে মনকে। কী করা যায়, কী আছে সামনে ; ভবিষ্যতের পৃথিবী ছোট থেকে ছোটতর হলে সর্বজনীন স্থান-কাল-পাত্রের অবস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে—এই সব ভেবে মনেব মাঝে নানারকম বাড়ির আবির্ভাব হয়। কী শিখব, কী শেখাব? কারা শিখবে? তারপরেও কেন?

উপরোক্ত কথাগুলি কি আগেও ছিল না? দেশ থেকে দেশান্তরে কি ভাবে, কেমন করে, চিন্তাধারার ও ব্যবসার প্রগতি, লেনদেন হতো ; কি কবে Culture Shockকে লঙ্ঘন করে নানা দেশের প্রথাকে লোকেরা আপন করে নিত? ইতিহাস কিভাবে লেখা হতো? সেই সবইতো IT ও globalization এর দৌলতে জানানো যেত, শেখানো ও শেখা হতো। তবে নতুনত্বটি কোথায়?

হ্যাঁ, বলা যায় যে মানব জগতের তিন ভাগের এক ভাগ লোকেদের অস্তিত্ব, আজকের দিনে, গতিশক্তির আওতায় পড়ে তথাকথিত ‘প্রগতির পথে’ পাড়ি দিচ্ছে। অন্য দুই ভাগ যেন সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

আফ্রিকার, দক্ষিণ আমেরিকার বনে জঙ্গলে সেই যে মহামহীরূহের কাণ্ডে লাঠি পিটিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে, ভূমধ্যসাগরের মায়োর্কা (majorca) দ্বীপপুঞ্জের শিসের আওয়াজে, এসব তো ITরই বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। তা ছাড়া symbolic বা প্রতীক মারফৎও ব্যাপারটা ইতিহাসের গোড়া থেকে চলে এসেছে আজও। অনেকের মতে সত্যিকারের বিশ্বায়ন এর আরম্ভ ১৬ শতাব্দীতে।

আজকাল ঘবে ঘবে টেলিফোন, বেতার, দূরদর্শন আর কম্পিউটার স্থান পেয়েছে। রাতদিন জিনিষগুলোর ব্যবহার হচ্ছে। আগের চেয়ে খববেব যাতায়াত আরো জলদি হচ্ছে। এই তাড়াতাড়ি হওয়ার চাঞ্চল্যে মানবজাতিব মৌলিক লাভটা যে কোথায় হচ্ছে সেটা সঠিক জানা বেশ রহস্যময়। ইন্টারনেট থেকে কত খবরই না হাতে আসে আঙুলের কয়েকটি ছোঁয়াতে। তবে সব খবরই যে সত্যি তা কে জানে, কে বলবে? সবটাই যদি গিলে ফেলা যায় তাহলে মানবজাতির সবার মাথায় যদি স্বতন্ত্র একটি ভাবনার অবস্থিতি হয় তাহলে ভো সারা দুনিয়ার কৃষ্টির গোড়ালিতে কুড়ুল মারা হবে।

Globalism এর দুটি দিক। স্বীকার ও অস্বীকার। রক্ষণশীলদের মতে নৈতিক মূল্য অথবা মানের অবনতি, জাতীয়তাবাদের চারিত্রিক অবসন্নতার দরুণ অবমূল্যায়ন ইত্যাদিরা খারাপ বা অস্বীকার করার কারণ। তারাই আবার অস্বীকারবশত দেশের সর্বনাশ করতে রাজি, সবুজ বা হরিত দলীয়দের মতে রাজনৈতিক দঙ্গাদলির দৌলতে দেশের ও জাতের অহিতকরণের ভয়। আর দুনিয়ার বাণিজ্যজাতীয় দর-শক্তির প্রতিকারক—একমাত্র শাসক হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ—এই ভেবে পরিবেশকে বজায় না রাখলে বিপর্যয়—তাই অস্বীকার।

Globalityর মানে হচ্ছে যে মানবজাতি আজীবন মানবসমাজে বিরাজ করছে। কোনো জাতি, কোনো দেশ অন্য দেশগুলি থেকে আর আলাদা ভাবে থাকতে পারবে না। নানারকমের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলবেই পারস্পরিক চলে, এবং শেষ অবধি যেটা না হলে চলে না সেটাকেই আবার নতুনভাবে চালাতে হবে। মানবজগতের মানে হচ্ছে একটার বেশি মানব সমাজের সমাবেশ। এই সম্মিলিত সমাবেশ সম্পর্কীয় যা হয়, যা হচ্ছে, যা হবে, সবটাই মানবজগতীয় বা global। স্বীকার করা বা অস্বীকার করা—এতে কিছু আসে যায় না।

বিশ্বায়ন ব্যাপারটি হচ্ছে একটা কার্যপ্রণালী যেটার মারফৎ প্রত্যেকটি জাতীয়তাবাদী দেশ পারস্পরিক, কম-বেশি শক্তির পরিস্থিতিতে থেকে নতুন রীতি নতুন বিধিগুলিকে আয়ত্ত করে অনন্যতা বজায় রেখে পৃথিবীকে ঘেরাবাঁধা জালের মধ্যে জড়িয়ে থাকে।

আপাতত এমন একটা যুগ এসেছে যে এই নতুন globalityর গতিকে আর রোধ করা যাবে না। খুলে বললে এই বোঝায় যে যতই আলাদারকমের যুক্তি বিশ্বায়ন সম্বন্ধে—প্রাকৃতিক পরিবেশ, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জনসামাজিক—সবই পাশাপাশি থাকবে—তবে তাদের কমিয়ে বাড়িয়ে, চিপে-পিষে ময়দামাখা করা চলবে না। যাই হোক, globalityর গতিকে আর কেন রোধ করা যাবে না তার কয়েকটা কারণ—

- ১) ভৌগোলিক পরিধি বেড়ে চলেছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়ছে, আর্থিক বাজারের লেনদেন হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে, আর দেশান্তরিক ব্যবসায় বৃহৎ শক্তি বাড়ছে।
- ২) খবরাখবরি যান্ত্রিক ব্যবহারের ক্রমিক উন্নতি।
- ৩) গণতান্ত্রিক একতীয়ারের রীতি অনুযায়ী বিশ্বভরা গণগণ।
- ৪) সারা দুনিয়ার সাংস্কৃতিক শিল্পালয়ের ধারাবাহিক ছায়াছবি।
- ৫) জাতীয়তাবাদোত্তর বহুকেন্দ্রিক-বিশ্বভরা রাজনীতির অভ্যুদয়, যথা বিশ্বব্যাপী অভিনেতার দল—(বাণিজ্যকেন্দ্র, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ U.N. ইত্যাদি) এবং প্রতিটি দেশের সরকারবৃন্দের শক্তিশালী হবার জন্য।
- ৬) পৃথিবীভরা দারিদ্র্যের দরুণ।
- ৭) প্রাকৃতিক (বিশ্বের) বিলয়। এবং
- ৮) একই এলাকাতে নানান সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, ইত্যাদির কারণে।

বিশ্বায়নের আপাতত অবদান, যেটা সকলেই জানে, সেটা হলো বিশ্বের কোণে

কোণে নানান দেশি সঙ্গীতের আড্ডা, ওয়ুথ, ড্রাগস, গৃহহারা-দেশহারার দল এবং বারোয়ারি human rights এর আন্দোলন ইত্যাদি। খাদ্য-খাদকের সম্পর্কেও ঐ একই কথা। এছাড়া খবরাখবরি আদানপ্রদান তো এখন মুড়িমুড়কির মত সর্বত্রই পাওয়া যায়। পৃথিবীটা যে আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে তার পাত্তা পেতেও দেরি হয় না। তবে সবই প্রায়, যেন শিক্ষিতদের মধ্যে একটা ঘেরাটোপে আটকে আছে। যত দেশে যুরি, যা দেখি, মনে রকমারি আশা-নিরাশার ঢেউ ওঠে-নামে। ভারতের একটাকায় বিলাতিবেগুন পাই ৩/৪টে, ক্যালিফোর্নিয়াতে এক টাকাতে (ডলারে) ১২/১৪টা আর বেইজিংয়ে ৩০/৪০টা। জাপানের এক টাকাতে পাই (ইয়েন) ছোট্ট আঙুরের সাইজের টোমাটো একটি মাত্র। অন্যদিকে আবার জাপানে একটি বাঁধাকপির দাম ৩০০ ইয়েন (ভারতের টাকায় ৯০ থেকে ১০০), ঐ ইয়েন দরে আমেরিকায় পাই দুটি বাঁধাকপি, এবং বেইজিংএ ৩০টি, ভারতে ৩০ থেকে চল্লিশটি। বিশ্বায়নের নানা দিক ও নানা মত। এখনো অনেক কিছুই বাকি আছে ব্যাপারটির।

সম্ভাব্য সংকটে সমাজ

আনন্দমোহন কর

সমাজবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব সমাজের সম্ভাব্য বিপদের দিকে আলোকপাত ও তার সমাধানের পথ অন্বেষণ করা। শিল্প বিপ্লব ও পরবর্তী সময়ে ফরাসি বিপ্লবের পর সমাজে পুঁজিবাদের উদ্ভবের সময়ে দেখা দেওয়া নৈবাজ্যের পটভূমিকায়, 'How is social order possible?'—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই 'সমাজতত্ত্ব' (sociology) বিষয়টির সৃষ্টি। সমাজতত্ত্বের জনক Auguste comte থেকে শুরু করে Karl Marx, Herbert spencer, Emile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel—সকলেই তাঁদের চিন্তা ভাবনা রেখে গেছেন সমাজের সমস্যার বিশ্লেষণ ও তার সমাধানে। সেই প্রয়াস সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজও অব্যাহত। কিন্তু বর্তমানে এক তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, উন্নত বিশ্বের বিশিষ্ট সমাজ বিশেষজ্ঞদের ভাবনায় ফুটে উঠছে ভবিষ্যত সমাজের আসন্ন বিপদের ছবি। এই সম্ভাব্য সমাজ সংকট থেকে মুক্তি যদি অসম্ভব নাও হয়, তবে জটিলতার নিঃসন্দেহে। সমাজের পরিস্থিতি একশ কেন, পঞ্চাশ বছর আগের থেকেও এখন অনেক জটিল। বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই রয়েছে দূশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা, হয়ত কিছুটা হতাশার ছাপ যা তাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। বছর দশেক আগে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ London School of Economics এর অধ্যাপক Anthony Giddens মন্তব্য করেন, 'The world in which we live today is a fraught and dangerous one' (Giddens, 1990: 10)। এর পরে এই সূরে সুর মিলিয়েছেন Ulrich Beck, George Ritzer এবং আরও অনেকে।

২

এই সমাজতত্ত্ববিদদের অভিমত, বর্তমানে সারা বিশ্বে সমাজ জীবনে বিপদ নতুন ধরনের কারণ বর্তমান সমাজ নতুন প্রকারের। কী তাহলে নতুন সমাজের প্রকৃতি? নিজেদের মত করে উত্তর দিয়েছেন তিন দেশের তিন সমাজবিজ্ঞানী—Giddens বৃটেনের, Beck জার্মানির আর Ritzer আমেরিকার। তাঁদের বিশ্লেষণ পদ্ধতিও পৃথক। তবে তাঁরা একমুখ্য যে আমরা এখনও আধুনিক যুগেই রয়েছি, উত্তর আধুনিক যুগে নয়। এর সপক্ষে যুক্তি হলো, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের (uniqueness) চেয়েও বিশ্বজুড়ে অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি—সব ক্ষেত্রেই একই রকম ধারা (trend) দেখা যাচ্ছে। Ritzer, যার হাতে তথ্য ও তত্ত্বের সুন্দর সামঞ্জস্য ঘটেছে, দেখিয়েছেন credit card, fast food রেষ্টোরা, প্রভৃতির

মাধ্যমে আমেরিকার consumer culture প্রসারিত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র। ফলস্বরূপ গড়ে উঠছে একই ধরনের সংস্কৃতি ও অর্থনীতি। 'উত্তর আধুনিকতা'র ধারণা বা মতবাদের বিরোধীদের বক্তব্যের আরেক প্রধান বিষয় 'যৌক্তিকতা' বা rationality, ইউরোপে Enlightenment এর সঙ্গে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। Enlightenment এর মূল অবদান ছিল যুক্তিসম্মত চিন্তাধারা। সমাজতত্ত্ববিদদের অনেকেব মতে সময়ের সঙ্গে এই যৌক্তিকতার ক্রমবর্ধমান প্রসার ঘটে চলেছে। এতে সূচিত হয় আধুনিক যুগেরই প্রবাহমানতা।

তাই বলে উত্তর আধুনিকতার সম্ভাবনাকে খারিজ করেননি এই সমাজবিজ্ঞানীরা। আধুনিক যুগেই সমাজে এসেছে অনেক পরিবর্তন। তাঁদের মতে আমরা এখন এক নতুন আধুনিকতার মধ্যে বাস করছি। এই নতুন আধুনিকতার নানা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাদের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো সমাজের সম্ভাব্য সংকট বা risk.

— Giddens এর কথায়, 'Modernity is a risk culture. I do not mean by this that social life is inherently more risky than it used to be, for most people that is not the case. Rather the concept of risk becomes fundamental to the way both lay actors and technical specialists organise the social world. Modernity reduces the overall riskness of certain areas and modes of life, yet at the same time introduces new risk parameters largely or completely unknown to previous eras' (Giddens, 1991 : 3-4)

এই risk বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাধিক আলোচনা করেছেন Beck— তাঁর মতে বর্তমানে আমরা 'risk society' বা 'ঝুঁকিপূর্ণ সমাজে' বাস করছি যেখানে প্রতিপদে রয়েছে সমাজের অস্তিত্বের সংকট। সংকট সমাজে বরাবরই ছিল। বর্তমানে তার চরিত্র বদলেছে। এখনকার সংকট মানুষের সৃষ্টির থেকে সৃষ্ট। এর প্রকৃতি আলাদা। আগে সংকটের কারণ ছিল অজ্ঞানতা, এখন জ্ঞান। আগে যে জ্ঞান মানুষকে সংকট প্রতিহত করতে সহায়তা করত এখন সেই জ্ঞানই হলো সংকটের মূল। Beck বলেছেন, 'While all earlier cultures and phases of social development confronted threats in various ways. Society today is confronted by itself through its dealings with risks. Risks are the reflection of human actions and omissions, the expression of highly developed productive forces. That means that the sources of danger are no longer ignorance but knowledge, not a deficient but a preferred mastery over nature; not that which eludes the human grasp but the system of norms and objective constraints established with the industrial epoch'. (Beck, 1997 : 182)

Beck এর মতে সম্ভাব্য সংকটের আশঙ্কাই ঝুঁকিপূর্ণ সমাজকে পৃথক করে পূর্বের শিল্পসমাজ (industrial society) থেকে। তবে বর্তমান সমাজে শিল্প সমাজ আর ঝুঁকিপূর্ণ সমাজ—এই দুয়েরই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ঝুঁকিপূর্ণ সমাজ শিল্প সমাজেবই এক ভিন্ন রূপ। শিল্পই হলো অধিকাংশ ঝুঁকির উৎস। শিল্প সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল ক্লাসিক্যাল

আধুনিকতা যার মূল লক্ষ্য ছিল সম্পদ এবং তার সমবন্টন পদ্ধতি। কিন্তু নতুন আধুনিকতার লক্ষ্য হলো ঝুঁকি এবং তাকে প্রতিহত করা। অতীত আধুনিকতার আদর্শ অবস্থা ছিল সাম্য, নতুন আধুনিকতায় তা নিরাপত্তা। শিল্প সমাজে মানুষের প্রধান সমস্যা ছিল দারিদ্র্য থেকে বাঁচা, সমাজে অধোগতির থেকে নিজের অবস্থানকে রক্ষা করা। সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল এ বিষয়ে মানুষকে উপযুক্ত করে তোলা। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ সমাজের পবিত্রিহিত আলাদা। এখন প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও চাই অতিরিক্ত দক্ষতা— সংকট থেকে পরিগ্রহের জন্য। ক্লাসিক্যাল আধুনিকতায় মানুষ সামাজিক ঐক্য অর্জন করেছিল সাম্যের লক্ষ্য অর্জনের উদ্যোগে। কিন্তু নতুন আধুনিকতায় তা অর্জনের প্রয়াস চলছে সম্ভাব্য বিপদকে প্রতিহত করার সম্মিলিত প্রয়াসে।

Beck এর কথা মতো, শিল্পসমাজের মূলে ছিল শ্রেণী ব্যবস্থা। ঝুঁকিপূর্ণ সমাজের মূলে রয়েছে সম্ভাব্য সংকট। কিন্তু এই ঝুঁকির সঙ্গে শ্রেণী ব্যবস্থার সম্পর্ক নিবিড়। শ্রেণী ব্যবস্থার ওপরেব দিকে এই সংকটের পরিমাণ কম, সংকট সঞ্চিত হচ্ছে শ্রেণী ব্যবস্থার একেবারে তলায়। ধনীদেব পক্ষে সম্ভব ঝুঁকিকে কমিয়ে আনা। সেজন্য রয়েছে নানা ব্যবস্থাও, যেমন বিমা। গরীবদেব পক্ষে এসব সুযোগ গ্রহণ করা শক্ত। সুতরাং ঝুঁকি শ্রেণী ব্যবস্থাকেই শক্তিশালী করেছে, তাকে পরিবর্তন করেছে না। যে পর্যবেক্ষণ সামাজিক শ্রেণী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সত্য, তা বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ধনীদেশের পক্ষে সম্ভব বিপদকে যতদূর হয় দূরে সরিয়ে রাখা। অন্যদিকে গরীবদেশের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে শক্ত কাজ। আবার ধনীদেশের পক্ষে সুযোগ আছে এই বিপদ থেকে ব্যবসায়িক লাভের। Beck দেখেছেন, এই সম্ভাব্য বিপদকে সম্বল করে চলছে এক নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। অতীতের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের প্রয়োজন মেটানো। আজকের নতুন অর্থনৈতিক কার্যসমূহের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন সম্ভাব্য বিপদকে প্রতিহত করতে উপযুক্ত প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবন ও তার বাণিজ্য। স্বভাবতই ধনীদেশের কাছে এটা আয় বাড়াবার এক মস্ত সুযোগ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ঠিক কী ধরনের বিপদেব কথা সমাজবিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন? এর উত্তর হলো সব ধরনেব। পারমাণবিক যুদ্ধ, পারমাণবিক কেন্দ্রে দুর্ঘটনা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, সামাজিক অনৈক্য, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা এবং পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি। Beck এর কাছে পরিবেশ দূষণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদের উৎস থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এই সম্ভাব্য বিপদ। শিল্প কারখানার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে ক্ষতিকারক জঞ্জাল। সাবা বিশ্বের মানব সমাজের পক্ষেই এর ফল হবে মারাত্মক। Beck চোখের সামনে দেখেছেন জার্মানির মত উন্নত দেশেও কিভাবে শিল্পকলকারখানাগুলো পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে। তাঁর মতে, এতদিনের অদৃশ্য বিপদ আজ ক্রমশ দৃশ্য হয়ে উঠছে। ঘটছে স্বাস্থ্যহানি, নানা বোগের প্রাদুর্ভাব। ক্রমশ মানুষের অস্তিত্ব হয়ে উঠছে বিপন্ন। ‘স্থান’ ও ‘কাল’ এর ধারণাকে ব্যবহাব করে Beck দেখিয়েছেন যে মানব সভ্যতার অস্তিত্বের এই নতুন সংকট আজ আর কোন ‘স্থান’ বা ‘কাল’ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ

নেই। কোথাও পারমাণবিক দুর্ঘটনা কেবল সেই অঞ্চলেরই নয়, তার আশেপাশের দেশ সমূহের ক্ষেত্রেও বিপদের কারণ হতে পারে। আবার একইভাবে এই দুর্ঘটনা কেবল যে বর্তমান মানুষজনকেই আঘাত করবে তা নয়, এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভবিষ্যত প্রজন্মও। অতীতের সমাজে যে বিপদের ঝুঁকি ছিল তার কখনই এই বৈশিষ্ট্য ছিল না।

একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম যে ধনীদেশ বিপদকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে এই বস্তুবাদের সত্যতা চোখে পড়ে। অতীতে শিল্পোন্নত দেশের কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোয় পাঠানো হতো। এমন অসংখ্য নজির রয়েছে। এখন দেখা যায় পরিবেশ দূষণকারী কলকারখানা বহুজাতিক সংস্থাগুলো গরীব দেশে স্থানান্তরিত করছে। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের প্রশ্নে এসব দেশের সরকার তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত আইন কানুন অনেক শিথিল করে রেখেছে। তবে নানাভাবে বিপদকে দূরে রাখা চেষ্টার পরও ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে ধনী দেশ কিংবা ধনী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও। এটাই Beck এর মতে ঝুঁকিপূর্ণ সমাজের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। আগের শিল্পসমাজের মত দরিদ্রা থেকে অব্যাহতি যে অস্তিত্ব নিরাপদ করবে সে নিশ্চয়তা এই ঝুঁকি-সমাজে নেই।

Beck সবচেয়ে বেশি ডাবিত পরিবেশ দূষণ নিয়ে। অতীতের শিল্পসমাজের ধারণায় ছিল সমাজ ও পরিবেশ পৃথক। সমাজ পরিবেশকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। ঝুঁকিপূর্ণ সমাজে পরিবেশ ও সমাজ নিবিড় ভাবে জড়িত। সামাজিক পরিবর্তন, পরিবর্তন নিয়ে আসে পরিবেশে আবার পরিবেশের সেই রূপান্তর সমাজে পরিবর্তন আনে। তাই আজ, 'nature is society and society is nature', সেজন্য পরিবেশ ও রাজনীতির বিষয়বস্তু হচ্ছে। সেই সূত্রে সমাজবিজ্ঞানীদের ন্যায় প্রকৃতিবিজ্ঞানীরাও চলে আসছেন রাজনীতির আওতায়।

৩

ওপরের এই আলোচনা আমাদের এক বড় প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আমরা তো মনে করি সময়ের সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে ঘটে চলেছে অভাবনীয় উন্নতি। সেই সুবাদে এগোচ্ছে মানব সভ্যতার প্রগতির রথ। তাহলে কেন দেখা দিল এই বিরাট সমস্যা? উত্তর খুঁজছেন অনেকেই।

Ritzer উত্তর খুঁজছেন যৌক্তিকতার (rationality) প্রকৃতির মধ্যে। আজকের সভ্যতার এই অগ্রসরের পেছনে নিঃসন্দেহে কাজ করেছে মানুষের যুক্তিবোধ। এই যুক্তিবোধ মানুষকে প্রেবণা দিয়েছে নিত্যনতুন আবিষ্কারে। জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ Max Weber এর মতে এই যুক্তিবোধের জাগরণের সঙ্গেই আবির্ভাব ঘটছিল পুঁজিবাদের। যুক্তিপূর্ণ মানসিকতা ব্যতিরেকে সম্ভব নয় বিজ্ঞানের জটিল আবিষ্কার, অসম্ভব ব্যবসায়িক জটিল হিসেব নিকেশ। Weber তাঁর আমলাতন্ত্রের আলোচনায় দেখিয়েছিলেন এই

যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থাটি সুদক্ষভাবে সাংগঠনিক কার্যকলাপ পবিচালনা করে পুঁজিবাদকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু যৌক্তিকতার অসুবিধের দিকটি Weber এর চোখ এড়ায়নি। তিনি উপলব্ধি করেন যে আমরা নিয়ম কানুন মেনে কাজ করায় কাজের সৃষ্টি পবিচালনা যেমন সম্ভব তেমনি অনেক সময় নিয়মবক্ষায় অধিক মনোযোগের ফলে কাজের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাও স্বাভাবিক। এতো গেল একদিক। অন্যদিকে নিয়মের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপে আমরা হারাচ্ছে তাদের মানবিক গুণাবলী (dehumanization). নিয়মই হয়ে উঠছে মুখ্য, মানুষ হয়ে যাচ্ছে গৌণ। পুঁজিবাদী সমাজে এই ধরনের সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন Max Weber এর ইহুদী বন্ধু George Simmel তাঁর বিখ্যাত 'Philosophy of Money'র আলোচনায়।

সুতরাং যৌক্তিকতার মধ্যে থেকেই আসতে পারে মানবিকতা সংক্রান্ত নানা সমস্যা। একেই Ritzer বলেছেন 'irrationality of rationality'. সেক্ষেত্রে প্রয়োজন যৌক্তিকতার আরও গভীর বিশ্লেষণ। Kalberg এর মতে Weber এর আলোচনা থেকে চার প্রকারের যৌক্তিকতার ধারণা পাওয়া যায়—Practical rationality, cognitive rationality, substantive rationality এবং formal rationality (Kalberg, 1980)। এদের মধ্যে পার্থক্যগুলো হলো, 'Formal rationality involves the increasing importance of structures (like the bureaucracy) which constrain people to act in a rational manner in their choice of means to ends. Substantive rationality entails the dominance of norms and values in their choice of means to ends. Theoretical rationality deals with rational cognitive processes, while practical rationality is more day to day rationality in the rational choice of means to ends.' (Ritzer, 1997 : 21)

Weber কে অনুসরণ করে Ritzer এরও বক্তব্য আধুনিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো formal rationality—সমাজজীবনে formal rationality প্রসারের সাথে সাথে পুঁজিবাদেরও বিকাশ ঘটেছে। Ritzer তাঁর McDonald Fast Food Restaurant ও Credit Card এর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে সাবা বিশ্ব জুড়ে এই 'formal rationality'র নীতিকে অবলম্বন কবেই ব্যবসাবাণিজ্য প্রসার করে চলেছে বড় বড় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো। তাঁর চোখে formal rationality'র বৈশিষ্ট্য সমূহ হলো—গণনার ক্ষমতা (calculability), দক্ষতা (efficiency), ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা (predictability), মানবিক প্রযুক্তিকে অ-মানবিক প্রযুক্তির দ্বারা প্রতিস্থাপন (replacement of human technology with non-human technology), নানা অনিশ্চয়তার ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং পরিশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বৃহত্তর সমাজের জন্য ধারাবাহিকভাবে নানা অযৌক্তিক পরিস্থিতির সৃষ্টি। এব থেকেই নানা বিপত্তি।

Formal rationality বিস্তারের কারণে প্রধান সমস্যা হলো এই বিস্তার অন্যান্য rationality গুলোর গুরুত্ব একেবারে হ্রাস করে দিয়েছে, বিশেষ করে substantive rationality'র। এই substantive rationality মানুষকে সহায়তা করে সামাজিক

মূল্যবোধের নিরিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণে। 'substantive rationality...directly orders action into patterns through clusters of values, substantive rationality involves a choice of means to ends within the context of a system of values. One value system is no more (sustantively) rational than another. Thus, this type of rationality also exists trans-civilizationally and trans-historically. whenever consistent value postulates exist.' (Ritzi, 1996 : 244) কিন্তু substantive rationality'র গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস হবার কারণেই সিদ্ধান্ত গ্রহণেব ক্ষেত্রে সমাজজীবনের মানবিক দিক হচ্ছে অবহেলিত। এটি হলো 'irrationality of rationality'।

Giddens আধুনিক সমাজের ঝুঁকির অনুসন্ধান করেছেন একটু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর মতে বিপদের সম্ভাবনার এক বড় কারণ হলো আধুনিক বিশ্বের পরিকল্পনাকারীদের ভুল। দ্বিতীয় ভুল এই আধুনিক বিশ্ব যারা পরিচালনা করছেন তাঁদের। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অনভিপ্রত পরিণাম (unintended consequence) যার পুরোটা কখনই আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। আর আছে সামাজিক জ্ঞানের প্রতিবর্তধর্মিতা (reflexivity of social knowledge). নতুন জ্ঞান সামাজিক ব্যবস্থাকে নতুন নতুন দিকে নিয়ে যাবে। সুতরাং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা যতই বিকাশ লাভ করুক, কখনই পুরোপুরিভাবে আধুনিক বিশ্বের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ কয়েম হবে না। অতএব সংকটের সম্ভাবনা থাকছেই।

Beck এর বিশ্লেষণে প্রধান জোর পড়েছে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের ওপর। আজকের আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের সৃষ্টি। তাই বিজ্ঞানীদের বলতে গেলে খোলাখুলিভাবেই তিনি দায়ী করেছেন ঝুঁকিপূর্ণ সমাজ নির্মাণের জন্য। একথা সবার জানা যে গবেষণার অনুদানের জন্য বিজ্ঞানীদের অনেক সময়ই নানা স্বার্থাশ্রয়ী গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু Beck আলোকপাত করেছেন বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণার ওপর্ব। 'Science has become the protector of a global contamination of people and nature. In that respect, it is no exaggeration to say that in the way they deal with risks in many areas, the sciences have squandered until further notice, their historic reputation for rationality' (Beck, 1992 : 70)। বিজ্ঞানীরা পরিবেশ দূষণের বিষয়ে উত্তর দেবার চেষ্টা করেন সব সময় কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে। সেক্ষেত্রে অবধারিতভাবে দূষণ সংক্রান্ত আলোচনা পৌঁছয় কতটা পর্যন্ত দূষণ মানুষ ও পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে তার চুলচেরা বিশ্লেষণে। সাধারণ মানুষের পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগকে অনেক সময়ই বিজ্ঞানীরা দেখেন মানুষের এই ক্ষতিকর মাত্রা সম্পর্কে অজ্ঞানতার প্রতিফলন হিসেবে। সেক্ষেত্রে জটিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লব্ধ গবেষণার ফলাফল সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারাই তাদের প্রথম কর্তব্য বলে মনে হয়। Beck এর মতে এহেন ধারণার বশবর্তী বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত থাকেন কতটা পরিমাণ দূষণের মাত্রা অনুমোদন করা যাবে তার সূক্ষ্ম নির্ণয়ে। অথচ অন্যদিকে পরিবেশ দূষিত হয়ে চলে, মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে, সামাজিক জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বর্তমানে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতেও আছে গলদ। একদিকে সরকারের সিদ্ধান্ত ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে বিজ্ঞানীদের গবেষণার ওপর। অন্যদিকে, সরকার হারিয়ে ফেলেছে তার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব। এখন আর সামাজিক পরিবর্তন আইনসভার বিতর্ক ও আইন প্রণয়নের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে গবেষণাগারে গবেষণার ওপর। এছাড়া অন্য সমস্যাও রয়েছে সরকারের সামনে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশে। কঠোর পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও তার রূপায়ণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে পুঞ্জি বিনিয়োগে। ফলে ধাক্কা খাবে আর্থিকনীতি, দেখা দেবে বেকারত্ব। রোজগারের বাজারের অনিশ্চয়তা কোন সরকারেরই কাম্য হতে পারে না।

সুতরাং বিজ্ঞানের দর্শন ও ব্যবহার সমাজের সংকটকে দূর করতে পারছে না। বরং এর মধ্যেই রয়েছে সংকটের উৎস। সমাজের সম্ভাব্য সংকটের সবচেয়ে গভীর আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে Holocaust নিয়ে Zygmunt Bauman এর লেখায়। Holocaust সংক্রান্ত বেশ কিছু চর্চা সমাজতত্ত্বে হয়েছে। হযত এর একটি কারণ আমেরিকায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে ইহুদিদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ। এমন রসিকতাও প্রচলিত যে ইহুদিদের খুঁজতে হলে Synagogue এ নয়, যেতে হবে সমাজতত্ত্ব বিভাগে। যাই হোক, Ritzer এর আলোচনায় আমরা দেখেছি যে সমাজের সংকটের কারণ হিসেবে রয়েছে formal rationality'র বিস্তার। তাঁর ও Bauman এর লেখা থেকে আমরা পাই যে হিটলারের গ্যাস চেম্বারের ইহুদি নিধন প্রক্রিয়াও ছিল পুরোপুরি formal rationality নীতিতে পরিকল্পিত। শুধু তাই নয়, সেই মারণ কারখানাও ছিল আধুনিক পুঁজিবাদের fast food restaurant এর মতই সমান দক্ষ। এখানে আশঙ্কার কথা যে অতীতের Holocaust হবার সকল কারণই বিশ্বসমাজে আজও পুরোপুরি উপস্থিত। Bauman এর কথায়, 'None of the societal conditions that made Auschwitz possible has truly disappeared, and no effective measures have been undertaken to prevent...Auschwitz-like catastrophies.' (Bauman, 1989 : 11), এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন Ritzer, 'Modernity has prided itself on being civilized, on having safeguards in place so that something like the Holocaust could never occur. But it did occur, the safeguards were not sufficient to prevent it. Today, the forces of rationalization remain in place and area. if anything, stronger. And there is little to suggest that the safeguards needed to prevent rationalization from running amok are any stronger today than they were in the 1940s.' (Ritzer, 1997 : 450).

একথা ভাবলে ভুল হবে যে সমাজবিজ্ঞানীরা কেবল আশঙ্কাই করে গেছেন, সমাধানের কথা ভাবেন নি। আশার আলো খুঁজেছেন প্রত্যেকেই। Giddens এর মতে নতুন আধুনিকতার কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এর মধ্যে একটি হলো reflexivity এই বৈশিষ্ট্যটি

আধুনিক যুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেখানে 'social practices are constantly examined and reformed in the light of incoming information about those very practices, thus constitutively altering their character.' (Giddens, 1990 : 38)—আধুনিক যুগে, 'Everything is open to reflection in the modern world, including reflection itself. Thus everything is open to question, leaving us with a pervasive sense of uncertainty. Furthermore, the problem of the double hermeneutic recurs here because the reflection of experts on the social world tends to alter that world.' (Ritzer, 1997 : 434)। Giddens বলেছেন এই reflexivity মানুষকে প্রেরিত করবে সামাজিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলবার। এর ফলে মানুষ আবিষ্কার করবে নতুন প্রযুক্তির, অন্বেষণ করবে নতুন উপায়ের। এই reflexivity থেকে অনিশ্চয়তা ও বিপদের ঝুঁকি এলেও এর থেকেই আসবে সম্ভাব্য সংকটের সমাধান। Giddens চেয়েছেন বাস্তবজীবনের সঙ্গে 'utopian realism' এর সামঞ্জস্য সাধনের। একই সাথে আশা রেখেছেন সামাজিক আন্দোলনের ক্ষমতার ওপরেও।

Reflexivity'র ক্ষমতাকে মেনে নিয়েছেন Beck। যেখান থেকে সমস্যার উৎস, সেখান থেকেই আসবে সমাধান। রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে Beck বলেছেন 'unbinding of politics'—রাজনীতি আর কোনভাবেই তার পরম্পরাগত সরকারের ক্ষেত্র নয়, সরকার ক্রমশ তার ক্ষমতা হারাচ্ছে। Beck এব মতে বর্তমানে ঝুঁকির উদ্ভবের উৎস হলো, 'subpolitics'—যেমন বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ইত্যাদি। এই 'subpolitical' ব্যবস্থাতেই, 'The structure of a new society are being implemented with regard to the ultimate goals of progress in knowledge, outside the parliamentary system, not in opposition to it, but simply ignoring it.' (Beck, 1992 : 223)। সরকার ও আইনসভার স্থানে রাজনীতি হয়ে উঠছে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তির ক্ষেত্র। এই সমস্ত গোষ্ঠী ও ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব সরকারের তুলনায় অনেকবেশি reflexive হয়ে ওঠা। সেজন্য নতুন আধুনিক সমাজের বিভিন্ন ঝুঁকি সামলানোর ক্ষেত্রেও এরা অনেক বেশি সক্ষম। সূত্রান্তে কিছু 'subpolitics' যেমন বিজ্ঞানের গবেষণাগার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমাজকে সংকটপ্রবণ করে তুলছে তেমনি অন্য কিছু 'subpolitics' যেমন বিচার ব্যবস্থা, গণমাধ্যম সেই ঝুঁকিকে নিয়ন্ত্রণ করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে।

তবে Beck এব মতে আসল সমস্যা রয়েছে বিজ্ঞানে। অতএব সেদিকেই মনোনিবেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। 'প্রযুক্তিগত উন্নতি ও তার ব্যবহারের অর্থ সামাজিক উন্নতি'—এ ভুল ধারণা ছাড়তে হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে চাই—'eco-human' দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা। এখন যে কোন একচোঁটয়ার রাজত্ব সমাজজীবনে শেষ। তাই বিজ্ঞানীদেরও আর উন্নতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি ওপর শেষ কথা বলার অধিকার নেই। কোন কলকারখানায় কোন প্রযুক্তি

ব্যবহারে যদি দেখা যায় যে ‘দূষণ’ হচ্ছে, তবে কতদূর মাত্রায় ‘দূষণ ক্ষতিকর’ হবে তার গবেষণায় না গিয়ে উচিত সেই প্রযুক্তির ব্যবহার বন্ধ করা। Beck বারবার উন্নতি সম্পর্কে আমাদের ধারণার পুনর্মূল্যায়নের ওপর জোর দিয়েছেন। সেই সঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করেছেন বিজ্ঞান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। এখন কেবলমাত্র আর ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষই নয়, পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন একদল বিজ্ঞানী যাবা এসেছেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে। Ritzer এর অভিমত গণতান্ত্রিক আলোচনা প্রসারের ওপর। সেই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন সমাজজীবনে নৈতিকতা প্রসারের কথাও। আগেই উল্লেখিত —Ritzer এর মতে formal rationality বিস্তারের ফলে substantive rationality’র গুরুত্ব হ্রাস সমস্যার এক প্রধান কারণ। substantive rationality জোব দেয় প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধের ওপর যার মধ্যে নিহিত থাকে মানবিকতা। বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনেও formal rationality’র প্রভাব এত বেশি যে এর বাইরে বেরিয়ে আসা শক্ত। Ritzer এই উদ্দেশ্যে রোজকার জীবনযাত্রায় যে সব পরিবর্তন আনার কথা বলেছেন তাও খুবই দুর্বল বলে মনে হয়।

এই দুর্বলতার কথা যে Ritzer জানেন না তা নয়। এছাড়াও formal rationality’র থেকে মুক্তির জন্য ভাবা হচ্ছে ‘আবেগ’ (emotion) এর কথা। আশা এই যে আবেগ মানুষকে নিয়ে যাবে কল্পনার রাজ্যে। যেখানে থাকবে না যৌক্তিকতার কোন শৃঙ্খল, উন্মেষ হবে মানবিকতার। হয়ত সত্য কিন্তু তা সম্ভব কি? সম্ভব আছে Stephen J Mestrovich এর। তিনি তাঁর ‘Postemotional Society’ বই এ বলেছেন যে বর্তমানে আমরা এসে উপনীত হয়েছি এমন এক সমাজে যেখানে বাজনারীতি অর্থনীতি বা সংস্কৃতি, সব কিছুই লক্ষ্য মানুষের আবেগকে ব্যবহার করা। গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে প্রয়োজন মত আবেগ তৈরি ও তার বণ্টন চলছে। সংবাদ বিষয় পরিণত হয়েছে বিনোদনে। বাস্তব আর কল্পনার জগতের মাঝখানের ফারাক যাচ্ছে মুছে। সরে যাচ্ছে ভালোমন্দের বিভেদরেখা। T. V. talkshow তে দাগী অপরাধীও পাচ্ছে celebrity’র মর্যাদা—যা আগে কখন ছিল না। সমস্ত ঘটনার প্রয়োজনীয়তা বিস্তৃত তথ্য (সঠিক বা বৈঠিক) সরবরাহ হচ্ছে সর্বদা। এরই ফলস্বরূপ চোখের সামনে অত্যাচার অন্যায় অবিচার হতে থাকলেও মানুষ হারাচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা। কারণ এর জন্য প্রয়োজন যে আবেগ তা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে formal rationality’র নীতির প্রয়োগে। সুতরাং মানুষের আবেগ সমাজকে রক্ষা করবে, এ সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

তাহলে উপায় কী? বলা খুবই শক্ত। অর্থনীতির গতি পুঁজিবাদের বিশ্বায়নের যুগে যেরকম ভাতে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা দুরূহ। Beck আশা রাখতে পারেন যে অর্থনৈতিক বিষয় যেমন দারিদ্র্য, বেকারত্ব প্রভৃতির চেয়ে পরিবেশ দূষণে অস্তিত্বের সংকট এখন নির্বাচনের প্রচারে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুতরাং ব্যবস্থা নিশ্চয়ই নেওয়া হবে যাতে পরিবেশের অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হয়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষমতা কমছে, বিশেষ

করে সরকারের। তাছাড়া বিজ্ঞান চর্চায় আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ কখনই কামা নয়। সূত্রাং পথ খুঁজতে হবে অন্য ভাবে। আসলে সমস্যা হলো মোটামুটিভাবে সারা পৃথিবী জুড়েই এক আর্থিক সাফল্যের লক্ষ্য, এক জীবনযাত্রার মানের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। তাকে Ritzer বলেছেন Americanization—সমস্যা এর থেকেই। পৃথিবীর যা জনসংখ্যা আর যা প্রাকৃতিক সম্পদ তাতে কখনই সবার পক্ষে সেই কাম্বিত মানের জীবনযাত্রা লাভ করা সম্ভব নয়। সেই প্রয়াস হলে প্রকৃতির বিপর্যয় অবশ্যজীবী। পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনায় Goddin বলেছেন যে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়াতে যদি হয় তবে ধনীদেশের জনসাধারণকে consumerism এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং ফিরে যেতে হবে অনেক সহজসরল জীবনযাপনে (Goddin, 1992)। এই ধারণাকে সমর্থন করেছেন Giddens : 'Given the vast global inequalities, there is little chance that the poor third world countries will sacrifice economic growth on their own part because of environmental problems created largely by the rich ones. Yet the earth doesn't seem to possess anywhere near sufficient resources for everyone on the planet to live at the standard of living most people in the industrialised societies take for granted. Hence if the impoverished sectors of the world are to catch up with the more favoured ones, the richer countries are likely to have to revise their expectations about constant economic growth,' (Giddens, 1996)।

অতএব নতুন এক সাধাসিধে আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রার কথা পৃথিবীর মানুষকে ভাবতে হবে—বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের মানুষদের। এদিকে উদ্যোগ নিতে হবে সমাজে বুদ্ধিজীবী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিদের। পাশাপাশি দৃষ্টি ফেরাতে হবে পরম্পরাগত জ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকে। দেখা গেছে যে অতীতে এই জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজন মিটিয়েছে পরিবেশের ক্ষতি না করে। আশার কথা, বর্তমানে কৃষি, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা এমনকি জলসেচ—ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে প্রাচীন যে জ্ঞান বা তার যতটুকুও আজ অবশিষ্ট আছে—তাকে রক্ষা করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। চলছে এ সংক্রান্ত গবেষণা। নগর বর্জন করে অরণ্যে ফিরে যাওয়া আজ সম্ভব নয়, কিন্তু অনেক বাহ্যিক বর্জন করে সাধাসিধে জীবনের দিকে যাওয়াও অসম্ভব নয়। একটা কথা ভুললে চলবে না যে এছাড়া কোন পথ নেই। খনিজ জ্বালানী তেল থাকবে না আর এক শতাব্দীও। সেজন্য ক্রমে আসবে পণ্য পরিবহন, খর্ব হবে বিশ্বায়নের যুগের পুঞ্জিবাদের আধিপত্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সমাজ সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবে। এর অর্থ এই যে সেদিন সমাজকে ফিরতেই হবে সাধাসিধে জীবনযাত্রায়, প্রকৃতির সঙ্গে সখে। এই বিনোদন সংস্কৃতির বৈভবের যুগ পেরিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে সহজ সবার জীবনযাত্রাকে গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে সহজ হবে না। সে জন্য মানুষের যা প্রয়োজন হবে তা হলো শুভ বুদ্ধি।

গ্রন্থসূচী

- ১) Ballinger, Jeff (1995) : Just Do it—or else, *Multinational Monitor* 16 (6) : 7-9.
- ২) Bauman, Zygmunt (1989) : *Modernity and the Holocaust*. Ithaca, Cornell University Press.
- ৩) Bauman, Zygmunt (1991) : *Modernity and the Ambivalence*. Ithaca, Cornell University Press.
- ৪) Beck, Ulrich (1992) : *Risk Society : Towards a New Modernity*. London : Sage.
- ৫) Coperland, B. R and Taylor, M. S. (1994) : 'North-South trade and the environment' in the *Quarterly journal of Economics*, August, 755-787.
- ৬) Dean, J (1992) : 'Trade and Environment : a survey of the Literature' in P. Low; *International Trade and the Environment*. P. Low ed. World Bank Discussion Paper no. 159.
- ৭) Dumaïne, Brian (1992) : Exporting jobs and ethics. *Fortune*, 126 (7) . 10.
- ৮) Esty, D.C. & Geradin. D. (1997) : 'Market access competitiveness and harmonization : Environmental protection in regional trade agreements'. *The Harvard Environmental Law Review*. 21 : 2, 265-336
- ৯) Giddens, Anthony (1990) : *The consequences of Modernity*, Stanford Calif. : Stanford University Press.
- ১০) Giddens, Anthony (1991) : *Modernity and Self-Identity : Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford, Calif. : Stanford University Press.
- ১১) Giddens, Anthony (1992) : *The Transformation of Intimacy . Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Stanford, Calif. : Stanford University Press.
- ১২) Giddens, Anthony (1996) : *Sociology*. Cambridge, Polity Press.
- ১৩) Goodin, Robert E (1992) : *Green Political Theory*. Cambridge : Polity.
- ১৪) Kalberg, Stephen (1980) : "Max Weber's Types of Rationality : Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History", in *American Journal of Sociology*, 85 . 1145-1179.
- ১৫) Mestrovich, Stephen J. (1997) : *Postemotional Society*. Sage.
- ১৬) Miller, Annetta (1995) : Armanis of aisc. *Newsweek*, 126 (5) : 60-62.
- ১৭) Ritzer, George and Le Moyne, Terri (1991) . "Hyperrationality : An Extension of Weberian and Neo-Weberian Theory". In G Ritzer, *Metatheorizing in Sociology*. Lexington, Mass. : Lexington Books : 93-115.

- ১৮) Ritzer, George (1993) : The McDonaldization of Society. Thousand Oaks. Calif. : Pine Forge Press
- ১৯) Ritzer, George (1995) : Expressing America : A Critique of the Global Credit Card Society. Thousand Oaks, Calif : Pine Forge Press.
- ২০) Ritzer, George (1996) : Classical Sociological Theory, Sage
- ২১) Ritzer, George (1997) : Modern Sociological Theory, Sage.
- ২২) Sener, Robert A (1998) : High priced shoes, low cost labour. America, 9 (1).
- ২৩) Ypeij, Annelou (1998) : Transferring risks, microproduction and subcontracting in the footwear and garment industries of Lima, Peru. Latin American Perspectives, 25 (2) : 84-105.

বিশ্বায়ন : অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ

স্বতন্ত্রত মুখোপাধ্যায়

কোনদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে ঘটবে, কোনপথে ঘটবে তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীতে নানা ধরনের চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বের চিন্তাধারা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা গঠনে সাহায্য করে। পৃথিবীর কোন কোন রাষ্ট্র ধনী আবার পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত—এই রাষ্ট্রগত বৈষম্য কেন এবং এই বৈষম্য দূর করার জন্য কোন ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দরকার হবে তা নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাধারার অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ বয়েছে। কোন দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে সেই দেশের প্রাকৃতিক ভূগোল কি রকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধকারের লক্ষ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিশিষ্ট স্কটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ তাঁর বিখ্যাত “The Wealth of Nations” গ্রন্থে কোন দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে দুটি গুরুত্বপূর্ণ hypothesis এর কথা বলেছেন :

১) একটি মুক্ত বাজার অর্থনীতি যেখানে সরকারের হস্তক্ষেপ ন্যূনতম থাকবে সেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যাপক বিকাশের স্বার্থে।

২) যেকোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেই দেশের প্রাকৃতিক ভূগোল অর্থাৎ তার নদী সমভূমি, উপকূলবর্তী অঞ্চল ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

অ্যাডাম স্মিথের দ্বিতীয় hypothesis টি দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতিবিদদের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে বঞ্চিত ছিল। সাম্প্রতিককালে এতে Neoliberal অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। ১৯৯৭-২০০১ সালের মধ্যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জেফরি ডি স্যাস, অ্যানড্রু ডি মেলিনগার ও জন আই গ্যালপ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন যার নাম “ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্ব”। হঠাৎ করে মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে এই তত্ত্বের আবির্ভাব কেন, এবং পেছনের আর্থ-সামাজিক যুক্তি ও উদ্দেশ্যগুলি—তা উন্মোচিত করা দরকার। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব—এই বিষয়কে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যায় :

ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভৌগোলিক প্রভাবের তাত্ত্বিক ভিত্তি

খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ভৌগোলিক প্রভাব—স্যাস, মেলিনগার, গ্যালপের তত্ত্বের বিকাশ ও তার আলোচনা

- গ) তাত্ত্বিক বিনির্মাণ
- ঘ) ভৌগোলিক প্রভাবের যৌক্তিকতা—ভৌগোলিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন
- ঙ) ভৌগোলিক প্রভাব থেকে অনির্ভরতার ধারণার ক্রমবিকাশ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভৌগোলিক প্রভাবের তাত্ত্বিক ভিত্তি

যেকোন দেশের/অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভৌগোলিক প্যারামিটারগুলি কীধরনের হবে (প্রভাব বিস্তার করবে) সেই ধরনের তাত্ত্বিক ধারণাসমূহ প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর ভৌগোলিকদের তাত্ত্বিক চেষ্টার মধ্যে সম্পৃক্ত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন চৈনিক তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কৃষিকাব্যবস্থার উপর মৃত্তিকার প্রভাব জলপথ পরিবহনের সুবিধা প্রভৃতি বিষয়গুলি কীভাবে কোন স্থানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যযুগে বিভিন্ন আরবীয় ভূপর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনীগুলোও প্রাথমিক তথ্য গঠনে সাহায্য করে।

তবে মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর পরিবেশের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি ভূগোল শাস্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামোতে স্থায়ীভাবে স্থান নেয় মূলত জার্মান দার্শনিক কার্ল রিটারের (১৭৭৯-১৮৫৯) সাহায্যে, কার্ল রিটার ও তাঁর প্রধান তাত্ত্বিক শিষ্য ফ্রেডরিক র্যাটজেল “Anthropogeographic” গ্রন্থে এই ব্যাপারে বলেছেন যে—“a single kind of physical phenomenon always has a corresponding human response.”

ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদের মূল বক্তব্য হলো—যেকোন একটি সামাজিক গোষ্ঠী বা জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার ধরন এবং বিকাশের পর্যায় তার পরিবেশের প্রাকৃতিক বিষয়গুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তিনজন ভূগোলবিদ “ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ” তত্ত্বকে তাদের অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তির মাধ্যমে শক্তিশালী করেন।

১) বিশিষ্ট মার্কিন ভূগোলবিদ ই. মি. মেন্‌পেলের (১৯১১) মত ছিল যে বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দৃষ্টি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন রকমের।

২) আবার আরেকজন বিশিষ্ট মার্কিন চিন্তাবিদ ই. হাশ্টিংটন (১৯৪৫) একটি ভৌগোলিক প্যারামিটারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণবাদের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে জলবায়ুগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের কার্যকলাপ ও সভ্যতা গঠনে সাহায্য করে। যে কোন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ জলবায়ুগত বিভিন্ন প্যারামিটারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হাশ্টিংটনের জলবায়ুগত নিয়ন্ত্রণবাদী বক্তব্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

i) পৃথিবীর বিভিন্ন মানবসভ্যতাগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত; (a) মৃদু সভ্যতাসমূহ যা গড়ে উঠেছে/উঠেছিল ক্রান্তীয় মৌসুমী ভূমধ্যসাগরীয় ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু

অঞ্চলে; (b) তীক্ষ্ণ সভ্যতাসমূহ মূলত গড়ে উঠেছে/উঠেছিল উষ্ণ ও শীতল মরু জলবায়ু অঞ্চলে, নিরক্ষীয় জলবায়ু ও মেরু জলবায়ু অঞ্চলে।

ii) হাষ্টিংটনের মতে শীতল ও উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু সেখানকার মানুষকে কর্মকর্ম করতে সাহায্য করে যা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উন্নতিতে সাহায্য করে। আবার ক্রান্তীয় অঞ্চলের জলবায়ুগত চরমতা তাদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার কারণ।

৩) ফরাসী তাত্ত্বিক এডমণ্ড ডেমোঁলা সামাজিক ভূগোল্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণবাদের আলোচনা করেন। তাঁর মতে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সেখানকার মানুষের সামাজিক সংগঠন ও অর্থনৈতিক কাঠামো গঠিত হয়েছে।

পরবর্তীকালে উপরোক্ত তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রণবাদী ভূগোলবিদরা মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাবের আরও তাত্ত্বিক গবেষণা চালিয়ে আসছেন তা অবশ্য আমাদের বিচার্য নয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ভৌগোলিক প্রভাব ও তার আলোচনা

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম মানুষের কার্যকলাপের উপর পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা যা ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদীরা শুরু করেছেন তার একটি ছক দেখানো হলো—

প্রাচীন ভৌগোলিক ধারণা

ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ

অ্যাডাম স্মিথ	ই মি মেম্পলের তত্ত্ব	ই হাষ্টিংটনের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণবাদ	ই ডেমোঁলার সামাজিক নিয়ন্ত্রণবাদ
---------------	-------------------------	--	--

উপরোক্ত আলোচনার সঙ্গে বর্তমান আলোচনার মধ্যে একটি পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ১৯৯৭-২০০১ সালের মধ্যে তিন অর্থনীতিবিদ জে. ডি. স্যাস, এ. ডি. মেলিনগার ও জে. এল. গ্যালপ নির্দিষ্টভাবে কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিবর্তনের ব্যাখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ভৌগোলিক প্রভাবের একটি তাত্ত্বিক কাঠামো করেছেন। এই “ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব” (Geographical Determination Theory) সৃষ্টির ক্ষেত্রে কতকগুলি নির্দিষ্ট টুল ব্যবহার করেছেন জেফরি স্যাসেরা, সেগুলি হলো—

- ১) ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা বা জি আই এস এর ব্যাপক ব্যবহার
- ২) প্রচুর পরিমাণে অর্থনৈতিক সামাজিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সমূহ
- ৩) জার্মান জলবায়ুবিদ ভি পি কোপেন ও আর গাইগাবের বিশ্বভিত্তিক জলবায়ু অঞ্চলের শ্রেণীসমূহ

৪) অ্যাডাম স্মিথের “ওয়েলথ অব নেশনস”

৫) পূর্ববর্তী নিয়ন্ত্রণবাদী ভৌগোলিকদের তাত্ত্বিক ভিত্তি

৬) বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র অভিক্ষেপ।

জেফরি স্যাস ও তার সহযোগীদের ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ তত্ত্বের মূল উপপাদ্যগুলি কী, তার বক্তব্য কাঠামো কী তা আমরা এবার দেখতে পারি।

১) দারিদ্র্য ও জলবায়ু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মোট জাতীয় উৎপাদন (G. N. P) ও মোট জাতীয় উৎপাদনের ঘনত্ব বা G. N. P Density-এর বিভিন্ন পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পৃথিবীর ক্রান্তীয় মরু ও উচ্চভূমি অঞ্চলগুলিতে পৃথিবীর মোট জাতীয় উৎপাদনের (G. N. P.) এর মাত্র ৫.৩% থেকে ১৭% উৎপাদিত হয়। কিন্তু উষ্ণ ও শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল থেকে পৃথিবীতে মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬৭.২% উৎপাদিত হয়।

২) জেফরি স্যাস বিভিন্ন পরিসংখ্যানসমূহ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উপকূলবর্তী অঞ্চল ও সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নদী সমভূমি অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেক বেশি। মহাদেশের অভ্যন্তরীণ মহাদেশীয় ভূখণ্ডের তুলনায় উপকূলবর্তী ও নদী সমভূমি অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপকভাবে ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি দরিরদের সমাবেশ ঘটেছে মহাদেশগুলির ক্রান্তীয় ও নিরক্ষীয় অভ্যন্তর ভাগে। উপকূলবর্তী অঞ্চল ও নদীসমভূমি অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব বিশেষত জল পরিবহনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ধরা যাক প্রচুর পরিমাণ পণ্য সামগ্রী হল্যান্ডের রটারডাম বন্দর থেকে জলপথে আফ্রিকার তানজানিয়া রাষ্ট্রের দার এস সালেমে নিয়ে আসা হয় তাহলে তার খরচ হবে ১৪০০ ডলার। কিন্তু সেই পণ্য সামগ্রী যদি তানজানিয়ার উপকূলভাগ থেকে আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তরে ১২৮০ কিমি দূরবর্তী রাওয়াণ্ডা রাষ্ট্রে সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার খরচ হবে ২৫০০ ডলার। জ্বালানী তেলের দাম, সড়কপথের অবস্থা প্রভৃতির কারণে জল পরিবহনের তুলনায় সড়ক ও বিমান পরিবহন খরচ বহুল। এই কারণে মহাদেশগুলির উপকূলবর্তী অঞ্চল ও সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নদীসমভূমি অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লক্ষ করা যায়।

উপরোক্ত দুটি উপপাদ্যকে পরের পাতার সারণির পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আরো পরিষ্কার ভাবে উপস্থাপিত করা যায়—

সারণি-১

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সম্পদের বিন্যাস ও বিস্তার
(পৃথিবীর মোট ভূমিরূপ জনসংখ্যা ও G. N. P এর শতাংশের হার)

জলবায়ু অঞ্চল	উপকূলবর্তী অঞ্চল ও সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নদী সমভূমি	মহাদেশগুলির অভ্যন্তর ভাগ
ক্রান্তীয় অঞ্চল	ক্রান্তীয় অঞ্চল	ক্রান্তীয় অঞ্চল
i) ভূমিরূপ ১৯.৯%	৫.৫%	১৪.৪%
ii) জনসংখ্যা ৪০.৩%	২১.৮%	১৮.৫%
iii) G. N. P. ১৭.৪%	১০.৫%	৬.৯%
মরু অঞ্চল	মরু অঞ্চল	মরু অঞ্চল
i) ভূমিরূপ ২৬.৯%	৩.০%	২৬.৬%
ii) জনসংখ্যা ১৮.০%	৪.৪%	১৩.৬%
iii) G. N. P. ১০.১%	৩.২%	৬.৮%
উচ্চ ভূমি	উচ্চ ভূমি	উচ্চ ভূমি
i) ভূমিরূপ ৭.৩%	০.৪%	৬.৯%
ii) জনসংখ্যা ৬.৮%	০.৯%	৫.৯%
iii) G. N. P. ৫.৩%	০.৯%	৪.৪%
নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল	নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল	নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল
i) ভূমিরূপ ৩২.৯%	৮.৪%	৩০.৯%
ii) জনসংখ্যা ৩৪.৯%	২২.৮%	১২.১%
iii) G. N. P. ৬৭.২%	৫২.৯%	১৪.৩%

উপরোক্ত সারণি থেকে তাহলে পরিষ্কার হলো যে পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে পৃথিবীর মোট G. N. P এর সবচেয়ে বেশি অংশ সম্বন্ধিত হয়েছে।

৩) তৃতীয় ও পরবর্তী উপপাদ্যে ভূগোলবিদ হাটিংটনের নিয়ন্ত্রণবাদী দর্শনের একটা প্রভাব লক্ষ করা যায়। পরিবেশগত কারণে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের রোগের বিশেষত ম্যালেরিয়া ও বিভিন্ন ধরনের পেটের রোগের অস্তিত্ব বেশি লক্ষ করা যায়। এর ফলে এখানে (ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে) শিশুমৃত্যুর হার বেশি। যার ফলে বহুস্থানে দরিদ্র মানুষ শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিনিয়োগ করতে পারে না। এই সকল tropical diseases ক্রান্তীয় অঞ্চলে ব্যাপকহারে অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে।

৪) প্রাকৃতিক ভূগোল বিশেষত কোন স্থানের ভূমিরূপ মৃত্তিকার অবস্থা কৃষি অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের না শীত না উষ্ণ আবহাওয়া এবং মৃত্তিকা গম, ধান ও মেইজ চাষের পক্ষে বিশেষত অধিক উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। মহাদেশগুলির ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অভ্যন্তরভাগে জলবায়ুগত চরমতার জন্য মাটিতে জলীয়বাষ্প ও জল ধারণ করার ক্ষমতা কম তাই সেখানকার মাটি সাধারণভাবে অনুৎপাদক। নাতিশীতোষ্ণ ইউরোপের সাম্রাজ্যবিস্তারকারী রাষ্ট্রগুলি তাদের জলবায়ুভিত্তিক কৃষিব্যবস্থাকে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় উপনিবেশগুলিতে চাপিয়ে দিয়েছিল। তার ফল হলো মারাত্মক, ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

জেফরি স্যাস ও তাঁর ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্ব অন্যান্য অভৌগোলিক বিষয়গুলির গুরুত্ব স্বীকার করলেও যেকোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও এক্ষেত্রে অ্যাডাম স্মিথের মত মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নয়নের যে সকল প্যারামিটার স্যাস'রা ব্যবহার করেছেন তা কিন্তু অনেক সময় অনেকক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। জেফরি স্যাস ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলতে গিয়ে মানবিক উন্নয়নের সূচকের বিভিন্ন পরিসংখ্যান ব্যবহার করেন নি। যদি আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানব উন্নয়নসূচক (H. D. I)-এর বিভিন্ন পরিসংখ্যান লক্ষ্য করি তাহলেও কিন্তু মানব উন্নয়নের উপর ভৌগোলিক তথা জলবায়ুগত প্রভাব লক্ষ্য করব যা নিচের সারণির মাধ্যমে পরিষ্কার হয়—

সারণি—২

মানব উন্নয়ন সূচক (এইচ. ডি. আই) ২০০১

উচ্চ (মানব উন্নয়ন) সূচক প্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা	নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত রাষ্ট্রের সংখ্যা	ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা	
		উপকূল	মহাদেশীয়
		অবস্থান	অবস্থান
৪৮ রাষ্ট্র সমূহ	৩০ (U.S.A কে সমগ্র ভাবে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে ধরা হয়েছে)	১৫	৩

—মাঝারি মানব সূচক
প্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা

নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচক

প্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা

৩৬

—

২২

১৪

অন্যান্য রাষ্ট্র যাদের মাঃ উঃ

সূঃ নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচকের

প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের কম

২৯

৬

১৯

৪

উপরোক্ত সারণি ২ এর মানব উন্নয়ন সূচকের পরিসংখ্যান থেকে কয়েকটি বিষয় পরিস্কার হয় যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর ভূগোলের বিষয়গুলির প্রাধান্যকে পরিস্ফুট করে তোলে।

১) পৃথিবীর উচ্চ মানব উন্নয়ন পরিসংখ্যান বেশি লক্ষ করা যায় নাতিশীতোষ্ণ-জলবায়ু অঞ্চলের উপকূলীয় ও মহাদেশীয় ভূখণ্ডের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলিতে।

২) একইভাবে সারণি থেকে আরেকটা তথ্য পবিষ্কার হয় যে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের উপকূলে ও তার সংলগ্ন রাষ্ট্রগুলিতে মানব উন্নয়নের মান অধিক পরিমাণের।

৩) ক্রান্তীয় উপকূল ও মহাদেশীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলিতে মানব উন্নয়নের পরিসংখ্যান অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্ন থেকে মাঝারিমানযুক্ত।

একইভাবে ২০০১ সালের UNDP এর মানব দরিদ্র সূচক বা Human Poverty Index (H P.I) এর পরিসংখ্যান সমূহকে যদি কোপেনের বিশ্বজলবায়ু শ্রেণী বিভাগের মানচিত্রে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে দেখা যায় যে সবচেয়ে কম দরিদ্র মানুষ থাকছে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের ৪টি রাষ্ট্রে এবং ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের উপকূলবর্তী ১১টি রাষ্ট্রে, এবং সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষ লক্ষ করা যায় ক্রান্তীয় অঞ্চলের উপকূলবর্তী ২১ রাষ্ট্র ও মহাদেশীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত ১৫টি রাষ্ট্রে। এবার U.N.D.P ২০০১ এর Human Development Report চারটি Category এর Technology Achievement Index বা T.A.I এর সদ্য প্রকাশিত পরিসংখ্যানের সঙ্গে জলবায়ুগত পরিসংখ্যান মিশ্রিত করলে একটি কৌতূহলসূচক তথ্য বেরিয়ে আসে। T.A.I এর প্রথম পরিসংখ্যানতথ্য থেকে দেখা যায় যে পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের (Global Hubs of Technological Innovation) অবস্থান ভূগোল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—

i) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল = ২৬টি hub এর অবস্থান

ii) ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের উপকূলীয় ও সমুদ্র নিকটবর্তী নদীসমভূমিতে অবস্থিত বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রের সংখ্যা = ১৮টি

iii) ক্রান্তীয় মরুভূমি জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র = ১টি (এল গাজালা, টিউনিসিয়া)

iv) ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের মহাদেশীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রের সংখ্যা = ১টি (গাউটাং, দক্ষিণ আফ্রিকা)।

৫ T. A. I এর দ্বিতীয় পরিসংখ্যানটি আরও চমকপ্রদ। একে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিনির্মাণ করলে ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণের ধারণাটি আরও শক্তিশালী হয়।

সারণি—৩

উন্নত প্রযুক্তিতে অগ্রসর মানব সমূহ বা Leader এর সংখ্যা	উন্নত প্রযুক্তিতে অগ্রসরমান ভবিষ্যতের নেতৃত্ব দেবার সক্ষম রাষ্ট্র সমূহের সংখ্যা	উচ্চমান প্রযুক্তি গ্রহণকারী রাষ্ট্র গ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা (Dynamic Adopter)	উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে অক্ষম পশ্চাদগত রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা
মোট নেতা বা leader রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৮, তার মধ্যে ১৪টি রাষ্ট্র নাতিশীতোষ্ণ দিকে এবং ৪টি ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।	মোট ভবিষ্যতের নেতা হবার যোগ্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯, তার মধ্যে ৮টি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং ১১টি ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।	এদের মোট সংখ্যা ২৬ যাব মধ্যে ২টি ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের মহাদেশীয় ভূখণ্ডে, ৫টি ক্রান্তীয় মরুভূমি অঞ্চলে এবং ১৯টি ক্রান্তীয় অঞ্চলের উপকূল ও নদী সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত।	এই প্রান্তিক রাষ্ট্র গুলির সংখ্যা ১০ সবকটি ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত।

U. N. D. P. এর ২০০১ সালের পরিসংখ্যানগুলি ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিন্তাধারাকে স্থাপিত করতে সাহায্য কবে বলে মনে হয়। যদিও প্রশ্ন জাগে, যার উপযুক্ত উত্তর প্রবন্ধের নির্দিষ্ট স্থানে দেওয়া যাবে।

তাত্ত্বিক বিনির্মাণ

এতক্ষণ যা আলোচনা করা হলো তা নিম্নলিখিত ছকে দেওয়া যেতে পারে—

ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী ধারণা
(মেম্পল হাটিংটনের চিন্তাধারা)

অ্যাডাম স্মিথের
Wealth of Nations

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূগোল প্রভাব

এই তিন মিলিয়ে স্যাস, মেলিনগার ও গ্যালপের ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্ব ও তার উপপাদ্য সমূহের সংক্ষিপ্তকরণ হচ্ছে—

i) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলসমূহ জলবায়ু ও অন্যান্য ভৌগোলিক প্যারামিটারগত কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত।

ii) ক্রান্তীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি ক্রান্তীয় মহাদেশীয় ভূখণ্ডের তুলনায় উন্নততর।

iii) ভৌগোলিক বিষয়গুলি বিশেষত জলবায়ু, মাটি, ভূমিরূপ অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপরে সবারকমের প্রভাব বিস্তার করে। স্যাসদের মূল যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু প্রশ্ন জাগে, সেই প্রশ্নগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া যেতে পারে—১) ভূগোল বিষয়েই ভৌগোলিক তথ্য পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণবাদীদের বিরুদ্ধে বিষয়গত ও বিষয়ীগত তাত্ত্বিক কাঠামোর সৃষ্টি হয়। তার নাম দেওয়া হয় সম্ভাবনাবাদ বা Possibilism। এই চিন্তাধারার জনক হলেন ফরাসী ভৌগোলিক ভিদাল দ্য লা ব্লাশ (Vidal de La Blache ১৮৪৫-১৯১৮)। এদের মতে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ মানুষের সামনে অনেকগুলো সম্ভাবনা বা সুযোগ তুলে দেয়। মানুষ তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রযুক্তির সাহায্যে উপযুক্ত সম্ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজেদের উপযোগী করে পরিবর্তিত করে নিজস্ব জীবনযাত্রা প্রণালী গড়ে তোলে। যেমন ধরুন রাজস্থানের পশ্চিমভাগের গঙ্গানগর জেলা ষাটের দশকেও যেখানে থর মরুভূমির বালুকণা বিস্তার যথেষ্ট পরিমাণ ছিল এবং agricultural output ছিল শূন্যের কোঠার সামান্য উপরে। নব্বইয়ের দশকের মধ্যে একটি চমকপ্রদ প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটল যা হচ্ছে পাঞ্জাবের সাটলেজ নদী ব্যবস্থা থেকে রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলা পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী ক্যানেল নির্মাণ যার সাহায্যে এই জেলায় জলসেচের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এর ফলে গঙ্গানগরে কৃষির ফলন সবুজায়ন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে ভৌগোলিক অবস্থানও হার মেনেছে। অনেক সময় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদের কিছু সরলীকৃত ধারণার সমালোচনা করা যায়। যেমন ধরুন নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে আমরা দুটি ভৌগোলিক অবস্থানে ভাগ করতে পারি—

i) পশ্চিম ইউরোপ, U. K., কানাডা, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A এর একটি বড় অংশ কিন্তু ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত)কে নিয়ে গঠিত উন্নত পশ্চিমি রাষ্ট্রের মণ্ডলী বা OECD।

ii) পূর্ব ইউরোপ, বাশিয়া সহ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকাংশ রাষ্ট্র সমূহ (C.I.S এর অংশবিশেষ)।

আবার ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে ছটি ভৌগোলিক অবস্থানে ভাগ করতে পারি—

(i) লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ন অঞ্চল

- (ii) পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়া
- (iii) আরব ও উত্তর আফ্রিকীয় রাষ্ট্রসমূহ
- (iv) দক্ষিণ এশিয়া
- (v) সাব-সাহারীয় বা কৃষ্ণ আফ্রিকা
- (vi) নগণ্য-উন্নয়নশীল রাষ্ট্রেরা বা L.D.C

এবার যদি বিভিন্ন মানব উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিসংখ্যানগুলিকে উপরোক্ত ভৌগোলিক অবস্থানে ভাগ করি তাহলে ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী ধারণা পাব তা পূর্বের মত সরলীকৃত নয়।

সারণি-৪

আয়ের পরিমাণ

(G.D.P per capita P.P.P. US\$)

১৯৯৯

আয়ের পরিমাণ	ভৌগোলিক অঞ্চলের নাম
২২০০০	OECD
৭০০০	লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ন দ্বীপপুঞ্জ
৬৮০০	পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়া ও CIS এর অংশবিশেষ
৪৮০০	আরব ও উত্তর আফ্রিকীয় রাষ্ট্রসমূহ
৪৫০০	পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়া
২৪০০	দঃ এশিয়া
২০০০	কৃষ্ণ আফ্রিকা
১৮০০	L.D.C.

সারণি নং ৪ থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর অন্তর্গত পশ্চিমি ধনী দেশগুলির কৃষ্ণগত। কিন্তু একই জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ায় চিত্রটা অন্যরকম। ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে তা উপকূলীয়, মহাদেশীয় ভূখণ্ড বা মরুভূমি অঞ্চলে যে কোনো রাষ্ট্রই হোক না কেন সেখানে আয়ের পরিমাণে করুণ অবস্থা দেখা যায়।

পরের সারণির তথ্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সারণি-৫

মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (১৯৮৫—purchasing price parity U.S.\$)
আয়ের আঞ্চলিক বৈষম্য ও বৃদ্ধির হার

১৯৬০ সালে আয়ের পরিমাণ	১৯৯৮ সালে আয়ের পরিমাণ	অঞ্চলের নাম
৬০০০	১৮০০০	OECD (উচ্চ আয়ের পশ্চিম রাষ্ট্রসমূহ)
২৫০০	৫০০০	লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ন অঞ্চল
১০০	২৫০০	পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়া
১০০	৮৫০	দক্ষিণ এশিয়া
১০	১২০	সাবসাহারা আফ্রিকা ও L.D.C

পৃথিবীর সব অঞ্চলগুলিতে গত ২৪ বছরে আয় বেড়েছে কিন্তু পশ্চিম দেশগুলিতে বেড়েছে কয়েকগুণ যা অন্য অঞ্চলগুলি এই কয়েকটি বছরে ধরতে পারেনি।

একইভাবে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পৃথিবীর কোন অংশে, বেশি অনুভূত হয় ও তার ব্যবহারও কতটা পরিমাণ দেশের মানুষের কাছে পৌছাতে পেরেছে তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

সারণি-৬

ইন্টারনেট ব্যবহার (মোট জনসংখ্যার শতাংশের হার)

অঞ্চলের নাম	১৯৯৮	২০০০
U.S.A.	২৬.৩	৫৪.৩
OECD (U.S.A বাদে পশ্চিম নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় রাষ্ট্রসমূহ)	৬.৯	২৮.২
লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ন অঞ্চল	০.৮	৩.২
পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়া	০.৫	২.৩
পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়া	০.৮	৩.৯
আরব ও উত্তর আফ্রিকীয় রাষ্ট্রসমূহ	০.২	০.৬
সাবসাহারা আফ্রিকা	০.১	০.৪

দক্ষিণ এশিয়া	০.০৪	০.৪
সমগ্র বিশ্ব	২.৪	৬.৭

৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত পশ্চিম দেশগুলিতে গত দুই বছরে ইন্টারনেটের অধিক ব্যবহার প্রমাণ করে ঐ সকল দেশে উন্নত ধরনের প্রযুক্তির উপর জনগণের অনুপ্রবেশ অনেক বেশি। যা অন্যান্য অঞ্চলে খুবই কম। ক্রান্তীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলের পশ্চাদপসরতা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। আবার মানব উন্নয়ন সূচকের পরিসংখ্যান একই ভৌগোলিক অবস্থানে যদি ভাগ করি তা হলে তার পরিসংখ্যানগত উপলব্ধি অন্যরকম হয়।

সারণি-৭

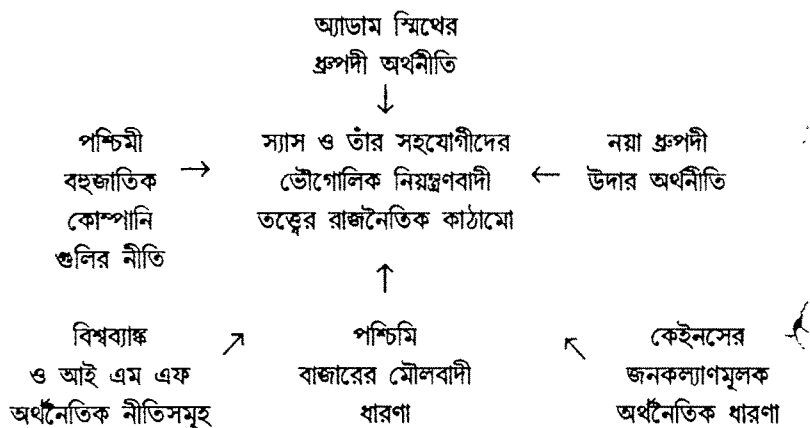
পূর্ণ বয়স্ক সাক্ষরতার পরিমাণ
(মোট জনসংখ্যার শতাংশের হিসেবে)

১৯৮৫	১৯৯৯	অঞ্চল
৯৮	৯৮	OECD
৯৮	৯৮	পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়া
৮২	৮৮	লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ন অঞ্চল
৭৫	৮৫	পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়া
৪৫	৬২	আরব ও উত্তর আফ্রিকীয় রাষ্ট্রসমূহ
৪৪	৬০	সাবসাহারা আফ্রিকা
৪৫	৫৫	দক্ষিণ এশিয়া
৩৮	৫২	L.D.C

৭নং সারণি থেকে দেখা যায় গত ১৪ বছরে সারা পৃথিবী জুড়ে পূর্ণবয়স্ক সাক্ষর মানুষের শতাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে আরব ও উত্তর আফ্রিকায় (১৭% বৃদ্ধি) সাবসাহারান আফ্রিকায় (১৬%) এবং L.D.C তে (১৪%)।

উপরোক্ত পরিসংখ্যানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদের তথ্যসূত্র মধ্যে একটা পরস্পর বিবোধিতা ও dualism লক্ষ করা যায়। জেফরি স্যাসেব ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিষয়গুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ চালাতে বাধ্য। যেমন ধরা যাক ব্রেজিল সরকার গমের উৎপাদনে স্বনির্ভরতা আনার জন্য উত্তর ব্রেজেলিয় আমাজন অববাহিকার অরণ্যহীন অংশে যদি উপযুক্ত প্রযুক্তি

মাধ্যমে গম চাষের প্রসার ঘটায় তাহলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই ধরনের প্রকৃতি নির্ধারিত সমাপনে বা conclusionএ আসার পেছনে কি কোন অন্য যুক্তি আছে—তা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গমের রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—এই ধরনের প্রশ্নগুলি উঠে আসে। যে কোন অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বের সৃষ্টিব পেছনে কোন আর্থসামাজিকরাজনৈতিক কারণ আছে—সেটা কীরকম? স্যাস ও মেলিনগারের ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্বের রাজনৈতিক পরিকাঠামো কী ধরনের তা নিম্নের ছকের মাধ্যমে অনুভব করা যায়—



ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব স্বীকার করে ঠিকই, কিন্তু নয়া গ্রুপদীপন্থী উদার অর্থনীতিবিদরা পশ্চিমী “নাতিশীতোষ্ণ” জলবায়ুযুক্ত রাষ্ট্রসমূহের ক্রান্তীয় অঞ্চলের উপনিবেশ স্থাপনের ফলে যে নয়া অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি হয়েছিল তা পরিষ্কার ভাবে এড়িয়ে যান। প্রথমে ক্রান্তীয় অঞ্চলের নির্দিষ্ট রপ্তানী কাঠামোকে ধ্বংসের মাধ্যমে সেখানে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা স্থাপন করা হয় বা সেখানকার মূল অর্থনৈতিক কাঠামোকে ধ্বংসের মাধ্যমে একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা স্থাপন করে। স্যাসের নিয়ন্ত্রণবাদ কি সেই ঔপনিবেশিক কাঠামোকে বজায় রাখার চেষ্টা নাকি যাতে ক্রান্তীয় অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলি সমগ্র বিশ্বঅর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল (dependent) হয়ে পড়ে তাদের নিজস্ব স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠতে না পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর অন্যান্য আর্থিক বিষয় ছাড়াও প্রাকৃতিক ও সামাজিক ভূগোলের বিষয়গুলো প্রভাব বিস্তার করে তার প্রকাশধর্মিতা বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হয়। কিন্তু সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে নিজস্ব স্বনির্ভর হওয়া কি সত্যি সম্ভব নয় যা অবশ্যই স্বনির্ভরতার সঙ্গে বিশ্বায়নের মধ্যে যুক্ত থাকবে? বিনির্মাণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ক নির্দিষ্ট ভাবে ভাবতে হবে যা পরবর্তী অংশের

আলোচনায় আসবে। সামগ্রিকভাবে ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোকে বিনির্মাণ করলে চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়—

(i) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুভূক্ত অঞ্চলসমূহ পৃথিবীর পূজিবাদী ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্র (core) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ব্যাপক কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। কিন্তু এই পুঞ্জি ও প্রযুক্তির কেন্দ্রীভবনের পেছনের ভৌগোলিক কারণসমূহের সঙ্গে ঔপনিবেশিক কারণসমূহকে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

(ii) ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের উপকূলবর্তী অঞ্চল এখানে outer periphery হিসেবে কাজ করছে। এই অঞ্চলগুলিতে প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে শিল্প ও কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে যা পশ্চিম-নিয়ন্ত্রিত (নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল কেন্দ্রিক) বিশ্বায়নের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে গণ্য।

(iii) ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের মহাদেশীয় ভূখণ্ডের অঞ্চলগুলি যা সমুদ্র থেকে দূরবর্তী তারা inner periphery হিসেবে গণ্য। যাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। তারা বিশ্ব পুজিবাদী বাজারে খনিজসম্পদ, শক্তিসম্পদ ও কৃষিজ কাঁচামাল রপ্তানি করে।

(iv) চতুর্থ বিনির্মিত ধারণা আসে উপরোক্ত তিনটি ধারণা থেকে। সমগ্র বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থার যেন আঞ্চলিকীকরণ করা হয়েছে যেখানে

(অ) অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সমগ্র সেবামূলক কার্য, কিছু ভারি ও হালকা শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষনামূলক কার্য নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় পশ্চিমি রাষ্ট্রসমূহে কেন্দ্রীভূত।

(আ) ভারি শিল্প, খনিজভিত্তিক ও কৃষিজভিত্তিক শিল্প ও কাঁচামালের প্রাপ্তিস্থান হিসেবে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের স্থানগুলি কাজ করে।

(ই) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত বহুজাতিক পুঞ্জি ও ফাটকা পুঞ্জি ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এইভাবে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলির জোট বা OECD বিশ্ব পুজিবাদী ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এক্ষেত্রে তাদের দুর্বল সহযোগী বা comprador হিসেবে কাজ করছে ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ—এটাকেই বলা যেতে পারে বিশ্বায়নের ভৌগোলিক ব্যাখ্যা। প্রশ্ন উঠতে পারে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে। এক্ষেত্রে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পৃথিবীর প্রথম সারির ৫০০টি বহুজাতিক কোম্পানির মধ্যে ৪১০টি কোম্পানি মূলত উদ্ভূত হয় OECD ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি থেকে (Fortune পত্রিকা June সংখ্যা)। ভারতের একটি মাত্র কোম্পানি ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (IOC) Fortune পত্রিকার এই তালিকাভুক্ত। এই ধরনের বৈষম্যমূলক বিশ্বায়ন ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত কি না সেই প্রশ্ন জাগতে পারে।

ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী ধারণার মধ্যে এক ধরনের ফ্যালাসি লক্ষ করা যায়— অর্থনৈতিক উন্নয়নের অধিক সার্থকতা ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উপকূলবর্তী

অঞ্চলে ও নদীসমভূমি অঞ্চলে লক্ষ করা যায় সমুদ্র থেকে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে। তা কিন্তু ভারতের মত বৃহৎ আকৃতির রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে অন্য ধারণা পোষণ করে। যা নীচের সারণী থেকে পরিষ্কার হবে।

সারণি-৮

ভারতে গরীব মানুষের সংখ্যা (মোট জনসংখ্যার % হিসেবে)

রাজ্যের নাম	কোন অঞ্চলে অবস্থান	১৯৯৩ সালে গরীব মানুষের %	১৯৯৯ সালে গরীব মানুষের %
১) পাঞ্জাব	সমুদ্র থেকে দূরবর্তী	১২	৬
২) হরিয়ানা	স্যাটলেজ/শতদ্রু		
	সমুদ্র অঞ্চলে অবস্থিত	২৫	৯
৩) U.P	উচ্চ ও মধ্যগাঙ্গেয়	৪১	৩১
৪) বিহার	সমভূমি সমুদ্র থেকে দূরবর্তী অবস্থান	৫৫	৪৩
৫) পশ্চিমবঙ্গ	নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি ও গাঙ্গেয় বদ্বীপ নিয়ে গঠিত, দক্ষিণ ভাগ বঙ্গোপসাগরের পাশে অবস্থিত	৩৬	২৭
৬) গুজরাট	কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ কচ্ছ উপদ্বীপ ও দঃ গুজরাট সমভূমি দিয়ে গঠিত, দক্ষিণ ভাগ সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত	২৪	১৪
৭) মহারাষ্ট্র	পশ্চিমভাগ আরবসাগরের নিকটে অবস্থিত	৩৭	২৫
৮) উড়িষ্যা	সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত	৪৯	৪৭
৯) কেরালা	সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত	২৫	১৩
১০) তামিলনাড়ু	সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত	৩৫	২১
১১) অন্ধ্রপ্রদেশ	দঃ ও দঃ পূর্ব ভাগ সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত	২২	১৬
১২) কর্ণাটক	পশ্চিমভাগ সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত	৩৬	২০

১৩) রাজস্থান	সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত	২৭	১৫
১৪) মধ্যপ্রদেশ	সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত	৪৩	৩৭

(সেঙ্গাস ২০০১ থেকে নেয়া)

৮নং সারণির পরিসংখ্যান থেকে কতকগুলি ধারণা সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে—

(i) উত্তরভারতের দুটি রাজ্য পাঞ্জাব ও হরিয়ানা সমুদ্রের থেকে দূরবর্তী, নদী গঠিত সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে গত ৬ বছরে নিশ্চিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সদর্থক প্রভাবে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

(ii) উড়িষ্যা রাজ্যের বড় অংশ বঙ্গোপসাগরের নিকটে অবস্থিত কিন্তু সেখানে গত ছয় বছরে গরীব মানুষের হ্রাসের পরিমাণ মাত্র ২%

(iii) কেরালা বাদে বাকি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে গত ছয় বছরে গরীব মানুষের সংখ্যার হ্রাসের পরিমাণ ৪-১২%।

পরিসংখ্যানগুলি থেকে দেখা যায় সামগ্রিক ভাবে ভারত ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে হলেও তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য ভূ অবস্থানের উপর নির্ভরশীল নয়। সামগ্রিকভাবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা সমুদ্র থেকে দূরবর্তী নদী গঠিত সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত হলেও সেখানে স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্ভর কৃষি অর্থনীতি, কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়নের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি সদর্থক প্রভাব দেখা যায় কিন্তু উড়িষ্যা সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত হলেও রাজ্যের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর শক্তিহীনতা প্রাকৃতিক পরিবেশের ধ্বংসসাধন করেছে এবং সেখানে অর্থনৈতিক উন্নতি সেরকম ঘটেনি। ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদের এই বিভ্রান্তি (fallacy) অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ভূগোলের প্রভাবের যৌক্তিকতায় কিছু প্রশ্ন তোলে যা আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কতটা প্রযোজ্য সেই সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

ভৌগোলিক প্রভাবের যৌক্তিকতা

আজকের এই ইন্টারনেট ডটকমের যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর ভূগোলের প্রভাব সত্যি কি আছে বা থাকবে এই প্রশ্ন উঠতে পারে। ইন্টারনেট নাকি পৃথিবীর সমস্ত ভৌগোলিক বাধাকে দূর করে তাকে এক ছোট নিবিড় সম্পর্কযুক্ত আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছে। ভৌগোলিক বাধা যে দূর করেছে এই কমপিউটারের যুগ তা অস্বীকার করা যায় না। তবে সামগ্রিকভাবে ভূগোল যে এই ইন্টারনেটের যুগকে প্রভাবিত করে তা

তিনভাবে বিশ্লেষণ করা যায়—

i) বর্তমান যুগে হাইস্পিড ডিজিটাল সাবসক্রাইবার লাইন বা DSL ইন্টারনেট ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটি অবশ্যই একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন করা দরকার—অর্থাৎ এক্ষেত্রে D.S.L এর অবস্থান কোথায় হবে তা স্বাধীন ধারণা সম্পন্ন নয়, সেটি স্থানবিশেষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ii) আধুনিক মহানগরীগুলিতে বিশেষত পশ্চিম রাষ্ট্রগুলির নগরীগুলিতে

ইন্টারনেটের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, এর ফলে বিপুল পরিমাণ তথ্য ও তথ্যপ্রবাহের আদানপ্রদান ঘটেছে ও এই তথ্যসমূহকে একত্রে একটি স্থানে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কমপিউটার-অর্থনীতির ভাষায় যেখানে এই সকল তথ্যের একত্রীভবন ঘটে তা Server Farm বা Data Centres অথবা Web Hotels বলা হয়, মূলত নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত এইসব বৃহৎ আকৃতির বাসস্থান দেখা যায় যেটি অবশ্যই প্রধান বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থার নিকটে অবস্থিত হবে।

(iii) ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে তথ্যপ্রবাহের মধ্যে ভৌগোলিক বন্ধন ছিল না, পৃথিবীর যেকোন দেশে তার আগমন বাধামুক্ত ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, রুচি ও অন্যান্য আর্থসামাজিক অবস্থা ইন্টারনেটের তথ্যপ্রবাহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে Geolocation প্রযুক্তির যার সাহায্যে যেকোন সার্ভার ফার্ম তার ইন্টারনেট উপভোক্তার রাষ্ট্রীয় অবস্থান জেনে সেই রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও স্বাগত তথ্য প্রবাহ তাকে দিতে পারবে। আরও সহজ করে বলতে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সের ফ্যাশান টিভির একটি ফ্যাশান শো FTV এর ইন্টারনেট এডিশনেও দেখানো হচ্ছে। এই ফ্যাশান শো-এর দৃশ্যাবলী অবশ্যই ইরান ও সৌদি আরবের মত রক্ষণশীল ইসলামিক রাষ্ট্রে স্বাগত নয়। সেক্ষেত্রে সার্ভার ফার্ম এই Geolocation প্রযুক্তির মাধ্যমে ফ্যাশান শো সংক্রান্ত তথ্যকে ইরান বা সৌদি আরবে আসতে দেয় না। উপরোক্ত ইন্টারনেট তথ্য প্রবাহ, লক্ষ করা যাচ্ছে, পরোক্ষভাবে নানাবিধ ভৌগোলিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ভৌগোলিক প্রভাবের যৌক্তিকতাকে শক্তিশালী করে। কিন্তু কিভাবে—সেক্ষেত্রে স্যাস, মেলিনগার ও গ্যালপের সংকীর্ণ ধারণা নয়—তার ব্যাপকতা আরও বেশি। যদি মেনে নেওয়া হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর অন্যান্য প্রভাবের মত ভৌগোলিক প্রভাব লক্ষ করা যায় তাহলে যেকোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনার আগে একটি ভৌগোলিক পরিকল্পনা রচনা করা দরকার। এই পরিকল্পনা (ভৌগোলিক) রচনার তৈরির উপাদান/ 1001গুলো কীভাবে আসে তা বুঝতে স্যাসদের কাছে আমাদের শিখতে হয় এবং অবশ্যই নিজস্ব কিছু ধারণার সৃষ্টি করতে হয়। এই উপাদানগুলি কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রভাবগুলির সামগ্রিকতা ধারণ সাহায্য করে।

কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিকল্পনাব মূল উপাদানসমূহ —

১) কমপিউটার মডেলিং ও কৃত্রিম উপগ্রহ চিত্র দ্বারা ও অন্যান্য তথ্যপ্রবাহ দ্বারা গঠিত ভৌগোলিক তথ্যপ্রবাহ বা G. I. S ব্যবস্থা

২) প্রাকৃতিক ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়সমূহ যেমন ভূমিরূপের গঠন, ভূমিরূপের ঢাল, নদীর প্রকৃতি, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তথ্য, মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য, স্বাভাবিক উদ্ভিদজৈব প্রকৃতি, আবহাওয়া ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় জাতিসত্তাগত বৈশিষ্ট্যসমূহ—এই সমস্ত বিষয়গুলির অতীত থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত গঠিত তথ্যপুঞ্জের সমষ্টি

- ৩) বিভিন্ন জরিপ সংস্থার দ্বারা গঠিত বিভিন্ন আকারের Topo মানচিত্র, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সংগৃহীত চিত্র থেকে গঠিত স্যাটেলাইট ইমেজেরি মানচিত্র
৪) বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র অভিক্ষেপ
৫) অঞ্চলটির ভূগোলের ইতিহাস, যা আবার কতকগুলি ভাগে বিভক্ত,
যেমন—

আঞ্চলিক ভূগোলের ইতিহাস

ভূমিরূপের ও নদীর বিবর্তনের ইতিহাস	ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস	প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ইতিহাস	অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস	রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ইতিহাস
			জলবায়ুর বিবর্তনের ইতিহাস	লোকসংস্কৃতি ও লোকধর্মের ইতিহাস

- ৬) প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণের ইতিহাস
৭) অঞ্চলটির মানচিত্রগত পরিবর্তনের তথ্যসহ মানচিত্রসমূহ
৮) স্থানীয় মানুষের শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাস
৯) অঞ্চলটির প্রশাসনিক কাঠামো এবং সেটির সঙ্গে রাষ্ট্রের উপরিকাঠামোর সঙ্গে সংযোগের ব্যবস্থাসমূহ। এই উপাদানগুলির সাহায্যে অঞ্চলটির ভৌগোলিক বিষয়গুলি তৈরি হবে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনায় তা সাহায্য করে।
একটি সংক্ষিপ্ত আকারে কেস স্টাডি করলে ব্যাপারটা বোঝা যায়। বর্তমান প্রবন্ধকার অধ্যাপনা সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে পশ্চাদপদ জেলা পুরুলিয়ার একটি কলেজে কর্মরত। সমগ্র পুরুলিয়া জেলাটির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ ভৌগোলিক উপাদান আছে যেগুলি উল্লেখ করা যায়—
১) জেলার অবস্থান অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ—পুরুলিয়া জেলা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বনিজসম্পদ ও শিল্পের সমৃদ্ধ অঞ্চল, বর্তমান জেলার শিল্পাঞ্চল ও কয়লাবলয় এবং মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার কৃষি অর্থনীতি সমৃদ্ধ পশ্চাদভূমির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত
২) সামগ্রিকভাবে জেলাটি ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বদিকেব ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ হিসেবে গণ্য
৩) জেলাটির পশ্চিম, দঃ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি ও ক্ষুদ্র পাহাড় অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত
৪) পুরুলিয়া জেলার উত্তর, উত্তর পূর্ব ও পূর্বভাগ মূলত তরঙ্গায়িত প্রায়সমভূমি

গঠিত, যার উপরে বিভিন্ন স্থানে অপেক্ষাকৃত কঠিন আগ্নেয়শিলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। যাদের স্থানীয় কুরমালী ভাষায় “ডুংরি” ও ভূগোলের ভাষায় “মোনাডনক” বলে। এই তরঙ্গায়িত সমপ্রায়ভূমিকে উত্তর থেকে দক্ষিণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

i) দামোদর উপত্যকা (ii) দামোদর কংসাবতী দোয়াব অঞ্চল (iii) দামোদর দ্বারকেশ্বর ও দ্বারকেশ্বর কংসাবতী জলবিভাজিকা অঞ্চল (iv) কংসাবতী কুমারী জলবিভাজিকা অঞ্চল (v) পূর্ব ও দঃ পূর্ব ভাগের সুবর্ণরেখা সমভূমি; প্রত্যেকটির গড় উচ্চতা ১৫০-৩০০ মিটার।

৫) জেলার নদীগুলি মৌসুমী বৃষ্টিব জলে পুষ্ট ফলে সাবাবছর জল থাকে না

৬) জেলার জলবায়ু ক্রান্তীয় শুষ্ক মৌসুমী প্রকৃতির। যেখানে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উত্তাপ ও শীতকালে অধিক শীতলতা দেখা যায়। জেলার বড় অংশে ক্রান্তীয় আর্দ্র ও শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য দেখা যায়।

৭) পুরুলিয়ার অধিকাংশ মাটি আগ্নেয়শিলার আবহবিকারজনিত কারণে পুঞ্জীভূতভাবে গঠিত greinic soil এর যার ফলে ভূগর্ভস্থ জলেব ভাণ্ডারের পরিমাণ কম।

৮) জেলার উত্তর-পূর্বপ্রান্ত নেতুরিয়া থানা এলাকায় দামোদর কয়লাবলয়ের কতকগুলি খনি রয়েছে।

৯) মূলত আমন ধান মূল ফসল। যদিও ভূট্টা আখ প্রভৃতিও চাষ করা হয়।

এবার যদি জেলার মূল প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি লক্ষ করা যায় দেখব কোন না কোন ভাবে তারা ভৌগোলিক উপাদান সম্পর্কিত—

১) জলবায়ুগত চরমতার জন্য গরমকালে মূলত এপ্রিল মে মাসে ও শীতকালে ডিসেম্বর মাসে প্রভূত জলকষ্ট দেখা যায় যা কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে প্রচুর অসুবিধার সৃষ্টি করে।

২) পূর্বেই বলা হয়েছে জেলার উত্তর প্রান্তে নেতুরিয়া থানা এলাকায় কিছু কয়লাখনি অঞ্চল রয়েছে যাদের কিছু সমস্যা রয়েছে, যেমন—

i) এই এলাকার পারবেলিয়া, রানীপুর ও ভামুরিয়া অঞ্চলের প্রায় সব কয়লাখনিতে কয়লার সঞ্চয় শেষ হয়ে আসছে। অথচ এই অঞ্চলগুলির মানুষের এক বড় অংশের জীবিকা কয়লাখনি ও সংশ্লিষ্ট অংশের সঙ্গে যুক্ত।

ii) একইভাবে পরিত্যক্ত খনিগুলি থেকে বেআইনিভাবে কয়লা সংগ্রহের ফলে অঞ্চলে ব্যাপক সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ ঘটছে।

iii) নেতুরিয়া থানার বড় অংশে কয়লাখনি থাকার জন্য অনেক জমিতে ব্যাপকভাবে মৃত্তিকা ক্ষয় হয়েছে ফলে সেখানে আর কৃষিকার্য হয় না।

৩) জেলার আর্থসামাজিক পরিকাঠামোতে উচ্চবর্ণীয় বাঙালি হিন্দু, মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী, বাউরি এবং কুর্মি মাহাতো সম্প্রদায়গুলির আধিপত্য লক্ষ করা যায় যা বিভিন্ন

ধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ বলে গণ্য হয় ও অন্যান্য জনজাতির কাছে পরোক্ষ শক্তার কারণ হয়ে উঠে।

৪) কংসাবতী কুমারী অববাহিকা অঞ্চলে বর্ষাকালে অধিক জলের উপস্থিতির কারণে আকস্মিক বন্যা (যাকে স্থানীয় সাঁওতালরা বলেন “হড়পা বান”) প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করে।

৫) জেলার পশ্চিম ও দঃ পূঃ ভাগের কিছু স্থানে স্বাভাবিক উদ্ভিদ ব্যাপকভাবে ছেদনের ফলে ব্যাপক মৃত্তিকা ক্ষয়।

৬) অন্যান্য জেলার মত পুরুলিয়াতেও আর্দ্র ও শুষ্ক পর্ণমোচী যে অরণ্য জায়গায় জায়গায় দেখা যায় সেখানে ঠিকাদার শ্রেণী ও তাদের সেবকদের হাতে সেই অরণ্য প্রায় শেষ হয়ে যেতে চলেছে। এক্ষেত্রে অরণ্যের স্বাভাবিক সন্তান যে আদিবাসীরা তারা একসময় তাদের ধর্মীয় সামাজিক কাঠামোর সাহায্যে যে অরণ্যকে রক্ষা করত, আজ তা করতে পারছে না।

অন্যান্য সমস্যা থাকলেও এই সমস্যাগুলি পুরুলিয়া জেলায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যাগুলির মোকাবিলার জন্য যদি কিছু ভৌগোলিক বিষয়গুলির সাহায্য নেওয়া হয় তাহলে তা এক পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক উন্নয়ন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই ভৌগোলিক উপাদানগুলির সাহায্য নিতে হবে যেমন—

১) এটা ঘটনা যে পুরুলিয়া জেলায় ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার করা কৃষিকার্যে সম্ভব নয়, তাহলে বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে শুষ্ক মরশুমে বিশেষত শীতকালে রবিশস্যের চাষ সুবিধা হয়। প্রশ্ন হলো কীভাবে তা করা সম্ভব। তিন ভাবে তা করা যেতে পারে—

ক) এই জেলায় পুরোনো আমল থেকে পুকুর দীর্ঘির অভাব নেই। এগুলির যথাযথ সংস্কার প্রয়োজন। এর জন্য অবশ্যই পঞ্চায়েত ও স্বচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগে জাতধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে সামিল করতে হবে যার ফলে বিভিন্ন জাত ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামাজিক সমস্যাগুলি আছে তা দ্রুত নির্মূল হয়।

খ) এই জেলায় ছোট ছোট নদী বা “জোড়ের” অভাব নেই। সেখানে ছোট ছোট বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে তাকে সারা বছর চাষের কাজে লাগানো সম্ভব। সাম্প্রতিককালে রঘুনাথপুর সাবডিভিশনের রামচন্দ্রপুরে এই ধরনের একটি প্রকল্প সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

গ) পুরুলিয়া জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় বা ডুংরি এবং residual hills বা মোনাডনকেব অভাব নেই। এই ধরনের উচ্চভূমির নিম্নঢালে ছোট ছোট জলাধার public participation এর মাধ্যমে নির্মাণ করা সম্ভব যেখানে বৃষ্টির জল পাহাড়ের মাথা থেকে ঝড়িয়ে পড়ার সময় নিম্নঢালের জলাধারে সঞ্চিত হবে ও শুষ্ক মরশুমে জলসেচের কাজে লাগবে। একইসঙ্গে এই জলাধারগুলিতে মাছের চাষ করা সম্ভব।

২) জেলাব উত্তরভাগে নেতুবিয়া থানা এলাকায় কয়লাখনি অঞ্চলের পরিত্যক্ত

খনিজুলিতে বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকা দৃঢ়কারী ঘাসের/তৃণের চাষ করা যেতে পারে। যে সকল কোলিয়াড়ি পরিত্যক্ত জলপূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে তাকে প্রাকৃতিক হুদে পর্যবসিত করে ছোটখাটো পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা যায়।

৩) কংসাবতী ও কুমারী নদী অববাহিকায় ব্যাপক পরিমাণে মৃত্তিকা ক্ষয় নিবারণের জন্য ছোট ছোট চেক-ডাম নির্মাণ করতে পারা যায় এবং ব্যাপক হারে বনসৃজনের মাধ্যমে তা হড়পা বানকে রোধ করবে।

৪) অরণ্যাক্ষলগুলিকে, সেখানকার অরণ্যের রক্ষাকে অধিকারকে আদিবাসীদের পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দিতে হবে।

পূর্বলিয়ার জলবায়ু, ভূমিরূপের ঢাল ও প্রকৃতি, মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য জানাচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের মিলেট, বাদাম, ইক্ষু, ভুট্টা, তুরজাতীয় ডাল প্রভৃতি খাদ্য উৎপাদনের দিকে কৃষি পরিকল্পনাকারীদের নজর দেওয়া উচিত। এছাড়া কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত, চিত্র, কম্পিউটার মডেলিং এর সাহায্যে গঠিত G.I.S. প্রযুক্তি, ব্যাপক field survey প্রভৃতির মাধ্যমে সমগ্র জেলার সম্পদ-মানচিত্র তৈরি করা যায় যা অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ব্যাপকভাবে কাজে লাগে।

কতকগুলি প্রশ্ন উঠে আসতে পারে—

- ১) এই বিপুল তথ্যসংগ্রহের কাজ কারা করবে এবং কীভাবে করবে?
- ২) ভৌগোলিক বিষয়ে প্রভাবিত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অনির্ভরতার অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি কী?
- ৩) এক্ষেত্রে বাজারের ভূমিকা কী হবে? পরের অংশে এই উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ভৌগোলিক প্রভাব থেকে অনির্ভর ধারণার বিকাশ

আগের অংশের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়াব আগে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ ও বিশ্বায়নের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে লেখা যেতে পারে যেটা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হিসেবে গণ্য করা যায়। পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভৌগোলিক জলবায়ুগত দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ করা যায় যে সামগ্রিক ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা ও কাঠামোর উপর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের প্রভাব প্রচণ্ড। এক্ষেত্রে USA এর নাতিশীতোষ্ণ ও উপক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রভাব নিয়ে বলতে হবে। অর্থাৎ এই পশ্চিম-নিয়ন্ত্রিত নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্বব্যাপী একটি (একাধিক) পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে একাধিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে এই নতুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যা বিশ্বায়নের জয়গান করছে তা কি এককধর্মী বা, অবিভাজ্য। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা চালানোর জন্য দুটি প্রধান শক্তি ও একাধিক অপ্রধান শক্তি লক্ষ্য করা যায়। দুটি প্রধান শক্তি হলো পুঁজিশক্তি

বা financial power এবং শক্তিসম্পদ বা energy power। এই পুঁজিশক্তি অবশ্যই বহুজাতিক যদিও তার প্রধান ঘাঁটি হলো নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ ও ক্রান্তীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলের comprador উপশক্তি। শক্তিসম্পদ মূলত খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসে অধিক কেন্দ্রীভবন লক্ষ করা যায় ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের মহাদেশীয় ভূখণ্ড, উপকূলীয় অঞ্চল ও মরুভূমি এলাকাগুলিতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভৌগোলিকভাবে খণ্ডিত যে বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাজনীতি পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি সারা বিশ্বের উপর চাপাতে চায়—সেই নব সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যধর্মী ক্রিয়ার কতকগুলি খণ্ডিত প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়, যেমন—

১) এ ঘটনা সত্য যে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের তৈলসম্পদ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর পশ্চিমী বহুজাতিকদের আধিপত্য এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই আধিপত্য তৈরি করেছে আরব ও মধ্য এশিয় compradorদের যাব সাহায্যে পশ্চিমী দুনিয়া তৈলসম্পদ সহজে পায় ও পশ্চিমী অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় থাকতে পারে। কিন্তু এই আধিপত্যের তলায় লুকিয়ে আছে আরেকটা পালটা আধিপত্যের লাভ। সেই পালটা আধিপত্যের প্রেরণা আসে ঐ comprador অর্থনীতির বর্ধিত ও গচ্ছিত পুঁজি মারফৎ যার উদ্ভব তৈলসম্পদের ও ভৌগোলিক অধিকার বোধ থেকে। এই চেতনার আবেগে আরব, ইরানীয় পুঁজিবাদের সৃষ্টি হয় যা পশ্চিমী আধিপত্যকারী পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই প্রতিক্রিয়া যেন “অর্জুনের বিভিন্ন শ্রেণীর তীর” দ্বারা গঠিত। কখনও সে আরব জাতীয়তাবাদী কখনও প্যানইসলামী মৌলবাদী। পশ্চিমের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে সে রুখতে চায় তার নিজস্ব ভৌগোলিক অর্থনৈতিক সুবিধার সাহায্যে।

২) একই ধরনের প্রতিক্রিয়া, পালটা আধিপত্যের ইচ্ছা ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার রাষ্ট্রের সীমানার ভিতরে ও বাইরে লক্ষ করা যায়। পুরো ব্যাপারটা যেন বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক পুঁজিবাদ ও অর্থনৈতিক জোটের মধ্যে বন্ধ। অনেকটা নিচের ছকের সাহায্যে পরিষ্কার হয়—

অর্থনৈতিক ভৌগোলিক সুবিধা

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা

ধর্মীয় ভাবাবেগ

স্থানীয় স্বনির্ভর অর্থনীতি

উপস্থিতি (চীন ও ভারতের

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

ক্রান্তীয় পেরিফেরিয়র comprador দের পুঁজিবাদী হবার ইচ্ছা

compradoreদের বর্ধিত পুঁজির
সাহায্যে স্থানীয় বহুজাতিক
কোম্পানির গড়ে ওঠার ইচ্ছা

পশ্চিমের সঙ্গে অর্থনৈতিক
সহযোগিতা ও রপ্তানিনির্ভর
বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে
বর্ধিত পুঁজির সৃষ্টি

ক্রান্তীয় অঞ্চলে পশ্চিম আধিপত্যের
ফলে সৃষ্ট কালো-অর্থনীতির লাভা
উদ্‌গীরণ

পশ্চিমের ভৌগোলিকভাবে খণ্ডিত
উৎপাদন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার
ফলে ক্রান্তীয় পৃথিবীতে দরিদ্রের
সংখ্যা অসহনীয়ভাবে বৃদ্ধি।

এরা সবাই মিলে তৈরি করেছে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় খণ্ড প্রতিক্রিয়া, যা শেষত পশ্চিমি রাষ্ট্রের আধিপত্য মানতে বাধ্য হয়—এই পশ্চিমি রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন ও বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের এই ধরনের খণ্ড প্রতিক্রিয়া বিদ্রোহকে আমরা একত্রে Tropical Revolt বা ক্রান্তীয় বিদ্রোহ বলতে পারি। এই বিদ্রোহ শোষণ ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধাচরণ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নতুনভাবে দেওয়ার ইচ্ছা, বর্ধিত পুঁজির বিনিয়োগের জায়গা খোঁজা, জনসংখ্যা বিস্তারণ, স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্ভর অর্থনীতির বিকাশ—প্রভৃতি ইচ্ছাশক্তির এক সংমিশ্রণ যেন। এই বিদ্রোহ খণ্ডবিশিষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় সিয়টিলে, জেনেভায়, জেনোয়ায় আবার কদর্যরূপে ১১ সেপ্টেম্বর W.T.C আক্রমণের মাধ্যমে; আবার এই খণ্ড বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের পুঁজিবাদের সহযোগিতামূলক বাণিজ্য ছোট গড়ে ওঠে। এইভাবে বিশ্বায়নের কতকগুলি নির্দিষ্ট দ্বন্দ্ব-বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে—

১) বিশ্বায়নের প্রথম দ্বন্দ্ব হলো পশ্চিমি আধিপত্যকারী পুঁজিবাদী ও ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় নবউদ্ভিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাসমূহের দ্বন্দ্ব

২) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরযুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব যেগুলি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতি ও ভাষাগত আবেগ ও পরিচয়ের মোড়কে থাকে

৩) বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যবিত্তদের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক সংগ্রামের মূল কারণ শ্রেণী উত্তরণ ও ভৌগোলিক আধিপত্য বিস্তারের ইচ্ছা থেকে।

এই যে বিশ্বায়নের অবস্থা সেখানে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠবে কীভাবে? এই যুগে যে স্বনির্ভর ব্যবস্থা গড়ে উঠা দরকার তার নাম দেওয়া যেতে পারে যৌক্তিক স্বনির্ভরতা বা র‍্যাশানাল জু-চে। 'জু-চে' শব্দটি ধার করেছি কোরিয় ভাষার শব্দ ভাণ্ডার থেকে যার অর্থ স্বনির্ভরশীলতা। এই যৌক্তিক স্বনির্ভরশীলতা বা র‍্যাশানাল জু-চে কোন রাষ্ট্র বা অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুক্তিবাদকে গুরুত্ব দেয়। এই অর্থনৈতিক যুক্তিবাদী উন্নয়নের ধারণা গড়ে উঠে কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের সম্পদসমূহের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় ও সুযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে। এই যৌক্তিক স্বনির্ভরতার উপর ভিত্তি করে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তার মূল ধারণাগুলো পরিষ্কার করে লেখা যেতে পারে—

১) অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থানীয় প্রাকৃতিক ভূগোলের বিষয়সমূহ ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে খেয়াল করে রচিত হবে।

২) বিভিন্ন অঞ্চলে যে যৌক্তিক স্বনির্ভরশীলতার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তা হবে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতামূলক।

৩) এই সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে যদি সেই সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে বহুদলীয় উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জনকল্যাণমূলক বাজার কাঠামোর উপর।

৪) এই জনকল্যাণমূলক বাজার র‍েষ্টায়ন্স ও বেসরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন শ্রেণীর সমন্বয়ের দ্বারা গঠিত সমবায় সংস্থা দ্বারা গঠিত হবে।

৫) অঞ্চলটির রাজনৈতিক কাঠামোতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা ফ্রন্টের বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মসূচি যদি করা হয় তার থেকে অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটা common উন্নয়নভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মসূচি গড়ে তোলা যেতে পারে, যা রূপায়িত করতে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক সংস্থা, স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি ও সমবায়সংস্থা নির্দিষ্ট জনকল্যাণমূলক ধর্ম নিরপেক্ষ আইন অনুশাসনের মাধ্যমে। এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বড় অংশ অঞ্চলের জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগঠিত হবে।

৬) বাজারের বর্ধিত লাভ ও পুঁজির কিছু অংশ প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে ব্যবহৃত হবে।

৭) যৌক্তিক স্বনির্ভরতার এই নীতি গড়ে উঠবে বিভিন্ন খণ্ড প্রক্রিয়া, ক্রিয়া ও খণ্ডিত একাধিক বিপ্লবী গোষ্ঠী বা পরিবর্তনকারী রাজনৈতিক শক্তির মাধ্যমে যা অবশ্যই ব্যক্তি স্বাধীনতা, বহুদলীয় গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী হবে।

৮) এই র‍্যাশানাল জু-চে প্রচেষ্টা প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ, ভৌগোলিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে ও ব্যক্তিমানুষ ও সামগ্রিক শ্রেণীব ভোগের ইচ্ছার মধ্যে এক ভারসাম্য ব্যবস্থা আনার চেষ্টা করবে তার যুক্তিবাদী ধারণার মাধ্যমে। যৌক্তিক স্বনির্ভরতা অনেকটা পশ্চিমী পুঁজিবাদের ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রতিক্রিয়ার যে দ্বন্দ্ব তার উপরের স্তর হিসেবে পরিগণিত হবার চেষ্টা করবে যাতে পৃথিবীর পরিবেশের সংরক্ষণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের ভোগ নিয়ন্ত্রিতভাবে

সম্পন্ন হয়। এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকল্পতত্ত্বের প্রয়োগিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিবর্তনমুখী নমনীয় রাজনৈতিক দর্শনের কথা ভাবতে হবে। বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি সেখানকার সম্পদের যথাযথ সমীক্ষণের তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। এই স্বনির্ভর অর্থনীতির মাধ্যমে দেশে ভিতরের আঞ্চলিক বৈষম্যকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। একদিকে এই স্বনির্ভরতার অর্থনীতি বিভিন্ন ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল জাতিসত্তার/বিকাশে সহায়ক হবে। অপরদিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ও অঞ্চলের মধ্যে সাম্যনীতিযুক্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতার সৃষ্টি হবে। সেই সৃষ্টি হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্বায়ন। এই অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য দরকার বিভিন্ন ধরনের পরস্পরবিরোধী পরিসংখ্যানের মধ্যে সামঞ্জস্য ও অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদের যথাযথ তথ্যগ্রহণ। না হলে দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যের মত হবে। যার অবস্থা মানব উন্নয়ন সূচকে অনেক উপরে হলেও সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থায় দক্ষিণ ভারতের ‘বিহার’ বলে পরিগণিত, মধ্যপ্রাচ্যের রপ্তানুলিতে দক্ষ শ্রমিক যোগানের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত, কৃষি ও শিল্পে নিদারুণভাবে ব্যর্থ একটি রাজ্য। কেরালার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেখানকার স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সমীক্ষণের মাধ্যমে হয় নি তাই “কেরালা মডেল” ব্যর্থ হয়েছে বলে বলা হচ্ছে।

এই যুক্তিবাদী অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য দরকার একটি সভ্য সমাজ ও একাধিক বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তি যারা অবশ্যই একদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবে, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও আঞ্চলিক সম্পদ সমীক্ষণে উৎসাহী হবে, শ্রদ্ধাশীল হবে ধর্মনিরপেক্ষতায় বহুদলীয় গণতন্ত্রে, ব্যক্তি স্বাধীনতায় ও জনকল্যাণমূলক বাজার অর্থনীতির উপর। এইভাবে গড়ে উঠবে বিকল্প মানবতাবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব যার ভিত্তি হবে একটি প্রগতিশীল নমনীয় সাম্যমনস্ক বিবর্তনমুখী রাজনৈতিক দর্শন যার কথা আমাদের ভাবার সময় এসেছে।

এই প্রবন্ধ রচনার সময় যে সকল পত্রপত্রিকা, পুস্তক, টোপো মানচিত্র এবং report কাজে এসেছে তার তালিকা—

- ১) Scientific American, মার্চ ২০০১ সংখ্যা
- ২) ইকনোমিস্ট, জুন ২-৪-২০০১ সংখ্যা
- ৩) ইকনোমিস্ট, আগস্ট ১১-১৭-২০০১ সংখ্যা
- ৪) ইকনোমিস্ট, জুন ১৬-২২-২০০১ সংখ্যা
- ৫) ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ, অক্টোবর ৪, ২০০১ সংখ্যা
- ৬) ডাউন টু আর্থ পত্রিকার Sept এর ১৫.৩০ এবং Oct ১৫ ও ৩০, ২০০১ এর চারটি সংখ্যা
- ৭) মার্কস’স ইকোলজি : মেটারিয়ালিজম এণ্ড নেচার—জন বেলোমি ফস্টার (মাহুলি রিভিউ প্রেস)

- ৮) নয়গণতন্ত্র—মাও জে দঙ (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড)
- ৯) সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ—সুকোমল সেন (ঐ)
- ১০) ভূগোল চিন্তার বিকাশ—কুস্তলা লাহিড়ী দত্ত (ওয়ার্ল্ড প্রেস)
- ১১) ই. হানটিংটন—সিডলাইজেশন এণ্ড ক্লাইমেট (নিউ হেভেন কন, ইয়েল ইউনিভারসিটি প্রেস)
- ১২) মজিদ হুসেন—কালচারাল জিওগ্রাফি (আনমল পাবলিসারস লিমিটেড, নিউ দিল্লি)
- ১৩) ঐ—এডুলেশন অফ জিওগ্রাফিক্যাল থট (রাওয়াত পাবলিশার্স, জয়পুর)
- ১৪) নেচার অব জিওগ্রাফি—আর হার্টশোন (রাওয়াত পাবলিশার্স, জয়পুর)
- ১৫) ওয়ার্ল্ড ডেভালপমেন্ট রিপোর্ট ২০০২ (ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও OUP)
- ১৬) হিউম্যান ডেভালপমেন্ট রিপোর্ট ২০০১ (UNDP এবং OUP)
- ১৭) দ্য নিউ থার্ড ওয়ার্ল্ড—সম্পাদনা : এ গণজালেজ ও যে নরউইন (ওয়েস্টভিউ প্রেস, লণ্ডন)
- ১৮) দ্য অলটারনেটিভ টু ক্যাপিটালস সোস্যাল অর্ডার—আই মেসজারোস (কে. পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানি)
- ১৯) পেটেন্টস মিথস এণ্ড রিয়ালিটি—বন্দনা সিভা (পেঙ্গুইন)
- ২০) গ্রোথ এণ্ড ডেভালপমেন্ট—এ. পি. থিরওয়াল (ম্যাকমিলান প্রেস লিমিটেড)
- ২১) হোয়েন করপোরেশনস রুল দ্য ওয়ার্ল্ড—ডেভিড মি কোরটেন (আদার ইণ্ডিয়া প্রেস)
- ২২) অন ইমপ্রিয়ালিস্ট গ্লোবলাইজেশন : টু স্পিচেস—ফিডেল ক্যাস্ত্রো (লেফট ওয়ার্ল্ড)
- ২৩) ডিপলিটিসাইজিং ডেভালপমেন্ট : দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এণ্ড সোস্যাল ক্যাপিটাল—জে. হ্যারিস (লেফট ওয়ার্ল্ড)
- ২৪) বাজার অর্থনীতি সমাজতন্ত্র ও মানবধর্ম—রতন খাসনবিশ (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স)
- ২৫) ধনতন্ত্র বিশ্লেষণ : মার্কস, কেইনস এবং শুমপিটার—হীবেন্দ্রনাথ রায় (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)
- ২৬) পুরুলিয়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য (ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড)
- ২৭) West Bengal District গেজেটিয়ার্স পুরুলিয়া (১৯৮৫)
- ২৮) District Statistical Hand Book Purulia ১৯৯৬ এবং ১৯৯৭ (Govt of West Bengal)
- ২৯) ওয়ার্ল্ড অর্ডারস : ওল্ড এণ্ড নিউ—নোয়াম চমস্কি (OUP)
- ৩০) ইণ্ডিয়ান কারটোগ্রাফার, ভল্যুম ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬ (জার্নাল অব ইণ্ডিয়ান কারটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশন)

- ৩১) সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায় নিম্নলিখিত টোপো মানচিত্রসমূহ
৭৩(I/১০), ৭৩(I/১১), ৭৩(I/১৩), ৭৩(I/১৪) ও ৭৩(I/১৫)
- ৩২) বুদ্ধির মুক্তি : নব্যমানবতাবাদ—প্রভাতরঞ্জন সরকার (আনন্দমার্গ পাবলিকেশন)
- ৩৩) অ্যান এনকোয়্যারি ইনটু দ্য নেচার এণ্ড কসেস অফ দ্য ওয়েলথ অফ নেশনস
—অ্যাডাম স্মিথ (মর্ডান লাইব্রেরি, ১৯৯৪)
- ৩৪) দ্য ওয়েলথ এণ্ড পভার্টি অব নেশনস : হোয়াই সাম আর মোর রিচ এবং সাম
মোর পুওর—ডে. এস. ল্যাণ্ডেস (ডব্লু ডব্লু নর্টন, ১৯৯৮)।
- ৩৫) আই টি শপার ইন্ডিয়া, বর্ষ ৪ সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারি ২০০১

বিশ্বায়ন ও পরিবেশ

রবীন মজুমদার

সম্পাদক মহাশয়কে জুলাই ২০০০ নাগাদ কথা দিয়েছিলাম ‘বিশ্বায়ন ও পরিবেশ’ নিয়ে একটি লেখা দেব, অক্টোবরের পরে। প্রবন্ধটি লেখার জন্য মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিলাম, একটি কাঠামোর আদল গড়ে উঠছিলো, ঠিক তখনই ঘটলো বিপর্যয়। প্রথমে ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকায় যাত্রীবাহী বিমান দিয়ে সন্ত্রাস হানা—ভেঙে পড়লো নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুটি গর্ভোদ্ধত স্তম্ভ এবং ওয়াশিংটনে পেন্টাগনের সদর দপ্তরের একাংশ। তারপর আফগানিস্তানের উপর আমেরিকার ঝাপিয়ে পড়া। আমেরিকার ব্যাখ্যায়—পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার যুদ্ধের প্রথম ধাপ; প্রধান সম্বেদনাজন ওসামা বিন লাদেনকে জীবিত বা মৃত পাওয়ার লক্ষ্যে এবং ওসামার আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা তালিবান সরকারকে উচ্ছেদ করতে ‘অনন্ত ন্যায়ের’ লক্ষ্যে তাদের এই অভিযান।

নতুন শতকের নবতম এইসব বিপর্যয় নিয়ে পৃথিবী এখন উত্তাল। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের স্তম্ভদ্বয় ভেঙে পড়া যদি প্রতীকী অর্থে আমেরিকার গর্ব অহঙ্কার ও উচ্চতার ভেঙে পড়া হয়, তাহলে আফগানিস্তানের উপর আমেরিকার এই আক্রমণও মানবতা ন্যায় ও সভ্যতার ভাঙনের প্রতীক। আমার প্রবন্ধের ‘মনগড়া’ কাঠামোও এসব ঘটনা বা দুর্ঘটনায় বিধবস্ত হয়ে গেল। কিন্তু এক নতুন সত্য প্রতিভাত হলো আমার কাছে—যা ‘বিশ্বায়ন ও পরিবেশ’ ভাবনায় খুবই প্রাসঙ্গিক। আর সেটাই আমার এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

বিশ্বায়ন—দুই ধারা

বিশ্বায়ন তথা গ্লোবালাইজেশন বলতে সাধারণত ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের (WTO) ছত্রছায়ায় বিশ্বজোড়া বাণিজ্যের লক্ষ্যে চলা কার্যধারাকেই বোঝানো হয়। ১৯৪৭ সালে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত নিরোধ-সমস্যার মধ্যস্থতার জন্য গড়ে উঠেছিল গ্যাটি (GATT-জেনাবেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যাণ্ড ট্যারিফ)। কতকগুলি ‘বাউণ্ড’ আলোচনার ধাপ বেয়ে উকণ্ডয়ে রাউণ্ড আলোচনাকালে গ্যাটি তার ক্ষেত্রকে সুদূর বিস্তৃত করে বিশ্ববাণিজ্যের প্রধান নিয়ামক হয়ে উঠল। ১৯৯৫ সালে তা গ্রহণ করল নতুন এক সাংগঠনিক রূপ—ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন তথা WTO—বিশ্বজোড়া মুক্ত-

বাণিজ্যের মূল নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

দুনিয়া জোড়া মুক্ত বাণিজ্যের হাতছানিতে আকৃষ্ট হবার উপাদানের অভাব নেই। প্রত্যেক দেশেরই আছে নিজস্ব সম্পদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। সেগুলি রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে চাঙা করার, বেশি লাভ করার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সবাই শুধু বেশি লাভ করবে এমন অবস্থা স্বাভাবিক নয়। আর বিশ্ববাণিজ্যের উপাদান এখন শুধু পণ্যই নয়—কৃষি, ওষুধ স্বাস্থ্য, শিক্ষা-গবেষণা, ক্রীড়া-সংস্কৃতি, বিনোদন এমনকি মেনে-প্রেম-ঈর্ষাও আজ বাণিজ্যের উপাদান, অতএব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে WTO-র নিয়ন্ত্রণাধীন।

WTO বা তার কর্মকাণ্ড আমাদের মূল আলোচ্য নয়। কিন্তু যেটা উল্লেখ্য তা হলো এই যে বিগত প্রায় এক দশকের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে নিম্নদুক তথা সমালোচকদের কথা মিথ্যা নয়। অবাধ বিশ্ববাণিজ্যের পথ চলা এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশে বিপর্যয় নেমে এসেছে। এইসব দেশের বণ্টানিযোগ্য পণ্যের বাজার উন্নত দেশগুলিতে তেমন বাড়ে নি। খাদ্য ও ওষুধপত্রের দাম বেড়ে চলেছে, উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল অনেক দেশই কৃষিতে ভর্তুকি কমিয়ে ফেলেছে, ফলে কৃষি ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে, আমদানি বাড়ছে। উন্নত দেশগুলিতে কিন্তু কৃষি-ভর্তুকি অব্যাহত। বিভিন্ন সমীক্ষায় ধরা পড়ছে যে উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচের জনসংখ্যা বাড়ছে। জীবনদায়ী ওষুধের জন্যও চড়া দামে বহুজাতিক কোম্পানির মুখাপেক্ষী থাকতে হচ্ছে।

ভারত শুরু থেকেই WTO-র সদস্য। যা আশা করা হয়েছিল তার প্রায় কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। ভারত থেকে বস্ত্র ও পোষাকের বণ্টানি বেড়েছে সামান্যই। মালেরিয়া, কুষ্ঠ, অস্ট্রিক, এইডস ইত্যাদি জনস্বাস্থ্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ রোগ প্রতিরোধে অগ্রাধিকার নেই। প্রয়োজনীয় ওষুধও হচ্ছে বা প্রয়োজনমত দেশে তৈরি করতে পারবো না। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাধারণভাবে খাদ্য ও স্বাস্থ্যের নিবাপত্তা ভীষণভাবে বিমিত। এমনকি সম্প্রতি দোহা বৈঠকে যোগ দিতে যাবার আগে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর মুখেও শোনা গেল—WTO উন্নত দেশের পেশীপ্রদর্শনের স্থান, ভারতবাসীর কাছে ভিলেনে পবিগত হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলি WTO-র বিভিন্ন চুক্তি—কাঠামো সংস্কার, কৃষিনীতি, আমদানি-রপ্তানি, মেধাস্বত্ব ইত্যাদি—নিযে এতই জেরবার যে ব্রাজিল সম্প্রতি পেটেন্ট-চুক্তি লঙ্ঘন করে জনস্বাস্থ্যে প্রয়োজনে এইডসের ওষুধ নিজের দেশেই তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের উপর বোঝা ও ঋণ যে কী ভয়ানকভাবে নেমে আসছে তার আঁচ পাওয়া যায় আমেরিকার উদ্ভিদেও। অ্যানথ্রাক্স আতঙ্কগ্রস্ত আমেরিকা সম্প্রতি হুমকি দিয়েছিল যে অ্যানথ্রাক্সের ওষুধের দাম যদি পেটেন্টের অধিকারী কোম্পানিরা না কমায় তাহলে সেও পেটেন্ট আইন না মেনে নিজেই ওষুধ তৈরি করবে। এতে কাজ

হয়, জার্মান কোম্পানি ওয়ুথের দাম কমিয়ে ফেলে অর্ধেক। WTO-তে আমেরিকাই প্রধান খেলোয়াড়, তাবই উচ্চাস ও আগ্রহ সবথেকে বেশি অথচ বিপদে পড়লে যে সেও চুক্তি-ভঙ্গ করতে পিছপা হয় না—তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি। উন্নত দেশগুলিতেও জনসাধারণের একাংশ WTO নির্দেশিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বীতশ্রদ্ধ ও হতাশ।

WTO-র বিশ্বায়নের প্রায় সমান্তরালভাবে কিন্তু চলছিল আর এক বিশ্বায়নের বিকাশ। সেটা হলো দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন (Sustainable Development)-এর বিশ্ববীক্ষার বিকাশ।

মানুষ ও পরিবেশের আন্তঃসম্পর্কের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উদ্ঘাটন, প্রকৃতি-পরিবেশের অন্তর্নিহিত ক্রিয়াপদ্ধতির উন্মোচন, পরিবেশ ও উন্নয়নের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তার নবচেতনার জাগরণ এই বিশ্বায়নের ভিত্তি। এসবের সূত্র ধরেই প্রতিভাত হয়েছে যে পরিবেশগতভাবে পৃথিবী-গ্রহ নানা অর্থেই এক ও অখণ্ড। পৃথিবীই এখনও পর্যন্ত জ্ঞান একমাত্র জীবাদার। এখানে প্রাণের প্রবাহ ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে, ইকোলজির নিরিখে, মানুষের ভূমিকা গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ-অণুজীব বা পশু-পাখির সঙ্গে একই সারিতে; এক অর্থে, এমনকি, গৌণও। খাদ্য-শৃঙ্খলে মানুষের অবস্থান একেবারে শেষ ধাপে। ফলে মানুষ না থাকলেও জীব-প্রাণ থাকবে, কিন্তু গাছপালা বা অণুজীব না থাকলে মানুষের অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই, আমরা, মানুষরা, যদি অন্যান্য জীব ও অজীব উপাদানের অপরিহার্যতা উপেক্ষা করি, ঘনিয়ে আসবে নিজেদেরও বিপদ। আবার, পৃথিবীর প্রতিটি মানবগোষ্ঠীই পরম্পরনির্ভর। যে বাতাসে আমরা সকলেই শ্বাস নিই, অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহার করি সেটাকে দূষিত-কলুষিত করার একপেশে অধিকার কারো নেই। জল-মাটি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু অনেকটা অন্যায়ভাবেই—আমরা বাতাস-জল-মাটির অংশবিশেষ নিজ নিজ দেশের কৃত্রিম গন্তীর ভিতর নিয়ে বা পেয়ে যথোচ্চাচার করেছি, করছি। ইতিমধ্যেই আমরা পার্থিব পরিবেশের কিন্তু মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতি করে ফেলেছি। এ থেকে উদ্ধারের জন্য এবং নতুন করে পরিবেশকে বিষিয়ে নষ্ট না করার জন্য পৃথিবীবাসীর প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে, প্রকৃত সহমর্মী অংশীদার হিসেবে আমাদের তা পালন কবতে হবে।

কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও অস্বীকার করা যাবে না—তথ্য দিয়েই তা প্রমাণিত—যে পৃথিবীবাসীর প্রত্যেকের দায়িত্ব সমান নয়। কারণ পার্থিব সম্পদের ভোগ সকলের সমান থাকে নি। ভোগের পরিমাণের সঙ্গে পরিবেশ-দূষণ সরাসরি সম্পর্কিত। কাজেই যারা দরিদ্র, পার্থিব-সম্পদের ন্যায্য অংশের ভোগ থেকে বঞ্চিত তাদের দায় আর যারা ভোগ-সম্পূর্ণ এমনকি অতি ভোগে আসক্ত তাদের দায় একরকম হতে পারে না। আর অনাগত মানুষদেরও যে একটি সুস্থ উৎপাদনশীল পরিবেশ পাবার অধিকার আছে, কোন মানুষই তা অস্বীকার করতে পারে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ধীরে ধীরে এই বিশ্বভাবনার বিকাশ ঘটেছে। এবং তাতে রাষ্ট্রপুঞ্জ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪৮ সালে (১০ ডিসেম্বর) মানবাধিকার ঘোষণাপত্র দিয়ে তার সূত্রপাত ধরা যায়। ১৯৫০-৭০ প্রায় দশক ধরে আমেরিকা-ইউরোপ প্রত্যক্ষ করেছে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান বিরোধী জন আন্দোলন, ছাত্র-যুব আন্দোলন। কখনও তা নিয়েছে পবমাণু অস্ত্র বিরোধী, যুদ্ধ-বিরোধী, শাস্তিকামী আন্দোলনের রূপ, কখনও তা নিয়েছে নারী বিদ্বেষ ও বৈষম্য বিরোধী, নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের রূপ, আবার কখনও বা পরিবেশ সুরক্ষার আন্দোলনের রূপ। বিজ্ঞানও সমান তালে এগিয়েছে, এইসব আন্দোলনের পাথেয় জোগান দিয়েছে। সমস্তবকম আন্দোলন কেমন করে একত্ৰোতে মিশে গেল—বেগবান করে তুলল প্রকৃতি পরিবেশ-মানবাধিকার-উন্নয়নের আন্দোলনে—তার ইতিহাস কিছু কিছু পাওয়া যায় (যেমন জন উইলি অ্যাণ্ড সন্স প্রকাশিত জন মাককরমিথের বই—দি গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল মুভমেন্টস, দ্বিতীয় সং, ১৯৯৫)। অন্যত্র আনীত তার কিছু কিছু তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি (বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, ২২ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন-জুন, ২০০০ এবং ‘বিতর্কিকা’, পরিবেশ সংখ্যা, ২০০০)। এসবেরই ফলশ্রুতি ১৯৭২-এর জুন মাসে স্টকহোমের মানবপরিবেশ সম্পর্কিত রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে সংগঠিত মহাসম্মেলন। নানাদিক থেকে এই সম্মেলন ছিল যুগান্তকারী।

উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশ (১১৯টি) এই প্রথম যুদ্ধ বা বাণিজ্যের বাইরে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করল, এবং একমত হয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল বা বলা যায় করতে বাধ্য হলো, যা দশ বছর আগেও ভাবা যেত না। স্টকহোম পরবর্তী এক দশকের মধ্যে পরিবেশ-কেন্দ্রিক নানা নির্দিষ্ট আইনকানুন তৈরি হয়েছে, শুধু উন্নত দেশেই নয়, স্বল্পোন্নত অনুন্নত প্রায় সব দেশেই। বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয়, আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং পার্থিব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানাবিধ আইন ও নীতিনিয়ম গৃহীত হয়েছে। ভারতে যেমন গঙ্গাদূষণ প্রতিরোধে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তেমনি দানিয়ুব বা মেকং নদীর অববাহিকা অঞ্চলের দেশগুলি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। জলাভূমি সংরক্ষণ, মরুপ্রসার রোধ, ওজোনস্তরের সুরক্ষা, অস্ত্রবৃষ্টির প্রকোপ কমানো, পৃথিবীর তাপমাত্রার উর্ধ্বগতিরোধ—ইত্যাদি নিয়েও গৃহীত হয়েছে আন্তর্জাতিক আচরণবিধি এবং সেসব অনুসরণে প্রণীত হয়েছে সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় আইনকানুন, বিধিনিয়ম। পরিবেশ ভাবনা বিস্তৃততর হয়ে অঙ্গীভূত করেছে উন্নয়ন ভাবনাকেও—এসেছে সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট তথা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের ধারণা।

স্টকহোমের কুড়ি বছর পরে ১৯৯২-তে জুন মাসে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে বসে পরিবেশ-সম্পর্কিত দ্বিতীয় মহাসম্মেলন—ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন এনভায়রনমেন্ট অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট (UNCED), বসুন্ধরা সম্মেলন (Earth Summit) নামে যা জনপ্রিয়। এতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দেশগুলির ছুটি বাদে সব দেশ (মোট ১৭৬টি)

অংশগ্রহণ করে। ২৭টি নীতিসম্মিলিত ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। পাশাপাশি পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ঠেকানোর লক্ষ্যে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দুটি সমঝোতা-দলিলও অনুমোদনের জন্য রাখা হয় (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC এবং Convention on Biological Diversity, CBD)।

স্টকহোম থেকে রিওঁর এই পরিক্রমাকালে পরিবেশ আন্দোলন রাষ্ট্রীয় থেকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং অবশেষে নতুন এক মাত্রা পেয়ে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের এক পার্থিব বিশ্ববীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো।

রিওঁর বসুন্ধরা সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে, ১৯৮৭-তে গঠিত হয় ব্রানডটল্যাও কমিশন। পরিবেশ ও উন্নয়নের সম্পর্ক বিচার করে এই কমিশন (ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট) ‘আওয়ার কমন ফিউচার’ শীর্ষক এক প্রতিবেদন পেশ করে। এতে উপস্থাপিত হয় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি। কমিশন বলে, ‘এটি এমন এক উন্নয়নপ্রক্রিয়া যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতাকে খর্ব না করেও বর্তমানের প্রয়োজন মেটাতে পারবে।’ আরও বলা হয় যে অধিকতর স্বচ্ছল ও সম্পন্ন যারা তাদের এমন এক জীবনধারা গ্রহণ করতে হবে যাতে সম্পদ (সংগ্রহ ও ব্যবহারের) সীমা লঙ্ঘিত হবে না এবং সব মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো ও উন্নততর জীবনের স্বপ্ন পূরণে সকলের সামনে সমান সুযোগ প্রসারিত হবে,...দরিদ্র মানুষরা পার্থিব সম্পদের ন্যায্য অংশের অধিকার পাবে এবং উন্নতি ধরে রাখতে পারবে—বিশ্বজোড়া দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন তবেই সফল হবে।

প্রচলিত অর্থে আমরা উন্নয়ন বলতে যা বুঝি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের ধারণা তা থেকে আলাদা। উন্নত দেশের বা মানুষের উন্নতির মূলে আছে পার্থিব সম্পদের অন্যান্য বৃহদংশের ভোগ। আর তা থেকেই সৃষ্টি হয় বেশি বেশি দূষণ, প্রকৃতি পরিবেশের নিরাময়-অযোগ্য ক্ষতি ও অসুখ। তাই বেশি ভোগ, বেশি অর্থ উপার্জন, বেশি বেশি শক্তি খরচের মধ্য দিয়ে না হয় মানুষের উন্নয়ন, না সুবক্ষিত থাকে পরিবেশ। আজকের দিনের উন্নয়ন-ভাবনায় তাই গুরুত্ব পাওয়া উচিত মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে পরিবেশের বন্ধুত্ব ও সহাবস্থানের সম্পর্ক—পারস্পরিকতা যা ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য। অর্থনীতিবিদরাও উন্নয়নের প্রকৃতি সন্ধান করেন—নানা ভাবে তারা প্রচলিত উন্নয়ন-ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের ত্রুটি-বিচ্ছাদিত-অসম্পূর্ণতার বিচার-বিশ্লেষণ করে চলেছেন এবং যথার্থ উন্নয়নের দিকনির্দেশ করা প্রয়াস পাচ্ছেন। একটি ব্যাপারে অনেকেই সহমত—শুধু ভোগতৃপ্তিই উন্নয়নের লক্ষ্য হতে পারে না; মানবোন্নয়ন হলো মানুষের সক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রসার। যেমন, অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেন—প্রকৃত উন্নয়ন ও স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। উন্নয়নের পথে চলতে চলতে ব্যক্তিমানুষ ক্রমশ বেশি বেশি করে কতকগুলি ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতা উপভোগ করার দিকে মুক্ত হয়, তাব বেছে নেবার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন, তাই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার পাশাপাশি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ বৈষম্যের বিলোপ, বিরোধ ও বৈরিতার অবসান, মানবোন্নয়ন এবং পরিবেশের উন্নত অবস্থার সংরক্ষণ—এ সব কিছুকেই এক সামগ্রিক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে। লাগাতার আলাপ-আলোচনা-পর্যালোচনা-গবেষণা এবং সুনির্দিষ্ট সাধারণ লক্ষ্যের দিকে পৃথকীকৃত দায়ভাগ বহন কবে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের দিকে এগোতে হবে। দরিদ্রতম যারা, উদবপ্তিহী যাদের এখনও প্রধান সমস্যা, পরিবেশ ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের স্বার্থে তাদের আরও স্বার্থত্যাগ করতে বলা যুক্তি ও বাস্তবসম্মত নয়। অপরদিকে অপচয়ী ও অবক্ষয়ী ভোগে যারা অতিসম্পৃক্ত তাদেরকে বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে পৃথিবীর রোগ নিরাময়ে। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের বিশ্ববীক্ষার এই হলো অতিসংক্ষিপ্ত একটি রূপরেখা।

বিশ্বায়নের দুই ধারার সংঘাত : বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার উত্থান

স্পষ্টতই, বাণিজ্য বিশ্বায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের বিশ্বায়ন দুই-বিপরীত মেরুর প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতৃত্বে ও মধ্যস্থতায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন-সম্পর্কিত নীতি ও প্রক্রিয়া যত স্পষ্ট হতে থেকেছে, ভোগবাদীরা ততই সন্ত্রস্ত হয়েছে, সচকিত হয়েছে, পাল্টা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ও তাকে জোরদার করায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। যাবতীয় দূষণ ও তছনিত অবক্ষয়ের দায় যত বেশি করে তাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক গবেষণাদির তথ্য যতই তাদের বিরুদ্ধে গেছে, যত বেশি করে বোঝা গেছে যে উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ, জল-বাতাসের মত পার্থিব এজমালি সম্পদ উন্নত দেশেরই ভোগের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে—ততই ভোগবাদীরা প্রমাদ গুনেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ ও তার বহুবিধ শাখা-সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ পদে যাতে তাদেরই প্রবক্তারা মোতায়েন থাকে, সে ব্যাপারে ভোগবাদীরা সদা সচেষ্ট। তা সত্ত্বেও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ভাবনার বিকাশ ও সে সম্পর্কে সচেতনতার প্রসার স্তব্ধ করা যায় নি। অবশেষে রিপোর্ট সম্মেলনে যখন দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ভাবনা প্রায় পূর্ণ রূপ পেল এবং তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ হলো, তখনই মুক্ত বিশ্ববাণিজ্যকেও তুলে ধরা হলো উন্নয়নের একমাত্র পন্থা হিসেবে, WTO প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা পেল এক সাংগঠনিক আধার। আমেরিকা—বিশেষত শিল্পে সামরিক আধিপত্যবাদী আমেরিকা—এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু তাকে সহায়তা দেবার জন্যও মুখিয়ে ছিল অনেকে—এমনকি উন্নয়নশীল দেশের ভোগবাদীরাও। তাদের কাছে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নকে গ্রহণ করা আর তাদের মৃত্যুপরোয়ানায় নিজে হাতে সই করা সমার্থক।

পরিবেশ ভাবনার সূত্র ধরে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন-ধাবণাদির বিকাশের পথে ভোগবাদী আমেরিকার প্রবক্তারা বাববার সুযোগ পেলেই বিরোধিতা করেছে, যৌথ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করেছে, নিজের এতটুকু ক্ষতিও মানতে না চেয়ে আন্তর্জাতিক সমঝোতা অস্বীকার

করেছে। ১৯৭২-এ স্টকহোমের UNCHE-তেই আমেরিকার সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। রাষ্ট্রপুঞ্জের উপরও আমেরিকা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলো। গতিপ্রকৃতি আন্দাজ করেই, সম্মেলনের ঠিক পরে পরেই আমেরিকা তার পরিবেশ দপ্তরকে—এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি (EPA) যা দু বছর আগেই তৈরি হয়েছিল—অর্থ ও কর্মী বলে প্রচুর শক্তিশালী করে তোলে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত EPA-র ঘোষিত লক্ষ্য বিশ্বপরিবেশের স্বাস্থ্য দেখভাল করা! কারণ আমেরিকা (এবং উন্নত দেশগুলির ভোগবাদীরা) ভালো করেই জানে যে পরিবেশ-সম্পদের ভোগের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে গোটা বিশ্বের পরিবেশকেই নখদর্পণে ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ঐতিহাসিকভাবেই আমেরিকা (এবং প্রাক্তন উপনিবেশবাদীরা) অপরাপর জনগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করে শোষণ-লুণ্ঠন চালিয়েছে। যেসব অর্থকরী ফসল সজ্জি শস্যাদি চাষাবাদ করে তারা সমৃদ্ধ হয়েছে তা হয় অন্য দেশ থেকে সংগৃহীত নয় স্থানীয় আদি-অধিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া। এগুলি তাদের নিজেদের আবিষ্কার নয়, আজ আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দারা প্রান্তিক নাগরিকে পরিণত, কোথাও বা অবলুপ্তির পথে। আজ যারা পেটেন্টের মাধ্যমে স্বত্ব কৃষ্ণিগত করার প্রবলতম প্রবক্তা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আবিষ্কার-উদ্ভাবনা আত্মসাৎ করার অভিযোগ কত কৌশলেই না তারা নস্যাৎ করার প্রয়াস পায়।

যাক সেকথা। আমেরিকা এখনও পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র পাঁচ শতাংশ নিয়ে পৃথিবীর মোট খনিজ তেলের ২৫ শতাংশ ভোগ করে; পৃথিবীর মোট বিশ্ববর্জ্যের ৫০ শতাংশ, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও ক্লোরোফ্লোরোকার্বন যৌগের প্রতিটির দূষণের ২৫ শতাংশই আমেরিকার অবদান। এহেন আমেরিকা রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকাকে দেখেছে উন্নয়নশীল দেশের তোষণকারী হিসেবে, বার বার বিরূপ সমালোচনা করেছে। এমনকি রাষ্ট্রপুঞ্জকে দেয় অর্থও আটকে দিয়েছে। রিপাবলিকান সরকারের আমলেই আমেরিকার এই ভূমিকা তীব্রতর হয়েছে।

পরিবেশ-সংক্রান্ত চুক্তি ও সমঝোতা থেকে আমেরিকা বারবার পিছু হটেছে। বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। জীববৈচিত্র্য চুক্তিতে আমেরিকা স্বাক্ষর দেয় নি তার বায়োটেকনোলজি শিল্প মার খাবে বলে। গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির নির্গমন কমানোর জন্য প্রস্তাবিত কিয়োটা প্রোটোকল সে মানতে অস্বীকার করেছে। (অনেক টালবাহানার পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপান এই প্রোটোকল মেনে চলতে স্বীকৃত হয়েছে)। কারণ স্পষ্টই তাতে আমেরিকার শিল্পে শক্তি ব্যবহারকে সংযত করতে হয়। ভারত ও চীনের মত দেশকে গ্রীনহাউস গ্যাসের দায় থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়াতেও আমেরিকার আপত্তি। একেবারে সম্প্রতি আমেরিকা আরও উদ্ধত হয়ে উঠেছে। প্রায় ত্রিশ বছরের পুরনো ফ্রেপগান্স নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে নতুন করে কাজে নেমেছে

—বিশাল টাকার পরিকল্পনা নিয়ে। জীবাণু ও বিষরাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ চুক্তিও মেনে চলতে অস্বীকার করেছে আমেরিকা, অজুহাত চিন বা ইরাককে আগে নিরস্ত করা হোক। যুদ্ধ ও অস্ত্রের চোরাচালান রোধের উদ্দেশ্যে গৃহীত চুক্তিও তাবা মানছে না।

সংঘাতের ক্লাইমাক্স : দীর্ঘমেয়াদী সন্ত্রাস না দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন

কাজেই বলা যায়, শুরু থেকেই আমেরিকার নেতৃত্বে ভোগবাদীরা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ভাবনা ও প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তৎপর ছিলো। এখন তা প্রায় সার্বিক বিরোধিতাব রূপ নিয়েছে। এমনই এক পটভূমিতে ঘটলো আমেরিকার উপব ১১ই সেপ্টেম্বরের আঘাত। যারাই এটা ঘটিয়ে থাকুক না কেন—একাজ মানবিক শুভবুদ্ধিপ্রসূত তো নয়ই, উপরন্তু এ কাজের ফলে শিল্প-সামরিক আধিপত্যের অভিল্যাপী আমেরিকার প্রচণ্ড সুবিধাই হয়ে গেল। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে—বিশ্বের ও দেশবাসীর আবেগের সুযোগ নিয়ে আমেরিকা আক্রমণ করেছে আফগানিস্তানের উপর। সেখানকার নিরপরাধ মানুষ ও নির্যম প্রকৃতি পরিবেশের উপর মানবতার উপর। কেউ তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে না (বিচ্ছিন্ন বহু কণ্ঠ বাদ দিলে) যে, যে কাজ ‘সন্ত্রাসবাদী’রা করতে পারে, বিজ্ঞান সভ্যতা ও মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতির প্রবক্তা রাষ্ট্রের পক্ষে সে কাজ অশোভন অমানবিক ও বিধবংসী। মানবাধিকার ঘোষণা, স্টকহোম ঘোষণা, রিও ঘোষণা—বিশ্ব সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষার ইউনেসকো কনভেনশন—সব কিছুই পরিপন্থী আমেরিকার এই আচরণ। ‘উন্নত’ মানুষের অন্তঃশক্তি নয়—অন্তঃসারশূন্য কাপুরুষতা-স্ত্রীকৃতা-দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ। বিশ্ব থেকে ভয়-সন্ত্রাস-যুদ্ধ নির্মূল করা দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনেরই অঙ্গ কিন্তু সেজন্য অন্যায় অবিচার অত্যাচারের মূল্যোৎপাটন করে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে সন্ত্রাসবাদকে বিচ্ছিন্ন, অপ্রয়োজনীয় করে তোলায় যে দীর্ঘমেয়াদী প্রয়াস প্রয়োজন, তা থেকে আমেরিকা সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এসব কথা জোরের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেবার দায়িত্ব যে রাষ্ট্রপুঞ্জের তার মুখ আজ বন্ধ। বহু নীতির অধিকারী হলেও যার নিরস্তর জুটেছে তিস্ত সমালোচনাই, সেই রাষ্ট্রপুঞ্জ ও তার সর্বাধিনায়ক আজ অকস্মাৎ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত।

আফগানিস্তান বা তার তালিবান সরকার বা সন্ত্রাসের এক বিশেষ প্রতিনিধি ওসামা নয়, আমেরিকার লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদি-উন্নয়ন প্রক্রিয়াকেই স্তব্ধ করা। সেকাজে সে সফল হলে অনন্ত ন্যায় বা স্বাধীনতা নয়, বিশ্ব নিমজ্জিত হবে অনন্ত সন্ত্রাসের অন্ধকারে। অন্যদিকে, এই ধ্বংসস্তূপ থেকে দীর্ঘমেয়াদী-উন্নয়ন প্রক্রিয়া ফিনিক্সের মত নতুন করে ডানা মেলে উড়তেও পারে। পৃথিবীর এ আর এক ক্রান্তিকাল। সচেতন পৃথিবীবাসীর নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করার সক্ষমতা।

পুনশ্চ

১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে, বিহারের এক জেলা শহরে একটি আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। প্রশস্ত রাজপথের ধার দিয়ে টলমল পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল এক আদিবাসী মাতাল, কখন সে এসে পড়ছিল রাজপথের বেশ খানিকটা ভেতরেও। অকস্মাৎ এসে পড়লো এক ঝকঝকে প্রাইভেট কার। মাতালের ঘাড়ের কাছে জোর ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো। সওয়ারহীন গাড়ির ড্রাইভারের আসন থেকে নেমে এলো কেতাদুরস্ত একটি লোক। নেমেই সে সটান এক চড় কষিয়ে দিল মাতালের গালে। সন্ত্রস্ত মাতাল পড়ে যেতে যেতে খাড়া হয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো লোকটির সামনে। কয়েক মুহূর্ত। লোকটি বুকপকেট থেকে একটি দশ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিলো মাতালটির দিকে, বললো—পি লো। হতভম্ব মাতাল হাত বাড়িয়ে দিলো, লোকটি তড়িঘড়ি গাড়িতে উঠে জোরে হাঁকিয়ে দিল।

একটি অশ্লীলতম দৃশ্য হিসেবে ঘটনাটি আমার মনে গেঁথে আছে, অনেকদিন পর তা আবার ভীষণভাবে জেগে উঠলো আফগানিস্তানের উপরে বোমার সঙ্গে খাদ্য বর্ষণের খবরে।

বিশ্বায়ন কি বিশ্বহিতায়

অরুণ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ব একটি, দেশ অনেক এবং জাতি-সম্প্রদায় অসংখ্য। অনেক দেশ ও অসংখ্য জাতি-সম্প্রদায় নিয়ে এক অখণ্ড বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনের শেষ পর্বে মানব-সভ্যতার সংকটের স্বরূপ তাঁর যে স্বপ্নকে ভেঙে দিয়েছিল, হিংসায় উন্মত্ত পৃথীতে শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের রূপ নিয়েছিল, সে বিশ্ব আজও খুব বেশি বদলয়ানি, শুধু সে হিংসা প্রকাশের পদ্ধতি বদলেছে মাত্র বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের ক্ষেত্রগুলিতে।

বিশ্বায়ন-পূর্ব বিশ্বপ্রেক্ষিত

আমাদের দেশে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বয়স ঠিক দশ বছর, কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে এর কাজ শুরু হয়েছিল সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। এবং শেষ হয়েছিল ১৯৮৮ সালের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় পুঁজিব অবাধ চলাচলে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও দেশীয় অর্থনৈতিক সংস্কার-প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক ইতিহাসের পূর্বে এক দীর্ঘকালীন ইতিহাসের পটভূমি আছে—কিছুই ‘বৃত্তহীন পুষ্পময়’ নয়, এর ধারাবাহিকতা আছে। এ ধারাবাহিকতার আনুষ্ঠানিক আরম্ভ মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঔপনিবেশিক বিস্তারের কাল থেকে যখন পরদেশ লুণ্ঠন ও শোষণ ছিল তাদের একমাত্র মূলমন্ত্র। এই সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ ব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনীতির চিত্র পাল্টে দেয়। কয়েক শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যবাদী বিবেক ও শোষকের সঙ্গে বিজিত ও শোষিতের সম্পর্ক চলেছিল। ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল স্বরূপ সাধারণ চাষিরা ছিল বঞ্চিত উৎপীড়িত এবং দেশের অভ্যন্তরীণ শিল্প বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য চলতো ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থে তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হলেও সমগ্র বিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল ভিত্তি শিথিল হয়ে যায় এবং তার ঔপনিবেশিক দেশগুলি ধীরে ধীরে স্বাধীন হয়ে উঠতে থাকে। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে যতটা নয়, ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিজস্ব দুর্বলতার ফলেই ঐ সব দেশ পরশাসন মুক্ত হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রেক্ষাপটও তাই। ব্রিটিশ তার রাজদণ্ড নিয়ে সরে পড়ল বটে, কিন্তু বণিকের মানদণ্ডটি গুটিয়ে নেওয়া সম্ভব হলো না। তাছাড়া স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত দুই শতাব্দীক বছর ধরে ব্রিটিশ শাসন ভারতে যে সব ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিল এবং আমেরিকা ও ইউরোপের বহু বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও বণিক গোষ্ঠীকে

ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ দিয়েছিল বিদেশি মূলধন ও প্রযুক্তি ব্যবহার এবং বৈদেশিক বাণিজ্য চালিয়ে যেতে, তাদের অবস্থা স্বাধীন ভারতে স্বভাবতই আগের মত সুদৃঢ় ও শোষণমুখী থাকল না ততখানি।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে বিশ্বের আর্থ-রাজনৈতিক চেহারা পালটে গেল, বলা উচিত ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ভাগাভাগি হয়ে গেল যার একদিকে আমেরিকা ও পশ্চিমের অন্যান্য উন্নত দেশ এবং অন্য দিকে সোভিয়েত রাশিয়া। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভের পর অনুরূপ দেশ সমূহের তৃতীয় বিশ্ব বলে চিহ্নিত হলো। বিদেশি শাসন এ সব দেশকে অর্থনীতিতে প্রায় ছিঁড়ে করে রেখে দিয়ে গেল। তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হলো বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সহজলভ্য হলো না। যেসব দেশের মধ্যে কিছু দেশ উন্নয়নমুখী সংস্কার-পরিকল্পনায় সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকল ভারত তাদের অন্যতম। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ তৈরির কিছু কিছু লক্ষণ ফুটিয়ে তোলা হলো। যোগাযোগ ব্যবস্থা সমূহের রাষ্ট্রীয়করণ সহ অনেক বেসরকারি সংস্থা সরকারের কৃষ্ণগত এবং শিল্প বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় পদসঞ্চার শুরু হলো রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের বিস্তারের মধ্য দিয়ে। ভারতে এত দিনের ব্রিটিশ অনুসৃত ধনতন্ত্রের ঐতিহ্যে সমাজতন্ত্রের নতুন মাত্রা যুক্ত করার প্রয়াস চলল এবং অন্য দিকে শিল্প-ব্যবসা বাণিজ্যে বিদেশি ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ আগের মত তত সরল রইল না যদিও বিদেশি পুঁজি, অনুদান ঋণ লাভের পথ বন্ধ করে দেওয়া হলো না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের অনুরূপ দেশ সমূহে পুনর্গঠনের একটা বড় ভূমিকা নিয়ে ক্ষেলে আমেরিকা তাদের পুঁজির নিয়োগ, অনুদান, ঋণ ও খাদ্য (ভারতে পি. এল. ৪৮০-র গমের কথা স্মরণীয়) দিয়ে, যেন তারা তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির স্ব-আরোপিত প্রভুর স্থান করে নিচ্ছিল ধীরে ধীরে। তার সঙ্গে সহায়তা করে তাদেরই প্রভাবপট্ট আই-এম-এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ফাউন্ডেশন শর্তসাপেক্ষ ঋণ ও অনুদান দিয়ে। তার সঙ্গে পুঁজি লগ্নির ব্যবস্থা তো আছেই। ভারতে ব্রিটিশ প্রবর্তিত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় ঐতিহ্যের মধ্যে অর্থনীতির সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কার (যা জহরলাল নেহরু আমলে শুরু হয়, শেষ হয় ইন্দিরা গান্ধীর আমলে) এবং কৃষি ও অন্যান্য ভর্তুকি ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। দেশীয় ধনসম্পত্তির সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং শিল্প বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বিস্তার থমকে দাঁড়ায় প্রায় দুই দশক আগে। এর কারণ শুধু এই নয় যে, পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক উন্নত দেশের এটা অভিত্রায়ের অনুকূল ছিল না, এই সমাজতান্ত্রিক সংস্কারে সাফল্য লাভে নিজস্ব দুর্বলতা ও উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবও কম দায়ী নয়। এ সময়ে উঠল বিশ্বায়নের জিগির, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির উদ্দেশ্যে, শুরু হলো তাদের অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কার প্রক্রিয়া।

বিশ্বায়নের রূপরেখা

বিশ্বায়নের সঙ্গে আরও দুটি আনুষঙ্গিক শব্দ দিয়ে বিশ্বায়নের সংজ্ঞা ও মাত্রা বোঝা যায়। বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণ শব্দদ্বয়কে বলা যায় বিশ্বায়নের দুটি শর্ত শুধু সেসব দেশের জন্য যারা বিশ্বায়নের আওতায় পড়ে। বিশ্বায়নের অর্থ হলো বিশ্ব অর্থনীতির এমন কাঠামোগত উদার সংস্কার প্রক্রিয়া যেখানে দেশের গণ্ডী ভেঙে সব দেশের পুঁজি-লগ্নি, আমদানি রপ্তানি, বাজার প্রভৃতির অবাধ ক্রিয়াকাণ্ড চলবে। বিশ্ব বাণিজ্য এক প্রাচীন প্রথা, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশের যুগে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাণিজ্যিক শোষণ এবং উপনিবেশিক শাসক ছাড়াও অন্যান্য উন্নতদেশের শিল্প লগ্নির বিস্তার উপনিবেশিক দেশগুলিতে। স্বাধীনতা লাভের পর তৃতীয় বিশ্বের দেশ অনুন্নত হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং দেশের স্বার্থে বিদেশি বাণিজ্য ও লগ্নিতে কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয় এবং কোথাও দেশীয় সম্পদের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় নিজেদের নীতির স্বার্থে। কিন্তু বিশ্বায়ন চায় ভেঙে দিতে বিশ্বময় পুঁজির বাঁধ, আমদানি-রপ্তানির বাঁধ, সমাজতন্ত্রের বাঁধ, বাজার অর্থনীতির বাঁধ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বাধা নিষেধ, যাতে সম্ভাব্য সমস্ত প্রকার অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার দাপটে প্রাচ্যের মতো বিস্তৃতি লাভ করতে পারে উন্নত দেশগুলির বৃহৎ আধিজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির অবাধ কর্মকাণ্ড। জাতীয় অর্থনীতির বিধিনিষেধের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের বাধা হটিয়ে দিয়ে বিদেশি পুঁজি বিশ্বায়ন, আমদানি-রপ্তানি বিশ্বায়ন, বাজার অর্থনীতি বিশ্বায়ন, দেশীয় কৃষির বিশ্বায়ন প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিশ্বায়নের উদার আকাশ থাকবে প্রতিটি দেশের মাথার ওপরে। এমন কি পুঁজির বিশ্বায়নের পরিণামে আধিজাতিক সংস্থা বহুজাতিক সংস্থায় রূপান্তরিত হয়ে এক দেশের মানুষের শেয়ার বিক্রি করে এবং আমানত সংগ্রহ করে অন্য দেশে তা লগ্নি করার আয়োজন এবং প্রতিটি দেশের বাজারকে বিশ্ব বাজারে পরিণত করার ব্যবস্থায় কোন বাধা থাকবে না। ভারতের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের এই নতুন ঢেউ এবং তার ফলে অভ্যন্তরীণ সংস্কার পরিকল্পনা শুরু হয় গত দশকের গোড়ায়।

লক্ষ করা যাচ্ছে, উন্নত দেশগুলিতে বিশ্বায়ন অনুসারী এমন সংস্কার-পরিকল্পনা শুরু হয় গত সত্তরের দশকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় পুঁজি চলাচলের সবরকম প্রাতিষ্ঠানিক বাধা সরিয়ে। আমেরিকায় তা ঘটে ১৯৭৮ সালে, ব্রিটেনে ১৯৭৯ সালে, জার্মানিতে (পশ্চিম) ১৯৮১ সালে এবং ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের যেসব দেশ সদস্য তারা সবাই এ কাজটি সমাধা করে ১৯৮৮ সালের মধ্যে। তাছাড়া ১লা জানুয়ারি (২০০২) থেকে প্রবর্তিত ইউরো ডলারও এই সংস্কার-কর্মের অংশ হিসেবে ধরা যায়। পুঁজি চলাচল অবাধ করার জন্য মুদার পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর যে আবশ্যিক ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে এখন সে রূপান্তরের সমস্যাও আর রইল না একই মুদা প্রবর্তনে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে মুদার পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরযোগ্যতা অপরিহার্য।

বিস্তৃত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে বিশ্বায়ন ও জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগের উদারীকরণ সমার্থক হয়ে যায়। আসলে রাষ্ট্রীয় ও আধা-রাষ্ট্রীয় শিল্প বাণিজ্য সংস্থাগুলির

বেসরকারিকরণ সমাজতন্ত্র বিবোধী ধনতান্ত্রিক অভিপ্রায়ের অনুযায়ী। বিশ্বায়নের পরিধির মধ্যে অর্থনীতির যে সব প্রসঙ্গ এসে যায় তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা যায় এবং তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে বিশ্বায়ন কাদের লাভবান এবং কাদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এক কথায় বিশ্বায়ন কি বিশ্বহিতায়?

প্রথমেই স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, বিশ্বায়নের প্রবক্তা ও করিতকর্মা উন্নত দেশগুলির লক্ষ্য এবং একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা, ডলারই তাদের ভগবান এবং তাদের বাঞ্ছিত উপার্জন যদি তাদের নীতি-বিরোধী সমাজতন্ত্র মেনেও হয়, এমনকি ব্রহ্মেল অথবা সেক্স টারিজম চালিয়েও হয় তাতে তাদের নৈতিকতাবোধে আঘাত লাগে না। কারণ তাদের চাই যেন-তেন-প্রকারেই শুধু মুনাফা, আরও মুনাফা। অন্যদিকে যে সব উন্নয়নশীল দেশ এ বিশ্বায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করে বিভিন্ন বিদেশি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির পুঞ্জ লম্বী, ঋণ, অনুদান, বাণিজ্য এবং ভোগ ও বাজার অর্থনীতির সম্প্রসারণের পথ অব্যাহত করে দিয়েছে তাদের নিজস্ব অর্থনীতির উন্নয়ন কীভাবে কতখানি সম্ভব অথবা ব্যাহত হচ্ছে তা অবশ্যই বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। প্রথমে ভোগ ও বাজার অর্থনীতির আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

ভোগ ও বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়ন

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও ভোগ্য বস্তুর চাহিদা বাড়ে এবং নতুন নতুন নানা দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়, তবে উন্নত দেশগুলিতে তা যত দ্রুত সম্প্রসারিত হয় উন্নয়নশীল দেশে তত নয়, কারণ ক্রয়ক্ষমতা সেখানে সীমিত করে রাখে দ্রব্যের চাহিদাকে। ভোগের অর্থনীতি তখনই মানবিক উন্নতির বিধায়ক হয় যখন মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ায় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করে অন্য কারুর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে—বর্তমানেরও নয়, ভবিষ্যতেরও নয়। কিন্তু বর্তমান কালে এ ভোগবাদ মানবিক উন্নয়নের পরিপন্থী, বিশেষ করে যখন ভোগের অর্থনীতি দারিদ্র্য, বৈষম্য ও পরিবেশ দূষণে সাহায্য করে। গত কয়েক দশক ধরে এই ভোগের উল্লাস চলছে বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে এবং ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশ্বায়নের পথে মুক্ত বাজারের অর্থনীতি ভোগবাদের এই কুপ্রভাবকে কয়েকজন বাড়িয়ে তুলেছে। মানবিক উন্নয়নের প্রক্ষেপে অর্থনৈতিক ও সামাজিক—এই দুই দিক দিয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সমাজের ওপর। অর্থনৈতিক দিক থেকে নতুন নতুন ও দামি ভোগ্য দ্রব্যের স্রোত মুক্ত বাজারে জমা হয়েছে বিশ্বায়ন এবং মাস মিডিয়ায় মনোলোভা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের জোরালো প্রচারের ফলে সমাজের ধনী, অভিজাত উচ্চবিত্তের মানুষের মধ্যে বিক্রয়ের বিজুতি বাড়ছে, দ্রব্যসমূহের ‘বিশ্ব ব্র্যান্ডের’ দিকে তারা দাক্ষণভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। এমনকি উন্নয়নশীল দেশের মুক্ত বাজারে নানা বস্তির অর্থবান লোকেরা তো বটেই, মধ্যবিত্তরাও ক্রমে ক্রমে এখন ‘কনজিউমারিজমের’ শিকার হচ্ছে। অন্য দিকে ক্রয়-ক্ষমতায় দুর্বল নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষরা এই ‘এলিট বাজারের’ বাইরে থাকছে। কেননা তারা

কোকাকোলা, পেপসি, ভিডিও মিউজিক সিস্টেম, নতুন ডিজাইনের জুতো, টি-শার্ট, জিন্স, নানা রকমের ফাস্ট ফুড প্রভৃতি দ্রব্য কিনতে পারে না। ফলে দেশে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আকাশ জমিন বৈষম্যের বাজার অর্থনীতির ভোগবাদের মধ্যে খুবই প্রকট ভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। আর্থসামাজিক বিভেদের এক স্থিরচিত্র তৈরি হয়েছে মুক্ত বাজারের ফ্রেমে। এই আর্থসামাজিক দিক ছাড়াও মুক্ত বাজারের বহু দ্রব্যের অবাধ ব্যবহার পরিবেশ দূষণের সহায়ক হয়। যেমন কৃষিতে কীট বা পোকামারা ওষুধে যে বিষাক্ত উপাদান থাকে তা খাদ্যশস্যের মধ্য দিয়ে, এমন কি দুধের মধ্য দিয়ে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে। বাজারের বহু দ্রব্য মানসম্মত নয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানে না, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিপর্যয় উন্নয়নশীল দেশে বেশি ঘটছে।

বিশ্বায়নের প্রবক্তা ও সক্রিয় উন্নত দেশগুলির প্রধান লক্ষ্য তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির বাজার দখল করা। তার পথে বড় বাধা সাধারণের সীমিত ক্রয় ক্ষমতা। মাত্র পাঁচ থেকে দশ শতাংশ উপরের স্তরের মানুষ এই বাজার অর্থনীতির আওতায় আসে। বাকি লোকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি না হলে তাদের দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে না। তাই তাদের দু'টি লক্ষ্য আছে—এক, উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাদের দরিদ্রসীমার উপর দিকে ক্রমেই তুলে আনতে হবে। দুই, শিক্ষার প্রসার বাড়তে হবে যাতে তারা দ্রব্যের বিজ্ঞাপন পড়ে, চিনে দ্রব্য ক্রয় করতে পারে। এই দু'টি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য আমেরিকা প্রভাবিত আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাংক এবং উন্নত দেশগুলির সরকার ও বেসরকারি ফাউন্ডেশন প্রভৃতি বহু উৎস থেকে ঋণ, অনুদান পাওয়ার সুযোগ খুলে দিচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির সামনে। তাদের এই বদান্যতা অবশ্যই নৈতিক ততটা নয়, যতটা ব্যবসায়িক। একই সঙ্গে conspicuous consumption-র বৃদ্ধি এবং ভোগদ্রব্যের general market-এর সম্প্রসারণই তাদের অস্থিতি।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় পণ্য চলাচলে বাধা-নিষেধ তুলে দেওয়া বিশ্বায়নের অন্যতম শর্ত। একদিকে আমদানি শুল্ক তুলে দিলে রাষ্ট্রের আয় কমে যাবে, অন্য দিকে অস্বদেশীয় শুল্ক অপরিবর্তিত রাখলে দেশীয় শিল্প এক অসম প্রতিযোগিতার সংকটে পড়ে যাবে—এমন উভয় সংকটের নিরসনের উপায় হলো এই দুই শুল্কের হারের মধ্যে সমতা রাখা এবং সব দেশের শুল্কের হারেও সমতা আসা। এ কাজটি করার দায়িত্ব বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার। অর্থাৎ আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও অস্বদেশীয় বাণিজ্যের সংস্কারমূলক নীতি এখন আন্তর্জাতিক স্তরে নির্ধারিত হবে। এর যুক্তি হলো, এমন সংস্কারের ফলে দেশে শিল্প বাণিজ্যের বিকাশ ঘটবে, সরকারী আয় বাড়বে, রপ্তা শিল্প ও কৃষিতে সরকারি ভর্তুকি বন্ধ হবে। আর একই সঙ্গে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য আয়করের হার কমিয়ে দিলে বিনিয়োগে উৎসাহ বাড়বে, ফলে শিল্প বাণিজ্য আরও চাপ্তা হবে এবং আয়কর থেকে সরকারি আয় এভাবেই পুষিয়ে যাবে। এই ফর্মুলা উন্নয়নশীল দেশের সামনে গাজবেষ মত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

পুঞ্জির বিশ্বায়ন ও প্রতিযোগিতার অর্থনীতি

পুঞ্জির বিশ্বায়নকেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সংস্কার পন্থা হিসেবে দেখা হয়েছে। আজঃবাহ্যিক পুঞ্জির অবাধ চলাচল যেমন দেশের মধ্যে বিদেশি পুঞ্জি লগ্নির ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করবে, তেমনি দেশের শিল্প বাণিজ্যের নেতৃত্বকে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করবে নতুন নতুন পুঞ্জি বিনিয়োগে। এই উদ্যমের মূলমন্ত্র হলো প্রতিযোগিতাব লড়াইয়েব হিম্নং। যে সব শিল্পপতি এ হিম্নং দেখাতে পারবে না, তারা পিছিয়ে পড়বে, ব্যবসা গুটিয়ে নেবে। আসলে বিশ্বায়িত পুঞ্জি লগ্নির সঙ্গে দেশীয় শিল্পোদ্যমে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে হবে তাদের, কারণ প্রতিযোগিতাব লড়াই দক্ষতা বাড়ায়, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়। রুগ্ন শিল্পকে ভর্তুকি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করে শ্রমিক ছাঁটাই করে, তাতেও সম্ভব না হলে কারখানা পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। শ্রমিকদের জন্য সৃষ্ট বিদায়নীতি প্রয়োগ করে। আসলে পুঞ্জির বিশ্বায়নের সংস্কারকর্মের মধ্যে অদক্ষ শিল্প ও অদক্ষ শ্রমিকের কোন স্থান নেই। স্থান নেই কোন সরকারি ভূমিকার। জাতীয় সম্পত্তির সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনাব তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। ফলে দেশে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজতান্ত্রিক কোন আইন থাকলে তাকে সংশোধন করতে হবে মুক্ত বাজার ও মুক্ত পুঞ্জি লগ্নির অনুকূলে, শিল্প বাণিজ্যের বে-সরকারিকরণ ও বিলম্বীকরণ এ সংস্কার পরিকল্পনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ধরতে হবে।

এখানে প্রশ্ন হলো—উন্নত দেশেব কথা বাদ দিয়েই বলি, বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের মাত্রা এক নয়, বিশ্বায়নের একই দাওয়াই যদি তাদের সকলের ক্ষেত্রে একইভাবে বর্তায় তাহলে এর যে সুফলের কথা ভাবা হয়েছে তা কি একই রকম হবে? অন্য কথায়, বিদেশি পুঞ্জি লগ্নি, উন্নতমানের প্রযুক্তি ও দক্ষতার সঙ্গে সব দেশের নিজস্ব শিল্পবাণিজ্য কি একই দক্ষতার প্রতিযোগিতার লড়াই-এ সামিল হতে পারবে?

★ ভারতের প্রসঙ্গে বিষয়টি স্থানান্তরে পুনরুল্লেখ্য।

বিশ্বায়ন, কর্মসংস্থান ও শ্রমিকশ্রেণী

এটা সাধারণ বিশ্বাস যে, বিশ্বায়নমুখী সংস্কারমূলক কর্মসূচিব প্রবর্তন ধনতান্ত্রিক উন্নত দেশগুলিতে যত তাড়াতাড়ি, যতখানি সম্ভব উন্নয়নশীল দেশে তত নয় প্রধানত এই কারণে যে, উন্নয়নশীল দেশের অনেকগুলিতেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেমন আছে তেমনি আছে দেশি ও বিদেশি পুঞ্জি-লগ্নি ও বাজার অর্থনীতিতে কিছু বিধিনিষেধ যা বিশ্বায়নবাহী দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূল নয়। এ ধারণা হয়তো তাত্ত্বিকভাবে অমূলক নয়। কিন্তু সংস্কারপন্থী উন্নত দেশগুলিব চেহাবা কেমন? তারাও কি অতীত লাভ করতে পেরেছে কয়েক দশক আগে থেকে এই সংস্কারকর্ম শুরু করে? তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, 'গ্রুপ অব সেভেন' বা উন্নত সাতটি দেশের গড় মাথা পিছু বার্ষিক উৎপাদন ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সালের ২.১ শতাংশ থেকে নেমে এর পাবের দশকে দাঁড়িয়েছে ১.৫ শতাংশ। আলাদা করে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, কানাডায় একই বকম স্রো

ডাউনের লক্ষণ দেখা গেছে ঐ একই সময়ব্যাপ্তির মধ্যে, অর্থনীতিতে তেজী ভাবের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

উন্নত দেশগুলির এই ঝিমিয়ে পড়া অর্থনৈতিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন স্পষ্টভাবে লক্ষ করা গেছে কর্মসংস্থানের অবস্থার মধ্যে। যেমন ঐ একই সময় সীমার মধ্যে বেকারত্বের হার বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি, যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারের হার খুবই উদ্বেগজনক। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইটালি, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের বেকারত্বের চিত্র কমবেশি একই রকম এবং তার কাঠামোগত কারণগুলিও তাই। প্রথমত দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হয়েছে, ব্যয় সংকোচের মধ্য দিয়ে দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছে এবং অদক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ; সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে, কিন্তু কর্মসংস্থান তত বাড়ছে না যত লোক কর্মবিমুখ থাকছে, কারণ আধুনিক কম্পিউটার-নির্ভর প্রযুক্তি কর্মসংস্থানের সুযোগকে সংকুচিত করে দিচ্ছে। অর্থনীতির এই এক প্যারাদকস—শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য পুঁজিঘন প্রযুক্তি দিয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যার ফলে দেশের বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থাৎ দেশের মোট ক্রয় ক্ষমতা তথা দ্রব্যের চাহিদা কমছে বই বাড়ছে না, ফলে ভোগদ্রব্যের বাজার ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে, মূলধনী দ্রব্যের বাজারও তাই। এ অবস্থার যোগফল অর্থনীতিতে মন্দা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, কিন্তু বিশ্বায়নের শর্তে সে ব্যবস্থা নেই, কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে জনসাধারণের চাহিদা বৃদ্ধির সুযোগ নেই এই নতুন সংস্কার পন্থার।

এই সংস্কারকর্ম উন্নতদেশে শ্রমিক শ্রেণীর গুণগতমান পালটে দিচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও উচ্চমানের যান্ত্রিক ব্যবস্থার হাত ধরে। আগের দিনের অদক্ষ বা অর্ধদক্ষ শ্রমজীবীর জায়গায় স্থান করে নিচ্ছে ‘নলেজ লেবারার’ যারা উচ্চমানের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে উৎপাদনকে বহুগুণিত করতে সক্ষম আধুনিক কালের মানেজমেন্ট প্রোফেশনাল হিসেবে। অফিসে পিয়ন, কেরানি টাইপিষ্ট প্রভৃতি ক্যাডারের কর্মীর দরকার হবে না এবং কারখানায় কলিধুলিমাখা শ্রমিকের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। এই সব প্রফেশনালরা ভাল মজুরি পাবে। এই প্রদীপের নিচে অন্ধকার আর এক শ্রেণীর শ্রমিকের পক্ষে। আমেরিকায় এমন আট শ্রেণীর শ্রমিক আছে যারা ফুরনে, সময় ধরে, পিস রেট ধরে একান্ত অস্থায়ী হিসেবে কাজ করে ; তাদের কাজের কোন নিরাপত্তা নেই, জীবনবীমা নেই, ডাকলেই আসে, অবিচ্ছিন্নভাবে ডাকও পড়ে না কাজের জন্য। এ দেশে ৩১.৩ শতাংশই হচ্ছে এ ধরনের নন স্ট্যান্ডার্ড শ্রমিক। এমন অস্থায়ী শ্রমের বিনিময়ে মজুরি দেওয়া ছাড়া মালিকদের আর কোন দায়দায়িত্ব নেই এই শ্রমিকদের প্রতি। ফলে এদের প্রয়োজন বাড়ছে এমন শ্রমের ব্যবহারের অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে। দ্বিতীয়ত, এখন উন্নত দেশগুলিতে কম্পিউটারের বসন্তের দিন দ্রুত চলে যাচ্ছে এই কারণে যে, কর্ম জীবনের সর্বত্র কম্পিউটারের ব্যবহার এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে এ ব্যবসায় ভাঁটার দিন শুরু হয়ে গেছে। সিলকন ভ্যালি এখন সংকটের মুখে পড়েছে।

যেহেতু তৃতীয় বিশ্বে বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে এখনও ঘরেও নহে পারেও নহে অবস্থা এবং শ্রমিক শ্রেণীর জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় মুক্ত বাজার নেই, সেহেতু এ সব দেশের শ্রমিকদের অবস্থা সংকটাপন্ন হচ্ছে। আগে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পারত শ্রম বিক্রি করতে, যেমন ভারত থেকে বহু শ্রমিক পশ্চিম জার্মানি, কানাডা, এমন কি মার্কিন দেশেও যেতে পারত, আজ সে পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে শ্রমিকের কম মজুরি, চাকরির নিরাপত্তাহীনতা এবং নানা ধরনের বঞ্চনা নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সংকট কী গভীর হতে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেক্সিকো যেখান থেকে মাইকুনাডোরাস কারখানাগুলিতে কাজ করতে গিয়ে এই সংকটের মুখে পড়ে। তবে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর সংকট এমন তীব্রভাবে এখনও দেখা দেয়নি।

ভারত ও বিশ্বায়ন

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মত ভারতে বিশ্বায়নশ্রিত সংস্কারের বয়স এক দশক পূর্ণ হয়েছে। ১৯৯১ সালে নরসিংহ রাওয়ের প্রধানমন্ত্রীদের আমলে অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং আগ্রহী হয়ে ওঠেন এ সংস্কার কর্মে। এক দশকের সংস্কার কর্মে ভারতে কী, কতটা পরিবর্তন হয়েছে তা বুঝে নেওয়ার আগের ভারতীয় অর্থনীতির নীতি ও প্রবণতার ওপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতান্তর অর্থনীতির উন্নয়নমুখী সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫২ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনা পর্বে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ছিল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, কিন্তু তার স্বাধীনতান্তর সংস্কার কর্মে দেশীয় সমাজের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও বেসরকারি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয়করণের পরিকল্পনা, মনোপলি কমিশন স্থাপন এবং শিল্পবাণিজ্যে সরকারি অংশগ্রহণ প্রভৃতি কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। নেহরুর আমলে সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ গঠনের পরিকল্পনাকে ইন্দিরা গান্ধী আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন দুই খেপে ২০টি ব্যাক জাতীয়করণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপিত করে। সাধারণভাবে অর্থনীতির এ কাঠামোই বজায় ছিল আটের দশক পর্যন্ত। তারপরেই ভারতের অর্থনীতিতে লাগল সংস্কারের ধাক্কা, মূলত আমেরিকার নেতৃত্বে ভাৰতের গায়ে এসে লাগল বিশ্বায়নের পুষ্পধনু, বিশ্বায়নের প্রতি ভারতের প্রেম সঞ্চারিত হলো, শিল্পবাণিজ্যের বেসরকারিকরণ ও উদারনীতি বিশ্বায়নেরই আনুষঙ্গিক শর্ত। শুরু হলো শিল্পবাণিজ্যের বেসরকারিকরণ, বিলগ্নিকরণ, বিদেশি পুঁজি লগ্নি ও দেশি শিল্প বাণিজ্যে বিদেশি অংশীদারির মাধ্যমে বিনিয়োগের বাজার উদারভাবে খুলে দেওয়া হলো, দ্রব্যের বাজার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো বিশ্বব সামনে, করা হলো শিল্প লাইসেন্সের বিলোপ, ভর্তুকি ছাঁটাই, শিল্পে শ্রমিক-কর্মচারি ছাঁটাই ভি. আর. এস-র মাধ্যমে, রপ্তা শিল্পের বিলোপ ও নতুন শিল্পে উৎসাহদান, প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ, মুদ্রার রূপান্তর যোগ্যতা, শিল্পবাণিজ্যে আয়করের হার কমানো শিল্প বিনিয়োগের অনুকূলে প্রভৃতি

একশুচ্ছ সংস্কার পরিকল্পনা গৃহীত হলো। ফলে জাতীয় সম্পদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, শিল্প-বাণিজ্যের সরকারিকরণ প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ধোঁক ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছিল বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে। তবে এ সংস্কার কর্ম তর্কাতীত ছিল না। প্রথম থেকেই ভারতের বামপন্থী নেতারা এর বিরোধিতা করে চলেছেন। তাদের মতে এটা আমেরিকার নেতৃত্বে উন্নত দেশগুলির নয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত, তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে তাদের স্বার্থের অনুকূলে পুরোপুরি কঙ্কা করার দূরভিসন্ধি এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। ভারতের শ্রমিক সংগঠনগুলি ছাঁটাই, ভি. আর. এস, বিলম্বীকরণ, রুগ্ন বলে চিহ্নিত করে কলকারখানা বন্ধ করা, বেসরকারিকরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে। বামপন্থীদের আর একটা বড় অভিযোগ ছিল—ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার বিদেশি পুঁজি লগ্নি ও দ্রব্যসামগ্রীর বাজার যেভাবে উন্মুক্ত কবে দিয়েছে বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সামনে তাতে দেশীয় শিল্প তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারবে না যতদিন না নতুন প্রযুক্তি দিয়ে পুরনো শিল্পকারখানাগুলি আধুনিকীকৃত হয় এবং সেভাবে নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনও একবার বলেছিলেন, দেশিও আন্তঃরাষ্ট্রীয় শিল্পবাণিজ্যে প্রতিযোগিতার চাপ সাধারণভাবে উন্নয়নমুখী, কিন্তু ভারতে সংস্কার কর্ম যখন শুরু হয় তখন তাকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে দেওয়ার অর্থ হলো অসম প্রতিযোগিতা, ভারতকে এই প্রতিযোগিতার লড়াইয়ের যোগ্য করে তুলতে হবে। এই এক দশকে তা সম্ভব হয়েছে কি?

তাছাড়া ভোগ্যদ্রব্যের উন্মুক্ত বাজারে বিদেশি দ্রব্য যে ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যেভাবে সুদৃশ্য বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে গণমাধ্যমগুলিতে, যেভাবে স্বপ্নদানের সংস্থাগুলি এগিয়ে এসেছে কনজিউমারিজমের আগ্রহকে উসকানি দিতে এবং যেভাবে, উদাহরণ স্বরূপ, এশিয়ান স্কাই শপ ক্রেন্তাদের ফোনে নানা বিদেশি দ্রব্য ক্রয়ের সুবিধা করে দিচ্ছে, তাতে ধনী, উচ্চবিত্ত, এমন কি মধ্যবিত্ত মানুষও কনজিউমারিজমের শিকার হয়ে পড়ছে ‘ফোরেন’ দ্রব্যের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে।

ভারতে বিশ্বায়নমুখী সংস্কার পরিকল্পনাব মধ্যে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, হিসেবমত এই কারণে যে, ভারতীয় অর্থনীতিতে দুই তৃতীয়াংশ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি-নির্ভর এবং এর জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশ কৃষি থেকে আসে। স্বাধীনতা-পূর্ব কৃষিতে সরকারি অনুপ্রবেশ এবং নিয়ন্ত্রণ ছিল না বললেই হয়, কিন্তু অতীতের খাদ্যাভাবের দুঃস্মরণীয় অভিজ্ঞতা স্বাধীনস্তোর ভাবতে কৃষির ওপর জোর দিয়ে খাদ্যশস্য বাড়ানোর পরিকল্পনা নিতে গিয়ে কৃষিতে সরকারি অনুপ্রবেশ, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হয়েছিল কৃষি-ক্ষেত্র থেকে খাদ্যশস্যের আমদানি রপ্তানির স্তর পর্যন্ত। ভূমি সংস্কার, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা, নতুন প্রযুক্তি, নতুন জলসেচ ব্যবস্থা, চাষে ভর্তুকি, কৃষি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও বিপণন প্রভৃতি ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে

পড়েছিল। এই কৃষি-নীতিই এত দিন চলছিল, হঠাৎ বিশ্বায়নের সংস্কার-কর্মের শর্তগুলি অর্ধশতাব্দী ব্যাপী অনুসৃত কৃষিনিীতিকে পরিবর্তিত করে দিতে চাইছে। এ সংস্কার অনুসারে কৃষিতে সরকারি হস্তক্ষেপ চলবে না, বিশেষত কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, ভর্তুকির ব্যবস্থা, শুধু গরিব মানুষদের জন্য বণ্টন ব্যবস্থায় সরকারি ভর্তুকি চলতে পারে মাত্র। নতুন সংস্কারের কিছু সুপারিশ সম্পূর্ণ যুক্তিহীন নয় কিন্তু এর বিপদ হলো একগুচ্ছ অনিশ্চয়তা রয়েছে এর সামনে ও পেছনে, প্রতিটি পদে ঝুঁকি যেমন রয়েছে তেমনি ভারতীয় কৃষির প্রধান দুর্বলতা—ভূমি সংস্কারের অনগ্রসরতা হেতু গ্রামীণ অর্থনীতির বৈষম্যের দূরত্ব, কমিয়ে আনাও সম্ভব হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাই ভারতে কৃষির মত এক গুরুত্বপূর্ণ সেকটরে বিশ্বায়নের শর্ত রক্ষা করার চেষ্টা এক ভয়ঙ্কর জুয়াখেলার সামিল হয়ে যেতে পারে।

উপসংহার

এখন শেষ প্রশ্ন হলো : বিশ্বায়নানুগ সংস্কার-কর্ম কি বিশ্বের হিত সাধনে সমর্থ হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে? আর একটু স্পষ্ট করে বলা যায়, বিশ্বায়ন বিশ্বের উন্নত দেশগুলির কতখানি উপকারে এসেছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিই বা কতখানি উপকৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্নোত্তরের বিস্তারিত আলোচনা যেখানে একটি বড় পুস্তকের পরিধি-সাপেক্ষে সেখানে বিশ্বায়নের ফলাফলের কিছু প্রবণতার ইঙ্গিত দেওয়াই সম্ভব।

আর বিশ্বায়ন কর্মসূচির বয়স প্রায় দু' দশক, যদিও তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশই প্রায় এক দশক আগে এ সংস্কার কর্মের আওতায় আসে। এই দুই দশকের মধ্যে উন্নত দেশগুলির বিশ্বায়নের অভিজ্ঞতা কিন্তু মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। সে সব দেশে মাথা পিছু জাতীয় আয় এমন ভাবে কমে এসেছে যে, মন্দার উপক্রম দেখা দিয়েছে সেখানে। উন্নতমানের প্রযুক্তির ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাচ্ছে, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, তাদের মধ্যে যুবকদের সংখ্যা বেশি, যুবতীদের সংখ্যা আরও বেশি, অর্থাৎ নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে না। তাছাড়া কলকারখানায় চুক্তিবদ্ধ, পার্ট টাইম অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে, যাদের চাকুরির নিরাপত্তা নেই; সঙ্গে স্থায়ী কর্মী ছাঁটাইও চলছে। সব নিয়ে এক নেতিবাচক চিত্র লক্ষ করা যাচ্ছে সেসব দেশে।

বিশ্বায়নের সংস্কার-পন্থীদের প্রধান লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশ। বালিকার শরীর যেমন সুস্থ মাতৃত্ব লাভের জন্য তৈরি থাকে না, উন্নয়নশীল দেশগুলির বিশ্বায়নের নানা শর্ত পূরণের তেমনি প্রস্তুতি নেই, কারণ এমন অনেক দেশেই যেমন শিল্প ও কৃষিতে সরকারি হস্তক্ষেপ বাস্তব ঘটনা (যা বিশ্বায়নের পরিপন্থী) তেমনি তাদের অর্থনৈতিক ভিত এমন শক্ত নয় যে তারা তাদের পুঁজি লগ্নি নিয়ে শিল্পবাণিজ্যে এবং মুক্ত বাজারের বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় শক্ত ভাবে দাঁড়াতে পারবে। হঠাৎ শিল্পায়নের হিড়িকে ঝোঁক দিতে গিয়ে মেক্সিকো বিশাল ঋণের কঠিন ফাঁদে জড়িয়ে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং বর্তমান

আর্জেন্টিনাও হচ্ছে যার পেছনে ছিল মার্কিন পুঁজির ফাটকার খেলা। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া পড়েছিল পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরযোগ্য মুদ্রাঘটিত সংকটে।

যদিও ভারত বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও রব তুলে বিধি-নিষেধের বাঁধ কিছুটা ভেঙে দিয়েছে বটে, কিন্তু বিশ্বায়নানুগ পুরোপুরি সংস্কারপন্থা গ্রহণ করতে পারেনি। যেটুকু পেয়েছে তার ফসল তুলে আনতে পারেনি ঘরে, এখনও অর্থনীতিতে বিশ্বজ্বালার বাঁতাবরণ রয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ—সংস্কার কর্মের এই এক দশকের মধ্যে ভারত বিশ্ববাণিজ্যের এক শতাংশও দখল করতে পারেনি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বিশ্বের ১৪তম স্থান থেকে উপরে উঠতে পারেনি। অতি সম্প্রতি রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির (অন্তত বিশ্ববাণিজ্যের এক শতাংশ) লক্ষ্য নিয়ে ৫ বছরের জন্য ১৫ দফার এক রপ্তানি নীতি ঘোষণা করেছে ভারত রপ্তানির দ্রব্য ও দেশ বাছাই করে এবং ক্ষুদ্র শিল্প দ্রব্যের ওপর জোর কর ছাড়ের সুবিধা ও নতুন শ্রমনীতি প্রবর্তন করে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল—সব দেশেই বিশ্বায়ন এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। মালয়েশিয়া তার অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বায়নের মধ্যে হিডন্ অ্যাঙ্গেল আছে বলে যেমন সন্দেহ করছে তেমনই উন্নয়নশীল দেশগুলির সাবধান হওয়া দরকার যে, বিশ্বায়ন শেষ পর্যন্ত ‘আমেরিকানাইজেশন’-এর রূপ না নেয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নত দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পরোক্ষ শিকার হয়ে না পড়ে। তবে বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত বিশ্ব হিতের কোন আশাপ্রদ লক্ষণ দেখাতে পারেনি। অন্যদিকে বিশ্বায়নের পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে এবং তার সহিংস দমনে সাম্রাজ্যবাদি সক্রিয়। ইটালির বন্দরশহর জেনোয়ায় বিশ্বায়নের প্রথম শহীদ কার্লো জিউলিয়ানি যাকে গুলি করে গাড়ি চাপা দিয়ে মারা হয়েছিল বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সময়। এমন প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

ভুবনীকরণ, জীবনযাত্রার মান

পার্থপ্রতিম মণ্ডল

মনে পড়ে যাচ্ছে ফেলিনির 'La Dolce Vita'-র সেই প্রথম দৃশ্যটির কথা। শূন্য ভাসমান যীশুর মূর্তি। তার হাতদুটি আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় উদন্ত। নিচে, সমুদ্রতীরে, সুইমিংপুলে, এমনকি বাড়ির ছাদে জোড়ায় জোড়ায় নগ্ন নরনারী—শারীরিক সুখে মাতাল। প্রথমবার দেখে মনে হয়, বিপথে পরিচালিত, মূঢ় মানবসম্মানদের যীশু যেন ক্ষমা আর আশীর্বাদ বর্ষণ করতে করতে চলেছেন। হঠাৎ যীশুর হাতের ছায়া এসে পড়ে একটি বাড়ির ছাদে একজোড়া নরনারীর উপর। আর তখনই দেখা যায়, যীশুর গলায় বাঁধা শেকল। যে হেলিকপ্টারটি করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তার সঙ্গে মূর্তিটি শেকল দিয়ে বাঁধা। প্রথমে যাকে দেখে মনে হয়েছিল ভোগবাদী সভ্যতায় আট্টেপুঠে নিমজ্জিত মানবমানবীর প্রতি করুণাভিক্ষারত এখন দেখা যায় সে নিজেই এই সভ্যতার শেকলে বন্দি, পরাস্ত।

একটা পরিবৃত্তিকালের সূচনায় দাঁড়িয়ে এইরকম একটা হতাশাবোধ আমাদের মনে কাজ করে। একটা সময় এক সাম্যবাদী, মূল্যবোধসর্বস্ব ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে যারা প্রত্যাশায় বসে ছিলেন আজকের ভোগসর্বস্ব, ব্যক্তিগত সুখে নিমগ্ন এক অপরিচিত সমাজের উত্থান দেখে এরকম একটা বিষণ্ণতা তাদের গ্রাস করে ফেলে। হয়ত পরিবৃত্তিকালের ধর্মই এটা। এবং একে রোধ করতে যাওয়ার অর্থ মূঢ়তা। যেকোনও পরিবর্তন যখন একটা চিরাচরিত ব্যবস্থাকে আমূল পাণ্টে দিতে থাকে তখন তার পিছনে একটা কারণ থাকে, একটা সামাজিক চাহিদাও থেকে যায়, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্তরে তা যতই হতাশাব্যঞ্জক হোক না কেন। আমাদের দেশে বিগত দশ বছরে এই পরিবর্তন এসেছে মূলত আর্থিক সংস্কারের হাত ধরে। বর্তমানে তার বেগ শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের মানসলোককেও তা প্রভাবিত করেছে ব্যাপকভাবে। আজ থেকে পনের বিশ বছর আগেও যখন দুই প্রেমিক প্রেমিকার আলোচনায় উঠে আসত জীবনানন্দ বা বোদলের আজ তখন তাদের আলাপচারিতার নব্বই ভাগ জুড়েই অধিক উপার্জনের প্রতিশ্রুতি বা অহংকার, ফ্ল্যাটবাড়ি কিনা শেয়ারবাজার। এবং একে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। বরং এই মুহূর্তে আমাদের ভেবে দেখতে হবে, এই নাগরিক চিত্রের বাইরে আমাদের দেশের যে অগণিত শহরগঞ্জের সাধারণ মানুষ, এই পরিবর্তনের টেউ কি তাদের জীবনযাত্রার মানকে কোনওভাবে উন্নত করতে পেরেছে?

সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান—কথাগুলি আমাদের মনে অনেকগুলি প্রশ্নের

জন্ম দেয়। জীবনযাত্রার মান বলতে কেউ কেউ বোঝেন সুখ। কারো কারো মতে, এ কথার অর্থ প্রাচুর্য। আজকের দিনে সুখ প্রাচুর্যনিরপেক্ষ নয়। তবু সুখ আর প্রাচুর্যের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কিছু পার্থক্য আছেই। অমর্ত্য সেন তাঁর *The Standard of Living* শীর্ষক আলোচনায় যেমন দেখিয়েছেন, You could be well off without being well. You could be well, without being able to lead the life you wanted. You could have got the life you wanted, without being happy. You could be happy without having much freedom. You could have a good deal of freedom, without achieving much. We can go on. জীবনযাত্রার মান সংক্রান্ত এই ধরনের জটিলতায় যাওয়া আমাদের কাজ নয়। সাধারণভাবে জীবনযাত্রার মান বলতে আমরা যা বুঝি—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি—তা নিয়ে বিতর্কের খুব একটা অবকাশ নেই। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর পর যে নীতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য এসব ক্ষেত্রে ঘটিতি ও দুর্বলতাগুলি দূর করা হলেও আজ পর্যন্ত সেসবের সম্পূর্ণ দূরীকরণ সম্ভব হয়নি। অত্যন্ত সাধারণ দু'একটা তথ্য অনুসন্ধান করলেই ব্যাপারটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর সরকার অনুসৃত শিক্ষানীতির ফলে এদেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটেছে অবিশ্বাস্যভাবে। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে উচ্চস্তরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরমাণুবিজ্ঞানী যতজন আছেন আমেরিকা আর রাশিয়া ছাড়া আর কোনও দেশে তত নেই। উচ্চশিক্ষার অনুপাত এখানে চীনের তুলনায় আটগুণ বেশি। অথচ স্বাধীনতার এতদিন পরেও এদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নাগরিক একেবারেই লিখতে বা পড়তে পারেন না। এমনকী, বার্মা বা শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলিতেও বয়স্কদের শিক্ষার হার ভারতের তুলনায় বেশি। অপুষ্টি বা অনাহারের দিক দিয়েও এদেশের অবস্থা একইরকম। শ্রীলঙ্কা বা চীনে মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু যেখানে ৬৯ বছর ভারতের ক্ষেত্রে তা কিছুদিন আগেও ছিল মাত্র ৫২ বছর। শুধু তাই নয়। এদেশের জনগণের বিরাট একটা অংশ আজও প্রতিনিয়ত অনাহারের শিকার হন। মাত্র কিছুদিন আগের ঘটনা। দু'বছরের শিশুসন্তানের দুখ কিনতে না পারায় ও নিজেরা অনাহারের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে বাড়িতে আশ্রয় খুঁজিয়ে আত্মহত্যা করেন রামু দাস (৩৫) ও তার স্ত্রী মানু (২৮)। তাদের দুই শিশু সন্তান রাজু (৪), পিঙ্কি (২)-ও এই আশ্রয়ে পড়ে মাঝা যায়। প্রতিবেশীরা জানান, দিনমজুর রামুর পক্ষে শুধু খার করে সংসার চালানো একরকম অসম্ভবই হয়ে পড়ছিল। ঘটনাটি ঘটে সোদপুরে, এবছরের ২ জানুয়ারি। টেলিগ্রাফ পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়।

বড় মাপের দুর্ভিক্ষ যখন এদেশের একটি বড় জনগোষ্ঠীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে যথেষ্ট হুইচই হতে দেখা গেছে। দেশের অন্য প্রান্তের সাধারণ মানুষও তখন সে বিষয়ে অবহিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ যখন কোনও বড় মাপের চেহারা নিয়ে হাজির হয়না, যখন তা বিচ্ছিন্ন কিন্তু নিয়মিতভাবে একটি একটি পরিবারের উপর আঘাত হানে তখন অনেক সময়ই সাংবাদিকদের তা চোখ এড়িয়ে যায়। জনগণের মধ্যেও এ নিয়ে কোনও অভিযোগ, অসন্তোষ শোনা যায় না। খাদ্যের

ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বিভেদটিকে বাদ দিলেও চলে না। ১৯৭৮ সালের বন্যার পর পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামে যে তীব্র খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তাতে বাচ্চা মেয়েদের ক্ষেত্রে অপুষ্টির ঘটনা বাচ্চা ছেলেদের থেকে যথেষ্ট বেশি ছিল।

‘জীবনযাত্রার মান’-এর কথা বলতে গেলে এসব আলোচনা চলে আসেই। তবুও আলাদা আলাদা করে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা এ রচনার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আলোচনার বিষয়টি এখানে ভিন্ন। নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকেই আমরা দেখলাম, বহির্বিশ্বের সঙ্গে কিছুটা তাল রাখার প্রয়োজনেই আমাদের দেশেও শুরু হয়ে গেল আর্থিক সংস্কারের অব্যাহত চল। আর্থিক সংস্কার ছাড়া আর কোনও গতি নেই—একথা মেনে নিতে বাধ্য হলো এমনকী বামপন্থী দলগুলিরও একটা বড় অংশ। মূলত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শুরু হলো এই আর্থিক সংস্কারের কাজ—এক, আর্থিক নীতির উদারীকরণ, দুই—রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগের বেসরকারীকরণ, তিন—জাতীয় অর্থনীতির ভূবনীকরণ। এর পিছনে যে বাস্তব পরিস্থিতিটি কাজ কবেছে আমাদের তাও মনে রাখা প্রয়োজন। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার মালিকানা বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার পিছনে যে কাণ্ডটি কাজ করেছে তা হলো আশির দশকে ব্যাপক সরকারি ব্যয়বাহুল্যের ফলে বাজেটে চূড়ান্ত ঘাটতি, রাজস্ব খাতে ঘাটতি। এমত অবস্থায় বেশকিছু রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা শেয়ার বেসরকারি সংস্থাগুলির কাছে বিক্রি করতে পারলে সরকারের কিছু অর্থউপার্জন হয়, বাজেটের ঘাটতিও কমানো যায়। আর বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে তাগিদটি ছিল ত্রিমুখী। দেশীয় শিল্পপতিরা চাইছিলেন বিদেশি উপকরণ কাজে লাগিয়ে উৎপাদনের কিছু সুবিধা করতে। বিদেশি শিল্পপতিরা চাইছিলেন এদেশের বাজারের বেশকিছু লাভজনক ক্ষেত্রে চুটিয়ে ব্যবসা করতে। আব দেশের মুষ্টিমেয় সম্পন্ন মানুষেরা—এদেশের অর্থনীতির নির্ধারক এরাই—চাইছিলেন দেশের নিম্নমানের ভোগ্যপণ্যের পরিবর্তে বিদেশি ভোগ্যপণ্য ভোগ করতে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি চাইছিল, অন্যান্য দেশের মতো এদেশেরও আর্থিক নীতি নির্ধারণে স্বাধীনতাকে হরণ করে নিতে। এবকম একটা পরিস্থিতিতে নব্বইয়ের দশকের গোড়াতে এদেশে আর্থিক সংস্কারের কর্মকাণ্ড শুরু হলো। এই আর্থিক সংস্কারেব শুরুর পিছনে কারণ যাই থাক না কেন একথা স্পষ্ট যে, এই আর্থিক সংস্কার ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনও বিকল্পও ছিল না। সরকারি নিয়ন্ত্রণের পথে এদেশের মরা অর্থনৈতিক অবস্থাকে যে আর বাঁচানো যাচ্ছিল না তা বলাই বাহুল্য। গত ৫ জানুয়ারি কলকাতায় Globalization and its discontent শীর্ষক এক আলোচনায় ভাষণ দিতে গিয়ে অমর্ত্য সেন আরও এককদম এগিয়ে এও বলেন, ভূবনীকরণের ধারণাটিকে শুধুই পাশ্চাত্যদেশীয় মনে করার সবসময় সঙ্গত কারণ নেই। কারণ বর্তমান অর্থনৈতিক ভূবনীকরণেব প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার অনেক আগে এদেশে তা ছিল। ভূবনীকরণের সুবিধাগুলি ঘরে আনতে এদেশকে এই লক্ষ্যে আরও অনেক পথ হেঁটে যেতে হবে। এক্ষেত্রে চিন, জাপানের মতো দেশগুলির অগ্রগতিব কথা তিনি তুলে ধরেন। এহেন বক্তব্যকে যারা মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেন না, তারাও আজ মানতে বাধ্য হবেন,

আজকের ক্রমশ ছোট হয়ে আসা দুনিয়ায় এইটাই প্রধান চালিকাশক্তি। আর্থিক, সাংস্কৃতিক সমস্তক্ষেত্রেই ভূবনীকরণকে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। এই নতুন বিশ্বে আমাদের নতুন জীবন যে আগের থেকে ভিন্ন হবে তা বলাই বাহুল্য। আর এ নিয়েই আমাদের যত সংশয়, সন্দেহ।

সাবেকি সাম্যবাদে একটা কথা প্রায়ই শোনা যেত। From each according to his ability, to each according to his need; অর্থাৎ বন্টনের মূল মন্ত্রটি হবে, প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে কাজ নেওয়া হবে তার ক্ষমতা অনুযায়ী আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে আয় প্রদান করা হবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী। আমরা দেখলাম, ধারণাটি শুনতে খুব ভালো লাগলেও শেষ পর্যন্ত বাস্তবে তা ধোপে টিকল না। সত্যি কথা বলতে কি, অন্যের দারিদ্র্য দূর করার জন্য নিজে খেটে যাবেন এরকম মহাপুরুষ আমাদের সমাজে মেলা ভার। সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এর একটা উপায় বের করা হয়েছিল। যার উপার্জন বেশি তার উপরে চাপানো হয়েছিল অত্যন্ত উচ্চ ব্যক্তিগত করের হার। যে প্রতিষ্ঠানটি বেশি মুনাফা উপার্জন করেছে তার উপরও উচ্চ করের বোঝা চাপানো হলো। অধিক মুনাফা উপার্জনকারী প্রতিষ্ঠানটি থেকে অর্জিত কর-এ লোকসান করেছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলিকে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে ফল হয়েছিল ঠিক বিপরীত। ভগ্নদশা প্রতিষ্ঠানটি গা ঝাড়া দিয়ে তো উঠলই না, বরং যে কোম্পানি লাভ করছিল তাও করের বোঝা, সরকারি নিয়ন্ত্রণের চাপে লোকসান করতে শুরু করল। তখন শুরু হলো তাকেই আবার সরকারি ভরতুকি দেওয়া।

আজকে সমাজতন্ত্র—উত্তর সমাজব্যবস্থায় অনেকেই তাই মনে করেন একটা কথা। তা হলো, যোগ্যতা অনুযায়ী, পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাজে অসাম্য থাকবে এবং তাকে মেনে নেওয়াই ভালো। জোর করে এই অসাম্য দূর করতে যাওয়ার অর্থ যতটুকু উন্নতি হচ্ছে তাও ধ্বংস করে ফেলা। এরা তাই বলে বেড়াচ্ছেন, আসুন, বাস্তব পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমরা আপেক্ষিক বৈষম্যের ধারণাটিকে আপাতত শিকেয় তুলে রাখি। বরং দারিদ্র্যরেখার নিচে যারা বাস করছে তাদেরকে দারিদ্র্যরেখার উপরে টেনে তোলার চেষ্টা করি। একটু ভেঙে বলার প্রয়োজন আছে। এদের মতে, ভূবনীকরণ ঠিক ঠিক মতো ঘটলে, কিছু মানুষের আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হবে। সমাজে একটা নতুন ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি হবে। ফরাসিতে যাকে nouveau riche বলে আরকি। একটা শ্রেণীর ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে সমাজের সকলশ্রেণীর মানুষেরই কিছু-না-কিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। এখন, বৈষম্য কমানোর একটা সংজ্ঞা দারিদ্র্য রেখা। সমাজের প্রত্যেকের ন্যূনতম জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট আয় থাকুক চাই। এটাই দারিদ্র্যরেখার তাৎপর্য। উপরিউক্ত ধারণা অনুযায়ী, নতুন এই ব্যবস্থায় এইভাবে অনেক মানুষকে দারিদ্র্যরেখার উপরে তুলে আনা সম্ভব হবে। এর ফলে এই nouveau riche গোষ্ঠী ও সদ্য দারিদ্র্যরেখা উত্তীর্ণ মানুষগুলির মধ্যকার বৈষম্য হ্রাস আগের থেকে অনেকখানি বৃদ্ধি পাবে। হ্রাস দেখা যাবে, আগে যখন একজনের আয়

হল পাঁচ হাজার অন্যজনের তখন ছিল পাঁচশ'। এখন তার জায়গায়, একজনের আয় এখন পাঁচ লক্ষ অন্যজনের তখন পাঁচ হাজার। কিন্তু তাতে কি? অন্যের উন্নতিতে স্বার্থকাতর হয়ে তো লাভ নেই। পাঁচশ টাকায় তো আর কারও পক্ষে খেয়ে পরে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বরং কষ্টে হলেও পাঁচ হাজার টাকায় বেঁচে থাকার নূনতম প্রয়োজনগুলি মিটানো সম্ভব।

এধরনের যুক্তির ভিতরে একটি অসঙ্গতি আছে। বিষয়টি বোঝা সহজ হলেও সহজে চাখে পড়ে না। ভুলে গেলে চলবে না, সমাজের একসংখ্যক মানুষের ক্রয়ক্ষমতা প্রস্রাবিক পরিমাণে যখন বেড়ে যায়, তখন উপরের ওই পাঁচ হাজার টাকার মূল্য আগের পাঁচশ'র থেকেও কমে আসে। কাজেই দারিদ্র্যরেখা দূরীকরণের বিষয়টি তখন আর প্রস্তাব্যিত হয়না। আর তখনই পূর্বে বর্ণিত প্রচলিত অনাহারের মতো বিষয়গুলি চলতে থাকে। ভুবনীকরণের আলোচনায় ধনতন্ত্রের বিষয়টিই বারে বারে ফিরে আসছে। বর্তমান বিশ্বায়নের আর একটি ধনতান্ত্রিক পদক্ষেপ—রপ্তায়ত্ত্ব উদ্যোগের বেসবকারিকরণ। বিশ্বায়নের যারা জোর সমর্থক একটি যুক্তি তাদের বক্তব্যে প্রায়ই উঠে আসে। অর্থশাস্ত্রে উৎপাদনের চারটি মৌলিক উপকরণের কথা বলা হয়—জমি, শ্রম, পুঁজি ও উদ্যোগ। এত গুণগোল এই উদ্যোগকে নিয়েই। জমি, শ্রম, পুঁজি এই তিনটির না হয় রপ্তায়িকরণ করা গেল। কিন্তু উদ্যোগের রপ্তায়িকরণ কীভাবে সম্ভব হবে। উদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতার প্রসঙ্গ। ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় থাকে না। আগের আলোচনার প্রসঙ্গে বলতে হয়, যদি কেউ বোঝেন যে, যথেষ্ট অর্থ ও সময় ব্যয় করে, যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করার পরও তার সুফলগুলি নিজের ঘরে আসছে না, তা করের আকারে চলে যাচ্ছে সরকারের ঘরে তাহলে তিনি ঝুঁকি নেবেন কেন? উদ্যোগিক থেকে আবার ব্যবস্থাটি যদি 'to each according to his need' হয়, তাহলে কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়েই কারো পক্ষে ভাল থাকা সম্ভব। সেক্ষেত্রে তিনিই বা ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন? কাজেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই কেবলমাত্র এটা সম্ভব। দেশের শিল্পগুলিকে বাঁচাতে গেলে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে তা ব্যক্তিগত উদ্যোগের দিকে ঠেলে দেওয়াই সমুচিত। এক্ষেত্রেও যে কথাটি আমরা ভুলে যাই, সরকারি ছত্রছায়ায় যে মানুষগুলি নির্দিষ্ট কোনও পেশাকে অবলম্বন করে খেয়ে পরে বাঁচছিলেন তারা কোথায় যাবেন। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের মালিক মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে নিয়মিতই নিত্য নতুন উৎপাদন ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেবেন। বাজারের চাহিদার কথা মনে রেখেও কোনও একটি উৎপাদন নিয়ে পড়ে থাকলে তার চলবে না। একটি ক্ষেত্র থেকে অন্য নতুন একটি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সময় প্রত্যেকবাব কর্মহীন হয়ে পড়বে বিরাট একটি কর্মীসংখ্যা। এদের মধ্যে যারা শিক্ষিত কর্মী নতুন উদ্যোগে তাদের কর্মসংস্থান না হয় সম্ভব হবে। মনে করুন একটি ইস্পাত উৎপাদনকারী সংস্থার মালিক মনে করল, ইস্পাতের বাজার পড়ে গেছে, সুতরাং নতুন কোনও ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। সংস্থটিকে তারা বন্ধ করে দিল। এক্ষেত্রে যারা পরিচালন বা উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রথমসারির প্রকর্মী তারা

অন্যত্র কর্মসংস্থান করে নিল। কিন্তু যারা নিচের তলার কর্মী, যারা ইম্পাত উৎপাদনে সঙ্গে সম্পর্কিত একটি স্বল্প-দক্ষ নির্ভর কাজের উপর নির্ভরশীল হয়েই জীবনধারণ করতে চলেছিল তারা কোথায় যাবে?

আর এইখানেই নিহিত মূল কথাটি। বিশ্বায়ন বা ভূবনীকরণের সূফল যদি আমাদের সত্যি সত্যিই পেতে হয় তাহলে প্রথম প্রয়োজন কর্মদক্ষতা বাড়ানোর আর তার জুড়ে চাই সরকারি হস্তক্ষেপ। এই সরকারি হস্তক্ষেপ ঠিক কীরকমের হবে এ নিয়ে অবশ্য বিতর্কের অবকাশ আছে। কর্মদক্ষতার সঙ্গে দুটো জিনিস সরাসরি জড়িত। প্রথম শিক্ষা ও দ্বিতীয় স্বাস্থ্য। অল্পবয়সে পুষ্টি না থাকলে বয়সকালে সুস্থাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যাবে না। ঠিক তেমনিভাবে অল্পবয়স থেকে ঠিক মতো শিক্ষা অর্জনের সুযোগ না পেলে ভবিষ্যতে চাকরির সম্ভাবনা থাকে না। কেউ কেউ মনে করেন, এগুলি বিশেষ করে শিক্ষার বিষয়টি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উদ্যোগের উপরই নির্ভর করে। অনেকেই আবার বলেন, এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে, এক্ষেত্রে সরকার সাধারণ মানুষের পাশে না দাঁড়ালে চূড়ান্ত বৈষম্যপূর্ণ এই সমাজব্যবস্থায় দরিদ্র মানুষের উঠে দাঁড়ানোর প্রশ্নটি অবাস্তব। এখন প্রশ্ন হলো শিক্ষা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকাটি ঠিক কী হবে? শুধুই কি বেশকিছু হাসপাতাল আর প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে যাবে? নাকি, দরিদ্র মানুষ যাতে করে এই সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারে সেদিকেও নজর দেবে। এদেশে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছিল সেরকম হলে তো চলবে না। সাধারণ ব্যবসায়ী বা ছোট চাষি ঋণ পাচ্ছে না বলে ব্যাঙ্কগুলিবে একের পর এক জাতীয়করণ করে দেওয়া হলো। কিন্তু সত্যিসত্যি কি তাতে দেশের দরিদ্রমানুষদের কোনও সুবিধা হয়েছে? নাকি এধরনের সরকারি নীতির ফলে লাভ হয়েছে আপনার আমার মতো মধ্যবিত্ত মানুষদের? সরকারের উচিত এ বিষয়টির দিকেও নজর দেওয়া। মনে রাখতে হবে, অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষকে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজটি কিন্তু সরকারকেই করতে হবে। বাজার কখনই এ কাজে অগ্রণী হবে না। তার কারণ, এ কাজে সরাসরি কোনও মুনাফা নেই। যে কাজে মুনাফা নেই সে কাজের সামাজিক উপযোগিতা লাভের অঙ্কে প্রতিফলিত হয় না। এ কাজে বেসরকারি উদ্যোগ যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে তাতে আশ্চর্য কি? আমাদের দেশের অনগ্রসর শ্রেণীর মূল সমস্যা পয়সার অভাব নয়, পয়সা উপার্জন করার মতো কর্মক্ষমতার অভাব। সরকারের তরফ থেকে তাদের ঘরে কিছু পয়সা পৌঁছে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। তারা যাতে, নিজের পায়ে নিজে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে সেইরকম কর্মক্ষমতার যোগান দেওয়াই এক্ষেত্রে আস্তে প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, সরকারি উদ্যোগের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে, সমাজকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত বেসরকারি সংগঠনগুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এতবড় একটি দেশে বিচ্ছিন্নভাবে সরকারের দিক থেকে কোনও ব্যাপক হস্তক্ষেপ ছাড়া কী করে এ কাজ সম্ভব হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা গেলে, ভূবনীকরণের কুফলের চেয়ে সুফলই আমরা বেশি পাব বলে মনে হয়। বিশ্বায়নের প্রথম ধাপে আমাদের অনেকেরই মনে ভয় কাজ করেছে যে এর ফলে বিদেশি শিল্পপতিরা এদেশের বাজারে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসবে। দেশীয় শিল্পকে প্রথমে তা উৎখাত করবে। এবং তারপর একবার বাজার দখল করা হয়ে গেলে চড়া দামে তাদের পণ্য আমাদের কিনতে বাধ্য করবে। এরকম একটা ধারণা এদেশের শিল্পপতিরাই দেশের মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। যেন এতদিন মুনাফা ছাড়াই তারা দেশের মানুষকে নিঃস্বার্থে সেবা করে আসছিলেন। আসলে ব্যাপারটা এরকম নয়। প্রথম কথা, বিদেশি সংস্থা এদেশে এসেই দেশীয় শিল্পকে উৎখাত করবে এরকমটা হওয়া তখনই সম্ভব যদি আমরা ধরে নিই যে আমাদের পণ্য কখনই বিশ্বমানের হতে পারবে না। আর চড়া দামে বিদেশি পণ্য কিনতেও আমরা বাধ্য নই। তার কারণ এদেশে তো শুধু কোনও একটি সংস্থার পণ্যই বিক্রি হবে না। সেখানেও প্রতিযোগিতা রয়েছে। যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান আমাদের সন্তায় পণ্যটি দেবে আমরা তার জিনিসই কিনব। উদারীকরণের ফলে দাম কমার সম্ভাবনা আরও একটি কারণে। বেসরকারি উৎপাদনের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমে এলে অযথা কেন্দ্র ও রাজ্যের কর চেপে কোনও একটা জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এদেশের দরিদ্র মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলে তাদের ক্রয়ক্ষমতাও কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। তখন উৎপাদন সংস্থাগুলির এই প্রতিযোগিতার সুযোগ নিয়ে তারা অনেক কিছুই ভোগ করতে পারবে, যা আজ তারা পারে না।

তবে বিশ্বায়ন পূর্ণমাত্রায় পৌঁছে যাওয়ার পর যে এরকমটা হবেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। এসবই সম্ভাবনা, সুনিশ্চিত নয়। দেশের মানুষকে তাই এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। কারণ ভূবনীকরণ হবেই। এছাড়া যে অন্য কোনও পথ বর্তমান পরিস্থিতিতে আর খোলা নেই সেকথা আগেই বলেছি। উদারনীতি আর শুধু শিল্পক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই, কৃষিক্ষেত্রেও এখন সংস্কারের উপব যথেষ্ট জোর দেওয়া হচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে অবাধ বাজারের উপরিউক্ত সুবিধাব কথা বললেও কৃষিক্ষেত্রে অনেকের মতেই এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। বর্তমানে আমাদের দেশে অধিকাংশ কৃষি সামগ্রীর উপরই সরকারি ভরতুকি আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন সারের উপর ভরতুকি দিয়ে আসছিলেন, রাজ্য সরকারের ভরতুকি আছে জল ও বিদ্যুতের উপরে। এছাড়াও কৃষিক্ষণের উপর নানারকম ভরতুকি আছে। স্বাভাবিকভাবে, উৎপাদনের ব্যয়ের বোঝা এদেশের কৃষকের উপর অনেকখানি কম থাকায় বাজারে ঋণদায়ক দামটিও কখনও লাগামছাড়া হয়ে উঠতে পারে না। এখন যদি সরকার এইসব ভরতুকি তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে এই দাম বাড়তে বাধ্য। ভরতুকি ছাড়াও এই উৎপাদনের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে এখানে বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের ক্ষেত্রে কৃষিপণ্যের একটা নির্দিষ্ট দাম বেঁধে দেওয়া হয়। ফসল ওঠার পর একটি পূর্বঘোষিত দামে সরকার কৃষিপণ্য কিনে নেন। খোলাবাজারে ওই কৃষিপণ্যের দাম

সরকারি দামের নিচে নামতে পারে না। এরফলে যে বছর উৎপাদন খুব বেশি হলো সেবছর কৃষক ন্যূনতম একটা দাম পান। আর যেবছর উৎপাদন হলো না সেবছরও তারা অত্যধিক চড়া দামে তা বিক্রি করতে পারেন না। কৃষিপণ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অব্যাহত হয়ে গেলে এসবের আর কোনও প্রশ্ন থাকে না। এক্ষেত্রে দাম কমার সম্ভাবনা খুবই কম। বরং সরকারি ভরতুকি না থাকায় দাম বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। খাদ্যশস্য যাদের বাজার থেকে কিনে খেতে হয় তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। শহরাঞ্চলে স্বল্প উপার্জনের যে মানুষগুলিকে বাজার থেকে খাদ্যশস্য কিনে খেতে হয় তাদেরকে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের দেশে গ্রামেরও প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষকে খাদ্যশস্যের জন্য বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। এদের অবস্থাও হবে একইরকম।

এমত অবস্থায় অনেকেই এখন খাদ্যশস্যের ব্যাপারে ব্যক্তিকে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলছেন। বিষয়টি অভিনব। অনেকের কাছে এটি কল্পনাপ্রসূতও। দেশের প্রতিটি মানুষ কীভাবে নিজের খাদ্যশস্য নিজেই উৎপাদন করে নেবে? তবু এর একটি বাস্তব ভিত্তি আছে। একজন সম্পূর্ণ অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষও যদি শুধুমাত্র তার অবসর সময়ে তার বাড়ি সংলগ্ন জমি বা যেকোনও খোলা স্থানে তার নিজের বা তার পরিবারের প্রয়োজন মতো ফসলটুকু উৎপন্ন করে নিতে পারেন তাহলে বাজারের উপর তার নির্ভরশীলতা অনেকখানি কমে আসবে। সম্প্রতি এই ধরনের ক্ষুদ্র সংস্করণের কৃষিবাগিচার ধারণাটি ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির কল্যাণে অত্যন্ত অল্প পরিসরে, এমনকী বাড়ির ছাদ বা এধরনের যেকোনও খোলা স্থানে তা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হচ্ছে।

যাইহোক, এধরনের অভিনব পন্থার উদ্ভাবন করা ছাড়া এমুহূর্তে আর কোনও গত্যন্তর নেই। পুরনো চিন্তা আঁকড়ে পড়ে থাকলে আমাদের আর চলবে না। নতুন যুগে আমাদের প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলতে হবে উদ্ভাবনী শক্তিকে। উদ্ভাবনই আমাদের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

খাদ্য, অখাদ্য, অনাহার ও বিশ্বায়ন

সৌরভ ঘোষ

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান জীবনধারণের প্রাথমিক উপকরণ এ কথা সবাই জানি। জানি না যেটা তা হলো এই সর্বজনীন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যারা যোগান দেন তাদের হাল-হকিকৎ পাশ্চাত্যে এক রকম, এ দেশে অন্য রকম। ও দেশের চাষিরা ক্ষেতে যায় গাড়া চড়ে, এ দেশে যারা গাড়া চড়ে তারা ক্ষেতে যেতে চায় না, ক্ষেতের মজুরের গাড়া চড়া হয়ে ওঠে না। যাদের উপর দায় বর্তিয়েছিল কৃষকের উন্নতি করানোয় সেই কৃষক-নেতারা বলেন ভারতবর্ষ সবেতেই পিছিয়ে তাই এ ব্যাপারেও পিছিয়ে থাকটা অবধারিত। এই যে ও দেশ-এ দেশের পার্থক্য তা মূলত গোড়াতেই—শিক্ষায়, সমাজমনস্কতায়, বিজ্ঞানমনস্কতায়। আমরা শিক্ষাকে বহন করে চলেছি বাহন করি নি, ওদের সমাজ জঙ্গম আর আমাদের স্থাবর। আমাদের বিজ্ঞান বিজ্ঞানী হয়ে চাকরি করবার ওদের বিজ্ঞান সূনাগরিক হওয়ার। তো ওরা ওদের মতো, আমরা আমাদের মতো এটা খুব পরিষ্কার কথা।

কিন্তু এখন পৃথিবী এক বৃহৎ পল্লী। সুদূর মার্কিনে সফটওয়্যারের চাহিদা হ্রাস পেলে মুম্বই শেয়ার মার্কেটে মন্দা হয়, আমাদের বেকার বাড়ে। এ দেশের নিম্ন-হলুদ-বাসমতীর পেটেস্ট করার তাগিদ আমাদের চেয়ে ওদের ঢের বেশি। আমাদের চার টাকার ডাব ছেড়ে ওদের তকমা আঁটা সফট ড্রিংক নটাকায় বিকিকিনি। ওদের কীটনাশক-সার-বায়োটেক আমরা ব্যবহার না করলে আমাদের খাদ্যশস্যের ফলন হয় না। এক অর্থে আমরা ওদের অধীন। কিন্তু আমরা ওদের অধীন বলেই ওদের কালো হাত ভেঙে দাও, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক এমন কথা বলার পক্ষপাতী নই। কারণ এসব বলে কাজের কাজ হয় না। বৃটিশ-শাসনের জন্য দায়ী যেমন এখানকাব মীরজাফররা ঠিক একইভাবে এখনকার পাশ্চাত্যের অধীনতার জন্যও দায়ী আমরাই।

খাদ্য-কৃষি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনের, গণকটনের দায়িত্বে যারা অর্থাৎ কৃষিজীবী, রাজনীতিক, ফোড়ে, ব্যবসায়ী, আমলা প্রত্যেকের শিক্ষার-কাজের ফাঁকফোকর দিয়েই দুর্নীতি ঢুকেছে তা মোটা দাগে বলা যায় বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে—যেমন কিনা এফ সি আই গুদামে খাদ্য পড়ে থেকেও মানুষ অনাহারে মবছে, কিংবা বডো ইলিশ বাজারে মিলছে না কেবলমাত্র ব্যবসায়ীর ট্রলারগুলিতে মেশ সাইজ ছোট হওয়ায় (ফলে বড় হওয়ার আগেই খোকা ইলিশ ধরা পড়ছে, বড় মাছ নদীতে মিলছে না) এবং তাতে মৎস্যমন্ত্রী করার কিছু নেই। অথবা বেশি মুনাফার আশায় চাষি হাইব্রিড বীজের জন্য

যে বহুজাতিক সংস্থার কাছে হাত পাতছে সে সংস্থা ওই বীজে ঢুকিয়ে দেবার কথা ভাবছে টার্মিনেটর জিন যা বক্ষ্যা গাছ উৎপন্ন করবে যাতে করে ফের চাষিকে পরবর্তী মরসুমে দ্বিগুণ দামে ওই বহুজাতিক সংস্থা থেকেই বীজ কিনতে হয়। দিনকেদিন কৃষিক্ষেত্রটি যত শিল্পায়িত হচ্ছে হবে ততই সমস্যা দানা বাঁধছে, দুর্নীতির ষণ ধরছে, বিপদসঙ্কুল অবস্থার দিকে যাচ্ছি আমরা। আমলারা বিদেশে ডল্ল টি গুর কনফারেন্সে গিয়ে খানাপিনা, সেরে দেশে ফিরছেন, ভারতের স্বার্থে কিছুই অস্ফুটে বলেন না, বলার ইচ্ছাও নেই। নামকরা বিদেশি কম্পানির ব্র্যাণ্ডনেম, ট্রেডমার্ক ব্যবহার করে চকোলেট, গুড়ো দুধ, প্রসেসড ফুড বা সংহত খাদ্য তৈরি করছেন এদেশের ব্যবসায়ীরা যদিও গুণগত ও পুষ্টিগত মানে বিস্তর ফারাক রয়েছে একই ব্র্যাণ্ডনেমের দেশি এবং বিদেশি খাদ্যপণ্যে। এ দেশের বিদেশি ব্র্যাণ্ডনেমের শিশুখাদ্য খেয়ে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, এদেশি ওষুধ ভালো কাজ দেয় না এ দোষ কি আমেরিকার? দায়টা এদেশি ক্রেতা-বিক্রেতা দুপক্ষেই। বিক্রেতা অন্যায় করছেন নিম্ন মানের খাদ্যপণ্য তৈরি করে আর ক্রেতা তাতে সায় দিচ্ছেন কেবলমাত্র বিদেশি ব্র্যাণ্ডনেমের হাতছানিতে। নবপ্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা গেট টুগেদার'এ যে মেহফিলে বসে বিদেশি ব্র্যাণ্ডের সুরাপান করেন তা প্রস্তুত করা হয় এদেশের এঁদো কারখানায় অত্যন্ত নিম্নমানের কাঁচামাল দিয়ে তা তরুণরা জেনেও জ্ঞানেন না, বিদেশের এমনই মোহ। সুতরাং ক্রেতা সুরক্ষা আইনের পাশাপাশি ক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গি-মনন-পরিবর্তনের দরকার পড়ছে ধারণযোগ্য ব্যবস্থাপনার সার্থক রূপায়ণের জন্যই।

কৃষি এবং খাদ্যের ব্যবস্থাপনায় তাই রাজনৈতিক নেতা, সবকারের নীতি, আমলাতন্ত্র এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগের উপর পূর্বোপরি ভরসা করা নিতান্তই নিবুদ্ধিতার। খাওয়ার এবং বেঁচে থাকার দায় যখন নিজেরই তখন চারপাশের পরিবেশ-পরিজন কাজে লাগিয়ে শুভ উদ্যোগ করা যায় কি? এই প্রশ্নে দুটি পথে সমান্তরালে কাজ করতে হবে—এক সক্রিয়ভাবে, দুই—পরোক্ষ প্রতিরোধমূলক।

তবে পথদুটো চেনার আগে বুঝতে চেষ্টা করব খাদ্য-রাজনীতির আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটটি; অনুষঙ্গে খাদ্যাভাব, অনাহার, দুর্ভিক্ষ ও অপুষ্টির অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক এবং প্রশাসনিক কার্যকারণ।

কৃষির শিল্পায়ন

পুঁজিবাদের জন্মলগ্ন থেকেই কৃষিপণ্যে ব্যবসায়িক উৎপাদন ও বিক্রির প্রথা চালু হয়েছে এবং তা চলেছে নিজস্ব ধারায়। বর্তমানে বিশ্বায়িত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এর গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে হবেও এবং তার দিকনির্ণয় সুকঠিন ও জটিল। কিন্তু হাতগুনে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি কৃষি এবং খাদ্যপণ্যের শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও যা কিনা সাধারণভাবে সামগ্রিক শিল্প-পুঁজিতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। যেমন

কৃষি শিল্পেও ইতিহাসগত এবং ভৌগোলিক কারণের উপর ভিত্তি করেই পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে—এটা অবশ্যস্বীকার্য কোনও ঘটনা নয়। দুই, পুঁজিবাদের পরম্পরবিরোধী ফলশ্রুতি যমন সমাজের একাংশের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি অপরাংশের শোষণযন্ত্রণা কৃষি ক্ষেত্রেও প্রকট হতে চলেছে, কেবল সময়ের অপেক্ষা। তিন, যুরোপ শিল্পায়ন-পুঁজিবাদভিত্তিক সমাজে ষোলো বছর আগেই একটা সামঞ্জস্যের অভাববোধ করেছিল যাকে নাম দিয়েছে world weariness। কৃষি-খাদ্যশিল্পেও উৎপাদনশীলতা এবং জীবনধারণের মানে বিস্তর বৈষম্য সন্নিবিষ্ট হচ্ছে—এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাসারাক্রান্তের সংখ্যা ভয়াবহ। কার্সিনোজেনিক খাদ্যপণ্য নিয়ে নিত্যনতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, খারিজও হচ্ছে। শোভনীয় চট্জলদি ট্যাকেটের খাবারের পাশাপাশি আশঙ্কাও কম নয়, কিছুদিন আগের ম্যাড কাউ ডিজিজের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

- মাৎস্যন্যায় অনুযায়ী ছোট প্রান্তিক চাষির ভাত মারা যাবে বড় বড় খাদ্যপণ্য উৎপাদক এম এন সি-র কল্যাণে এটা স্বতঃসিদ্ধ—এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছে তাই এখানে বৈধ। ওখানে কারগিল প্রচুর টাকা ঢেলেছিল ছোট ছোট চাষিদের গ্রাস করতে এবং চাষিদের প্রতিরোধ সফল হয় নি যদিও কৃষক-সমবায়গুলি যথেষ্ট ক্ষমতা দেখিয়েছে। য কারণে গোল্ড কিস্ট, ফার্মল্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি সমবায়গুলির আঙ্গও অস্তিত্ব আছে। হিলসন, আর্মার এবং সুইফট যাদের মাংসকসাই এবং প্রক্রিয়াকরণে সুনাম ছিল ধরা ডল ভেজাল কেলেঙ্কারিতে ফলে মার্কিন সরকারের প্রথম ফুড এ্যাণ্ড ড্রাগ আইন প্রণয়ন হলো, স্টক হোর্ডিং করে একচেটিয়া বাজারদর বাধ্যতামূলক করার প্রচেষ্টা সরকারের গাচরে আসতেই কৃষিবিভাগের উপবিভাগ প্যাকার্স এ্যাণ্ড স্টক ইয়ার্ডস্ এজেন্সি তৈরি হলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লুটেপুটে খাওয়ার লিঙ্গা প্রতিহত করতে। তারপর বেগতিক দর্শে সুইফট এবং আর্মারকে কিনে ফেলল বৃহত্তর 'নির্দোষ' সংস্থা কন অ্যাগ্রা, এবং সুইফট এবং আর্মারের যাবতীয় কালো টাকা সাদা হলো এভাবেই নতুন আইনের রূপে পড়ার আগেই। এমন মার্কিং, টেকওভার ভারতে মুক্ত বাজারের আওতায় প্রায়শই টে থাকে, মুক্ত বাজারের প্রবক্তারা এভাবে আইনের ফাঁকে কালো টাকা সাদা করাকেই 'খাদ্য দেন 'সরকারের নিয়ন্ত্রণ রোধ'। বোঝাই যাচ্ছে ভেজাল খাদ্যপণ্য, ঘুষ আপনাকে মাকে খাইয়ে এভাবে পার পেয়ে যেতে পারে যে কোনও সংস্থা কোনও বৃহত্তর সংস্থার হানাতায়, বিশেষ করে যখন আইন প্রণয়ন এবং আইন বলবৎ করা মার্কিনের তুলনায় দেশে শব্দক গতিতে হয়ে থাকে তখন ব্যাপারটা এখানে আরও সহজ। উপরন্তু 'রাপসান অফ পাওয়ার' এ দেশে অনেক ব্যাপক। ভারতের ভিজিল্যান্স কমিশনার স্তাল সম্প্রতি যেমন বলেছেন রাজনৈতিক দলগুলির টাকার দরকার যা নগদ দান হিসেবে নেওয়া হয় এবং এ টাকার কোনও হিসাব দাখিল করতে হয় না তাই এ ভাবে লো টাকা সাদা হয়ে যায়। দেশে দুর্নীতি এখন অত্যন্ত সুন্দরভাবে চাহিদা ও যোগানের নতুন রক্ষা করেছে, রাজনৈতিক ও আমলারা এই প্রক্রিয়ায় একদিকে রয়েছে, অন্যদিকে

রয়েছেন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা। মার্কিনে কিছুদিন আগেও বিল ক্রিস্টন বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের বিল গেটসের ডানা ছেঁটে দু'ভাগ করেছিলেন সেখানে আমাদের রাজনীতিকদের অসাধু ব্যবসায়ীর গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা যে নেই তা ভিত্তিহীন বক্তব্যেই স্পষ্ট। কৃষি ও খাদ্য ক্ষেত্র শিল্পায়িত হওয়ার পর এ কথা প্রাঞ্জল হয়ে যাচ্ছে যে এই দুর্নীতি ঠেকানোর আত্মশক্তিটুকুও অপুষ্টি ও অখাদ্যের কারণে হারিয়ে ফেলেছে মানুষ না-দাম হয়ে পড়ছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে কোনও বাজারের মোট লেনদেনের চল্লিশ শতাংশ মনোপলি (বা অলিগপলি) বা একচেটিয়া বলেই বাজারটি ওই একচেটিয়া উদ্যোগের উপনির্ভরশীল হয়। বাজারের যাবতীয় প্রকৃতি-প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করে ওই সংস্থা বিভিন্ন সংস্থার প্রতিযোগিতা থাকলে ক্ষুদ্র-প্রান্তিক চাষির স্বাধীনতা-স্বার্থ রক্ষা হয় কিঞ্চিৎ কিন্তু সংস্থাগুলি ওই মার্জিং বা টেকওভার করে ক্ষুদ্রচাষির অসুবিধার সৃষ্টি করে আমেরিকার কৃষি বিভাগ এই অসুবিধা রুখতে প্রয়োজনীয় আইন চালু করেছে তাতে দেশে তাই একথা বলার কোনও যুক্তি নেই যে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক চাষির স্বার্থ দেখা হচ্ছে কেবলমাত্র চিনে, সোভিয়েতে, কিউবায় বা পশ্চিমবঙ্গে—মোদ্দাকথাটা হলো সংজ্ঞা কল্যাণার্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করার ব্যাপার যা ডান-বাম যে কেউই সদিক থাকলে পারেই।

আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম খাদ্যপণ্য বিক্রেতা সংস্থা অন্যান্য বত্রিশটি দেশে তা ব্যবসায়িক জাল বিছিয়েছে প্রধানত খামারিদের সংগে কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থায়। কম্পানির নির্দেশমতো খামারিদের প্রয়োজনীয় জমি, বাড়ি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনা করতে হয়, শ্রমিক যোগাড় করতে হয়, কিন্তু ধান-গম-পোস্তি উৎপাদনে মালিকানা এবং জিন প্রযুক্তিগত কলাকৌশলগুলি কেবলমাত্র সংস্থাটির হাতেই থাকে সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের কোনও একটি জিন-প্রযুক্তির কোম্পানি উন্নত বীজ চাষিদের দেয় এই অঙ্গীকারে সরকারের সংগে ওই একইভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং তাতে করে ৫ কোম্পানির উপর চাষিদের নির্ভরতা যে বেড়েই চলবে তাতে সন্দেহ নেই। নির্ভরতা বাড়লে শোষণ অনিবার্য।

বিশ্বায়নে খাদ্য-তত্ত্ব যে ভাবে সমকলিত হয়ে চলেছে তাতে বিশেষ কোনও দেশে খাদ্য-তত্ত্বের কথা না বলাই ভালো। আই বি পি, কারগিল, কন অ্যাগ্রা আমেরিকার মেগোমাংস-প্রক্রিয়াকরণ-শিল্পের একাধি শতাংশ দখলে রেখেছে এবং অস্ট্রেলি়া, মেক্সিকো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনায়ও তারা কামড় বসিয়েছে এই শিল্পে। এখন এই দু'বাজার অর্থনীতিতে দেশ থেকে দেশান্তরে ব্যবসা বাড়ানো সহজ আর ততটাই কঠিন ওই সব দেশের ক্ষুদ্র উৎপাদকের টিকে থাকা। এই অবস্থায় অনেক অর্থনীতিবিদ একথা বলছেন যে কৃষিক্ষেত্রটির উৎপাদনে জনৈক ব্যক্তির বা চাষির কোনও ভূমিকা আর থাকবে না, বরং 'প্রক্রিয়াকরণ' শিল্পটিই চাষির কর্মসংস্থানের জায়গা হবে। খাদ্য-ক্ষেত্র

বহুজাতিকদের পক্ষে এতেটাই লোভনীয় যে মিৎসুবিসির মতো গাড়ি বিক্রির কোম্পানি এখন গোমাংস-প্রক্রিয়াকরণে বিশ্বের পয়লা নম্বর সংস্থা। আবার গুঁড়ো সাবান, পেস্টের কোম্পানি ইউনি লিভার পাঁচ সাত বছর আগেই চিংড়ি চাষে নেমেছে। একটা খবর দিই পৃথিবীর ৮৫ শতাংশ তুলাবীজের উৎপাদন-বন্টন-জিন কারিকুরির দখল মনস্যান্টোর হাতে, মনস্যান্টো তুলোর টার্মিনেটর জিনের পেটেন্টও যোগাড় করে ফেলেছে।

মার্কিন কোম্পানিগুলি সারা পৃথিবীব্যাপী শস্য রপ্তানি করে। গ্যাট চুক্তি মোতাবেক দু হাজার সালে এই রপ্তানির কারণে ফিলিপিন্সে শস্যের দাম কুড়ি শতাংশ কমে গেছে ফলে প্রায় পাঁচ লাখ চাষি অর্থসংকটের কবলে। কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার বিষয় এই যে আমেরিকা স্বদেশীয় চাষিদের গড়ে যা ভর্তুকি দেয় তা মিস্তানাও'এর জনৈক চাষির আয়ের ১০০ গুণ। অর্থাৎ গরীবের রুটিকুক্তিতে সরকারের ভর্তুকির বিরুদ্ধে ভারত তথা তৃতীয় বিশ্বের শিল্পপতিদের যে আর্জি তা বিজ্ঞাতীয়করণ ও মুক্ত অর্থনীতির নামে নিতান্তই কায়মি স্বার্থ-রক্ষার প্রচেষ্টা—‘ভর্তুকি’ কথাটা সমাজতান্ত্রিকতার দিবাস্বপ্ন নয়, এটা বৃহত্তম ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গরিব ও প্রান্তিক মানুষের সুরক্ষার অনিবার্য আশ্বাস যা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোকেই দৃঢ়তর করে তুলবে। কৃষি, কৃষিজ পণ্যের বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভর্তুকির সুফল কাজে লাগাতে পারার অধিকার এবং সুযোগ এমনও মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই কেউ কেউ। মজার কথা হলো মার্কিনের নিজস্ব কৃষিনীতি এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কৃষিনীতিতে এই ভর্তুকি দেওয়া এবং অবাধ বাণিজ্যের সুযোগের ফলশ্রুতির আকাশ-পাতাল ফারাক থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের সরকারগুলি আত্মতুষ্ট এবং শিল্পপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় জনসমর্থন আদায়েও উদ্যোগী।

ওয়াটকিন্স লিখছেন, Legal niceties aside, the Uruguay Round agreement bears all the hallmarks of an elaborate act of fraud. It requires developing countries to open their food markets in the name of free market principles, while allowing the U.S. and the EU to protect their farm systems and subsidize exports. (“Free Trade and Farm Fallacies : From Uruguay Round to the World Food Summit”. The Ecologist. 26 [1996] : 244-255)

বন্টন ব্যবস্থার চালচিত্র

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে দুর্ভিক্ষের কারণ খরা বা বন্যা নয়, অনাহার দুর্ভিক্ষ বন্টন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সারা দেশে রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন, অথচ কালাহাণ্ডি ধুকছে। পর্যাপ্ত কৃষিজ পণ্যের ফলন, কেন্দ্র-রাজ্যের জনদরদী সরকার যারা সংবিধানানুযায়ী ‘সমাজতান্ত্রিকতা’ বজায় রাখতে চান এ দেশে, কিংবা বাইরের বায়োটেকের বদান্যতার দেশি বীজ-বিক্রেতা সংস্থা, সার-সংস্থা, কীটনাশক সংস্থাদের তথাকথিত ‘সেবা-ব্যবসা’

সন্ত্বেও উড়িষ্যায় অনাহারে মৃত্যু অথবা প্রাদেশিক সরকারের উন্নত বীজ পাবার আশায় ব্যবসায়ীর দ্বারস্থ হওয়া কেন ঘটবে। সরকারেব নিজস্ব পরিকাঠামো কি ফোঁপড়া হয়ে গেছে? প্রশ্নটা স্বয়ং সুপ্রিম কোর্টের, প্রশাসনের দিকেই।

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় বলে ক্ষুধা সমস্যা অনেককিছুকে জড়িয়ে ধরে জটিলভাবে। খরা-বন্যা না হলেও ‘আমের কুসী’ খেয়ে থাকাটা অবাস্তব হয় নি কিছু দিন আগেও, অথচ শুদামে চাল-গম পচেছে। একজন মানুষ খেতে পাবে কি না পাবে নির্ভর করে—এক, শ্রমের বিনিময়তার পরিকাঠামো-পরিবেশের উপর; দুই, তার স্বাস্থ্য-ক্ষমতার উপর; তিন, তাঁর সামাজিক প্রতিপত্তির উপর; চার, পারিবারিক শান্তি-সুরক্ষার উপর। যারা উড়িষ্যায় কিছু দিন আগে মরেছে দেখা যাবে তাদের শ্রমের বিনিময়তা হয়তো প্রায় শূন্য ছিল, অথবা তাদের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে হয়তো তারা সমাজে অর্বাচীন অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছিল কিংবা কোনও রাজনৈতিক দল তাদের এই অকর্মণ্যতার কারণে তাদেরকে দলভুক্ত করেনি অর্থাৎ তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি প্রায় ছিলই না কিংবা বিভিন্ন কারণে ভাই-এ ভাই-এ বিরোধ বা বউ পেটানো বা মদ গেলা ইত্যাদি বদভ্যাসে তারা লিপ্ত ছিল। এই রকম অর্বাচীন লোকদের রেশন দোকানের মালিক কিংবা এফ সি আই এর ইন্সপেক্টররা বা স্থানীয় কাউন্সিলর, এম এল এ তো উপেক্ষা করবেই, কারণ এদের কাছ থেকে পাবার কিছু নেই—না খাদ্যের দাম, না ঘৃষ, না পাটির হয়ে খাটার ক্ষমতা। অমর্ত্য সেন তাঁর গবেষণায় দুর্ভিক্ষের কার্যকারণের এই ব্যাখ্যাকেই বলেছেন “entitlement approach”। এর থেকে প্রান্তিক মানুষের নিদেনপক্ষে দুমুঠো খেতে পাওয়ার জন্য যা করণীয় সেটা খুব সহজভাবে বেরিয়ে আসছে। এক নিজের শ্রমের বিনিময়তা বজায় রাখা। তার মানে পারিপার্শ্বিকে যারা খেতে দিতে পাবেন তাদের চাহিদা অভাবগুলি কি বুঝে নিয়ে আমার শ্রম দিয়ে সেই চাহিদা মেটানোর প্রচেষ্টা। তা হতে পারে তার ঘটি বাটি মাজা, কিংবা তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো বা অস্বাস্থ্য শেখানো অথবা তার বাজারটা করে দেওয়া, তার পাখাটা সারিয়ে দেওয়া বা অন্য কিছু। দুই, নিজের জন্মগত স্বাস্থ্য অটুট রাখার কৌশল জানাটা একান্তই দরকার কারণ খাদ্য যোগাড় করতে প্রয়োজনীয় শ্রম কেবল সুস্থ দেহমনই দিতে পারে। তিন, সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের প্রয়াস প্রান্তিক মানুষকেও করতে হবে তার ন্যাচারাল ট্যালেন্টের ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে। চার, পবিত্র প্রীতিবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা—পাঁচটি কাঠি একত্রে ভাঙা কঠিন একথা প্রান্তিক মানুষকেও বুঝতে হবে। খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট হলেও ১৯৪৩ এর বাংলার দুর্ভিক্ষ, আফ্রিকার কিছু দেশে দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রতিক উড়িষ্যায় অনাহারে মৃত্যু যে উপরোক্ত কারণগুলির জন্যই ঘটেছে তা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের খাদ্য-উৎপাদন বণ্টনের ক্ষমতা নির্ভর করে খাদ্য-ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্য এবং বিভিন্ন পণ্যের উপযোগিতার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর। তা সত্ত্বেও কোন পরিবার খাদ্য পাবে কি পাবে না তা দেশের উৎপাদন ক্ষমতার উপর

ততটা নির্ভর করে না যতটা করে সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, রাজনৈতিক স্থিতি এইগুলির উপর। আবার রাষ্ট্রের গণবন্টন নীতির নেপথ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধিও পরিবারের খাদ্য-সংকট ডেকে আনতে পারে। যেমন কাগজে কলমে রেশনে গম-চালের যা গুণমান তা আদতে রেশন দোকানের খদ্দেরের পাওয়া চাল-গমের মানের সঙ্গে মেলে না। রেশন দোকানের মালিক তথা এক শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীর যোগসাজসে রেশনের জিনিস 'ব্ল্যাক' করার কথা বাড়ির পরিচাবিকারাও বোঝে। এছাড়া সুযোগ বুঝে স্টক হোল্ডিং তো সর্বজনবিদিত একটি অসাধু পন্থা।

ধনী দেশগুলির খাদ্য-নীতি ও কৃষি নীতি গরীব দেশগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব ফেলে যদিও গবেষণা প্রমাণ করে ধনী দেশগুলিতে খাদ্য-উৎপাদক প্রান্তিক মানুষ সুরক্ষা পেলে তা গরীব দেশেও আশীর্বাদস্বরূপ। অর্থাৎ ধনীদেশের প্রান্তিক মানুষ গরীব দেশের সমর্থন পেলে আখেরে গরীব দেশের প্রান্তিক মানুষেরই উন্নতি। তবে বিদেশের উন্নত বাজারে যদি গরীব দেশের শ্রমিকদের চুকতে না দেওয়া হয় তবে তা বিরূপ প্রভাব ফেলে।

মিডিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা আছে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার। স্বাধীন প্রেসের অভাবে চিনে ১৯৫৮-৬১ সালে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ জানানো যায় নি, তা ছড়িয়ে গিয়েছিল। আবার ভারতবর্ষে স্বাধীন প্রেস থাকা সত্ত্বেও উড়িষ্যায় অনাহারে মৃত্যু ঠেকানো যায় নি তার কারণ খবর-বিক্রেতার লোক মরে গেলে খবরের দাম বেশি হয় তা জানে কিন্তু খবর-তথ্যের মাধ্যমে জীবনধারণের কৌশল শেখানোতে তাদের অনীহা। অর্থাৎ সাংবাদিকদের আরও বেশি করে গঠনমূলক সংবাদ প্রচার করতে হবে মৃত্যুসংবাদের অপেক্ষায় বসে না থেকে।

অর্থনীতিবিদেরা দেখেছেন স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং মাপতে গিয়ে যে খাদ্যের পিছনে পরিবারের খরচের পরিমাণটাই এর সর্বশ্রেষ্ঠ মাপকাঠি। এ থেকে জানতে পেরেছি হাতে একটু অর্থ হলে মানুষ কনসুমার প্রডাক্টের পিছনে ছোট, আরও অর্থ হলে তবে খাদ্যের মান বদলাতে চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে প্রত্যেক মানুষের নূতনভাবে চিন্তার প্রয়োজন—সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেওয়া উচিত খাদ্যের প্রতিই।

বলা হয় সবুজ বিপ্লবই নাকি ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে রেখেছে। পরিসংখ্যান বলছে এটা সঠিক কথা নয়—উনবিংশ শতকে ভারতীয়ের মাথাপিছু খাদ্যের যা পরিমাণ তা এখনও প্রায় ধ্রুবকই আছে। সাফল্যটা অন্য জায়গায়—সাফল্য আমাদের বহু দলভিত্তিক গণতন্ত্র ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের শিল্পায়নে এ অবস্থাটা বজায় বোধহয় থাকবে না যদি না কৃষিক্ষেত্রের ব্যাপক শিল্পায়ন ঠেকানো যায়। কৃষি ও খাদ্যপণ্যের উৎপাদনে সাধারণ চাষির সক্রিয় যোগদানের যে ঐতিহ্য তা কেড়ে নিতে চলেছে এ্যাগ্রো বেস্‌ড কোম্পানিগুলি যারা মনোপলি বা অলিগপলির জোরে মানুষকে তাদের অধীন করে রাখবে। অধীনতা হলে শোষণ অনিবার্য। এই কোম্পানিগুলি

এদের বিপণন নীতির প্রাথমিক স্তরে প্রায় বিনামূল্যে খাদ্য বন্টন করে ‘ফুড এইড প্রোগ্রাম’ নামে। আস্তে আস্তে পুরো বাজারটার এরা দখল নেয়, স্থানীয় উৎপাদকদের হুঁটো বানিয়ে।

খেয়ে পরে বাঁচতে যা যা কর্তব্য

খাদ্য-ক্ষেত্রের শিল্পায়ন এবং তার বিশ্বায়ন হবেই। এই গতির বিরুদ্ধে উজান বওয়ার কথা ভোটের কৌশল হতে পারে, তা বাস্তবে খেতে না পাওয়ার সমাধান মোটেই নয়। বিশ্বায়নের স্রোতে ভাসতে ভাসতেই নিজের চারিত্রিক শক্তি প্রয়োগে আগ্রাসনের বেনোজল প্রতিরোধ করার উপায়গুলি ভাবব; সঙ্গে ভাবব ব্যক্তিগত প্রয়াসে আপন প্রাণ বাঁচানোর প্রক্রিয়ায় খাদ্য-সংগ্রহে স্বয়ম্ভর ও স্বাধীন হওয়ার কথাও।

মার্কিনে খাদ্য শিল্পের নতুন ধারার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তথা প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ মানবিক সংগঠনগুলি ইতিমধ্যে নিয়ে ফেলেছে। এই সংগঠনগুলির মতে পারিবারিক কৃষি ও খামারের পুনরুজ্জীবন, পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ রাখা, ও খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা—এই তিনটিই সক্রিয়ভাবে খাদ্যসমস্যার সমাধানে সক্ষম। এ ছাড়া পারিবারিক চাষাবাদ বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা, ছোট ছোট গ্রামীণ সংগঠন স্থাপন, এবং তৃতীয় বিশ্বের জিন-সম্পদকে বহুজাতিকদের দ্বারা অবক্ষিত অংশগ্রহণ ও পেটেন্ট রোখা—এ ক’টিকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধারণযোগ্য খাদ্য ও কৃষি-তন্ত্রের সপক্ষে ছোট ছোট সংগঠনগুলি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়িয়ে তুলেছে, এবং এরা প্রতিপক্ষের বিভেদকামী হাত অনেকটাই দমন করে রেখেছে। কোনওরকম রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় না থেকে সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন মানবতাবাদী গোষ্ঠীর সংগে হাতে হাত মিলিয়ে চলছে এরা—গড়ে তুলেছে জোটবদ্ধ বৃহৎ আন্দোলন।

এই আন্দোলন আমেরিকায় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে সাড়া জাগিয়েছে। ধারণযোগ্য কৃষি-তন্ত্রের সংস্থা National Campaign for Sustainable Agriculture (যোগাযোগ : P.O. Box 396, Pine Bush, New York 12566; (914) 744-8448; Fax : (914) 744-8477 ; e-mail : campaign@magiccarpet.com) ক্রমে বৃহত্তর হয়ে উঠছে এবং এটি দুনিয়াব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে। ভারতের বিবেকবান মানুষেরা এদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাদের সমস্যা-সমাধান-প্রতিবাদের আন্তর্জাতিক মাত্রা পেতে পারে।

এনসিএসএ ‘ধারণযোগ্য কৃষি’র একটি সংজ্ঞা দিয়েছে—এ এমন এক কৃষি পদ্ধতি যা মাটি ও মানুষকে অবক্ষয় হতে বাঁচিয়ে রাখে। ভারতবর্ষে চাষাবাদ ঐতিহ্যগতভাবে কোনওদিনই ‘বাণিজ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি বরং তা বরাবরই একটি বৃহত্তর জীবনদর্শন রূপে সমাদর পেয়েছে। তাই ঐতিহ্যগত দিক থেকেও এনসিএসএ-র ধারণাগুলি এবং কর্মকাণ্ড ভারতীয়দের জীবনে অভিযোজিত হওয়া অত্যন্ত সহজ।

নেত্রাস্কার ওয়াল্ট হিলের সেন্টার ফর রুরাল এ্যাফেয়ার্স ধারণযোগ্য কৃষির লক্ষ্যে চাষিদের কর্তব্যগুলি নির্ধারণ করেছে। যেমন, এক, সারের বদলে মাটিতে শুটি জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করলে জমি উর্বর হয় এবং যে কোনও চাষের ক্ষেত্রে শুটির এই 'প্রাকৃতিক সার' কিভাবে কাজে লাগাতে হবে তার প্রশিক্ষণ নিতে বলছে চাষিদের। দুই, পারিবারিক পশুপালনের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি 'হপ হাউস'এ পশুপালনের পস্থা শিখে নিতে বলা হচ্ছে। এই পন্থায় প্রতিটি পরিবার পশুপালন করলে পশু ব্যবসায় বহুজাতিকদের কোণঠাসা করা অনায়াসসাধ্য। তিন, গ্রামীণ সমবায়ের মাধ্যমে ধারণযোগ্য কৃষিভিত্তিক জীবন গঠনের প্রশিক্ষণ দেওয়ায় জোর দিচ্ছে সি আর এ।

আইনগত দিক থেকে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের সুরক্ষা দিতে বাধ্য হয়েছে মার্কিন সরকার। ১৯৯০ এ ফার্ম বিল এর ২৫০১ নং ধারা মোতাবেক ক্ষুদ্র চাষিদের সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং এজন্য ১০ মিলিয়ন ডলার ধার্য করা হয়েছে। এ থেকে যেটা বুঝি তা হলো ভারতবর্ষেও এই নিরিখে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে চাষিদেরই।

গ্রামে সমবায়ভিত্তিক কৃষিকর্মও যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। এবং কৃষি ক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে—আমাদের দেশের চাষিভাইরা এবং বন্ধুরা এই সমবায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন : NOFANY, P.O. Box 21, South Butler, NY 13154 এবং The Biodynamic Association P.O. Box 550, Kimberton, PA. 19442.

প্রথাগত কৃষি ব্যবস্থা যা কিনা খাদ্য-তন্ত্রের বহুজাতিকরা ক্রমাগত উৎসাহিত করে যাচ্ছে তার কুফল সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ তথ্যগুলির ডেটাবেস তৈরি করা হয়েছে। এই তথ্যগুলি হলো—

১) ব্যাপক ভূমিক্ষয়, মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা হ্রাস, কীটনাশকের বিরুদ্ধে পতঙ্গের প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি।

২) উপরোক্তগুলি মোকাবিলা করতে গিয়ে যা খরচ তা উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের চেয়ে বেশি।

৩) মুনাসফারক বাছাই-করা কতগুলি উদ্ভিদের চাষেই কৃষিতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ রাখতে পরিবেশে উদ্ভিদ বোগ প্রতিরোধের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

৪) আমেরিকায় কীটনাশক ব্যবহারকে সীমিত করতেই প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার প্রতিবছর খরচ হচ্ছে।

৫) প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কীটনাশক আবিষ্কার করতে হচ্ছে।

৬) ভূমি ও জলে সারের অব্যবহৃত অংশ মিশে যাওয়ায় দূষণ বেড়েই চলেছে।

৭) জলে এই সারের অংশ মিশে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনেব মাত্রা কমিয়ে দিয়ে

জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবননাশ ঘটাবে। মেক্সিকো উপসাগরে এমনই একটি ডেড জোন বর্তমান।

৮) কেবলমাত্র একটি জাতের উচ্চফলনশীল শস্য চাষ করাতে উৎসাহ দিচ্ছে কোম্পানিগুলি; ফলে কীটপতঙ্গের পক্ষে সুবিধা হচ্ছে। রোগে একটি মাত্র জাতের উদ্ভিদকে জর্জরিত করতে পোকাদের খুব সহজ হচ্ছে।

৯) জিন-বৈচিত্র্য বিনষ্ট হচ্ছে।

ধারণযোগ্য কৃষি কাজে কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে তার একটি খসড়া প্রস্তুত করা গেছে। যথা—

বায়ো ও প্রাকৃতিক সার প্রয়োগ। মাশ্টি ক্রপিং, ডাবল্ ক্রপিং, স্থিপ ক্রপিং, সাতার ক্রপিং, ইস্টার ক্রপিং ব্যবস্থার প্রচলন। শহরে গ্রামে প্রতি বাড়িতে কিছু সজ্জি শাক ফল মূলের ধারণযোগ্য চাষে উৎসাহ প্রদান।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার সফটওয়্যার কাজে লাগাতে পারলে এক ধাপে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যাবে। এতে দুটো কাজ হবে। বহুজাতিকরা তথ্য-প্রযুক্তির শক্তি নিয়ে বলীয়ান হচ্ছে ক্রমাগত এবং প্রান্তিক মানুষ এই ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছে না বলে দুর্বলতর হয়ে পড়ছে। বিশেষত কৃষিভিত্তিক যাবতীয় তথ্য তা হতে পারে বীজ সঞ্চয়ী বায়ো-সার সঞ্চয়ী বা বিপণন সংক্রান্ত বোতাম টিপে হাতের মুঠোয় পেলে বিরট লাভ। প্রান্তিক মানুষের তথ্যভাব অর্থনৈতিক দুরবস্থা সৃষ্টি করে—এ নিয়েই গবেষকরা এবার অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন। সুতরাং তথ্যকে হাতের মুঠোয় রাখতেই হবে প্রান্তিক চাষিকে। কম্পিউটার সফটওয়্যার বলে দেবে চাষিকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কৃষি কাজে কত টাকা কত সম্পদ ব্যবহার করলে চাষি লাভবান হবে। সফটওয়্যারের মধ্যে খরা-বন্যার এবং অন্যান্য প্যারামিটার'এর উত্থান পতনের সম্ভাবনা ও হিসাব কষা থাকে বলে কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী চাষির পক্ষে তা যথার্থ প্রয়োজনীয় হবে। বিদেশে কোম্যাক্স নামে একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এক্সপার্ট সিস্টেম তুলোচাষিদের ব্যাপক সুযোগসুবিধা করে দিয়েছে। এ বিষয়ে চাষিকে এমপাওয়ার করতে হলে প্রাথমিকস্তরেই খুব ভালোভাবে ইংরাজি শেখানো প্রয়োজন। তা ছাড়া কম্পিউটার প্রযুক্তির ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইন্টানশিপের মতো করে চাষিদের সফটওয়্যার, নেটওয়ার্কিং ইত্যাদির সুবিধা নেওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে পারে—এ ব্যাপারে প্রযুক্তিগত শিক্ষায় কম করে দু বছর স্নাতকোত্তর স্তরে 'ইন্টানশিপ' বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। এই ভাবে ছাত্রছাত্রীর কৃষিতে অবদান থাকবে, উৎপাদন বাড়বে, সুগম হবে ধারণযোগ্য বিকাশের পথও। ব্যাপারটা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বা সমবায়ের মাধ্যমে হতে পারে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে কৃষক পৌছে যেতে পারেন সরাসরি ক্রেতার কাছে। সুতরাং রাজনৈতিক মদতপুষ্ট ফোড়োদের ক্ষমতা খর্ব হতে পারে এ ভাবেই, কৃষক

ক্রেতার কাছে সরাসরি কৃষি পণ্য বিক্রি করতে পারবেন, লাভের শুড় ওই ফোড়েরদে পটে আর যাবে না। কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই বদলে যাবে। ভারতবর্ষের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক এম এস স্বামীনাথন এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে কতগুলি প্রস্তাব দিয়েছেন। গ্রাম পুনর্গঠনের কাঙ্ক্ষ ও কম্পিউটার ব্যবহার বাস্তব রূপও পেয়েছে যার বর্ণনা শ্রয়ণ : মে-অগষ্ট : ২০০০ সংখ্যায় পাই।

পরোক্ষ প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ

The doctrine of passive resistance—এ পথে বুটিশের বিরুদ্ধে আমরা ব্যাপক সাফল্য পেয়েছি এ কথা অনস্বীকার্য। রক্তপাতহীন শান্ত নীরব অথচ বলিষ্ঠ বিপ্লবের এই অসাধারণ কৌশলে খাদ্য-তত্ত্বের শিল্পায়ন ও বাণিজ্যায়করণ রোধ করতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ আজ একটি দিন সফট-ড্রিংক বা সংহত খাদ্য পণ্য কিংবা অন্যান্য যে কোনও বাণিজ্যিক খাদ্যপণ্য খাব না এই অঙ্গীকার যদি দেশের প্রত্যেকটি মানুষ করতে পারে (এটা পারতে কোনও ধকলই নেই) তবে আজ এই একটি দিনেই উপরোক্ত খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলির যা ক্ষতি হবে তাতে তাদের বিপণনের মেরুদণ্ড নাড়া খাবে। এই ভাবে এই সব কোম্পানিগুলির মূল উপড়ে ফেলাটা কঠিন নয় বোঝা যাচ্ছে। সহজ যেটা নয় তা হলো প্রত্যেক মানুষকে এটা বোঝানো যে বাণিজ্যিক খাদ্যপণ্য কুপথ্য, রোগকারক। তাছাড়া সব থেকে শক্ত জায়গা হলো বাণিজ্যিক খাদ্যপণ্য দামে প্রাকৃতিক খাদ্যের চেয়ে অনেক সস্তা—যেমন কিনা সারহীন টমেটোর দাম সার দেওয়া টমেটোর প্রায় দ্বিগুণ। এ সত্ত্বেও হিসেব কষে দেখা গেছে যে দিন-মজুর শ্রমিক কর্মচারীর দৈনন্দিন জলখাবার যেমন চা বিস্কুট, ইউরিয়ায় ফোলানো মুড়ি, তেলেভাজার পিছনে যা খরচ তা প্রাকৃতিক খাদ্য ছোলা-বাদাম-নারকেল এর প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং খাদ্যচয়নের পিছনে জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেচনা বাড়ালে পথ অনেকটাই পরিষ্কার হয়। কিন্তু এই প্রাকৃতিক খাদ্যের চাহিদা বাড়লে ওইগুলির দাম স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে যাবে, আর তাই প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন নিজেদের হাতে থাকাটা অনিবার্য। একারণেই আগে বলেছি কৃত্রিম খাদ্য-পণ্য-তত্ত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিরোধ সমান্তরালে চালিয়ে যেতে হবে। সোজা কথায় কৃত্রিম খাদ্য-পণ্য বা বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য সম্পূর্ণ বয়কট করতে হবে প্রত্যেককে এবং একই সঙ্গে প্রাকৃতিক খাদ্য (এবং ভেষজও) নিজেদের ফলিয়ে নিতে হবে বাড়ির পাশের এক ফালি জমিটায় বা ছাদে দশটি টবে—এটাই বোম্বইয় আমার এতো কথার সার কথা। সঙ্গে সঙ্গে চলবে ধারণাযোগ্য কৃষির পক্ষে যারা আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আদানপ্রদান ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস।

প্রাকৃতিক খাদ্য সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান আমাদের অশিক্ষার দেশে বিরল। অশিক্ষার কারণেই কৃত্রিম খাদ্যের প্রতি টান অনেক বেশি। জানি না কৃত্রিমতার কুফল—শরীরে, মনে। তাই ধারণাযোগ্য কৃষির সপক্ষে এবং প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার

লড়াইএ দার্শনিক অনুশাসনের প্রয়োজন অনুভব করছি। মনে করি প্রখ্যাত দার্শনিক কবি খালিল জিব্রানের ‘দ্য প্রফেট’-এর খাদ্য সম্পর্কে অনুশাসন—

Then an old man, a keeper of an inn, said,

Speak to us of Eating and Drinking.

And he said :

Would that you could live on the fragrance of the earth, and like an air plant be sustained by the light.

But since you must kill to eat, and rob the newly born of its mother's milk to quench your thirst, let it then be an act of worship,

... ..

When you kill a beast say to him in your heart :

“By the same power that slays you, I too am slain ; and I too shall be consumed....

And when you crush an apple with your teeth, say to it in your heart :

“Your seeds shall live in my body. And the buds of your to-morrow shall blossom in my heart,

And your fragrance shall be my breath,

And together we shall rejoice through all the seasons.”

ইঙ্গিতে-ব্যঞ্জনায় নিরামিষ আহারেরও আহারশুদ্ধির কথা ব্যক্ত হয়েছে। কোনও লোভনীয় সংহত খাদ্যের কথা তোলাই হয় নি। খাদ্য বলতে প্রাকৃতিক ফল মূল শস্যই বোঝানো হয়েছে—খেতে হবে বিবিক্ত হয়ে, বৃহৎ আনন্দ পাবার অভীক্ষা নিয়ে।

এই যদি খাদ্যগ্রহণের নেপথ্যের দর্শন হয়ে থাকে তো এর বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যাক। তবেই বুঝব খাদ্য-অখাদ্যের প্রভেদটুকু আর এই প্রভেদই কিভাবে গড়ে দেয় আমাদের চরিত্র, জীবন ও মনন। আর তা বুঝলেই বাগিচ্যিক খাদ্যপণ্য বয়কট করা অনায়াসসাধ্য এবং যুক্তিগ্রাহ্য হবে।

সঠিক প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাস গঠন এবং সংহত খাদ্য বর্জনের প্রভাব শরীরে-মনে কিভাবে ফুটে ওঠে তার বিজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রভিত্তিক গবেষণার পথিকৃৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ। নিভৃত অশ্রমে রোগী-অরোগী প্রত্যেকের উপর অনুসন্ধানভিত্তিক পরীক্ষা চালিয়ে পথ্য-অপথ্য ও প্রাকৃতিক যোগচিকিৎসার যে সব সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হন তার বিস্তৃত বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন তাঁর গ্রন্থগুলিতে।

দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর খাদ্যের প্রভাব কমবেশি আমরা সবাই জানি। কিন্তু দেহের এশোক্রিন গ্রন্থিগুলি এবং অন্যান্য গ্রন্থিগুলির (যা আমাদের মন গঠন করে বলে সাইকিয়াট্রিক বিজ্ঞানে স্বীকৃত) নিঃসরণও খাদ্য-অখাদ্যের উপর নির্ভবশীল। সংহত বা

প্রক্রিয়া করা খাদ্য গ্রন্থিগুলির কার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটায় ফলে মানসিক শক্তি হ্রাস পায়। সুতরাং শুদ্ধ মন গঠনে প্রাকৃতিক খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

এখন শুদ্ধ খাদ্য কাকে বলব। স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী বলছেন অসংহত খাদ্য যেমন ডাল, ফলমূল, সব্জি, শাক, তরকারি, দুধ সবই অল্প রান্নায় সুখাদ্য—এগুলিই তিনি নাম দিয়েছেন ক্ষারধর্মী খাদ্য ('ক্ষার' বা 'অম্ল' এখানে রসায়নের 'ক্ষার' বা 'অম্ল' নয়)। আর প্রক্রিয়া করা খাদ্য যেমন ভাত-রুটি, ছানা, সন্দেশ-রসগোল্লা এবং মানবদেহে অনুপযোগী খাদ্য মাছ-মাংস-ডিম অম্লধর্মী খাদ্য। সঠিক পুষ্টি, সুমন ও সুস্থাস্থ্যের অনুকূল সুখাদ্য তালিকায় উপরোক্ত অম্লধর্মী ও ক্ষারধর্মী খাদ্যের অনুপাত হবে ঠিক ১ : ২। এই পরিমাপই সুখম পুষ্টি-বিপাক-পরিপাকের সর্বশেষ কথা। তিনি ও তাঁর আশ্রম ১৯২৯ সাল থেকে বহু মানুষের উপর এটা প্রয়োগ করে তাদের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। সৃষ্টিশীল শ্রেয়স্কর মনন সমৃদ্ধ নীরোগ জীবনগঠনে তিনি একটি ছাপানো ব্যবস্থাপত্র দেন প্রত্যেকের জন্যই। এই ব্যবস্থাপত্রে তিনি লেখেন :

পথ্য : দৈনিক আহাৰ্যের ১/৩ অংশ ভাত রুটি, ২/৩ অংশ ডাল, সব্জি, বাদাম, সয়াবিন, নারকেল, দুধ-দই ও যে কোন প্রকাব ফল।

নিষিদ্ধ পথ্য : মাছ, মাংস, ডিম, ঘি, মাখন, তেলেভাজা-ঘিয়েভাজা খাদ্যসমূহ, মূড়ি, চিড়া, মিষ্টি-মিঠাই, চিনি (গুড় ও মধু ঋণ্য যেতে পারে), গুড়া দুধ, হরলিক্স ও টিনমিস্ক, চকোলেট, বিস্কুট, লজেন্স, চানাচুর, আইসক্রীম, চা, কফি, বিড়ি, সিগারেট, খয়ের, জরদা, নস্য ও যে কোন প্রকার মাদকদ্রব্য।

এতাবৎ খাদ্যপণ্য কোম্পানিগুলির দুর্নীতি এবং ব্যবসায়িক শোষণমুখী যে পদক্ষেপগুলির কথা লিখেছি তা উপরোক্ত খাদ্য-পথ্য মেনে চললে অচিরেই দমন করা যায়। দেখুন চিনি, গুড়ো দুধ, চকোলেট, হেলথ ড্রিংকস, বিস্কুট, লজেন্স, চানাচুর, আইসক্রীম, চা, কফি, সিগারেট-বিড়ি, জরদা, নস্য, সফট-ড্রিংক্স, মাদকদ্রব্য এবং অ্যালোপ্যাথিক ওষুধসমূহ বয়স্কট করতে পারলে খাদ্য-তন্ত্রে বিপ্লব আসবে, ধারণযোগ্য কৃষিব্যবস্থা ত্বরান্বিত হবে, খাদ্যতন্ত্রের বহুজাতিকদের দৌরাভ্যা ও ক্ষমতা কমবেই। যখন বিজ্ঞানদর্শনে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, সেই ১৯২৯ সাল থেকেই, বাণিজ্যিক খাদ্যপণ্য প্রস্তুতি, বিপণন এবং ঋণ্যার অশুভ দিকগুলি তখন প্রত্যেক নাগরিকের উচিত নয় কি নিজেদের খাদ্যাভ্যাসে আমূল পরিবর্তন আনবার এবং ধারণযোগ্য কৃষির বিস্তার ঘটানো সাধ্যের মধ্যে? এ দায় প্রত্যেকের।

উপসংহার

'ওরা' এবং 'আমরা' এই আলোচনায় শুরু করে পাশ্চাত্যের 'কল্পবিজ্ঞান' আর তার সমতুল্য প্রাচ্যের 'কল্পদর্শন' আলোচনায় শেষ করছি এই নিবন্ধ। ওরা কল্পবিজ্ঞানে বলেছে বিশ্বায়ন : ১৬

হেলথ্ ক্যাপসুলের কথা—এ ক্যাপসিউল খেলে নাকি খিদে পায় না আর, ক্যালরি পুষ্টি সবই মেলে। রান্না করার বক্সি ঝামেলা পোহাতে হয় না, ঘাম ঝরিয়ে চাষ করে ফলাতে হয় না ফসল। হয়তো ভাবীকালের মানুষের খাদ্য হবে কর্পোরেট সেক্টরে তৈরি ওই, ক্যাপসিউলই। কল্পবিজ্ঞানের এই ক্যাপসিউলের কথা সবাই জানে।

কিন্তু জানে না প্রশান্ত সনাতন ভারতবর্ষে খাদ্য-সমস্যার সমাধানে হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যার ‘কল্পদর্শন’ের কথা। এ কথার আধুনিক অভিব্যক্তি শ্রোত্রিয় মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতীর কথায়—

“উদ্ভিদ অর্থাৎ গাছপালার একটা বিশেষ শক্তি আছে। মাটির ভিতরে, জলের ভিতরে, পাথরের ভিতরে শিকড় প্রবেশ করাইয়া দিয়া উহার ঐ সমস্ত বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিকে আহরণ করিতে পারে। এই সংগৃহীত প্রাণশক্তি দ্বারাই তাহারা নিজ নিজ দেহের প্রাণকোষগুলি গড়িয়া তোলে; স্বীয় দেহপুষ্টির বিধান করে। মাটি ও পাথর প্রভৃতির অভ্যন্তর হইতে প্রাণশক্তি বা খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহের ক্ষমতা মানুষের মাঝে নাই; এই জন্যই মানুষকে প্রাণধারণের জন্য উদ্ভিদ্ধি অর্থাৎ শাক-সজ্জি, ফল-মূল ও শস্যাদির উপর নির্ভর করিতে হয়, অথবা উদ্ভিদভোজী জীবের মাংস অর্থাৎ আমিষ ভোজনে আসক্ত হইতে হয়। আলো-বাতাস হইতেও উদ্ভিদরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ করে। এই আলো-বাতাস হইতে খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহের ক্ষমতাও মানুষের মাঝে সীমাবদ্ধ। এই জন্যই প্রকৃতিদেবীর অক্ষয় ভাঙারে অফুরন্ত খাদ্যপ্রাণ থাকা সত্ত্বেও খাদ্য বিষয়ে মানুষ অসহায়।...

...পুরুষানুক্রমে প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া, আমরা যদি আমাদের ফুসফুসকে সবলতর করিতে পারি, তাহা হইলে শ্বাসের সহিত আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহা হইতেই প্রচুর খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ করিয়া, দেহের পুষ্টিবিধান করিতে পারিব। প্রাণায়াম অভ্যাসকারীরা স্বভাবতই অম্লাহারী হয়। প্রাণায়ামসিদ্ধ যোগীদের যে অম্লাহারের প্রয়োজন হয় না, তাহার কারণ—বায়ুর মাঝে যে সবরকম খাদ্যপ্রাণ থাকে, উহার সমস্তই তাহারা দেহপুষ্টির কাজে লাগাইতে পারেন। এই জন্যই অনাহারে তাহাদের দেহ কৃশ বা দুর্বল হয় না।”

কৃত্রিম খাদ্যপণ্য ও কৃষিতন্ত্রের কলুষে সভ্যতার এই সংকটকালের সমাধান তাহলে কি? কর্পোরেট সেক্টরের তৈরি কল্পবিজ্ঞানপ্রসূত ছোট্ট একটি হেলথ্ ক্যাপসিউল; নাকি যেমন চলছে চলবে বহুজাতিকদের টার্মিনেটর জিনসমৃদ্ধ বীজের শস্য-উদ্ভিদ, সার-কীটনাশকের ব্যবসা; খাদ্যপণ্য তন্ত্রে যে সভ্যতার সংকট উপস্থিত সেটাকেই অস্বীকার করা; নাকি সনাতন ভারতবর্ষের হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকার উপায়; না ধারণযোগ্য কৃষির পথে হাঁটা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পতাকা ধরে? বিবেচনা করার কথা আপনারই।

তথ্যপঞ্জি

১। Political Economy of Hunger : Amartya Sen & others

২। Monthly Review, Vol 50 No. 3, July Aug 98

৩। “Computers in Agriculture” by Sourav Ghosh—approved paper for presentation in All India IE (I) Convention 2000

৪। ‘যোগবলে রোগ আবোগ্য’

‘খাদ্য নীতি ও শিশুপালন বিধি’

‘বিবিধ প্রাণায়াম ও নেতি ধোতি’

—স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী,

কৃতজ্ঞতা

শিবানন্দ মঠ ও যোগাশ্রম সংঘ, ৪৭১ নেতাজি কলোনি, কলকাতা ৪০, ৫৩১-১১১৭ ;
অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য; দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়; সুদীপ্ত দে; শ্রয়ণ সম্পাদনা ও গবেষণা
মণ্ডলী।

বিশ্বায়ন, উন্নয়ন ও উচ্ছেদ

অভিজিত গুহ

কতকাল বিশ্বায়ন

বিশ্বায়নের বয়স কত? নিঃসন্দেহে ইংরেজি Globalization-এর বাংলা করে আমরা এই শব্দটি পেয়েছি। কিন্তু সে তো ভাষার ব্যাপার। সমগ্র বিশ্ব বা ভুবনকে কোন একটা কিছু মध्ये নিয়ে আসার প্রক্রিয়াই যদি বিশ্বায়ন হয় তবে প্রশ্ন ওঠে সেই ‘কোন কিছুটা’ ঠিক কি আব কে বা কারা সমগ্র বিশ্বকে একটা কিছুর মধ্যে নিয়ে আসতে চাইছে? ওই কোন কিছুটা অর্থনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাজ্য বা সংস্কৃতি যা হোক কিছু হতে পারে। হয়ত বিশ্বায়ন মানে এসব কিছুই। কে বা কারা বিশ্বায়ন ঘটাতে উন্মুখ? এই সব প্রশ্ন বিশ্বায়নের আলোচনায় ওঠা উচিত। কিন্তু তার আগে, প্রায় দুশো বছর আগে যে ব্রিটিশ জাতির বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য অস্ত যত না তাদের দিকে একা’ তাকানো যাক। মাধব গ্যাডগিল ও রামচন্দ্র গুহ তাঁদের ‘ইকোলজি এণ্ড ইকুইটি’ (১৯৯৫) গ্রন্থে অনবদ্য ভাষায় ওই ব্রিটিশ জাতির এক ধনী প্রতিনিধির জীবন যাত্রার ছবি এঁকেছেন এইরকমভাবে : “যে ব্রিটিশ জাতি যারা ভারত জয় করে দেশটিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল সে সময়ে তারা ছিল বিশ্বের প্রথম সারির সর্বভূক। বসুন্ধরার যে কোনো প্রান্ত থেকে ব্রিটিশ জাতি সংগ্রহ করে আনত তাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি উপকরণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিভূ একজন ধনী ব্যক্তির কথা ভাবুন। তিনি বসে আছেন যে চেয়ারটিতে সেটি ‘তৈরি’ হয়েছে বর্মামূলকের সেগুন কাঠে। আর তার সামনে রাখা ভারী টেবিলটির কাঠ এসেছে আফ্রিকার মেহগনি গাছ থেকে।

“টেবিলের উপর ধুমায়িত পাত্রে অস্ট্রেলিয়ার নখর গোমাংস। এই মাংস ধুয়ে নেওয়া হয়েছে সুন্দা দু ফরাসি আর ইতালিয়ান মদে। ব্রিটিশ ব্যক্তির সামনে যে রমণী বসে আছেন তার দেহ ঢাকা আছে কানাডার লোমশ কোনও প্রাণীর চামড়ায় তৈরি কোটে। আর সেই কোটের নিচে আছে সুদূর মিশর দেশে উৎপন্ন তুলোর থেকে তৈরি জামা। সেই তুলোর সুতোয় লাগানো হয়েছে ভাবতবর্ষের নীলের রং। রমণীটির গলায় ঝুলছে পেরুর খনি থেকে উত্তোলিত সোনা দিয়ে তৈরি নেকলেস যার মধ্যে চকচক করছে দক্ষিণ আফ্রিকার ছোট ছোট হীরের দানা।” উনবিংশ শতকের ভাষায় বিশ্বায়ন শব্দটি ভাগ্যিস ছিল না, তাহলে বিশ্বায়ন বোধহয় সেই সময়ে তার স্বর্ণযুগে পৌঁছেছিল এমন কথা অনেকেই উচ্চারণ করতেন।

বিশ্বায়নের অর্থনীতি বনাম ভাষার রাজনীতি

অধুনা বিশ্বায়ন শব্দটি ক্রমেই তার অর্থনৈতিক অর্থের গভী ছাড়িয়ে অন্য নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বায়নের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মাত্রা নিয়ে নানারকম আলোচনা, জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। এইসব আলোচনার ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে বিশ্বায়নের মূল অর্থনৈতিক চেহারাটি। অনেকে বিশ্বায়নকে শুধুই কমপিউটার আর ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যমের বাইরে অন্য কোন স্তরে ভাবতেই চাইছেন না। সারা বিশ্ব একটি ছোট গ্রাম (small global village) যেখানে ই-মেল আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবাই প্রত্যেকের হাতের কাছে রয়েছে এইরকম একটা ধারণা প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে। এই ধারণার উপযোগী বহু শব্দ নিয়ে তৈরি হচ্ছে একটা আলাদা ভাষা। আর এই ভাষা ঢেকে দিচ্ছে বিশ্বায়নের আসল অর্থনৈতিক রূপটিকে। এটাকেই বোধহয় বলে ভাষার রাজনীতি।

বিশ্বায়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ডাইনোসরের মত বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ ও বেড়ে ওঠার ইতিহাস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এদের বাড়বাড়ন্ত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এ সম্বন্ধে একটু তথ্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করলে বিষয়টির গুরুত্ব ঠিক বোঝা যাবে না।

বহুজাতিক সংস্থা : কারা এবং কত বড়

বহুজাতিক সংস্থা (Transnational Corporation বা Multinational Corporation) হলো এমন একধরনের বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যাদের মালপত্র কেনাবেচা, কাঁচামাল সংগ্রহ, ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও বন্টন, বিজ্ঞাপন ও ব্যবসা সংক্রান্ত গবেষণা পৃথিবীর একাধিক দেশজুড়ে চলে। কোন বহুজাতিক সংস্থা তার লাভের কিছু অংশ শেয়ার হিসেবে বাজারে বিক্রি করতে পারে। এই রকম সংস্থা হলো ডুপন্ট ও এনরন। আবার এমন বহুজাতিক সংস্থা আছে যারা বাজারে শেয়ার বিক্রি করেনা। যেমন কারগিল কোম্পানি।

বহুজাতিক সংস্থাগুলির আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো যে যদিও এদের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে থাকে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে, তবুও কোনও একটি দেশে থাকে এর মূল কর্তৃত্বের চাবিকাঠি। বলা বাহুল্য এই চাবিকাঠি ধরা থাকে বহুজাতিক কোম্পানিটির উদ্ভব যে দেশে সেখানেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সুইজারল্যান্ডের এবিবি বৈদ্যুতিক ও কারিগরি সংস্থার কথা। এদের শাখা আছে পৃথিবীর ১৪০টি দেশে। হল্যান্ডের রয়্যাল ডাচ-শেল কোম্পানি তেলের খোঁজ করে পৃথিবীর ৫০টি দেশে, তেল পরিশোধন করে ৩৪টি দেশে আর বিক্রি করে পৃথিবীর ১০০টি দেশে, গ্রেট ব্রিটেনের রাসায়নিক কোম্পানি আই.সি.আই পৃথিবীর ৪০টি দেশে বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে আর সেগুলি বিক্রি করে ১৫০টি দেশে। বহুজাতিক সংস্থার জীবনকাঠি হলো বিশ্বায়ন। এবার দেখা যাক এদের টাকাপয়সার পরিমাণটা কীরকমের।

টি.এন.সিগুলোকে পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনৈতিক সংগঠন বললে খুব একটা বাড়িয়ে

বলা হয় না। অর্থনীতিবিদদের একটা আনুমানিক হিসেব থেকে জানা যায় যে বর্তমানে ৩০০টি বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা গোটা পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ উৎপাদনশীল সম্পদের মালিক। টাকার অঙ্কে এই সম্পদের মূল্য ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ১০০ হাজার কোটি ডলার। আর একভাবে এই অর্থনৈতিক দৈত্যদের সম্পদের পরিমাণের একটা মাপজোক করা যায়। বিচারটা তুলনামূলক। যেমন জাপানের বহুজাতিক সংস্থা ইতাছু ১৯৯২ সালে ১৬৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যে মালপত্র বিক্রি করেছিল। ১৯৯১ সালে অস্ট্রিয়ার জাতীয় আয় ছিল ১৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর দুটি দৃষ্টান্ত। সুইজারল্যান্ডের নেসলে কোম্পানির এক বছরের বিক্রি হলো ৩৮ বিলিয়ন ডলার আর নাইজেরিয়ার জাতীয় আয় ৩৪ বিলিয়ন ডলার। জর্মন টি.এন.সি. সিমেন্স একটি বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের জিনিসপত্র বিক্রি করেছিল। ঐ সময়ে পেরু, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের জাতীয় আয় ছিল যথাক্রমে ৪৮, ৪৭, ৪৩ ও ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই রকম টাকার ছোঁর যাদের তাদের হাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলির রাজনৈতিক নেতৃবর্গ যে বেশ খানিক পুতুলের মত নাচবেন এতে আর আশ্চর্যের কি? এবার দেখা দরকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বিশ্বায়ন কীভাবে জড়িত।

একটি বহুজাতিক কোম্পানির কাল্পনিক কাহিনী : গল্প হলেও সত্যি

অনেক সময় সত্যিকারের তথ্য ও পরিসংখ্যান আমাদের মনকে ক্লান্ত করে তোলে। যদি একটা গল্পের মত করে বহুজাতিক সংস্থার কথা বলা যায় তাহলে একটা জটিল প্রক্রিয়াকে বুঝতে সুবিধে হয়। সেইজন্যই এই কাল্পনিক গল্পের অবতারণা। মনে করুন কোন একটি ঔষধ প্রস্তুতকারী একটি বহুজাতিক সংস্থার কথা। এই কোম্পানিটির ঔষধ তৈরির কাঁচামাল যদি হয় জঙ্গলের নানা গাছপালা তাহলে এমন একটি দেশ দরকাব যেখান থেকে প্রায় বিনা বাধায় এবং সস্তায় ওইসব অরণ্যসম্পদ সংগ্রহ করা যায়। ধরে নিন এই দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত, এরপর কোম্পানিটির ঔষধ তৈরির কারখানা দরকার, স্বাভাবিক কারণেই কারখানাটি এমন একটি দেশে থাকলে ভাল হয় যে দেশে শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম এবং পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আইনকানুন তুলনামূলকভাবে শিথিল। মনে করুন এই দেশটি দক্ষিণ আমেরিকার কোন সামরিক একনায়ক দ্বারা শাসিত একটি রাষ্ট্র। কারখানায় ঔষধ তো তৈরি হলো এবার তার বিক্রি দরকার। এর জন্য এমন সব দেশ দরকার যেখানে ওই ঔষধটি কেনবার মত ক্রেতা আছেন। ধরা যাক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াব বেশ কয়েকটি ধনী দেশে ওই দ্রব্য ঔষধটি বিক্রি করে বেশ লাভ হলো। এবার প্রশ্ন হলো লাভের টাকা কোথায় জমবে? এর জন্য দরকার এমন সব ব্যাঙ্ক যেখানে সবচেয়ে নিরাপদে টাকা রাখা যায় এবং সুদের হারও বেশ চড়া। এই ধরনের ব্যাঙ্ক আছে ইউরোপের কোন কোন ধনী দেশে। তাহলে দেখুন কয়েকটা ঔষধ তৈরি কবে বিক্রি করার জন্য একটি বহুজাতিক কোম্পানিকে আফ্রিকা, লাতিন

আমেরিকা, এশিয়া ও ইউরোপ এই চারটি মহাদেশে দাপাদপি করে বেড়াতে হচ্ছে। এই সংস্টিব ব্যবসার পথে যদি ক্রমাগত একের পর এক নানাধরনের অর্থনৈতিক বাধা, আয়করের বোঝা ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইনকানুন এনে হাজির করা হয় তাহলে এই অর্থনৈতিক দৈত্যটির পরমায়ু যে বেশিদিন নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। ব্যবসার স্বার্থে এবং মূলত দৈত্যাকার বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাঁচামাল সংগ্রহ, কারখানা স্থাপন ও বাজার সৃষ্টির জন্যই অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ কমিয়ে ফেলা ও এক মুক্ত বাজার ব্যবস্থা তৈরি করার পোশাকি নামই হলো বিশ্বায়ন। নিঃসন্দেহে বিশ্বায়ন ঔপনিবেশিক অর্থনীতির যোগ্য উত্তরসূরী কিন্তু উপনিবেশবাদের সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। প্রথম, উপনিবেশবাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশগুলি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিজেদের দেশের কারখানায় ভোগ্যপণ্য তৈরি করা। বিশ্বায়নে কারখানাটিও তথাকথিত অনুন্নত দেশে। দ্বিতীয়ত, উপনিবেশবাদের সঙ্গে ছিল প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রভুত্ব। বিশ্বায়নের বাজিকররা বেশিরভাগ সময়েই পদার অস্ত্রালাে। তৃতীয়ত, বিশ্বায়নের বাজিকরদের অনেকরকম নতুন ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এইরকম একটি নতুন বাধার নাম পরিবেশবাদ (Environmentalism)। একে কজা করার জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলি নিজেরাই হয়ে উঠছে মস্ত বড় পরিবেশবাদী। জেড গ্রির এবং কেনি ব্রুনো নামে দুই অর্থনীতিবিদ বহুজাতিক সংস্থাগুলির এই কৌশলের নাম দিয়েছেন সব্জ বোঁকা (Green Wash)। কাজেই বিশ্বায়নকে শুধুই নয়া সাম্রাজ্যবাদ বললে সবটা বলা হয় না এটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা শক্তি। এদের কাছে পুঁজিবাদী দেশেব গণতান্ত্রিক সরকারগুলিও লিলিপুটের মত। মার্কস বা লেনিন পুঁজিবাদের এই পর্যায় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই কল্পনা করতে পারেন নি।

ভারতে বহুজাতিক সংস্থা বনাম দেশের উন্নয়ন

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত সরকার বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগ সম্পর্কে একটা দ্বিধামূলক নীতি নিয়ে চলে আসছেন। একদিকে সরকার বিদেশি বেসরকারি সংস্থার বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলির উপর নানা নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করেছেন আবার অন্যদিকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নানাভাবে উৎসাহও দিচ্ছেন। এই দ্বিচারিতা আমাদের সমস্তরকম সরকারের মস্ত বড় একটি বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আমরা পবে পশ্চিমবদের বামফ্রন্ট সরকারের সাম্প্রতিক নীতি নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করব। যাইহোক, বিদেশি সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ দেবার পেছনে সবকারি অর্থনীতিবিদদের মাথায় একটা ধারণা কাজ করেছে। ধারণাটি এরকম ‘বিদেশি বিনিয়োগের ফলে দেশে নতুন প্রযুক্তি আসবে, কর্মসংস্থান হবে ও বিদেশি মুদ্রা আয় করা যাবে।’ এই ধারণার ফলেই ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ দ্বিগুণ হয় এবং যন্ত্রপাতি ও বাসায়নিক পদার্থের জন্য বিনিয়োগ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিদেশি বিনিয়োগ ঘটে পেট্রোলিয়াম উৎপাদনেব ক্ষেত্রে। এই সময়ে পেট্রোলিয়ামে বিদেশি

বিনিয়োগ সাতগুণ বেড়ে যায়। অল্প কয়েকটি বিদেশি বহুজাতিক সংস্থা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই কোম্পানিগুলি হলো বাটা, ফায়ার স্টোন, ডানলপ ও হিন্দুস্থান লিভার (এটি ব্রিটিশ ইউনিলিভার কোম্পানির শাখা)। বাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলি ভারতবর্ষে বেশ জাঁকিয়ে বসে। ভারতে ১৯৬৬ সালে ১১২টি বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬২টি ছিল বিদেশি এবং এরা ছিল মোট সম্পদের ৫৪ শতাংশের অধিকারী। ষুধপত্র তৈরির ক্ষেত্রে এইসব সংস্থাগুলির কর্তৃত্ব হয়ে ওঠে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে ভারতে উৎপাদিত ষুধপত্রের ৮০ শতাংশই তৈরি করত সিবা, গ্ল্যাক্সো, ফাইজার, হেক্সি ও বেরারের মত বড় মাপের বিদেশি বহুজাতিক সংস্থা।

এইসব সংস্থাগুলি কিন্তু তাদের লাভের একটা বড় অংশ নিজেদের দেশে নানাভাবে নিয়ে যেতে শুরু কবে আর এর ফলে ভারতের বিদেশি মুদ্রা অর্জনেব গন্ডাটা গন্ডাই থেকে যায়। এছাড়া ভারতীয় বহু ছোটখাট উৎপাদনকারী সংস্থা এইসব কোম্পানিগুলির উপর প্রযুক্তির ব্যাপারে ভীষণরকম নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এরপর ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার দেশ থেকে বিদেশি মুদ্রা এইভাবে বেরিয়ে যাওয়া আটকানোর জন্য ‘ফেরা’ (FERA বা Foreign Exchange Regulation Act) নামে একটি আইন পাশ করান। এর মূল কথা ছিল যে বিদেশি কোম্পানিগুলিকে কমপক্ষে তাদের শেয়ারের ৬০ শতাংশ ভারতীয়দের মধ্যে রাখতে হবে। কোকা-কোলা ও আই.বি.এম. কোম্পানি এই আইন মানতে চাইল না এবং ওরা ভারত থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিল। কিন্তু বেশির ভাগ বহুজাতিক সংস্থা তাদের শেয়ার কিছু ভারতীয়দের মধ্যে বিক্রি করল এবং একই সঙ্গে নতুন নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবেশ শুরু করল। এই সময় বেশ কিছু যৌথ উদ্যোগে নতুন নতুন ব্যবসা শুরু হয়। ‘ফেরা’ আইনকে বিদেশি সংস্থাগুলি সুন্দরভাবে ব্যবহার করে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখে ক্রমেই লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে চলে। এর পর আসে ৯০-এর দশক। ভারতে উদার অর্থনীতি তথা বিশ্বায়নের যুগ। কিন্তু তার আগে বিদেশি বিনিয়োগ ও দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার।

ভারতে বিদেশি বিনিয়োগেব স্বর্ণযুগ শুরু হলো ১৯৯১ সালের পর থেকে। কিন্তু ওই একই সময়ে দরিদ্রা বেকার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ভাবতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র্যেরখাব নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১.৭২ শতাংশে। ১৯৮৯-৯০ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৩.৭ শতাংশ। গোটা দেশের ক্ষেত্রে (শহর ও গ্রাম মিলিয়ে) দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৩৪.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয় ৪০.৬৯ শতাংশ অর্থাৎ ৬.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মাথা গোনার হিসেবে ধরলে এই মানুষদের সংখ্যা হলো ৬ কোটি।

ভারত সরকারেব পরিকল্পনা দপ্তরের এক সমীক্ষা অনুযায়ী অর্থনৈতিক সংস্কারের পরবর্তী বছরগুলিতে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেকখানি নেমে গেছে বলে স্বীকার করা হয়েছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (National Sample Survey) ৪৮

তম হিসেব থেকে জানা যায় দেশের মানুষের নিচের দিক থেকে ৩০ শতাংশের ভোগ্যপণ্য ক্রয়ক্ষমতা ভীষণভাবে কমে গেছে। মাঝের ৪০ শতাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা গ্রামাঞ্চলে কমেছে এবং শহরে স্থিতিবস্থাতেই আছে। শুধুমাত্র উপরের দিকে ৩০ শতাংশ মানুষের ভোগ্যপণ্য ব্যবহার বেড়েছে এবং এর বেশিরভাগটাই হয়েছে এক্কেবারে উপরতলার ১০ শতাংশ মানুষের জন্য। খুব সোজা কথায়, ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ এদেশের মানুষের মূল সমস্যাগুলির কোন সমাধানই করতে পারেনি। এই সমস্যাগুলি হলো বেকারি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পরিবেশ দূষণ ও নানান ধরনের সামাজিক ব্যাধি যেমন অপরাধ প্রবণতা। এরপর বলা প্রয়োজন ১৯৯১ সালের পর থেকে ভারতের যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করেছেন বিদেশি বিনিয়োগ সম্বন্ধে তাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতি কোন খাতে বইছে।

নানান ধরনের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বায়নকারী বহুজাতিক সংস্থা।

১৯৯১ সালে কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার যখন অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করেন ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের বাধানিষেধ আলগা হতে আরম্ভ করে, তখন দক্ষিণপন্থী ভারতীয় জনতা দল থেকে শুরু করে বামপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছিল। এরপর যখন ১৯৯৬ সালে ১৩ দিনের ভাজ্পা সরকার ক্ষমতায় এল তখনও কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগ কমানোব কোনোরকম চেষ্টা তারা করে নি। ১৩ দিনের ভাজ্পা সরকার ভেঙে যাবার পর ১৩টি আঞ্চলিক দল ও বামপন্থী দলগুলিকে নিয়ে তৈরি হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। কংগ্রেস এই সরকারকে সমর্থন করেছিল। এখানে বলে নেওয়া ভাল যে ১৩ দিনের মধ্যেই কিন্তু ভাজ্পা সরকার বিতর্কিত বিদেশি এনরন প্রকল্পকে ব্যবসা শুরু করার অনুমতি দেন। এরপর যুক্তফ্রন্ট সরকার এটা পরিকল্পনাভাবেই ঘোষণা করেন যে অর্থনৈতিক সংস্কার ও উদারীকরণের প্রক্রিয়াকে উল্টোপথে চালানো সম্ভব নয়। এ খবরটা অনেকেই বোধহয় জ্ঞানেন না যে বাম সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট সরকার তিনমাসের মধ্যেই ১১৩টি বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাবকে ছাড়পত্র দেন। এই বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭০০০ কোটি টাকা যা কিনা কংগ্রেস পরিচালিত নরসীমা রাও সরকার ৫ বছরে যত বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দিয়েছিলেন তার সমান। বিদেশি বিনিয়োগ সম্পর্ক খতিয়ে দেখে অনুমতি দেবার যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড (FIPB বা Foreign Investment Promotion Board) নরসীমা রাও সরকার গঠন করেছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকার তাব মাত্র তিনটি সভায় এই অনুমোদন দেবার কাজটি সমাধা করে ফেলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরমের একটি মন্তব্য মনে করা যেতে পারে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে একটি আলোচনা সভায় উনি বলেছিলেন : “আপনারা ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং ২০০ বছর ছিলেন। এখন আবার ভারতে আসার জন্য প্রস্তুত হন। বিনিয়োগ করুন। আবও ২০০ বছর থাকুন। আপনাদের বিপুলভাবে পূরস্কৃত করা হবে।” মন্ত্রী মশাইয়ের এই উদাত্ত আহ্বানটি দি

টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ২ অক্টোবর ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ যুক্তফ্রন্ট সরকারের ন্যূনতম কর্মসূচিতে বিদেশি বিনিয়োগকে কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া উৎসাহিত করার কথা ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই এই সরকার প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুতকারী বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ভারতে ব্যবসা করার অনুমতি দেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী 'আউটলুক' পত্রিকায় (২০ নভেম্বর ১৯৯৬) এ বিষয়ে বলেছিলেন : “ন্যূনতম কর্মসূচীতে অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিতে বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগকে নিরুৎসাহ করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোন শিল্পই চিরকাল ‘কম প্রয়োজনীয়’ হয়ে পড়ে থাকতে পারে না।” এরপর যখন ভারতীয় জনতা দল পুরোমাত্রায় ক্ষমতায় আসে তখনও বিদেশি বিনিয়োগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ডে বিশদমাত্র পরিবর্তন হয় নি। ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থী ‘স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ’ থেকে বিদেশি বিনিয়োগের বিরুদ্ধে গরমাগরম বক্তৃতা ও আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু অবস্থা এতটুকু পাল্টায় নি। অর্থনৈতিক দৈত্যদের দাপাদপি বেড়েই চলেছে। পর্দার আড়ালে এরাই আমাদের সব রংয়ের রাজনীতিবিদদের নাচাচ্ছেন। বিশ্বায়নের বাজীকরদের হাতে আমাদের নতুন পরাধীনতার যুগ শুরু হয়ে গেছে।

বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন ও পশ্চিমবঙ্গে কৃষক উচ্ছেদ

বিশ্বায়নের সিংহভাগ জুড়ে আছে বহুজাতিক সংস্থাগুলির লাগামছাড়া পুঁজি বিনিয়োগ এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের একটা বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা। ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের হাতে জমি তুলে দেওয়া বা বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার সাহায্যে যৌথ প্রাকৃতিক সম্পদগুলির জনমুখী ব্যবহার বিশ্বায়ন তথা দেশি-বিদেশি বৃহৎ শিল্প-পুঁজি বিনিয়োগের নীতির সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু যদি কোন সরকার দীর্ঘদিন ধরে ভূমিসংস্কারকেই তার প্রধান নীতি হিসেবে ঘোষণা করে থাকে এবং সেই অনুযায়ী তার রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনা করে তাহলে বিশ্বায়নকারী পুঁজি বিনিয়োগের আবহাওয়া তার কাছে কতগুলি আদর্শগত সংকট সৃষ্টি করে। কীভাবে সেই সরকারের নীতি প্রণেতারা এই সংকটের মোকাবিলা করেন সেটা দেখার একটা ভাল ক্ষেত্র নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গ। বিশ্বায়নকারী শক্তিগুলির সামনে একটা বামপন্থী সরকার কী করছেন এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত সেরকম আলোচনা (গবেষণা দূবে থাক) ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী মহলে শোনা যাচ্ছে না। এই আলোচনাটা দরকার।

বছর চারেক আগে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘জমি : কৃষি বনাম শিল্প’ এই শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, সম্পাদকীয়টিব মুনশিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে। বক্তব্য শুরু এভাবে যে ‘লাঙল যাহার জমি তাহার’ এই অতি ব্যবহৃত বামপন্থী শ্লোগানের দাসত্ব ছেড়ে উদারনীতি গ্রহণের দিন এসেছে। আর পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও তাঁর সহকর্মীরা আজ এটা ঠেকে শিখেছেন। সেজন্যই বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী আজ দ্বিধাহীন চিন্তে ঘোষণা করেছেন যে

শিল্পোন্নয়নের জন্য কৃষিজমির কিছু অংশ দখল করা দরকার। আনন্দবাজারের সম্পাদক এই পবিবর্তনকে সাদরে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু সম্পাদকের আশঙ্কা যে অধিগৃহীত জমি শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠুরূপে ব্যবহৃত নাও হতে পারে। ওঁর একবারও মনে হয়নি যে লাঙলধারী কৃষকদের ঠিক কিরকম অবস্থা এই ধরনের অধিগ্রহণের ফলে হয় সেটা বামপন্থী সরকারের জানার প্রয়োজন আছে, যেন অধিগৃহীত জমিজমা শিল্পের প্রয়োজনে লাগলেই কৃষকের নির্বাণলাভ হয়। এটাই বিশ্বায়নের বাতাবরণ। আব সেকারণেই আনন্দবাজারের সম্পাদকের মনে বামপন্থী শিল্পায়ন সম্পর্কে যত সম্মত হই থাক বামপন্থীরা কিন্তু আদৌ তা মনে করেন না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) দৈনিক মুখপত্র গণশক্তি পত্রিকায় ২৯শে মার্চ ১৯৯৬ তারিখে এক তথ্য সম্বলিত সংবাদের শিরোনাম ছিল : ‘শিল্পায়নে রাজ্য এগোচ্ছে প্রথম সারির দিকে’। নিজস্ব প্রতিনিধি এ সংবাদে জানিয়েছেন যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পায়নের পথে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হচ্ছে যে শিল্পে প্রথম তিনটি রাজ্যের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যটি খুব শীগগীরই উঠে আসবে। সংবাদে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ রাজ্যে এক বছরের মধ্যে ১৩৮টি প্রকল্পে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে চলেছে একথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে। আর এই এগিয়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ করে ভূমিসংস্কারের কাজে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য। যুক্তিটা অনেকটা এরকম—ভূমিসংস্কারের ফলে চাষির ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে এবং তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রচুর পরিমাণে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ সম্ভব। গণশক্তির সংবাদদাতা আমাদের জানাচ্ছেন : “বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক কোম্পানি। তারা সব কিছু খতিয়ে দেখেই বিনিয়োগ কবতে আসছে। অনেকেরই সংশয় ছিল বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান হযতো এখানে বিনিয়োগে কোন আগ্রহই দেখাবে না। কিন্তু তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে আসছে সিমেন্ট, ফিলিপস, আই.সি.আই., নালকো, রোলসরয়েস, ভিস্কাইয়াস, ক্যালটেক্স, ট্রান্স আমেরিকান কর্পোরেশন, মোটারোলা, সুমিতোমা, মাংসশীতা, মিৎসুবিসি, বি.ও.সি., প্রাইস ওয়াটার হাউস, অ্যালকোরা, ডোল, জে. এইচ, সুগার কর্পোরেশন, সোরাস প্রভৃতি। প্রতিদিনই তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে।” তালিকা থেকে এটা অস্বত পবিষ্কার যে বিশ্বের পুঁজিবাদী দুনিয়ায় রাঘব বোয়াল বহুজাতিক সংস্থাগুলির পশ্চিমবঙ্গকে ভাল লেগেছে। এরা কীভাবে ব্যবসা করেন, শোষণ করেন, পরিবেশ দূষণ ঘটান, সে সবেব আলোচনা বামপন্থী পত্রপত্রিকায় প্রায়শই প্রকাশিত হয়। এরা সারা দুনিয়াকে যথেষ্টভাবে শোষণ করে শুধু পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতার অধিকারী একটি বামপন্থী সরকারকে দেখে ভয় পেয়ে যাবেন এরকম কল্পনা বোধহয় শিশুরা স্বপ্নেও করে উঠতে পারবে না। আর যদি বামপন্থীরা এমন যুক্তি দেখান যে কেন্দ্রে অর্থনৈতিক নীতির উদারীকরণ ঘটান ফলে তারা বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহ দেখাচ্ছেন তাহলে বলা যায় : ‘১৯৯১ সালে সারা বিশ্বে উদারীকরণের চাপে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারও বাধ্য হয়েই নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালু করেছিলেন। ওঁদের এ ছাড়া

আর কোন উপায় ছিল না। আসলে বামপন্থীরা এখন পড়েছেন উভয় সংকটে। এই উভয় সংকটের আলোচনায় যাওয়ার আগে একটু তথ্যের দিকে তাকানো যাক। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত এক পুস্তিকায় দেখা যায় যে অর্থনৈতিক সংস্কার ঘোষিত হবার পর থেকে ১৯৯৫ সালের মে-জুন মাস পর্যন্ত বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। নিচের সারণিতে চিত্রটি তুলে ধরছি।

সারণি—১

ভারতে প্রথম পাঁচটি রাজ্যের বিদেশি বিনিয়োগ

আগস্ট ১৯৯১—মে ১৯৯৫

রাজ্য	বিনিয়োগের সংখ্যা	শতাংশ
মহারাষ্ট্র	৪৬৪	১৬.৫
পশ্চিমবঙ্গ	১০১	১০.৬
দিল্লি	২৩৫	১০.৩
তামিলনাড়ু	২৭৫	৭.০
গুজরাট	১৪৩	৬.৯

(কভলজিং সি ও জেড গ্রিগ ১৯৯৬)

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ ও নানাধরনের পুঁজিপতিদের সঙ্গে যৌথ সরকারি উদ্যোগ যে নয়া অর্থনৈতিক নীতি তথা বিশ্বায়নেরই ফলাফল এসব আঙ্গ আর গোপন কোন তথ্য নয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নেতৃবর্গ বিশ্বায়নকারী প্রক্রিয়াগুলিকে দুহাত তুলে আহ্বান জানাচ্ছেন এই বলে যে এই রাজ্যই অর্থনৈতিক উদারীকরণের প্রকৃত ক্ষেত্র। কেন? যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের সাফল্যের ফলে কৃষক পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু শিল্পায়নের ফলে বিশেষ করে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে শিল্প তৈরি করলে ভূমি সংস্কারের কাজ যে আবারও পিছিয়ে যেতে পারে আর পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কারের কাজ যে এখনও অনেকটা পথ অতিক্রম করা বাকি এসব কথা বামদলগুলি এখন প্রায় ভুলতে বসেছেন। তাছাড়া শিল্পায়নজনিত উচ্ছেদের ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক এবং বর্গাদারদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে সে সম্পর্কে কোনরকম সুপরিষ্কৃত পুনর্বাসন নীতি এখনও পর্যন্ত প্রগতিশীল বাম সরকার গ্রহণ করে উঠতে পাবেন নি। যদিও বিগত লোকসভা নির্বাচনে সি. পি. আই. এবং সি. পি. আই (এম) এই দুটি দলেরই নির্বাচনী ইস্তাহারে উন্নয়ন প্রকল্পের দরুণ উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের জন্য পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে।

বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থীদের আদর্শগত সংকটকে এইরকম একটা প্রেক্ষাপটে বোঝার চেষ্টা করা উচিত। বামপন্থীদের কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য আজ শুধু উপবতলার নেতৃবৃন্দের মধ্যে নয় নিচুতলার সাধারণ কর্মী ও মানুষের মনেও সংক্রামিত। এব ফলে জন্ম নিচ্ছে হতাশা ও সবকিছু মেনে নেওয়ার একটা মানসিকতা। এও বিশ্বায়নের আর একদিক।

এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের কিছু চিন্তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ১৯৮৬ সালে “পশ্চিমবঙ্গে যৌথ বিনিয়োগ” শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে ভবতোষ দত্ত খুব সুন্দরভাবে বা-পন্থী আদর্শগত সংকটের বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর ভাষায় : “পশ্চিমবঙ্গে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে বিভ্রান্তি, মতভেদ তথা বিতর্কের প্রধান কারণ—এই রাজ্যের সরকার বামপন্থী। এই বামপন্থী সরকার প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় নীতির দক্ষিণায়নের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং বিশেষ করে বিদেশি এবং বহুজাতিক মূলধনের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। অনাবাসিক ভারতীয় মূলধনের নিয়োগেও তাঁরা আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু এই সরকারই আবার পশ্চিমবঙ্গের জন্য একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির জন্য ভারত সরকারের কাছে ওকালতি করেছেন,... আপত্তি উঠেছে বামপন্থী সরকার বেসরকারি শিল্পপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বলে।” এইসব আপত্তির বিরুদ্ধে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বামপন্থীরা নানা ধরনের যুক্তি তর্কও করে চলেছেন। ভবতোষ দত্তের মতে রাজ্য সরকারের নিজের ক্রিয়াকলাপের সপক্ষে “এত কথা বলার প্রয়োজন থেকেই প্রমাণ হয় যে তাঁদের মনে একটা অপরাধবোধ আছে, একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে নিরুপস্থিত তত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান অবস্থার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত অন্তর্বিরোধ আছে।” এই অন্তর্বিরোধটার একটা যোঁজখবর তৃণমূল স্তর থেকে নেওয়া চলেছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে। এই নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের বয়স প্রায় বছর ছয়েক, কিন্তু এরই মধ্যে এই সমাজ অনুসন্ধানের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে নানাধরনের ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ তথ্য। এখনকার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার মূল বলয়ের বাইরে থাকা বামপন্থীরা এখনও এই ধরনের সমাজ অনুসন্ধান ও গ্রামজীবনের উপর নেমে আসা বিশ্বায়নী আঘাত সম্পর্কে গবেষণায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন নি। যদিও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কংগ্রেসি বা ভারতীয় জনতা দল পরিচালিত সরকারের শাসনে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা প্রায়শই সরব হয়ে ওঠেন।

শিল্পায়ন, কৃষিজমি ও গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা

অবিভক্ত মেদিনীপুর ছিল পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা। এই জেলা এখনও মূলত কৃষি নির্ভর। ১৯৯১ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী মেদিনীপুর জেলার মোট আয়তন ১৪,০৮১ বর্গ কি.মি. ও লোকসংখ্যা ৮৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৯০। আর এই জেলার মোট জমির ৬৪ শতাংশেরও বেশি হলো কৃষিজমি যদিও এই জমির মাত্র ২৮ শতাংশ সেচের জল পায়। গান, পাট, আলু, তিল ও নানা রকমের তরিতরকারি ও শাকসবজির উৎপাদন এ জেলায় বেশ ভালই। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার মোট জনসংখ্যার ৮৯.৯ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন এবং জেলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পও বেশ উঁচু মানের।

এ ধরনের কৃষিভিত্তিক ও কুটির শিল্প সম্বলিত গ্রামীণ একাট জেলায় সাধারণ দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য কী ধরনের পরিকল্পনা

রচনা করা দরকার তার খুব সুন্দর চিত্র আছে ‘মেদিনীপুর জেলার গ্রামের মানুষ’ নামে একটি ছোট বইতে। বইটি প্রকাশ করেছিলেন মেদিনীপুর জেলা পরিকল্পনা কমিটি, খড়্গপুর আই. আই. টি-র গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ ও মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৬ সালে, নয়া অর্থনৈতিক নীতি ঘোষিত হবার চার বছর আগে। এখন বইটি পড়লে আর চোখের সামনে মেদিনীপুর জেলার শিল্পায়নের চেহারা দেখলে দুটোকে মেলানো যায় না। পুস্তিকার এক জায়গায় বলা হয়েছিল : “গ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো গ্রামের জমি—চাষের জমি, পুকুর, বনজঙ্গল, ফলের ও অন্যান্য গাছের বাগান ইত্যাদি। এই জমির সম্যক ব্যবহার শুধুমাত্র গ্রামের আজকের আশু প্রয়োজনের জন্য নয়, যাতে আরও বহু বছর আমাদের উত্তরপুরুষরা গ্রামে ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারেন তার দীর্ঘস্থায়ী প্রয়োজনেও।” এই পুস্তিকা তৈরির মূল উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চায়েত কর্মী ও গ্রামসেবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিটি গ্রামের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ সম্পর্কে ঝুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ ও ভবিষ্যতে সেই তথ্যের ভিত্তিতে গ্রামভিত্তিক জেলা পরিকল্পনার কাঠামো তৈরি করা। খড়্গপুর আই. আই. টি-র (Indian Institute of Technology) তৎকালীন গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের অধ্যাপক অজিত নারায়ণ বসু নেতৃত্বে মেদিনীপুর জেলার ৭৬৬টি গ্রামের ৫৮, ২২১টি পরিবারের কাছ থেকে উন্নয়ন সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। এইসব তথ্য সংগ্রহের মূল লক্ষ্য ছিল একটিই সেটি হলো গ্রামবাসীদের দ্বারা গ্রামপরিকল্পনা তৈরি করা। উপর থেকে চাপানো উন্নয়ন পরিকল্পনা নয় নিচ থেকে উঠে আসা গ্রামভিত্তিক, কৃষিভিত্তিক পরিকল্পনাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এসব ঘটনার চার পাঁচ বছরের মধ্যেই বেজে উঠল শিল্পায়নের দামামা। বামফ্রন্ট নেতৃবর্গের গলায় অন্য সুর বেজে উঠল। নেমে এল উপর থেকে চাপানো শিল্পায়নের নানা প্রকল্প। গ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যে কৃষিজমি তার উপরেও ভারি শিল্লের থাবা বসল। ছিন্নভিন্ন হতে শুরু করল কৃষকের একমাত্র অর্থনৈতিক সঞ্চয়। ভূমিসংস্কারের দ্বারা অর্জিত অধিকার হারাতে শুরু করল মেদিনীপুরের কৃষক। এই জেলার কৃষকই প্রথম গ্রামপরিকল্পনার কাজ নিজে হাতে শুরু করেছিল। বিশ্বায়ন তথা নয়া অর্থনৈতিক নীতির ভয়ানক আঘাত আজ বামপন্থী সরকার মারফৎ নেমে আসছে গ্রামের একেবারে অন্তঃস্থলে। এর খবর শহরে বুদ্ধিজীবীদের কাছে এখনও পৌঁছয় নি।

গোকুলপুর-আন্থা অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

গত ১০ জানুয়ারি ১৯৯৬ The Statesman পত্রিকায় মেদিনীপুর থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশিত হয় যে খড়্গপুর মহকুমার কলাইকুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত মথুরাকিসমত মৌজায় স্থানীয় গ্রামবাসীরা জমি সমীক্ষা ও পরীক্ষার কাজে প্রবল বাধা দেন। ওই জমি সমীক্ষা করা হচ্ছিল বিড়লা গোষ্ঠীর স্পঞ্জ ও পিগ আয়রন কারখানা স্থাপন করার জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। আর কৃষকদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন

বামপন্থী কোন নেতা বা নেত্রী নন। খড়্গপুর ব্লক আই.এন.টি.ইউ.সি.-র কংগ্রেসী নেতা ত্রিলোচন রাণা, সংবাদে প্রকাশ যে স্থানীয় কৃষকরা ত্রিলোচনের নেতৃত্বে প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে পথ অবরোধ করে রাখেন ও জমি সমীক্ষাকারী কোম্পানির বিরুদ্ধে জমির মালিকের অনুমতি ছাড়া সমীক্ষার কাজ শুরু করার জন্য থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। এরপর ওই অঞ্চলের ১৮টি মৌজার ৬৬ জন কৃষক খড়্গপুর মহকুমা শাসকের কাছে কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কবে এক স্মারকলিপি জমা দেন। স্থানীয় কৃষকদের দাবিগুলি ছিল : (১) জমির মালিকদের একরপ্রতি ৩ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং (২) যে সমস্ত পরিবারের জমি অধিগ্রহণ করা হবে তাদের পরিবারের অন্তত একজনকে ওই কারখানায় চাকুরি দিতে হবে অথবা সমপরিমাণ কৃষিজমি ফেরৎ দিতে হবে। এই দুটি দাবি ছাড়া কৃষকরা এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অন্য কয়েকটি কারখানা গড়ে ওঠার ফলে যে সমস্ত চোলাই মদের কাবখানা গজিয়ে উঠেছে সেগুলি তুলে দেবার দাবি জানান। ওই সংবাদ থেকে আরও জানা যায় যে, এর আগে ১৯৯০-৯১ সাল নাগাদ ওই অঞ্চলে পশ্চিম আশ্বা নামে গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় টাটা মেটালিকস এবং ওয়েলম্যান কোম্পানির কোক ওভেন (এরা টাটা কোম্পানির পিগ আয়রন তৈরির মস্ত চুল্লীর জন্য জ্বালানী সরবরাহ করেন) কারখানা স্থাপন করার জন্য প্রায় ২২০ একরের মত উর্বরা কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এর ফলে প্রায় ২০০-র বেশি কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের মধ্যে অনেকেই ভূমিহীন হয়েছেন, অনেকে ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি আর ওইসব কারখানায় খুব বেশি হলে জনা কুড়ি স্থানীয় মানুষ চাকুরি পেয়েছেন। এরপর ২২শে মার্চ ১৯৯৬ The Statesman-এ আবার প্রকাশিত হয় যে ত্রিলোচন রাণার নেতৃত্বে প্রায় ২০০ জন কৃষক মেদিনীপুর জেলা কালেক্টরেটের সামনে ৪ ঘণ্টা ব্যাপী এক অবস্থান আন্দোলন চালান। দাবিগুলির মধ্যে ছিল ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও জমির বদলে জমি ও কলাইকুণ্ডা অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন। এর কিছুদিন পূর্বে ১৯৯৬ সালের ২রা মে তারিখের Statesman-এ প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে কলাইকুণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত বহু কৃষিপরিবার জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সরকারি ক্রিয়াকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তৎকালীন লোকসভা নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রায় ১০০ জনের বেশি কৃষক এই সিদ্ধান্তের কথা লিখিতভাবে জেলাশাসককে জানিয়ে দেন।

এবার এ প্রসঙ্গে দুটি তথ্য পাঠকপাঠিকাদের অবগতির জন্য নিবেদন করা দরকার।
সেগুলি এরকম :

(ক) ১৯৯৭ সাল থেকেই কলাইকুণ্ডা অঞ্চলে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন দানা বেঁধেছিল তা এখন সম্পূর্ণ স্তব্ধ। কোন রাজনৈতিক দলই এই আন্দোলনের কোনরকম দীর্ঘস্থায়িত্ব চান নি। ফলে জমি হারানো কৃষক তাব রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছে।

(খ) বিড়লা গোষ্ঠী যে স্পঞ্জ ও পিগ আয়রন কারখানা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৯৬

সালে ৫২৬ একর উর্বরা কৃষিজমি দশটি মৌজা থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ভূমিহার্য হয়েছিলেন প্রায় হাজারখানেক কৃষক, আজও সেই জমিতে কোন কারখানা স্থাপিত হয়নি। কারণ বিড়লা গোষ্ঠী রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা ওই ব্যবসা লাভজনক হবে না বলে ওখানে কারখানা তৈরি করবেন না।

এই হলো তৃণমূল স্তরে বিশ্বায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাব। এবার আমরা গোকুলপুর আশ্রা অঞ্চলে শিল্পায়নের ফলে কৃষক উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্রসমীক্ষার একটা বর্ণনা করব।

গোকুলপুর-আশ্রা অঞ্চলে উচ্ছেদের কাহিনী

উচ্ছেদ কাকে বলব? কৃষকের কৃষিজমি ও বাস্তুভিটে এই দুটি থেকেই যদি সে উৎখাত হয় তবেই কি উচ্ছেদ (Displacement) হয়েছে বলা যাবে? আর যদি এমনভাবে জমি অধিগ্রহণ হয় যে কৃষকের বাস্তুভিটে কেড়ে নেওয়া হলো না অথচ তার কৃষিজমি সবটা বা খানিকটা চলে গেল কোন সরকারি অথবা বেসরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে তখন কি উচ্ছেদ হয়েছে বলা যাবে না? আসলে মানুষ গৃহহারা হলে তাই নিয়ে হুঁচুই বেশি হয়। মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর সেই উচ্ছেদ যদি হয় কলকাতা শহরে তখন তার খবর ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাঙ্কের সদর দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছয়। কিন্তু গোকুলপুরে ভূমিসংস্কারে সুফল প্রাপ্ত চাষি ও বর্গাদার ভূমিহীন হলে এবং সরকারি সমর্থনে কৃষিজমি হারালে সে খবর ‘গণশক্তি’ পত্রিকার সম্পাদকের আপিস পর্যন্ত পৌঁছয় না। বরং সেই জমি অধিগ্রহণের বিস্তৃতি ছাপিয়ে ‘গণশক্তি’ পত্রিকা রাজ্য সরকারের জমি অধিগ্রহণ দপ্তর থেকে বিজ্ঞাপন বাবদ টাকা রোজগার করেন। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতাই আমাদের হয়েছে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের সমীক্ষায় কলাইকুশা অঞ্চলের যে গ্রামগুলির উপর নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালান হয় সেগুলি হলো : অজবপুর, লিলুয়াকলা, গোকুলপুর (খড়্গপুর ও মেদিনীপুর রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী একটি স্টেশনের নামও গোকুলপুর), মহেশপুর ও পশ্চিম-আশ্রা। এর মধ্যে পশ্চিম-আশ্রা গ্রামটি দক্ষিণ-পূর্ব রেললাইনের পশ্চিম দিকে আর বাকিগুলি পূর্বদিকে। সবকটি গ্রামই কৃষিনির্ভর এবং গ্রামগুলিতে নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। এইসব গ্রামের মানুষদের যে কৃষিজমিগুলি টাটা মেটালিকস্ ও ওয়েলম্যান কোম্পানির জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি মেদিনীপুর রেল স্টেশন থেকে খড়্গপুর যাবার পথে (৭-৮ কি.মি) কংসাবতী (স্থানীয় নাম কাঁসাই) নদী পেরোবার আগেই দেখতে পাওয়া যায়। এখানেই টাটা মেটালিকস্ কারখানা তৈরি হয়েছে। রাত্রিবেলা এখন এসব অঞ্চলে সোডিয়াম ভেপার আলো ঝলমল করে। কলকাতা থেকে যেসব মানুষ এইপথে রাত্রে রেলগাড়িতে আদ্রার দিকে যান তারা এই ঝলমলে আলো, মস্ত বড় বড় কারখানার চিমনি দেখেন। হয়তবা ভাবেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন সফল। এই রকম অজ গ্রামের মধ্যেও এইরকম ভারি শিল্প গড়ে উঠেছে। আমাদের রাজ্য সত্যিই শিল্পে এগিয়ে চলেছে। টাটা

মেটালিকসে প্রতিদিন ২৯৫ টন পিগ আয়রন তৈরি হয়। আকরিক আসে উড়িষ্যার খনি থেকে। এ ধরনের ভারি শিল্পের জন্য প্রয়োজন ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, বর্জ্য পদার্থ ফেলবার জায়গা, জল ও সস্তার শ্রমিক। এসবগুলি উপাদানই এখানে আছে। রেল লাইন, বর্জ্য পদার্থ ফেলবার জন্য কাঁসাই নদী, ভূগর্ভস্থ জলের জোগান, আর কৃষিজমি থেকে উৎপাদিত আদিবাসী ও নিম্নজাতিভুক্ত নারী ও পুরুষের মস্ত বড় এক শ্রমিকের দল এ অঞ্চলে মজুত। আর একটি বড় রাজনৈতিক উপাদান এ অঞ্চলের শিল্পায়নে সাহায্য করেছে। সেটি হলো এ রাজ্যের বামপন্থী সরকার যারা বিশ্বায়নের আবেতে পড়ে আজ বলছেন ভূমিসংস্কার সফল হয়েছে বলেই পশ্চিমবঙ্গ আজ দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের আদর্শ ক্ষেত্র। ফলে অধিগৃহীত কৃষিজমির ঠিক পাশেই রেল লাইনের দুপাশে বিপুল পরিমাণ লালমাটি ও বালি মিশ্রিত উঁচু নিচু খোয়াই সদৃশ যে জমিতে এখনই চাষবাস হয়না সেগুলি ভারিশিল্প বসানোর জন্য টাটা এবং বিড়লাদের দেওয়া হয়নি। পাছে ওই জমি তাঁদের অপছন্দ হলে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যান। প্রতিযোগিতার বাজার, উদারনীতি মানলে এসব মানতেই হবে।

যে পাঁচটি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির উপর নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালানো হয়েছিল সেগুলির সংখ্যা ১৪৪ এবং লোকবল ৮৩০ জন।

সারণি—২

পাঁচ গ্রামের জমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যা

গ্রামের নাম	পরিবার সংখ্যা
অজবপুর	৪৭ (৩২.৬৩৮)*
পশ্চিম আত্রা	২১ (১৪.৫৮৩)
গোকুলপুর	৩২ (২২.২২২)
লিলুয়াকলা	১২ (৮.৩৩৩)
মহেশপুর	৩২ (২২.২২২)
মোট	১৪৪ (৯৯.৯৫৩)

* বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যাগুলি শতকরা হিসেব প্রকাশ করছে।

সারণি ২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে কাঁসাই নদীর দক্ষিণ দিকে রেল লাইনের পূর্বদিকের গ্রামগুলি (অজবপুর, গোকুলপুর, লিলুয়াকলা ও মহেশপুর) টাটা মেটালিকসের জমি অধিগ্রহণে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত। এইসব গ্রামগুলির মানুষরা খুব ভাল চাষি। এঁরা খান ছাড়াও নানারকমের তরিতরকারি ও শাকসবজির অত্যন্ত ভাল চাষ করেন। সারা বছরই এঁরা চাষ করেন। বাড়ির পাশের জমিতে এইসব চাষিরা বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলো, কুমড়া, সর্ষে এসব প্রচুর পরিমাণে ফলান। মেদিনীপুর ও খড়্গপুর্বে বাজারে এসব ভালই বিক্রি হয়। এখনও এঁরা তরিতরকারি চাষ করতে পারছেন কারণ এদের সবজি চাষের জমি অধিগ্রহণ হয়নি। হয়েছে খানজমি। ফলে এদের পারিবারিক অর্থনীতি ভীষণ

জোর ধাক্কা খেয়েছে। এখন এদের তরকারি বিক্রি করে খান চাল বাজার থেকে কিনতে হচ্ছে। এ আঘাত যে একজন চাষির পরিবারে কত বড় আঘাত তা রাইটার্স বিন্ডিংস বা বিজ্ঞান ভবনের ঠাণ্ডা ঘরে বসে অর্থনীতি লেখচিত্র তৈরি করতে করতে বোঝা মুশকিল।

এরপরেব সারগিতে আমরা গ্রামগুলিতে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষকে কিভাবে জমি হারিয়েছেন তার একটি ছবি তুলে ধরব।

সারণি—৩

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জাতি সম্প্রদায়গত চিত্র

জাতি/সম্প্রদায়	পরিবার সংখ্যা
ব্রাহ্মণ	৬ (৪.১৬৬)
কায়স্থ	১৩ (৯.০২৭)
ক্ষত্রিয়	১৫ (১০.৪১৬)
বৈষ্ণব	৪ (২.৭০৭)
মুসলমান	৮ (৫.৫৫৫)
নাপিত	২ (২.৩৮৮)
সদগোপ	৫৫ (৩৮.৮৮৮)
তফশিলি জাতি	১২ (৮.৩৩৩)
তফশিলি উপজাতি	২৪ (১৬.৬৬৬)
তন্তুকার	৩ (২.০৮৩)
তেলি	১ (০.৬৯৪)
মোট	১৪৪ (৯৯.৩৬৮)

এই সারণিটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে কলাইকুণ্ডা অঞ্চলে বসবাসকারী বহু রকমের জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষই এই সরকার দ্বারা উৎসাহিত শিল্পায়নে কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে সদগোপ জাতির কৃষকদের। এঁরাই এখানে অধিক সংখ্যায় থাকেন এবং এঁরা কৃষক হিসেবে খুবই পারদর্শী। তারপরই আসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কথা। তফশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের নিয়ে যোগ করলে এরা মোট ক্ষতিগ্রস্তদের প্রায় এক চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করে আছেন। রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কাকরই এ বিষয়ে কোনরকম আইন বা পুনর্বাসন নীতি নেই। পিছিয়ে পড়া এই মানুষরা উন্নয়ন প্রকল্পের যুপকাণ্ডে বলি হলে কোনরকম আলাদা সাহায্যের ব্যবস্থা নেই। অমর্ত্য সেন তাঁর বিশ্বায়ন সংক্রান্ত বক্তৃতায় বারবার social safety net-এর কথা বলেছেন কিন্তু উন্নয়ন প্রকল্পগুলি দ্বারা উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া মানুষদের safety net তৈরি করা সম্পর্কে কিছুই বলেননি। উন্নয়নের এদিকটা অমর্ত্যের দৃষ্টি

একেবারেই বাইরে থেকেছে চিরকাল। সে যাইহোক এবার আমরা পরপর দুটি সারণির সাহায্যে এই অঞ্চলে কৃষিজমি অধিগ্রহণের ফলে এখানকার কৃষকরা কিভাবে ভূমিহীনতার ঝুঁকি এগিয়ে গেছেন সেই চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সারণি-৪

জমি অধিগ্রহণের আগে পরিবারগুলির জমির পরিমাণ

জমির পরিমাণ (একরে)	পরিবার সংখ্যা
ভূমিহীন	কেউ নয়
০.৫ ও তার কম	১৯ (১৩.১৯৪)
০.৫-১.৫	৫৮ (৪০.২৭৭)
১.৫-২.৫	৩২ (২২.২২২)
২.৫-৩.৫	১৩ (৯.০২৭)
৩.৫-৪.৫	৮ (৫.৫৫৫)
৪.৫-৫.৫	৬ (৪.১৬৬)
৫.৫-৬.৫	কেউ নয়
৬.৫-৭.৫	৮ (৫.৫৫৫)
মোট	১৪৪ (৯৯.৯৯৬)

সারণি-৫

জমি অধিগ্রহণের পরে পরিবারগুলির জমির পরিমাণ

জমির পরিমাণ (একরে)	পরিবার সংখ্যা
ভূমিহীন	২২ (১৫.২৭৭)
০.৫ ও তার কম	৩৫ (২৪.৩০৫)
০.৫-১.৫	৫১ (৩৫.৪১৬)
১.৫-২.৫	১৪ (৯.৭২২)
২.৫-৩.৫	১৩ (৯.০২৭)
৩.৫-৪.৫	৫ (৩.৪৭২)
৪.৫-৫.৫	৩ (২.০৮৩)
৫.৫-৬.৫	১ (০.৬৯৪)
৬.৫-৭.৫	কেউ নয়
মোট	১৪৪ (৯৯.৯৯৬)

সারণি ৪ এবং ৫ থেকে এটা খুব পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে এই অঞ্চলে সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ১৪৪টি পরিবারের মধ্যে অধিগ্রহণের আগে ভূমিহীন পরিবার একটিও ছিল না এবং বেশিরভাগ পরিবারই ০.৫ থেকে ৩.৫ একর পর্যন্ত কৃষিজমির মালিক ছিলেন। এইরকম পরিবারের সংখ্যা ছিল মোট পরিবারের প্রায় ৭২ শতাংশ। সরকারি শ্রেণি বিভাজন অনুসারে এঁরা সকলেই ক্ষুদ্র চাষি অথবা প্রান্তিক চাষি। এদের মধ্যে যাদের কিছুটা তরিতরকারির চাষ আছে তাদের অবস্থা একটু ভাল। কিন্তু কোন মতেই এইসব কৃষকদের সেই ধনীদেবের মধ্যে ফেলা যায় না যাদের বাড়িতে টিভি, ফ্রিজ, স্কুটার, মিক্সি আছে; যারা কোশ্ড ড্রিংকস পান করেন বা টিনের খাবার খান। এদের মধ্যে অনেকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন। টাটা এবং ওয়েলম্যান কোম্পানির জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের পর এই একই পরিবারগুলির জমির মালিকানার চিত্র অত্যন্ত হতাশাজনক। সারণি ৫ থেকে দেখা যায় যে অধিগ্রহণের পর ১৫ শতাংশ পরিবার ভূমিহীন হয়ে পড়েছেন। আর ০.৫ একর ও তার কম জমির অধিকারী পরিবারের সংখ্যা ১৯ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫। তেমনি অন্যদিকে অধিগ্রহণ-পূর্ব অবস্থায় ৩.৫ থেকে ৭.৫ একর পর্যন্ত রায়তদের সংখ্যা অধিগ্রহণ-পরবর্তী অবস্থায় ২২ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৯টি পরিবারে।

আর একটি বিষয়ের কথা এ প্রসঙ্গে বলা উচিত। তা হলো এইসব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে আমরা পেয়েছি ১১টি বর্গাদার পরিবারকে। এঁরা মালিকের জমি চাষ করতেন অধিগ্রহণে মালিক এবং বর্গাদার দুজনেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ আইন মোতাবেক বর্গাদার সবসময়েই দেরিতে এবং কম পরিমাণে ক্ষতিপূরণ পান। অথচ তিনিই তো প্রকৃত কৃষক যার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বামফ্রন্ট সরকার চালু রেখেছেন অপারেশন বর্গা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের শিকার বর্গাদারদের জন্য এই সরকার কোন আইন প্রবর্তন দূরে থাক পুরনো আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা পাণ্টে বর্গাদার যাতে বেশি ক্ষতিপূরণ পান তার ব্যবস্থা করেন নি। এইসব মানুষদের চোখে অপারেশন বর্গা ও বামফ্রন্টের জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে শিল্পায়নের কোন মিল নেই। আসলে বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির খেলায় এই ধরনের ঘটনা আরও ঘটবেই। কলিকাতার জমি অধিগ্রহণের ঘটনা সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। ক্ষতিপূরণ কৃষকরা অনেকেই পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু অভাবী গ্রামীণ পরিবারে এই টাকা নিমেষে খরচা হয়ে গেছে ঋণ শোধে, মেয়ের বিয়েতে অথবা স্নেহ সংসার খরচা চালানোতে। কিছু পরিবার ক্ষতিপূরণের টাকা ব্যাঙ্কেও রেখেছেন। কিন্তু আবার জমি কিনেছেন খুবই কম সংখ্যক পরিবার। সবটা মিলিয়ে অবকৃষকায়নবই (Depeasantisation) একটা ছবি ফুটে ওঠে বিশ্বায়নের ‘গ্লোবাল ভিলেজে’ মেদিনীপুরের গোকুলপুর, আদ্বা, মহেশপুর, লিলুয়াকলার চাষিরা আজ হতাশা আর ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে টাটা মৌলিকসের মস্ত বড় চিমনি আর বিড়লাদের কারখানার জন্য অধিগ্রহণ হয়ে যাওয়া সুফলা ৫০০ একর জমির দিকে ওখানে তাদের প্রবেশ নেই। কৃষিজমি পরিণত হয়েছে গোচারণভূমিতে আর মস্ত বড়

স্বী চকচকে কারখানা গজিয়ে উঠেছে তাদেরই ধান জমির উপর। বিশ্বায়ন ওদের নিজগৃহে ফরে তুলেছে পরবাসী। বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাতে ভারতবর্ষের অবস্থা এর চেয়ে খুব খারাপটা আলাদা নয়।

প্ৰস্তাসূত্র

- ১। The Reality of Foreign Investments by Kavaljit Singh, 1997, Madhyam Books, New Delhi.
- ২। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭।
- ৩। TNC's and India by Jed Greer and Kavaljit Singh, 1998, Public Interest Research Group, New Delhi.
- ৪। শিল্পায়ন বনাম কৃষিজমি : বামপন্থীরা যা করছেন, অভিজিত গুহ, *আনন্দ বাজার পত্রিকা*, ১৮ অক্টোবর ২০০০।
- ৫। Land of Our Fathers : Development and the Poor, by Abhijit Guha *The Statesman*. 1 April 1998.
- ৬। পশ্চিমবঙ্গে যৌথ বিনিয়োগ, ভবতোষ দত্ত, *প্রসঙ্গ অর্থনীতি*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৫, কলকাতা।
- ৭। Plough, Politics, Pig-iron and Displacement in Medinipur in the Wake of Liberalisation by Abhijit Guha, Laxman Jana, Tapan Barman and Raghunath Mondal. *Journal of the Indian Geographical Foundation*. Vol 3, 1996.
- ৮। Greenwash : The Reality Behind Corporate Environmentalism by Jed Greer and Kenny Bruno, 1996, Third World Network, Penang Malaysia.
- ৯। Village based District Planning Process : An Outline of Methodology, District Planning Committee, Midnapore, West Bengal, 1985.
- ১০। বিশ্বায়ন ও বামপন্থী রাজনীতির সাম্প্রতিক সংকট : একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, অভিজিত গুহ, প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সমাজবিজ্ঞান কংগ্রেসের “বিশ্বায়ন ও সাম্প্রতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি” শীর্ষক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ। উক্ত কংগ্রেস ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- ১। Capitalist Friendly Communists, by Abhijit Guha, *Frontier* Vol. 30, No. 46, June 20, 1998.
- ২। Development Policy of the Left Front Government in West Bengal : From Bottom up to Top Down. Paper Presented by Abhijit Guha in an International Symposium on *Development Policies for the New Millennium in Honour of Professor Kirit S. Parikh* held during 12-14 July 2000 and Indira Gandhi Institute for Development Research,

Mumbai.

- ১৩। Dispossession of Peasants from Agricultural Land in Medinipur : A Need for Radical Changes in Policy of the Govt. of West Bengal
Paper presented by Abhijit Guha in an International workshop on Livelihoods and Poverty Reduction : Lessons from Eastern India held during 25-27 September 2001 at Bhubaneswar.
- ১৪। Ecology and Equity by Madhav Gadgil and Ramchandra Guha, 1995 Penguin Book, India.

কৃতজ্ঞতা

এই লেখা তৈরির জন্য আমি আমার তিন ছাত্র তপন বর্মণ, রঘুনাথ মণ্ডল ও লক্ষ্মণ জ্ঞানার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ওরাই গোকুলপুর অঞ্চলে প্রথম আমাকে নিয়ে যায় কলাইকুণ্ডা অঞ্চলের যে সমস্ত গ্রামের মানুষ আমাকে সবসময় তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি জানাই আমার অকুণ্ঠ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। আর কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত আমার স্ত্রী প্রীতি ও দুই ছেলে রনি ও রুরুর কাছে। ওরা সব সময় এই লেখা তৈরি ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। সবশেষে ভালবাসা জানাই শ্রয়ণ-বন্ধুদের 'শ্রয়ণে'র পাভ তাঁরা খালি রেখে বসেছিলেন আমার এই লেখার জন্য।

বিশ্বায়ন বনাম বিকেন্দ্রীকরণ

অজিত নারায়ণ বসু

বিশ্ব-রাষ্ট্র বনাম স্বাধীন রাষ্ট্রদের সহযোগিতা

যতদূর মনে পড়ে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শেষ হয়ে আসছে তখন আমেরিকান রাজনীতিবিদ (ভাইস প্রেসিডেন্ট?) ওয়েগেল উইকি একটা বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব - দুনিয়ার সামনে রেখেছিলেন। আন্তর্জাতিকতাবাদের স্বপ্নে দীক্ষিত অনেক মানুষ ঐ প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এদের মধ্যে যারা অভিনন্দন জানাননি তারা এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে ১৯৪৫-৫০ সালে দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষের কাছে স্বপ্ন ছিল বিশ্ব-রাষ্ট্রের নয়। স্বপ্ন ছিল তাদের নিজ নিজ দেশের স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের। এদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবর্ষ ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য দেশ। পবায়ীতার শৃঙ্খলে আটকানো সবচেয়ে বেশি মানুষের দেশ। ঐ সময়ে বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপনের পিছনে সামিল হবার অর্থ ছিল ভারতবর্ষের মত দেশের স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে দূরে সবে আসা। সেটা আমরা করিনি। আমরা এক রাষ্ট্রওয়ালা দুনিয়ার পরিবর্তে, বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত স্বাধীন দেশগুলির সহযোগিতার আদর্শ সামনে রেখেছিলাম। মনে হয়, আমরা তখন সঠিক কাজই করেছিলাম। সমগ্র দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিকেন্দ্রীকরণের পথ বেছে নিয়েছিলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে, দুনিয়াতে একটা রাষ্ট্রই ছিল প্রায় অক্ষত। আমেরিকা। অর্থনৈতিক এবং সাময়িক দিক থেকে তখন দুনিয়ার বাকি সব কটি রাষ্ট্র—বুটেন থেকে জাপান পর্যন্ত একেবারে বিধবস্ত। তুলনামূলকভাবে আমেরিকা তখন খুবই সমৃদ্ধ। ঐ সময়ে আর একটা দেশ—সোভিয়েট ইউনিয়ন—যুদ্ধে বিধবস্ত হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে আর একটা শক্তিকেন্দ্র হিসাবে মাথা তুলে রাখতে পারল। ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার প্রধান শক্তি হিসাবে, যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করা সত্ত্বেও তার রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক গঠনের জন্য দ্রুত স্ব-নির্ভরভাবে নিজেদের দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে আসতে পারার জন্য, নতুন স্বাধীন হওয়া সব দেশের স্বাভাবিক বন্ধু হিসাবে, দুনিয়ার সব দেশের বঞ্চিত মানুষদের ভালবাসার এবং ভরসা করার শক্তি হিসাবে, সোভিয়েট ইউনিয়ন একটা বিকল্প প্রধান শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কবল।

দুনিয়াতে দুটি শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হলো। আমেরিকা এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগেই শুরু হয়ে গেল এদের মধ্যে ‘ঠাণ্ডা লড়াই’। ফলে,

দুনিয়াজোড়া বিকেন্দ্রীকতার ঝোঁকের পাশাপাশি দুটো কেন্দ্রীয় শক্তিকে চেষ্টা করতেই হলো নিজ নিজ শক্তির পিছনে যত বেশি সম্ভব অন্য সব বাষ্ট্রকে সামিল করতে। সমগ্র দুনিয়াকে দুটি কেন্দ্রের আওতায় আনতে। কেন্দ্রীকরণকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

এই দুই মেরুতে কেন্দ্রীকরণের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথম কাণ, যুদ্ধ চলাকালীনই আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্র প্রধানদের ইয়ান্টা ও পটশডামে মিলিত হয়ে জার্মানির পূর্বার্ধসহ পূর্ব-ইউরোপকে সোভিয়েট আওতায় এবং গ্রীস ও জার্মানির অর্ধেক সহ পশ্চিম ইউরোপকে আমেরিকান আওতায় ভাগ করে নেয়া। দ্বিতীয়ত, আমেরিকান সাহায্য ব্যতীত কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেরই তখন নিজ নিজ পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সামলে তোলা সম্ভব ছিল না। তখন সব সময়ই একটা ভয় ছিল যে তারা যদি সামলে উঠতে না পারে, তবে হয়ত দেশে একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও হয়ে যেতে পারে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন রকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ছাড়াই। ফলে, পুঁজিবাদী দুনিয়াতে এই প্রথম সব কটা পুঁজিবাদী দেশ বাস্তবে একটা সবচেয়ে শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সর্বময় প্রভাবকে মেনে নিয়ে নিজ নিজ দেশের পুঁজিবাদী উন্নয়ন করতে লাগল। পুঁজিবাদী রাষ্ট্ররা নিজেদের মধ্যের অন্তর্দ্বন্দ্বকে ধামা চাপা দিয়ে রাখল। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের পথ নেয়া পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলি এবং বিপ্লবোত্তর চীন ও পরে ভিয়েতনাম ও কিউবার রাষ্ট্রপ্রধানরা স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদী দুনিয়ার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য সোভিয়েট কেন্দ্রের পিছনে নিজেদের সামিল করল। চতুর্থত নতুন স্বাধীন যে সব দেশ ভারতের মত পুঁজিবাদী পথেই নিজেদের উন্নয়ন করতে চাইল তাদের কাছে ঐ দুই শক্তিকেন্দ্রের ঠাণ্ডা লড়াই একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দিল উভয়ের কাছ থেকেই সাহায্য নিয়ে নিজেদের দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে।

১৯৪৫ থেকে ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত এই ২০/২৫ বছর দুনিয়া এই অবস্থায় ছিল। ১৯৭০-এর দশক থেকে একটা পরিবর্তন শুরু হয়ে ১৯৯০-এর দশকে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই পরিবর্তনকে বুঝবার পক্ষে সুবিধা হয় যদি আমরা খেয়াল রাখি যে পুঁজিবাদের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত মূল ঝোঁক আছে কেন্দ্রীকরণের দিকে যেমন এর ঠিক একটা উল্টো ঝোঁক থাকবার কথা সমাজতন্ত্রের মধ্যে যেখানে কেন্দ্রীকরণের প্রধান প্রকাশ চলতি রাষ্ট্রই নাকি বিলীন হয়ে যাবার কথা।

পুঁজিবাদী কেন্দ্রীকতা

পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে জমি সহ উৎপাদনী সর্ববিধ উপায়ের অধিকাংশের মালিকানা মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে যাওয়া এবং অধিকাংশ মানুষের সম্পত্তিহীন মজুবে পরিণত হওয়া; এবং সবচেয়ে বেশি মুনাফার জন্য নিজ নিজ মালিকানার পণ্যের বাজারের সবচেয়ে বেশি বিস্তৃতির জন্য অন্য সব দেশি-বিদেশি মালিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা।

দেশের মধ্যে বা বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের আদান প্রদান সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ছিল। বেশ কিছু শহরও সে সময় গড়ে উঠেছিল যার মূল কাজ ছিল ঐ রকম বিনিময়ের কেন্দ্র হওয়া। কিন্তু একটা সমগ্র দেশ ধরলে, মোট উৎপাদনের খুব সামান্য একটা অংশই তৈরি হতো মূলত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে বাজারের জন্য পণ্য হিসাবে। এই সব অর্থনীতিতে তাই “বাজার” একটা সবথেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে, অর্থাৎ মোটামুটি পাঁচশত বছর আগে থেকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে শুরু করে দুনিয়ার অর্থনীতিতে কখনও ধীবে এবং কখনও দ্রুত যে পরিবর্তন শুরু হয় তাই সৃষ্টি করে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে। কখনও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এবং কখনও বা সংরক্ষণের মাধ্যমে লাভজনক বাজারের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে এক একটা দেশের অর্থনীতির—এবং শেষ পর্যন্ত তাই রাজনীতির—মূল চালিকা শক্তিতে পরিণত করা হলো।

মুনাফার জন্য পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের বিস্তৃতি যে যে মূল পরিবর্তন নিয়ে এল তার মধ্যে পড়ে :

ক) কলা-কৌশল এবং বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি। প্রত্যেক মালিকই চেষ্টা করছে তার নিজের কারখানার উৎপাদন খরচ কমাবার জন্য, উন্নততর পণ্য উৎপাদন করার জন্য নতুন নতুন কলা-কৌশল ব্যবহার করতে যাতে তার মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এই মুনাফার তাগিদই সৃষ্টি করছে কলা-কৌশলের চাহিদা এবং তার বিকাশ। একদিকে এই মুনাফার তাগিদ এবং অন্যদিকে সৃষ্ট কলা-কৌশল ও বিজ্ঞান এরা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে উভয়ে এগিয়ে চলেছে।

খ) প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অসংখ্য ছোট মালিকের বাজার থেকে হটে যাওয়া এবং পণ্য উৎপাদনের এক একটি ক্ষেত্রে একটি বা কয়েকটি সংস্থার প্রথমে দেশীয় উৎপাদনের এবং ক্রমশ আন্তর্জাতিক উৎপাদনের সিংহভাগের কর্তৃত্ব যাওয়া। পণ্য উৎপাদনের কেন্দ্রীভবনের এটা একটা দিক। এই একচেটিয়া সংগঠন সৃষ্টি কিন্তু প্রতিযোগিতার রাজত্বকে শেষ করে দিল না। কারণ তখন প্রতিযোগিতা খুব বড় বড় সংগঠনের মধ্যে যারা হয় একই পণ্য কিম্বা একই পণ্যের বিভিন্ন বিকল্পের উৎপাদক।

গ) এই বৃহৎ, একচেটিয়া সংস্থার অতিরিক্ত মুনাফা সৃষ্টির এবং তার পুনরায় নিয়োগের সুযোগে এক একটি সংস্থার হাতে বিশাল পরিমাণ পুঁজির কেন্দ্রীভবন হওয়া। এটা কেন্দ্রীভবনের অন্য দিক। এই দুটি দিক পরস্পরকে ক্রমশ বাড়িয়ে নিয়ে চলে।

ঘ) ষোড়শ শতাব্দী থেকেই পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকায় বাজার এবং বাসস্থানের সন্ধানে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও সামরিক সংঘর্ষের মাধ্যমে নিজ নিজ উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু কবে। পরবর্তী ৩০০ বছরে বাকি দুনিয়াকে (অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে) নিজেদের কর্তৃত্ব নিয়ে আসা পরিপূর্ণ হয়।

তার পরই বিংশ শতাব্দীতে শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগ, উপনিবেশগুলিকে নতুন করে ভাগ বাটোয়ারা করার যুগ, একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগ।

গ) দুই বিশ্ব যুদ্ধের মাধ্যমে প্রথমে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পরে চীন ও তার সঙ্গে পূর্ব ইউরোপ এবং ভিয়েতনাম ও কিউবার সাম্রাজ্যবাদের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব গড়ার দিকে পা বাড়ায়। পুঁজিবাদী বিশ্বকেন্দ্রীকতার উপর এই ছিল একটা বিরাট আঘাত।

চ) আগেই আলোচনা করা হয়েছে দুই বিশ্ব শক্তিকেন্দ্রের সৃষ্টি, তাদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই এবং লড়াইতে রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ভাঙন। সমগ্র দুনিয়াতে আমেরিকার নেতৃত্বে জি-৭ দেশগুলির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সমগ্র দুনিয়াতে একটি মাত্র ‘বহুশক্তি’ হিসাবে আমেরিকার আবির্ভাব হওয়া। বিশ্ব কেন্দ্রীকতা একটা চরম বিস্মৃতে পৌঁছল।

সমগ্র দুনিয়াকে একটি মাত্র বহু পুঁজিবাদী শক্তির কর্তৃত্বে নিয়ে আসা নিশ্চিত হলো। ১৯৯০র দশকের শুরুতে সোভিয়েট ইউনিয়নের ‘শান্তিপূর্ণ’ অবলুপ্তির পর। এতখানি কেন্দ্রীভবন দুনিয়ার আর কখনই ছিল না। এই হচ্ছে বর্তমান ‘বিশ্বায়ন’, এবং তাই বিশ্বায়নের অপর নাম ‘দুনিয়াব উপর সংকটে পড়া আমেরিকান পুঁজিবাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা।’ এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করতে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের কেন্দ্রীকতার ভূমিকা অনেকখানি।

রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা

শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার উপর যে অর্থনীতি নির্ভরশীল, এবং যে অর্থনীতিতে যুটিমেয় মানুষের একটা শ্রেণী—সেই দাস-মালিক এবং জমিদার থেকে শুরু করে পুঁজির মালিক পর্যন্ত—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে বাকি অধিকাংশ মানুষের একটি বা কয়েকটি শ্রেণীর উপর তাদের অর্থনৈতিক শোষণ চাপিয়ে দিয়ে, সেই সমাজ ব্যবস্থায় একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান লাগে ঐ অধিকাংশ মানুষকে সমাজের মধ্যে সংহত কবে রাখবার জন্য। এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের তিনটি মূল কাজ। এগুলি হলো : (১) চলতি শোষণভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে জোরদার করা ; (২) দেশের অধিকাংশ শোষিত মানুষ যাতে চলতি অবস্থাকে চিবুগুয়ী ধরে নিয়ে এর মধ্যেই নিজেদের মানিয়ে নেয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা ; এবং (৩) যে মানুষরা এই ভাবে নিজেদের চলতি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের মানিয়ে নিতে অস্বীকার কববে, পোষ মেনে যেতে অস্বীকার করবে, তাদের শাস্ত করা জন্য নানা রকম আইন-কানুন এবং পুলিশ-সৈন্য-জঙ্গ-ম্যাজিস্ট্রেটদের ব্যবহার করা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে দেশের শ্রমজীবীদের—অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ মানুষদের—নতুন সমাজ ব্যবস্থার মাথায় স্থাপন করা। এই অধিকাংশ মানুষেরই

কর্তৃত্বে আসা এবং এই কর্তৃত্বকে শ্রেণীশোষণ কায়েম করার জন্য নয়, সবরকমের শ্রেণী শোষণকে চিরদিনের মত শেষ করে দেবার জন্যই এই কর্তৃত্বকে ব্যবহার করা উদ্দেশ্যে থাকার জন্য, সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্রকে তার জন্মের প্রথম দিন থেকেই চলতি রাষ্ট্রের মত একেবারেই দেখতে হবে না। এটা মার্কস এবং এঙ্গেলস হাতে কলমে শিখেছিলেন ১৮৭১ সালের ‘প্যারী কম্যুন’ থেকে। মার্কসবিরোধী দুই সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বে প্যারিস শহরের শ্রমজীবীরা, প্রধানত মজুররা, এই একেবারে ভিন্ন ধরনের একটা রাষ্ট্র স্থাপন করে। এই নতুন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম কথা হলো পুরোনো রাষ্ট্রের স্থায়ী সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশকে ভেঙে দিয়ে সমস্ত শ্রমজীবীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া যাতে তারা প্যারিসের একদিকে যুদ্ধে বিজয়ী জার্মান সৈন্যদলকে এবং বাকি তিনদিকে জার্মানির কাছে যুদ্ধে পরাজিত ফরাসী রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীকে রুখতে পারে। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে শহরের মিউনিসিপালিটির ওয়ার্ড (ফরাসী ভাষায় ‘কম্যুন’) থেকে শুরু হবে সবচেয়ে ক্ষুদ্র গ্রাম পর্যন্ত সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত, সব থেকে বেশি গণতান্ত্রিক যা হতে পারে এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান খাড়া করা। এই প্রতিষ্ঠান একই সঙ্গে কী করা দরকার যে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে, সেই সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করবে, এবং কেউ কিছু অন্যায় করল কি না তা বিচার করার জন্য ‘বিচারক’ নির্বাচন করবে। এই সবচেয়ে নিচের স্তরের কম্যুন তার উপরে জেলা স্তরের কম্যুনের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তারা উপরে গিয়ে কী কী কাজ করবে তার একটা নির্দেশনামা দিয়ে দেবে। নির্বাচকরা যদি মনে করেন যে প্রতিনিধিরা তাদের দেয়া নির্দেশ পালন করছে না, তবে অবিলম্বে ঐ প্রতিনিধিকে ফেরৎ নিয়ে এসে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। প্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিচারক সরকারি কর্মচারী প্রভৃতি সকলেই নির্বাচিত হবে এবং একজন দক্ষমজুরের থেকে এরা কেউ বেশি মাইনে পাবে না।

তত্ত্বগত ভাবে, মার্কস-বিরোধী সমাজতান্ত্রীদের নেতৃত্বে চলা এই ভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র কয়েকটা ভুল কাজ সত্ত্বেও [যথা ফরাসী ব্যাঙ্ককে দখল না করা ইত্যাদি] তারা যে অতগুলো নতুন পথনির্দেশক কাজ করতে পেরেছিল তার প্রধান কারণ—মার্কসের ভাষায়—শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। তাই ‘সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী’ (associated workers) যে রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি, তাকে বিকেন্দ্রীক হতেই হয়। কারণ, এই বিকেন্দ্রীকভাবে শহরের ওয়ার্ডে, বা গ্রামে, বা কারখানায় একমাত্র সম্ভব সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। এই রাষ্ট্রেরও নিশ্চয়ই বেশ কিছু উপরের স্তরে বা কেন্দ্রীয়ভাবে দেশ স্তরে কার্যকলাপ থাকবে। এই শেষোক্ত কাজও শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে নিচের তলার নির্বাচকরা, তাদের দেয়া নির্দেশনামা নিয়েই উপরের স্তরের প্রতিনিধিদের কাজ করতে হয়। মাত্র ৭২ দিন বেঁচে থাকা এই প্যারী কম্যুনে যে ভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রর আভাস সকলের সামনে তুলে ধরেছিল, সেই ধরনের রাষ্ট্রকেই মার্কস ও এঙ্গেলস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষা ব্যবহার করে বলেছিলেন “শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্র।” এই বিজ্ঞানের ভাষায়,

আমাদের চলতি যে সমাজ ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় মালিকেরা সমাজের কর্ণধার, সেই সমাজের রাষ্ট্র ব্যবস্থার—তা সে হিটলারের ধরনের বা ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ধরনের বা আমেরিকার ফেডারাল ধরনের ইত্যাদি যাই হোক না কেন—মূল চরিত্র হচ্ছে “বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব।” একদিকে অনেক কথার চলতি অর্থের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরিভাষাব অর্থের অনেক সময় ফাবাকের জন্য এবং অন্যদিকে প্রধানত সোভিয়েট ইউনিয়নে “শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব”র নামে প্রথমে একটা বিশেষ পার্টি এবং শেষ পর্যন্ত সেই পার্টিব উচ্চতম নেতারই রাষ্ট্রের কর্তা হয়ে ওঠার অত্যন্ত বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক সময়ই ‘প্যারী কমুনের’ ঐতিহ্যের কথা, মার্কস ও এঙ্গেলসের নিজেদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি গণতান্ত্রিক হওয়া সম্ভব যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্র এবং গঠন সম্বন্ধে তারা যে বক্তব্যকে হাজির করেছিলেন তার কথা, আমাদের স্মরণে থাকে না। একই রকম ভাবে স্মরণে থাকে না যে ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লবও শুরু হয়েছিল মূলত শ্রমজীবীদের নিজ উদ্যোগে গড়া মজুর, কৃষক, ও সৈন্যদের স্থানীয় সংগঠন (সোভিয়েট)গুলির বিকেন্দ্রীকভাবে ক্ষমতা দখল দিয়ে। কেন্দ্রে কেরেনস্কি সরকার এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সোভিয়েট সরকার ছিল ঐ বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত “দ্বৈত সরকার” (dual power)। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে, ঐ সোভিয়েটের নামেই রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কেরেনস্কি সরকারকে হটিয়ে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এর পরে একদিকে অপ্রত্যাশিত অবস্থার চাপ—পশ্চিম ইউরোপের অগ্রসরমান পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না হওয়া বা কিছুটা হলেও জয়লাভ না করা; পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির একত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করা এবং তাদের সহায়তায় দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেওয়া এবং দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি; এবং অন্যদিকে, অনভিজ্ঞতা, কৃষকদের মধ্যে এবং পেট্রোগ্রোডের বাইরে অন্য শহরেও সচেতন সংগঠনের অভাব, ১৯১৮ সালের আগস্টে লেনিনের মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে ৪ বছর ধরে অশস্ত্র হয়ে ১৯২৪ সালের জানুয়ারিতে মৃত্যু, লেনিনের সাবধান বাণী সত্ত্বেও ষ্টালিনকে পার্টির নেতৃত্বে বসান ইত্যাদির ফলে একটা মিশ্র ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টি হলো। এর একদিকে ছিল পুরোনো ধরনের আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে প্যারী কমুন জাতীয় সংগঠিত গণ-উদ্যোগের আধিপত্য থাকার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। অন্যদিকে ছিল একই সঙ্গে উৎপাদনে আমেরিকার সমকক্ষ হবার জন্য এবং একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গড়ার ফলে চারিপাশের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য শক্তি অর্জন করার প্রয়োজনীয়তার জন্য যথাসম্ভব দ্রুত জাতীয় সঞ্চয় এবং নিয়োগকে সবচেয়ে বেশি বাড়িয়ে দেশের অর্থনীতি এবং আত্মরক্ষার ক্ষমতাকে জোরদার করা। সঙ্গে সঙ্গেই নজর ছিল দেশের সব সাধারণ মানুষের খাওয়া-পরা-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য যাতে সবচেয়ে বেশি উন্নত করা যায় তাব জন্য এই পৃথিবীতে প্রথম একটা মহৎ

আন্তরিক চেষ্টা। পুঁজিবাদী যুগ শুরু হবার পরে পৃথিবীতে এই প্রথম সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা লুপ্ত করে দেয়া হয়েছিল। ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ারের বাজারের আধিপত্য শেষ করে দেয়া হয়েছিল। এর পরিবর্তে অবশ্য ঐ সম্পত্তির উপর মার্কস কথিত ‘সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর’ associated workerদের, কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়নি। শ্রমিক শ্রেণীর নামে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ফলে বাস্তবে কলে-কারখানায়-রাষ্ট্রীয় কৃষি খামারে শ্রমিকরা আগের তুলনায় কল্পনাভীত আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তারা বি-কেন্দ্রীকৃতভাবে ঐ কলে-কারখানা-রাষ্ট্রীয় খামারের কর্তৃত্ব পায়নি। ফলে তাদের ‘মজুরের’ অবস্থানের মৌলিক পরিবর্তন হলো না। তারা হয়ে গেল কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের উৎপাদনী ব্যবস্থার ‘মজুর’। স্ব-কর্তৃত্বে থাকা স্বাধীন সংগঠিত শ্রমিক নয়। ফলে সেখানে বি-কেন্দ্রীকৃত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারল না। গড়ে উঠল পরস্পর বিরোধী চবিত্র নিয়ে একই ধরনের ‘রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র’। ঠিক যেমন ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বরে ছিল একটা পরস্পর বিরোধী চবিত্র নিয়ে গড়া ‘দ্বৈত সরকার’।

বিশ্বায়ন এবং তার আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ

১৯৭০-এর দশকে শুরু হয়ে ১৯৯০-র দশকে যে বিশ্বব্যবস্থা পরিপূর্ণতা লাভ করে তার মধ্যে দুটো একেবারে পরস্পরবিরোধী ঝোক খুবই স্পষ্ট। এব মধ্যে যেটা প্রকট এবং আপাতত আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে তা হচ্ছে সমগ্র দুনিয়া জুড়ে একমাত্র বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রধানত আমেরিকান বহুজাতিক একচেটিয়াদের দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে চলা। এই কর্তৃত্ব স্থাপনের হাতিয়ার হচ্ছে তাদের অন্তত পাঁচ ধরনের প্রায় একচেটিয়া মালিকানা। এগুলি হচ্ছে :

- ক) বিশ্বের আর্থিক সম্পদ এবং তার প্রধান বাজারগুলির উপর প্রায় একচেটিয়া মালিকানা ;
- খ) বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকার ;
- গ) বিশ্বের সমস্ত সংবাদ আদান-প্রদান ও সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলির উপর প্রায় একচেটিয়া মালিকানা ;
- ঘ) দুনিয়ার যাবতীয় আধুনিক কলা কৌশলের উপর প্রায় একচেটিয়া মালিকানা ;
- ঙ) বিশ্ববাসী সর্বগ্রাসী অস্ত্রশস্ত্রের প্রায় একচেটিয়া মালিকানা।

যে পদ্ধতির মাধ্যমে এই একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং তার দুনিয়াজোড়া আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে এবং চালু রাখতে হয়েছে তার মূল কথা হলো ক্রমশ বেশি বেশি পুঁজি নিয়োগ করে তার মুনাফা সৃষ্টিকে চালু রাখা এবং এই মুনাফাকে পুঁজিতে কপান্তরিত করে ক্রমান্বয়ে পুঁজিকে সম্প্রসারণ কবে চলা। পুঁজির ক্রমাগত সম্প্রসারণের এই বাধ্যবাধকতা দেশীয় পুঁজিকে কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মূলত

দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মূলত আমেরিকা এবং জি-৭ দেশগুলিকে কেন্দ্র করে বহুজাতিক পুঁজির আবির্ভাব এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুঁজির দিক থেকে এই কর্তৃত্বকে বজায় রাখার বাধ্যবাধকতাই ১৯৭০-এর দশকের পর থেকে পুঁজিকে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের রাজনৈতিক সঙ্কটে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই হচ্ছে বিশ্বব্যবস্থায় চলতি পুঁজিবাদী বিশ্বায়নকে অতিক্রম করার বিরোধী ঝোঁকের মূল কথা।

এই বিরোধী ঝোঁকের প্রকাশ যাদের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে তার মধ্যে পড়ে—

(১) ১৯৬০-এর দশক থেকেই যুদ্ধে বিশ্বস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির আমেরিকান পুঁজির সাহায্যে সামলে ওঠা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে ঐ সব দেশগুলি আমেরিকান পণ্যের বাজার ও পুঁজির নিয়োগ ক্ষেত্র হয়ে থাকার বদলে, ঐ সব দেশগুলিরই দরকার হয়ে পড়ল নতুন বাজার নিজেদের পণ্য এবং পুঁজির জন্য। এটা বিশেষ করে সত্যি হলো জার্মানি (পশ্চিম) এবং জাপানের ক্ষেত্রে। যুদ্ধে পরাজিত এই দেশদুটিকে বাধ্য করা হয়েছিল সামরিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত ভাবে নিরস্ত থাকতে। ফলে এই দেশ দুটি অ-সামরিক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে; এবং বিশ্বের বাজারে আমেরিকান শিল্পের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। ফলে ১৯৪৫-৭০-এর যুগের পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক আধিপত্যের কেন্দ্র একটির বদলে তিনটি হয়ে ওঠে : পশ্চিম ইউরোপকে নিয়ে জার্মানি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া নিয়ে জাপান, এবং আমেরিকা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়ে চলল। অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হলো ও বেড়ে চলল। এই অবস্থা কিন্তু সামরিক ক্ষেত্রে আমেরিকানদের একাধিপত্যকে বিপদগ্রস্ত করল না।

(২) অপেক্ষাকৃতভাবে পিছিয়ে রাখা দেশগুলির উপর আধিপত্যের সুযোগ নিয়ে তাদের লুঠ করা বাদ দিলে, ১৯৭০-এর দশকের আগে পর্যন্ত অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পুঁজির সম্প্রসারণের প্রধান মাধ্যম ছিল বস্তুগত উৎপাদনে পুঁজি নিয়োগ। গত দু দশক ধরে ক্রমাগত বেশি বেশি করে এই মাধ্যম হয়ে উঠল শেয়ার বাজারে আর বিদেশি মুদ্রার বিনিময় মূল্যের ক্রমাগত বাড়ি-কমাকে ভিত্তি করে ফাটকাবাজিতে পুঁজি নিয়োগ। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই পুঁজিবাদী উৎপাদনের মধ্যে ক্রমশ বেশি বেশি করে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন এবং মুষ্টিমেয় বড়লোকদের বিলাস সামগ্রী উৎপাদনের অংশ বাড়তে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের মধ্যে এই অবশ্যস্বাধী বিকৃতি অনেকখানিই ব্যাপক হয়ে গেল ঐ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে ক্রমবর্ধমান প্রত্যক্ষ উৎপাদন বর্জিত ফাটকাবাজিতে।

(৩) একই সঙ্গে বিশেষ করে অগ্রসর দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের ক্রমশ কম কম ভাগ পুঁজি হিসাবে নিয়োজিত হচ্ছে ক্রমশ বেশি বেশি ভাগ বিলাসদ্রব্য ভোগের

পিছনে ব্যয় হচ্ছে। এই হচ্ছে চলতি বিকৃত ভোগবাদী সভ্যতার গড়ে ওঠার বাস্তব ভিত্তি। শ্রমজীবীদের শোষণ করে পাওয়া সম্পদকে নবাব-রাজা-জমিদারদের আমলে ব্যয় করা হতো নির্লজ্জ ভোগে : পূজিবাদী সভ্যতার অগ্রগতিতে একটা প্রধান ভূমিকা ছিল ঐ সম্পদকে ভোগ করে নষ্ট না করে, বাড়তি উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করা। এই ভূমিকা অনেকাংশেই এখন ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে।

(৪) উৎপাদনে নিয়োজিত কল-কারখানার ক্রমশ বেশি বেশি অংশ এখন অলস করে ফেলে রাখা হয়েছে চালু কারখানায় এবং রুগ্ন ও বন্ধ কারখানায়। এর প্রধান কারণ ঐ কারখানার উৎপাদনকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। মুনাফা কেন্দ্রীকতাই মুনাফা সৃষ্টির জন্য পুঁজির নিয়োগের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৫) অন্যান্য কারণের সঙ্গে উৎপাদনভিত্তিক পুঁজির অনেকখানি এই ফাটকা পুঁজিতে রূপান্তরের ফলে এবং উৎপাদনী ক্ষমতা ব্যবহার না করতে পারার ফলে অগ্রসর দেশগুলিতে গত শতাব্দীর শেষ তিন দশকে আগের দশকের তুলনায় শিল্প উৎপাদনের হার ক্রমাগত কমে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে উল্টোদিকেও যায় অর্থাৎ উৎপাদন কমে, বেকারির হার বাড়তে থাকে এবং নতুন কর্মসংস্থানের বেশির ভাগই হতে থাকে অনেক কম মাইনের 'সেবা' বিভাগে এবং 'চুক্তিমূলক কাজ' হিসাবে; সামাজিক সুরক্ষার পরিমাণ কমতে থাকে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৬০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে দ্রুত উন্নয়নের এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবের ফলশ্রুতি হিসাবে শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে যে একধরনের সমঝাওতা ছিল, তা শেষ হয়ে যায়। আবার পুরোনো দিনের মত শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব সামনে চলে আসে। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক বিক্ষোভ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

(৬) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্বাধীন হওয়া দেশগুলির শাসকগোষ্ঠীকে ঋণের ফাঁদে ফেলে বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলির বহুজাতিক কর্পোরেশনের একটা বশব্দ শক্তিতে পরিণত করা। ফলে দেশীয় শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিরোধ অনেক বেশি তীব্র হলো এবং একটা নতুন মাত্রা পেল। এটা হচ্ছে বিশ্ব-পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই। এই জাতীয় স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোকে অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক দিশা অর্জনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়া।

(৭) আগেকার সোভিয়েট ইউনিয়নে এবং পূর্ব-ইউরোপের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ বিরোধী এবং পুঁজিবাদী 'স্বাধীনতা'র পক্ষে যে মোহ সৃষ্টি হয়েছিল গত এক দশকের অভিজ্ঞতায় সেই মোহ বহল পরিমাণে কেটে যাওয়া এবং আগের তুলনায় অনেকখানি ভিন্ন ধরনের সাম্যবাদী সংগঠনের সৃষ্টি হওয়া। এই ঘটনা দুনিয়ার বহু দেশেই ঘটে চলেছে।

(৮) বিশ্বায়নের বাহন খোলা বাজার বাধ্য করেছে অপেক্ষাকৃত ভাবে অনেক দুর্বল করে রাখা দেশীয় শিল্প, কৃষি ও বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থাকে তাদের থেকে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মূলত পরাজিত হতে। পুরো পরাজয় বাঁচাতে কেউ কেউ বহুজাতিকদের ছোট অংশীদারে পরিণত হচ্ছে। ফলে আগেই উল্লেখ করা শ্রমিকদের পাশে ক্রমশ বেশি বেশি কৃষকও জমায়েত হচ্ছে একটা ভিন্ন পথ খোঁজার জন্য।

পুঁজিবাদের ইতিহাসে সব সময়ই যে বা যারা সবচেয়ে অগ্রসর দেশ তারা দুনিয়ার উপর ‘খোলা বাজার’ চালু করতে চেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃটিশ পুঁজিপতিরা চেয়েছিল জার্মানি যেন ‘খোলা বাজারে’ অংশগ্রহণ করে এবং তারা তখন সবচেয়ে সহজে যা উৎপাদন করতে পারত সেই কৃষি দ্রব্যই উৎপাদন করে বৃটেনকে সরবরাহ করে এবং বিনিময়ে বৃটেন থেকে শিল্পজ দ্রব্য কেনে। এই সাম্রাজ্যবাদী চাওয়ার সমর্থনে তখনকার দিনে একটা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্ব ছিল বিভিন্ন দেশের আপেক্ষিক সুবিধা অনুসারে উৎপাদন সংগঠিত করার তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসরণ করলে জার্মানি বা আমেরিকা বা জাপান এবং অধুনা হংকং বাদে দক্ষিণ এশিয় ব্যাঘ্র বলে পরিচিত দেশগুলিতে এবং এমন কি আমাদের নিজেদের দেশে যেটুকু শিল্পায়ন হয়েছে তাও হতে পারত না। আসলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটা মূল অর্থই ছিল। নিজ নিজ দেশের নতুন গড়ে ওঠা শিল্পকে রাষ্ট্রের সহযোগিতায় রক্ষা করা। আগে গড়ে ওঠা এবং তাই অধিকতর শক্তিশালী দেশের তৈরি পণ্যের খোলা বাজারে প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করা। চলতি বিশ্বায়নের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে আমেরিকার নেতৃত্বে জি-৭ দেশের সম্মুখে পড়া অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর পণ্য এবং পুঁজির বাজারের সবচেয়ে বেশি বিকৃতি এবং সেই জন্য পিছিয়ে রাখা দেশগুলোর সবরকমের পণ্যকে সব রকমের রক্ষীয় সুরক্ষা থেকে বার করে নিয়ে এসে একেবারে অ-সম প্রতিযোগিতার ‘খোলা বাজারে’ ফেলে দিয়ে পরাস্ত করা।

চলতি বিশ্বায়নের এই আক্রমণ একই সঙ্গে অগ্রসর এবং অনগ্রসর দেশের শ্রমজীবীদের পর্যুদস্ত করে দেবার চেষ্টা করছে। অগ্রসর দেশের পুঁজি অনগ্রসর দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে ঐ শেষোক্ত দেশের সস্তা মজুর এবং অনেক কম করের বোঝা থাকার ফলে অতিরিক্ত মুনাফা করার জন্য। ফলে যে পুঁজি দেশে নিয়োগ হলে অগ্রসর দেশের মজুরদের কাজ ছুঁত, সেই পুঁজি রপ্তানি হয়ে বিদেশে গেলে দেশে কর্মসংস্থান বাড়ছে না। বেকারি বাড়ছে। ফলে দেশে শ্রমিক বিক্ষোভ বাড়ছে। একই বকম ভাবে পিছিয়ে রাখা দেশগুলোর সস্তা মজুর ব্যবহার করার জন্য এবং দূষণ সংক্রান্ত আইনের অনেক কম কড়াকড়ি থাকার জন্য, কম খরচে তৈরি পণ্য অগ্রসর দেশে আমদানির ফলে সেই দেশের বাজারে একটা প্রতিবাদ সৃষ্টি হচ্ছে। চলতি বিশ্বায়নের কেন্দ্রে যে সব দেশগুলো রয়েছে সেই সব দেশের মানুষরাও ক্রমশ বেশি বেশি করে বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনে জড়ো হচ্ছে।

একই রকম ভাবে, অগ্রসর দেশের পুঁজি এবং পণ্য অনগ্রসর দেশে এসে সেই সব দেশের অপেক্ষাকৃত বেশি কর্মসংস্থান যুক্ত ছোট কারখানাগুলোকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে উঠে যেতে বাধ্য করেছে, এবং বড় কারখানার মালিকগুলোকে ক্রমশ বেশি বেশি করে বিদেশি পুঁজি এবং পণ্যের কারবারের একটা ছোট শরিকে পরিণত করেছে। ফলে পিছিয়ে রাখা দেশগুলোতেও কর্মসংস্থান কমছে এবং একই সঙ্গে খুবই অল্প কিছু অবিশ্বাস্য উচ্চ মাইনেতে কিছু মানুষের চাকরি হচ্ছে। ফলে, পিছিয়ে রাখা দেশগুলোতেও আপাতদৃষ্টিতে উল্টো কারণে বিশ্বায়ন বিরোধী বিক্ষোভ ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে।

পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন বিরোধী চলতি বিক্ষোভের একটা মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর বহুমাত্রিকতা। বহুদিক থেকে, অনেক সময় এমন কি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী দিক থেকে, বিভিন্ন ধারার বিক্ষোভ আজ একত্রে মিলিত হবার চেষ্টা করছে। চলতি বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে।

আমাদের মত দেশের কাছে বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন একদিকে দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার আন্দোলন; এবং অন্যদিকে দেশীয় বৃহৎ পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ছোট অংশীদারে পরিণত হয়ে দেশদ্রোহীর ভূমিকায় চলে যাবার ফলে, দেশের এগিয়ে চলার দিশা পরিবর্তনের আন্দোলন। পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠাকে আরও দৃঢ় করার চলতি পথের বদলে সাম্য ও সমবায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা স্থাপনের পথে যাবার দিক পরিবর্তন করার আন্দোলন।

একই সঙ্গে এই আন্দোলন আধুনিক বিজ্ঞান এবং কলাকৌশলকে—যাকে ব্যবহার করেই চলতি বিশ্বায়ন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে—পুঁজির মুনাকা সৃষ্টির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দেবার আন্দোলন। বিজ্ঞান এবং টেকনোলজির সমস্ত সু-সম্ভাবনাকে সমস্ত মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার আন্দোলন।

পুঁজির আকাঙ্ক্ষিত মুনাকা সৃষ্টি করতে পারেনা বলে আজ যে বিশাল সম্পদ ব্যবহার করা যাচ্ছে না, নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে, সমাজকে এই অ-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দেবার আন্দোলনও বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনের শরিক। সব দেশেই, বিশেষ কবে আমাদের মত দেশে বহু সহস্র কোটি জন-দিনের শ্রম-শক্তি কাজে না লাগিয়ে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। হাজার হাজার কল-কারখানা আধা-আধি বা পুরো বন্ধ করে ফেলে রাখা হয়েছে। বহু লক্ষ একর জমি পতিত জমি হিসাবে ফেলে রেখে মানুষের কাজে লাগান হচ্ছে না। সম্পদের কাজ যদি হয় পুঁজি হিসাবে মালিকের আকাঙ্ক্ষিত মুনাকা উৎপাদন, তাহলে উপরে উল্লিখিত অপচয় হতে বাধ্য। মুনাকা সৃষ্টির এই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পাবার আন্দোলনও তাই পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনের অংশীদার।

সম্পদ ব্যবহারের অ-ব্যবস্থার আর একটা দিক হচ্ছে চলতি পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের যুদ্ধান্ত তৈরির শিল্পের (military industrial complex) উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা। তাই বিশ্বায়ন : ১৮

যুদ্ধের বিরুদ্ধে, আণবিক বোমার বিরুদ্ধে এবং শক্তির সপক্ষে আন্দোলনও আজকের বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

পূজিবাদী বিশ্বায়নের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে মুনাফাকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত পূজির সম্প্রসারণ। এই মুনাফা কেন্দ্রীকতা পূজিবাদকে বাধ্য করে উৎপাদনের খরচ কমাতে এবং তার জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দূষণ সৃষ্টিকারী সম্ভ্র উপাদান ও উৎপাদ পদ্ধতি ব্যবহার করতে। ফলে দুনিয়াজোড়া পরিবেশ সুরক্ষার জন্য আন্দোলন, প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার আন্দোলন, আমাদের অল্প কিছু সুবিধার জন্য ভবিষ্যত বংশধরদের সর্বনাশ থেকে রক্ষা করার আন্দোলন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সচেতনভাবে পূজিবাদী বিশ্বায়নকে পরাস্ত করার চেষ্টার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে অন্য যে কোন রাষ্ট্র তার তাবেদারি মানবে না তার উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাকে শায়েস্তা করার চেষ্টা হচ্ছে চলতি সন্ত্রাসের একটা দিক। এর আর একটা দিক হচ্ছে প্রায় সব কটা রাষ্ট্রের মধ্যেই যে সব সংখ্যালঘু জাতিসত্তা আছে তার মাথা তুলে দাঁড়ানোতে বাধা দেবার জন্য ঐ সব দেশের সরকারের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। অনেক সময় নানা রকম অতি অ-মানবিক আইন করে, কখনও কোন আইনেরই তোয়াক্কা না করে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আজ চলিত অনেক সময়ে ঐ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের অংশীদার হিসাবেই। অনেক সময় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসই মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে দিয়ে সেখানে একটা বসস্বদ সন্ত্রাসবাদীকে রাষ্ট্রীয় প্রধান হিসাব খাড়া করতে। ফলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া লড়াইও ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে বিশ্ব আধিপত্যাকামী সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। আমেরিকান নেতৃত্বে চলা বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে। এরই একটা প্রকাশ হয়েছে গত ১১ই সেপ্টেম্বরের আমেরিকার WTO বাড়ি পুরো এবং পেট্যাগনের বাড়ির আংশিক ধ্বংসের মধ্যে। আমেরিকান রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শুধুমাত্র বিগত মহাযুদ্ধের পর ভিয়েতনাম থেকে শুরু করে আফগানিস্তান পর্যন্ত যে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ নারী-শিশু ও অন্যান্যদের হত্যা করেছে তার তুলনায় ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হত্যাকাণ্ড খুবই সামান্য। কিন্তু প্রশ্ন এখানে ভিন্ন।

সন্ত্রাসের মোকাবিলা : দুই পরস্পর বিরোধী ভিত্তি

পূজিবাদী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মোকাবিলা দুই পরস্পরবিরোধী ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে করার চেষ্টা করা যায়। এর একটা হচ্ছে প্রাক-পূজিবাদী অবস্থান থেকে। সামন্ততান্ত্রিক, patriarchal, ধর্মীয় গোঁড়ামির অবস্থান থেকে। পূজিবাদ তার কৈশোর এবং যৌবনে পুরোনো মধ্যযুগীয় অবস্থাকে সরিয়ে দিয়ে সমাজকে যেটুকু আলোর পথে নিয়ে এসেছিল, তার সব কিছুকে বববাদ করে প্রাক-পূজিবাদী জগতে প্রত্যাবর্তনের অবস্থান থেকে। তালিবান এবং তালিবান জাতীয় অন্যরা এই অবস্থান থেকে আক্রমণ করেছে (সমস্ত

পৃথিবীর কথা ভাবলে) তার সব চেয়ে ঘৃণ্য, বিশ্ব-কর্তৃত্ব প্রয়াসী, দুনিয়ার সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল রষ্ট্রযন্ত্রকে। অল্প কিছু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের প্রয়াসের কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রেরও আত্মরক্ষার ক্ষমতা যে কত সীমিত তা দুনিয়ার সকল মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে এই ভাবে আঘাত করার ক্ষমতা দুনিয়ার বেশির ভাগ বঞ্চিত মানুষদের—হয়ত কিছুটা গোপনে—স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা অর্জন করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আঘাত প্রগতির পক্ষে আঘাত নয়। এই আঘাত মানুষের অগ্রগতির সহায়ক নয়। বরং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পথই ঐ ধরনের আঘাত প্রশস্ততর কবেছে। সঙ্গত কারণেই ক্রুদ্ধ আরও কিছু যুবক-যুবতীকে ঐ বন্ধ্যাপথে সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত তাকেই শক্তিশালী করে তুলবে। গুটিকতক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের এইভাবে আত্মবলিদানের মাধ্যমে এই দুনিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপকে দূর করে দেয়া যাবে না। কোন দেশে কিছুদিনের জন্য এটা সম্ভব হলেও, তা সাধাবণ মানুষকে মুক্ত করবে না। কাজেই এটা পথ নয়। এটা বিপথ।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা ব বিকল্প ভিত্তি হচ্ছে ভবিষ্যতের সাম্য ও গণতন্ত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অবস্থান থেকে। এই অবস্থানেও গুটি কতক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের প্রয়োজন হবে। এই প্রয়োজনটা হচ্ছে সাধারণ মানুষেরা, শ্রমজীবীরা যাতে স্বেচ্ছাচিন্তনভাবে সংগঠিত হয়ে নিজেদেরই উদ্যোগে এই নতুন সমাজব্যবস্থা স্থাপনের দিকে এগিয়ে আসতে পারে তার প্রাথমিক প্রস্তুতির জন্য।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাপনার একই অন্তর্নিহিত মূল বিরোধ হচ্ছে বাজ্জনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ‘গোষ্ঠীতন্ত্রের’। রাজ্জনৈতিক স্তরের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের একটা করে ভোট প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য। অর্থনৈতিক স্তরের মূল কথা হচ্ছে বাজার। এই বাজারে ‘ভোট’ হয় ব্যালট কাগজ দিয়ে নয়, টাকা দিয়ে। ফলে, যে মুষ্টিমেয়র বছরে ১০০ কোটি টাকা আয় হয় তাদের প্রত্যেকের ভোট ১০০ কোটি করে, বাকি অধিকাংশের যাদের আয় বছরে ৫ হাজার টাকারও কম তাদের প্রত্যেকের ভোট ৫ হাজারেরও কম করে। ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কর্তৃত্ব থাকে মুষ্টিমেয় মানুষের। তারাই উৎপাদনী সম্পদের মালিক এবং এই উৎপাদনী সম্পদকে তারা ব্যবহার করে পুঁজি হিসাবে সবচেয়ে বেশি মুনাফা করার জন্য। সবচেয়ে বেশি মানুষকে সম্পত্তিহীন মজুরে পরিণত করে তাকে শোষণ করার জন্য।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে রাজ্জনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্রের বিরোধ পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। তারই ফলে, প্রতিনিধিমূলক বাজ্জনৈতিক গণতন্ত্র প্রায়শই পরিণত হয় শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রে। সেখানে পাঁচ বছরে একবার নির্বাচনে ভোট দেয়া ছাড়া সাধারণ নির্বাচকদের আর কোন রাজ্জনৈতিক ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ কারণে অগ্রসর দেশে এবং পিছিয়ে থাকা দেশের সংগঠিত শিল্প ও ব্যাঙ্ক, সরকারি প্রশাসন, শিক্ষক ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মীদের অবস্থা

বাকিদের তুলনায় কিছুটা উন্নত রাখা হয়। ফলে ঐ সব অন্যান্য দিকে অগ্রসর সংগঠিত কর্মীদের মধ্যে একটা ঝোঁক সৃষ্টি হয় চলতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই নিজেদের মানিয়ে নিতে। আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে। অগ্রসর এবং অনগ্রসর এই উভয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে নয়। সাধারণ মানুষদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে একটা অগ্রসর অংশকে চলতি ব্যবস্থার মধ্যেই সন্তুষ্ট রাখার ব্যবস্থাও চলতি পুঁজিবাদী সমাজের হাজারো রকমের বিকৃতি সত্ত্বেও এখনও বেঁচে থাকার একটা মূল কারণ।

পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিকল্প : একটা সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা
চলতি পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিরোধিতা বহুমাত্রিক। বহু দিক থেকে, এমনকি অনেক সময় পরস্পর বিরোধী দিক থেকেও এই বিরোধী শক্তিগুলি মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে। কোন বিরোধী ধারার মূল কথা হয়ত ‘প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা’। কারুর কাছে মূল কথা দেশীয় শিল্প-ব্যবসার ব্যবস্থাপনায় WTO বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। কারুর কাছে মূল কথা হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ বা খাদ্যের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা। কোন বিরোধী পার্টির কাছে মূল কথা ক্ষমতাশীল পার্টির বদলে তার ক্ষমতায় যাওয়া। কারুর কাছে মূল কথা দেশের শিল্পায়ন। কারুর কাছে মূল কথা মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কারুর কাছে মূল কথা শিশু শ্রম বন্ধ করা এবং তার জন্য শিশুশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য বয়কট করা। একই রকম ভাবে দূষণ সৃষ্টিকারী উপাদান বা উৎপাদন পদ্ধতিতে তৈরি পণ্য বয়কট করা। কারুর কাছে মূল কথা হলো সব কাঁচা জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এই ধরনের আরও অনেক ধারা ক্রমাগত সৃষ্টি হয়ে চলছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চলতি পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নানাবিধ বিকৃতির মোকাবিলা করার জন্য।

বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে এর অনেকগুলি বিকৃতিরই আংশিক সমাধান চলতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই করা সম্ভব। ফলে, ঐ সব আন্দোলনকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখলে, এর অনেকগুলিই কিন্তু বাস্তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে শক্তি হিসাবেও কাজ করতে পারে, এবং মনে হয় এখন কেউ কেউ করছেও। সব থেকে লক্ষণীয় হচ্ছে যে এই কাজগুলি করা হচ্ছে যত বেশি সম্ভব ‘জন উদ্যোগ’ সৃষ্টি করে। আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের যত বেশি সম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করে। চলতি সমাজব্যবস্থার মধ্যেই বেশ কিছু “উপকার” একেবারে তৃণমূল স্তরে সম্ভব করে, সাধারণ মানুষের মধ্যে চলতি সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে —এবং তাই চলতি বিশ্বায়ন সম্বন্ধে—মোহ সৃষ্টি করছে। চলতি সমাজব্যবস্থাকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখার শক্তি হিসাবে সাধারণ মানুষকে জমায়েত করছে।

অনেক সময়েই বিশ্বায়নের পক্ষের শক্তির আনুকূল্যে পাওয়া সাহায্য নিয়ে উপর থেকে আসা নানারকম ইঞ্জেকশন বা ঔষধের বড়ি গর্ভবতী মা ও শিশুদের দেয়া :

শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করা ; নিজেদের সক্ষম এবং অনেক সময় তার সঙ্গে সরকার ও ব্যাঙ্কের সাহায্য মিলিয়ে বিভিন্ন “স্ব-নির্ভর” দলের পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করা ; অনেক সময়ে বিদেশে রপ্তানির জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বর্জিত কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ দেয়া ; বিজ্ঞান ও কলা-কৌশলের অগ্রগতি সম্বন্ধে জন-চেতনা সৃষ্টি করা ; এই সব ধরনের সরকারের বিভাগীয় স্কিমকে সমন্বিত করে ও জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা করা ; নির্বাচনে মেয়েদের এবং বঞ্চিত সম্প্রদায়গুলির আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ; আমাদের মত পিছিয়ে রাখা দেশও যাতে খোলা বাজারে বহুজাতিকদের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অগ্রগী হয় তার ব্যবস্থা করা—ইত্যাদি ধরনের সব স্কিমগুলিই আলাদা আলাদাভাবে এবং একত্রে চলতি বিশ্বায়নের পক্ষেই সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করতে চেষ্টা করে।

এর বিকল্প অর্থাৎ চলতি বিশ্বায়ন বিরোধী জনমত সৃষ্টির পথের শুরু কিন্তু ঐ স্কিমগুলিকে বরবাদ করার মধ্য দিয়ে নয়। শুরু হতে হবে ঐ স্কিমগুলির সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারা দিয়ে। এই সীমাবদ্ধতা বুঝবার সর্বপ্রথম ধাপ হচ্ছে শ্রমজীবীদের বুঝতে পারা যে বাইরের সব রকম সাহায্য বাদ দিয়ে তাদের নিজেদের গ্রামে বা কারখানায় বা শহরের মহল্লায় তাদের নিজেদেরই যে বস্তুগত সম্পদ আছে তাকে টেকসইভাবে ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজনীয় কি কি বস্তু এবং সেবা সৃষ্টি করা সম্ভব। এখানে তিনটি বিষয়ে নজর দেয়া দরকার। প্রথমটি হচ্ছে : প্রাথমিক বুঝবার এলাকা হচ্ছে নিজেদের গ্রাম বা কারখানা বা শহরের মহল্লা। এই এলাকাগুলি হচ্ছে এমন যাতে এলাকার সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ একত্রে বা প্রয়োজনে ২/৩ ভাগে গ্রাম বা শহরের পাড়ায় বা কারখানার বিভাগ ধরে ধরে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে পারে। দ্বিতীয় হচ্ছে : প্রাথমিকভাবে এটা ধরে নেয়া যে—এলাকার সব বস্তুগত সম্পদ (শ্রমশক্তি, জমি, জল, গাছপালা, যন্ত্রপাতি, কারখানা, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি) এলাকার সব মানুষের যৌথ বা সমবায়গত সম্পদ ; ফলে ঐ সম্পদের ব্যবহারের ধরন এলাকার মানুষরাই ঠিক করতে পারে। তৃতীয় হচ্ছে : সমস্ত উৎপাদনই হচ্ছে মূলত এলাকার মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ (অর্থাৎ অন্য এলাকার সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে) প্রয়োজন মেটানোর জন্য, কোন ব্যক্তি বিশেষের মুনাফা সৃষ্টির জন্য নয়।

এই যা বস্তুগত ভাবে সম্ভব, তার সঙ্গে তুলনা করতে হবে এখনকার অবস্থায় যা হয় বা হয়ে চলেছে সেই চলত বাস্তবে। এই আত্ম-নির্ভরশীল ভাবে এবং টেকসইভাবে ‘কি সম্ভব’ থেকে ‘এখন যা হয়ে চলেছে’ তার ফারাকটা উপলব্ধিই হচ্ছে চলতি পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন যে কতখানি সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে তা সাধারণ মানুষের বুঝতে পারার সবচেয়ে সহজ উপায়।

এই আত্মনির্ভরশীল ভাবে, আমাদের নিজেদেরই বস্তুগত ভাবে যা এখনই আছে

তাকে টেকসইভাবে ব্যবহার করে আমাদের সকলের কতটা প্রয়োজন মটান সম্ভব, এবং চলতি বাস্তবের কোন্ কোন্ সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারলে ঐ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়া যায় এই উপলব্ধিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শক্তি যা দেশের শ্রমজীবীদের এগিয়ে চলার, দিশার, দিকের সন্ধান দেবে। এই দিশা স্থির হবার পর তখন সহজ হবে বেছে নেয়া চলতি কোন্ কোন্ স্কিম আমরা কি ভাবে ব্যবহার কবতে পারব আমাদের চলার দিককে ঠিক রেখে। চলতি বিশ্বায়নের বিকল্প সৃষ্টির পথে এগুতে পারব।

এলাকা ধরে ধরে এইভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন বিরোধী চেতনা ও সংগঠন সৃষ্টির পরিপূরক হচ্ছে চলতি আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রকেও ব্যবহার করা এবং রূপান্তরিত করা। চলতি গণতন্ত্রের চেহারা হলো পাঁচবছরে একদিন বিভিন্ন পার্টির বেছে দেয়া প্রার্থীদের একজনকে ভোট দেয়া, এবং নির্বাচিত সভ্যের পাঁচ বছরের বাকি দিনগুলির বড়জোর ১ থেকে ৫% দিন এলাকার মাতব্বরদের সঙ্গে কথা বলা এবং এলাকায় খরচের জন্য তাকে যে টাকা দেয়া হয় তার মাধ্যমে এলাকার কিছু লোককে খুশি রাখা। এই অ-ব্যবস্থার একটা প্রতিকার পিছনের দিকে হটে গিয়ে নির্বাচন তুলে দিয়ে রাজতন্ত্র বা অন্য কোন রকম একনায়কত্ব স্থাপন করা। এর বিকল্প হলো, সর্বনিম্নস্তরের এলাকার—গ্রামের, শহরের, মহল্লার, কারখানার—সংগঠিত সর্বসাধারণের হাতে যতদূর সম্ভব বেশি ক্ষমতা দেয়া স্থানীয় প্রকল্প-রচনা এবং বাস্তবে রূপায়ণ করাব জন্য। সর্বনিম্নস্তরের নির্বাচকগোষ্ঠী (আমাদের রাজ্যে গ্রাম-সংসদ এবং মিউনিসিপালিটির ওয়ার্ড) সকলে মিলে একটা সচেতন সংগঠন সৃষ্টি করে চলতি গণতন্ত্রকে একই সঙ্গে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবে। এই সর্বনিম্ন স্তরের সংগঠিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশকে হতেই হবে প্রত্যক্ষ শ্রমজীবী, ঠিক যেমন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যত বেশি উপরের স্তরে উঠবেন তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ শ্রমজীবী তত কম হবে, বা হয়ত কেউই শ্রমজীবী হবেন না।

শ্রমজীবীকেন্দ্রীয় এই জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ এলাকার বস্তুগত সম্পদের 'বর্তমান ব্যবহার', এবং আগেই আলোচিত, 'যে ব্যবহার সম্ভব' তার পর্যালোচনা সহজ। এই পর্যালোচনা তাদের স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে বাধ্য যে সম্পদের বর্তমান মালিকানা ব্যবস্থা এবং তার ফলে মালিকদের মুনাফার জন্য সম্পদের ব্যবহারের ফলে কিভাবে (১) বিশাল সম্পদকে ব্যবহার করতেই পাবা যায় না ; (২) যেটুকু ব্যবহার হয় তার মধ্যেও অপ-ব্যবহারের অংশ কত বেশি, এবং ফলে (৩) চলতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শুধু যে অ-সাম্যের সৃষ্টি করে জাতীয় আয়ের অধিকাংশকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত করে তাই নয়, এই পদ্ধতি জাতীয় আয় বস্তুগতভাবে যতখানি হওয়া সম্ভব তাকে সেই স্তরে পৌঁছতে না দিয়ে সম্পদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার অপদার্থতাকে জনমানসে স্পষ্ট করে তুলবে। সংগঠিত মানুষদের, বিশেষ করে শ্রমজীবীদের চেতনা যদি এই স্তরে আসে, তবে বর্তমানের মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের রাজত্ব, অর্থাৎ পুঁজির কর্তৃত্বের দিন যে শেষ

হয়ে আসবে এবং সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনের দিকে শ্রমজীবীরা যে এগিয়ে যেতে পারবে সে বিষয়ে যথেষ্ট নিশ্চয়তা আশা করা যায়।

সংগঠিত শ্রমজীবীদের নিজ নিজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাদের সচেতন করবে যে ভবিষ্যতের সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা শুধু শ্রমজীবীদের নয়, সমগ্র দেশ ও দুনিয়াকে চলতি পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের অ-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দেবে। বিশেষ করে গত দুই দশক ধরে অন্যান্য কলা-কৌশলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে তা প্রত্যেকটি স্থানীয় চেতনাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনায় রূপান্তরিত করতে পারবে। মুষ্টিমেয় বহুজাতিকদের কর্তৃত্বে থাকা পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের চলতি প্রভুত্ব অবসানের পথে এগুবে। দেশ-দুনিয়ার শ্রমজীবীদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে থাকা সাম্যবাদী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হবে। অগ্রসর এবং পিছিয়ে রাখা এই উভয় অংশের শ্রমজীবীদের একত্রে এগুনা সম্ভব হবে। গত বছরের ১৮ই জুলাই ইটালির জেনোয়া শহরে বিশ্ব কর্তৃত্ব প্রয়াসী জি-৮ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনের বিরুদ্ধে লড়াইতে প্রথম শহিদ ইটালির শ্রমজীবী কার্লো জিওলানি এই যৌথ আন্দোলনের প্রতীক হয়ে থাকবেন।

এই যৌথ আন্দোলন পিছনের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য নয়। এই আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীরা চলতি বা আগের যুগের মত কতিপয় বীর বা কোন অগ্রগামী বাহিনীর পিছনে সামিল হওয়া অর্ধচেতন মানুষেরা নয়। আন্দোলনের মাধ্যমে সামনের দিকে টেকসই ভাবে এগিয়ে চলার জন্য চলতি সামাজিক অব্যবস্থার পূর্ণ রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন হবে এমন ধরনের সচেতন সংগঠন যা—নয়ত প্রাথমিক ভাবে বাইরের কিছুটা সাহায্য নিয়ে—নিজেরাই নিজেদের চালনা করতে সক্ষম। এই সক্ষমতার একটা প্রকাশ হবে তাদের নির্বাচিত নেতারা যাতে শ্রমজীবীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে মাতব্বরে পরিণত না হন তার ব্যবস্থা করতে পারার মধ্যে। এরই অন্য প্রকাশ হবে প্রতিটি এলাকায় সবচেয়ে বেশি মানুষকে শ্রমজীবীদের পাশে জমায়েত করে, সকলের স্বার্থে এলাকায় যা যা পরিবর্তন দরকার তাকে বাস্তবায়িত করতে। এলাকার মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ যদি এই পরিবর্তনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তবে সেই বাধাকে অতিক্রম করতে। এটা প্রয়োজন হবে এলাকাগতভাবে। দেশগত ভাবে। দুনিয়াগতভাবে।

পুঁজির অন্তর্নিহিত বাধ্যবাধকতা আছে ক্রমাগত কেন্দ্রীভবনের দিকে এবং তার ফলেই আজকের এই চলতি বিশ্বায়ন। এই বিশ্বায়নকে অতিক্রম করে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মূল উপায় হলো পুঁজিকে অতিক্রম করা, সমাজকে পুঁজির আধিপত্য থেকে মুক্ত করা, এবং তাব মাধ্যমে সংগঠিত শ্রমশক্তির আধিপত্য স্থাপন করা।

এই শ্রমশক্তির আধিপত্য স্থাপনেরও একটা অন্তর্নিহিত বাধ্যবাধকতা আছে। এটা হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তির, সব সামাজিক সিদ্ধান্ত নেবার শক্তির সবচেয়ে বেশি বিকেন্দ্রীকরণ। কারণ একমাত্র এই অবস্থাতেই সংগঠিত শ্রমশক্তি প্রত্যক্ষভাবে নিজের আধিপত্য স্থাপন

করতে পারে। সমাজে যত ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে সিদ্ধান্তগুলি গড়পড়তা গ্রামে, শহরের মহল্লায় বা কারখানায় নেয়া সম্ভব সেগুলি ঐ সর্বনিম্ন এলাকার বিষয় হবে। বাকিগুলির মধ্যে যেগুলি পরের স্তরে—ধরা যাক ব্লক বা পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে—সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব সেগুলি হবে ঐ স্তরের বিষয়। এই ভাবে গ্রামে, ওয়ার্ড, ব্লক, জেলা, রাজ্য এবং কেন্দ্রে ক্ষমতার ভাগ হবে। সর্ব-নিম্ন স্তরকে মূল ভিত্তি করে এই যে বহুস্তরবিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামো এই ভাবেই সম্ভব পুঞ্জির আধিপত্য এবং তাই চলতি বিশ্বায়নের আধিপত্য বরবাদ করে শ্রমজীবীদের আধিপত্য স্থাপন করা। এই ধরনের রাষ্ট্রেই সম্ভব হবে বিকেন্দ্রীকরণকে এগিয়ে নিয়ে তৃণমূল স্তরের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর হাত যাতে উপরের স্তরে পাঠানো তার প্রতিনিধিদের নিজেদের আয়ত্বে রাখতে পারে—তার ব্যবস্থা করতে।

এই ধরনের রাষ্ট্র কাঠামো হয়ত প্রথমে দুনিয়ার একটি বা কয়েকটি দেশে স্থাপিত হবে। কিন্তু এই ধরনটা যদি দ্রুত অন্যান্য দেশে—বিশেষ করে অগ্রসর দেশগুলিতে ছড়িয়ে না পড়ে তবে শুধুমাত্র ২/১টি দেশে এই ধরনের রাষ্ট্রের স্থায়িত্বকে নিশ্চয়তা দেয়া যাবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সমগ্র দুনিয়ার সামনে আজ চলবার দিশা হচ্ছে চলতি পুঞ্জিবাদী বিশ্বায়নকে দুনিয়া থেকে দূর করে দিয়ে, যত দ্রুত সম্ভব সমগ্র দুনিয়াব্যাপী শ্রমজীবীভিত্তিক বিকেন্দ্রীক রাষ্ট্রসমূহের একটা আন্তর্জাতিক সমবায় স্থাপন করা।

বিশ্বায়ন : বিজ্ঞান ও কৌশল

বিশ্বায়ন : বিপন্ন ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তা । রূপজিৎ চৌধুরী

বিশ্বায়ন ও আমাদের ছেলেমেয়েরা । স্নিগ্ধা সেন

বিশ্বায়ন, পরিবার ও আমরা । পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বায়নের অশুভসঙ্গে সম্প্রদায়ের প্রাথমিক প্রত্যয় । রূপা দত্ত

শিক্ষা ও বিশ্বায়ন : কিছু বিক্ষিপ্ত কথা । ইরাকতী মিরে রহমান

বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা । শামিম আহমেদ

তৃতীয়

বিশ্বায়ন : বিপন্ন ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তা

রণজিৎ চৌধুরী

বিশ্বায়নের যে অগ্রগতি বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। অনেক সমাজ বিজ্ঞানী মনে করেন এর আরম্ভ হয়েছে শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশে বিশ্বায়নের এক অস্পষ্ট চেহারা দেখা যায়। শিল্প বিপ্লব থেকে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশের উৎপত্তি। প্রযুক্তি তার বাহন ছিল। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আসতে থাকে। প্রযুক্তির প্রভাব কেবল যে উদ্যোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে দিয়েছে এমন নয়, গোটা অর্থনীতির রূপ ভয়ানকভাবে বদলে দিয়েছে। এই বিষয়ে মার্ক্স-এর ধারণা ছিল খুব পরিস্কার। তিনি Capital-এ লিখেছেন—

Hand in hand with the centralization (of capital)...develop, on an ever-extending scale.. the entanglement of all peoples in the net of the world-market, and with this, the international character of the capitalistic regime. Along with the constantly diminishing number of the magnets of capital, who usurp and monopolize all advantages of this process of transformation, grows the mass of misery, oppression, slavery, degradation, exploitation...

রাজনীতিতেও তার প্রভাব দেখা যায়। যেমন সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সংশয়ের কারণ বহু বিস্তৃত। প্রযুক্তি সব দেশের অর্থনীতিকে একই রূপে গড়ে তুলছে। লক্ষ্য ঐশ্বর্য তৈরি করার চেষ্টা। সমাজে প্রযুক্তির প্রভাব সর্বাঙ্গিক আকার নিয়েছে। ব্যক্তির মূল্যবোধ এবং সামাজিক মূল্যবোধ প্রযুক্তির প্রভাবে এক গভীর পরীক্ষার সম্মুখীন। সমাজধর্ম এতদিন সমাজকে যে-ভাবে ধরে রেখেছিল বিশ্বায়নের এবং প্রযুক্তির প্রভাবে সে বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। সমাজ পরিবর্তনের যে ইঙ্গিতগুলি লক্ষ্য করে আমরা এমন কথা বলি সে ইঙ্গিতগুলিকে ভালভাবে বোঝার দরকার আছে। সমাজে সে শক্তিগুলির উৎস কোথায়, তাদের চরিত্র কি রকম, তাদের প্রভাব কি ভাবে কাজ করছে,—এ সব পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ দরকার।

আরম্ভ করা যাক বিশ্বায়ন বলতে আমরা কি বুঝি। বিশ্বায়ন মূলত এক অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিক এবং মানবিক ব্যবস্থা, যার মৌলিক উপাদান তৈরি হয় বহুজাতিক সমন্বয়ে এবং সংঘাতে। যা বিশ্বের সব প্রান্তের প্রাকৃতিক সম্পদকে আয়ত্তে আনে, সেই সঙ্গে প্রসারিত বিশ্ববাজারকেও শাসন করে, এক বাজারি সংস্কৃতি তৈরি করে, সেই সংস্কৃতিতে ব্যক্তির পরিচয় থাকে না। ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাস্তবরূপে এটা হলো উন্নতদেশের

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সমগ্র বিশ্বের সম্পদ এবং বাজারকে করায়ত্ত করার এক জটিল কৌশল যা ওরা প্রযুক্তি এবং মানবিক কলাকৌশলের মাধ্যমে অর্জন করে। ধীরে ধীরে বিশ্বের দেশগুলি তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারাতে থাকে। এটা গভীর এবং সর্বাত্মক। এই পরিবর্তনের মুখে মানবিক মূল্যবোধগুলি ভেঙেচুরে যান্ত্রিক রূপ নিচ্ছে। মানুষের মূল্যবোধগুলি কি ভাবে যান্ত্রিক হয়ে উঠে তার সম্যক পরিচয় দেওয়া কঠিন। কিন্তু এটা সত্যি যে যন্ত্রের প্রভাবে মানুষ ক্রমে যান্ত্রিক হয়ে উঠে। প্রযুক্তি যখন প্রবল হয়ে মানুষকে শাসন করে মানুষ তখন প্রযুক্তির হাতে যন্ত্র হয়ে উঠে। মানুষ তখন এক অচেতন সত্তা হয়ে পড়ে। মানুষের অজান্তে কখন অচেতন সত্তা চেতন সত্তাকে দাবিয়ে দেয়। এটা মানুষের মনের এক প্রত্যক্ষ রূপান্তর। ব্যক্তির মন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমাজ-মনের অধীন হয়। সমাজ যখন যুক্তি এবং নীতি হারিয়ে ফেলে তখন অচেতন বড় হয়ে চেতনকে ঘিরে ফেলে।

অচেতন সত্তা বড় হয়ে পড়ে যখন ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব হারায়। ব্যক্তির মধ্যে যখন পরস্পর সম্পর্কের প্রাণের সজীবতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন একরকম বিচ্ছিন্নতাবোধ কাজ করে। যেটাকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে ভুল হয়। ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ অচেতনের কাছে নিজেকে কখন সঁপে দেয়। মনে রাখা দরকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক কাজ করে, এক অন্তর্লীন প্রাণের প্রবাহ থাকে। ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার মধ্যেও স্বাভাবিক পরস্পর যুক্ত সামাজিক-সম্পর্ক খুঁজে পায়। কিন্তু ব্যক্তি যখন বিচ্ছিন্নতাবোধে পীড়িত হয় তখন সামাজিক বাঁধন আলগা হয়ে যায়। ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধের যে লক্ষণগুলি আমরা দেখতে পাই তাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। এটা ঠিক যে এই মানবিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত ঘটনা নয়। কিছুটা বোঝা যায়, পুরোটা নয়।

এটাকে দ্রুত করে দিয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর নিশ্চয়বাদী নিউটনীয় বিজ্ঞান এবং দর্শনের ক্ষেত্রে মীমাংসার নিশ্চয়বাদী সূত্র। বলা যায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ ভাবতো তার পার্থিব এবং অপার্থিব জীবন ছিল জৈব সম্পর্কে প্রকৃতির সঙ্গে বাঁধা। তাতে প্রাণের আবেগ ছিল। তখন মানব জীবন ছিল ছোট ছোট গোষ্ঠীবদ্ধ। পরস্পর নির্ভরশীল ছিল সেই সমস্ত গোষ্ঠী। বনম্পতি, ওষধি, পশু, পক্ষী সবের সঙ্গে ছিল প্রাণের যোগ। এই সত্য যেমন ভারতীয় বিজ্ঞানে এবং দর্শনে অনুভূত হয়েছিল, তেমনি পাশ্চাত্য দর্শনে এবং বিজ্ঞানেও সেই সত্য অনুভূত হয়েছিল। অসীম রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান ভেবেছে সর্ব প্রাণময় জগৎ। দর্শনে শ্বেতাস্থতর উপনিষদ ভেবেছে সর্বব্যাপিনমু আত্মানম। কোপারনিকাস জগতকে ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের (heliocentric) পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন জগত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র নয়। এক ধরনের ব্রহ্মজিহ্বাসা কেপলারের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। কোন অনন্ত ব্রহ্মের এক কোণায় জগত এবং ব্যক্তি রয়েছে কে তার সন্ধান জানে। সে রহস্য কেপলার এবং কোপারনিকাস দুজনকেই আন্মত করেছে।

নিউটন (১৬৪২) এসে বিজ্ঞানে এক যান্ত্রিক নিশ্চয়বাদ নিয়ে এলেন। প্রকৃতির উপর, প্রাণের উপর বিজ্ঞানের আধিপত্য বসাতে চেষ্টা করলেন। অঙ্কের মাপে সব কিছুকে বুঝতে চেষ্টা করলেন তাঁর *Mathematical Principles of Natural Philosophy* পুস্তকে। ছোটভাবে যাকে বলা হয় *Principia* তা বহির্বিশ্ব এবং অন্তর্বিশ্বের সব কিছু অঙ্কের মাপে বুঝতে চেষ্টা করেছে। সব ঘটনা কার্য-কারণে আবদ্ধ, কারণের দ্বারা ফল তৈরি হয়। কার্য, কারণ এবং ফল মিলে নির্ধারিত ভবিষ্যতকে আরোপিত পথে নিয়ে চলে এমন মনে করা হয়। নিশ্চয়বাদ বিজ্ঞানকে এমনি নির্ধারিত গতির সন্ধান জানায়। নিউটনীয় গতিবাদ অঙ্কের নিয়মে অণুর প্রবাহ বুঝতে চেষ্টা করে, যা যন্ত্রের মতো কাজ করে। নিউটনের কাছে প্রকৃতিও সেই যন্ত্রের অংশমাত্র। সেই যান্ত্রিক নিয়ম দিয়ে নিউটন আমাদের সাথে বিশ্বের পরিচয় করিয়েছেন।

মানুষকে তেমনভাবে প্রায় যন্ত্রের মতো বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গেলো। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব সেই অর্থে নিউটনীয় নিশ্চয়বাদী মনস্তত্ত্ব। মানুষের মনের সঙ্গে কতক বাহ্যিক উপাদান এবং লক্ষণ যুক্ত করে এক নির্ধারিত পথে মনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলে। উপাদান এবং লক্ষণগুলি অঙ্কের নম্বরের মতো চিহ্নিত করা হয়। মনস্তত্ত্ব সেই কারণে বিজ্ঞান বলে মান্য হয়েছে যা নিউটনীয় বিজ্ঞানের মতো অঙ্কের প্রবৃত্তি বাঁধা যায়।

শিক্ষা, যার সঙ্গে মূল্যবোধের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, ধীরে ধীরে প্রশিক্ষণের এক বিশেষ ধাঁচায় পর্যবসিত হয়েছে। শিক্ষা আর প্রশিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য ঘুচে গেলো। শিক্ষার ভিতর যান্ত্রিকতা এক বড় স্থান অধিকার করলো। শিক্ষায় যান্ত্রিকতা এসে ব্যক্তিকে এক নতুন ছাঁচে গড়তে লাগলো। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এক ভিন্ন মাপকাঠিতে পরীক্ষা হতে লাগলো। সে পরীক্ষা *standardization* বা সমমান অর্জনের পরীক্ষা। ব্যক্তির লক্ষ্য যতটা পারদর্শিতা লাভ করা নয়, তার চেয়ে বেশি সম্মান লাভ করা। পোষাকে, খাদ্যে, বাসস্থানে, নাচে, গানে, অভিনয়ে, অন্য সংস্কৃতির প্রতীকে, এক কথায় জীবনের প্রায় সব দিকে, সম্মান লাভ করা ব্যক্তির অজান্তে কখন আরাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে সমমান বাজার এবং উপভোক্তা তার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে।

সেই সঙ্গে সমাজের বাঁধন ভাঙতে শুরু করেছে। সমাজ থেকেও মানুষ মুক্তি পেতে চায়। মানুষ মুক্তির জন্য ব্যগ্র। সমাজের শাসন কমেছে। কিন্তু এক সর্বাঙ্গিক নিয়ন্ত্রণ এসে মানুষকে আরো কঠোরভাবে শৃঙ্খলিত করেছে। এই নিয়ন্ত্রণ অদৃশ্য। কিন্তু ভয়ানক সত্য। অর্থনীতিতে এই শৃঙ্খল সব চেয়ে নির্দয় রূপ নিয়েছে। এতে এক ভয়ঙ্কর সর্বাঙ্গিক অমানুষিক শোষণ এবং শাসন তৈরি হয়েছে। এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। এই শ্রেণী মালিক, ম্যানেজার এবং যন্ত্রতত্ত্ববিদদের যৌথ শ্রেণী। এই তিন স্তরের শ্রেণীর যৌথ স্বার্থ ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই নব্য শ্রেণীস্বার্থ এবং বহুতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্বায়নকে নতুন রূপ দিয়েছে। মূলত এটা ধনতান্ত্রিকতায় বর্ধিত রূপ। Herbert Marcuse তাঁর *One Dimensional Man* পুস্তকে লক্ষ করেছেন—

The capabilities (intellectual and material) of contemporary society are immeasurably greater than ever before—which means that the scope of society's domination over the individual is immeasurably greater than ever before.

এই শ্রেণীস্বার্থ সমকালীন অর্থনীতি এবং বৃহত্তর সমাজকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। ব্যক্তিসত্তা এখানে অসহায়।

মানুষ মুক্তির দর্শন শিখেছে, কিন্তু মুক্তিকে অর্জন করতে পুরোপুরি পারে নি। মানুষ আজ বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত। যারা মানুষকে বন্দী করেছে তারা জেলখানায় মানুষকে বন্দী করে নি। কিন্তু প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে মানুষ অনুভব করছে তারা শৃঙ্খলিত। Franz Kafka যেমন তাঁর Trial বইতে অনুভব করেছেন সকালবেলায় হঠাৎ ফোনের ডিটর দিয়ে খবর এলো একজন বন্দী। এটা এক আশ্চর্য অনুভব। যখন সেই অনুভব এলো তখন সে ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে জেলখানার যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলো। তখন সমস্ত পরিবেশ অসহ্য হয়ে গেছে। জেলখানা সত্যি বলে যন্ত্রণা কম। জেলে পুলিশের উপস্থিতি জানিয়ে দেয় সে বন্দী। যখন সত্যিকারের জেল নেই, মনে হয় আমরা মুক্ত, কিন্তু মুক্তির কোন লক্ষণ নেই, সত্যিকারের কোন পুলিশ নেই। অথচ স্বাধীনতা নেই, সে যন্ত্রণা অনেক ভয়াবহ। চূড়ান্তভাবে মানুষ তখন অসহায় হয়ে পড়ে। কোন বিচারালয়ে তার বিচার হয় না। কোন কানুন তাকে সেই বন্দিদশা থেকে বাঁচাতে পারে না। এক বোবা যন্ত্রণা শুধু জীবনকে পীড়িত করে।

এই যন্ত্রণা মূলত দমন থেকে আসে। যে দমন সর্বাঙ্গিক। যে দমন বিশ্বায়ন থেকে, বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থেকে আসে। বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ গুটি কয়েক প্রতিষ্ঠানের হাতে। দেশে দেশে এ নিয়ন্ত্রণ গাছের শেকড়ের মতো অদৃশ্যভাবে মানুষের অজান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সে নিয়ন্ত্রণ অনেক দূব, অনেক গভীর, বহুরাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় স্তরের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানকে কিনে নেয় বা নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এতদিন জাতীয় অম্লে, জাতীয় জলবায়ুতে বড় হয়েছে। বহুরাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো এসে ধীরে ধীরে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের শেকড়ের সঙ্গে শেকড় জড়ো করে পরগাছার মতো নতুন বলে বলীয়ান হয়ে প্রত্যেক জাতির উপর বহুভাবে নিয়ন্ত্রণ কায়ম করতে শুরু করেছে। আবার জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বহুরাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলে গিয়ে নতুনভাবে ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে এমন মনে করে।

আদতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর চেহারা বদলাতে শুরু হয়েছে। তাদের রূপ কি রকম হয়েছে তার সঠিক বর্ণনা সম্ভব নয়। তবে তাদের রূপ বদলাচ্ছে এটা সত্যি। কী রূপ শেষ পর্যন্ত নেবে তার সম্যক পরিচয় এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। কতকগুলো বাহ্যিক সংকেত পাওয়া যায়। যেমন অর্থনীতির ক্ষেত্রে মঙ্গলের ভূমিকা লোপ পেয়েছে। হঠাৎ অর্থনীতিতে অনুদান দেওয়া এক রকম ব্যাভিচার এমন একটা সর্বজনীন মত গড়ে উঠছে। অনুদান বন্ধ করে তার জায়গায় লাভের ভূমিকা বাড়ানো অনেকটা পবিত্র

কাজ এমন মনে করা হয়। শ্রমিককে নির্দয়ভাবে কাজে লাগান নৈতিক সমর্থন পাচ্ছে।

শ্রমিক নির্দয়ভাবে উৎপীড়িত হচ্ছে এটা সকলের জানা। কারখানায় শ্রমিক সংগঠন এখন দ্রুত অস্বীকৃত হচ্ছে। সব দেশে শিল্পপতিদের দাবি যে শ্রমিক অন্যান্য পণ্যের মত খোলা বাজারে কেনাবেচা হবে। শিল্পে শ্রমিকের শিক্ষার মান বেড়েছে। তাদের বেতন হার কিন্তু কমেছে। ছাঁটাই ঘন ঘন হচ্ছে। নারী শ্রমিকদের কাজে লাগাবার প্রবণতা বেড়েছে। মনে হয় নারী মুক্তি অনেক এগিয়ে গেছে। নারীকে ধীরে ধীরে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে এমন মনে হয়। তা থেকে অন্য ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। নারী-পুরুষের সম্বন্ধ অনেকটা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে। মানবীয় সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

নারী মুক্তির কথা দামি। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই পরিষ্কার নয়। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা পেতে গিয়ে তারা কি অন্যান্য শ্রমিকদের মতো উৎপীড়িত নয়? নারী মুক্তি কি ব্যক্তিনির্ভর, না বস্তুনির্ভর? ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং প্রথাগত বন্ধন শেষ হলো, শুরু হলো এক অর্থনৈতিক সম্পর্ক যার কোন সামাজিক রূপ চিহ্নিত করা হয় নি। আইনগত সম্পর্ক তৈরি হলো। প্রথাগত রূপটা বাকি বইলো। সে সম্পর্কের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নারী-পুরুষ সুরক্ষিত বোধ করে না। মানুষ প্রথাগত সম্পর্ক ভাঙলো, কিন্তু পরিবর্তে কোন সুরক্ষিত সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারলো না। ফলে মানুষ স্রোতে ভেসে চলেছে, যে-স্রোতে অনেক মানবীয় সম্পদও ভেসে যেতে লাগলো। সে অন্ধ স্রোতে মানুষ কিছুই রাখতে পারে না। এক বিরাট শূন্যতা দেখা দেয়। মানুষ নাম হারায়, রূপ হারায়, বর্ণ হারায়। তার জায়গায় এক অপরিচিত সত্তা এসে হাজির হয়। সে সত্তাকে চেনা যায় না। চেনার আগে তা পাস্টে যায়। আবার নতুন কিছু আসে। সেটাও চেনার আগে বদলে যায়। সব কিছু অপরিচিত থেকে যায়।

এটা ঠিক যে নারী মুক্তিকে বাদ দিয়ে মানব মুক্তির কথা ভাবা যায় না। কিন্তু নারী মুক্তিকে যদি অব্যক্ত অবোধ একটি আদর্শ হিসাবে ধরা হয় তা হলে সেই আদর্শ ধীবে ধীরে মানুষকে শৃঙ্খলিত করে তুলতে পারে। মুক্তি তখন কেবল একটি উচ্চারিত শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। তার বেশি কিছু নয়। শৃঙ্খলের বদলে শৃঙ্খলাকে ভাঙা হবে। আসবে এক শৃঙ্খলাহীন জীবন। সে জীবন কাম্য হতে পারে না। কারণ শৃঙ্খলার অভাব জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলতে পারে। তার থেকে মুক্তি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মুক্তি অসম্ভব হতে পারে তার অন্য কারণ এই যে শৃঙ্খলাহীন জীবনে পারিবারিক বিরোধ প্রায় ঘটে। পরিবার ভাঙেও। তখন মানুষের অন্তরঙ্গ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সম্পর্ক নিয়ে মানুষ বাঁচে। জীবন অর্থবহ হয়ে উঠে সম্পর্কের মাধ্যমে। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে জীবন বেশি এগোয় না। মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে মানুষ স্বার্থান্ধ হয়ে উঠে। বিশ্ববাজারভিত্তিক যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক নারী-পুরুষকে স্বার্থান্ধ

করে তোলে। ব্যক্তি বাজারভিত্তিক সম্পর্কে কিছুতেই এড়াতে পারে না। বরং বাজার এবং তার নেশা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে। এক ধরনের বাজারি সংস্কৃতি গড়ে উঠে। সে সংস্কৃতি কোন শাস্ত্র মূল্য মানে না। বাজারের নিয়ম অনুযায়ী এক ক্ষণস্থায়ী মূল্য নিয়েই মানব অস্তিত্ব যাচাই হয়। কখন অজান্তে শাস্ত্র মূল্য মন থেকে ঝরে পড়ে। জীবনযাত্রা যন্ত্রের মতো প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

আজকাল কুশল কর্মী জগতে প্রচুর সংখ্যায় তৈরি হচ্ছে। প্রতি বছর প্রযুক্তির বিদ্যালয় থেকে অনেক সমমানের কুশল শ্রমিক ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে। বিভিন্ন কুশল কর্মীর বিশ্ববাজার তৈরি হচ্ছে। শ্রমিক আমদানি-রপ্তানি চলছে। সমমান তৈরির জন্য বিশ্বময় যে-প্রযুক্তির বিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান সময়ের এটা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এরা সবাই বাজারের দিকে চেয়ে থাকে। বাজারি-সংস্কৃতির নুন খেয়ে এরা মানুষ। এদের সঙ্গে প্রাণের কোন যোগ থাকে না। প্রকৃতির সঙ্গে যখন আমরা যোগ হারাই তখন আমরা এক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হই। এ বিষয়ে মার্কস-এর উপলব্ধি মূল্যবান। তিনি Economic and Philosophic Manuscript-এ লিখেছেন—

Nature is man's inorganic body—nature, that is, in so far as it is not itself the human body. “Man lives on nature” means that nature is his body, with which he must remain in continuous intercourse if he is not to die. That man's physical and spiritual life is linked to nature means simply that nature is linked to itself, for man is part of nature.

মার্কস যখনই প্রকৃতির বিষয়ে চিন্তা করেছেন প্রকৃতির রহস্যময় আধ্যাত্মিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষের প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতির উপর মানুষের শাসন চলে না। মানুষের শক্তি নির্ভর করে মানুষ কত সুন্দরভাবে প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে আপোষ করে নিতে পারে।

সমমানের বাজার সংস্কৃতি প্রত্যেক মানুষকে প্রত্যেক মানুষের প্রতিযোগী করে তোলে। প্রতিযোগী মনোভাব ধীরে ধীরে একে অপরের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক তীব্র অবিশ্বাস পরস্পরের মধ্যে কাজ করে। জঁ-পল সার্তর এই পারস্পরিক ভয় সম্বন্ধে বলেছেন—Each man sees in his fellow man the other who is a constant threat to him. এই ভয় মানুষের পিছু ধাওয়া করছে। মানুষ মানুষকে যতটা বন্ধু মনে করে তার চেয়ে অনেক বেশি পরস্পরকে ভয় করে। এ এক অদ্ভুত মানসিকতা। এই মানসিকতার জন্ম হয় প্রতিযোগিতার মধ্যে। সার্তর উপলব্ধি করেছেন—History is the conjunction of alterite (otherness) and alienation. নিজের মধ্যে এক নির্বোধ অন্য সত্তা কাজ করে। বোধি হারিয়ে যায়, আত্মপরিচয় লোপ পায়। মানুষ স্বাভাবিক সত্তা হারিয়ে ফেলে। কৃত্রিম জীবন এসে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা তৈরি হয়। ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তা যেমন দ্রুত বদলে যায়। বর্তমান ব্যক্তির জন্ম হয় প্রযুক্তির আঁতুর ঘরে। সেখানে শাখ বাজে না। সেখানে প্রচুর ইলেকট্রনিক খেলনা যান্ত্রিক শব্দ তুলে ছুটে বেড়ায়। শিশুর সামনে পেছনে থাকে যন্ত্রের খেলনা। সে যন্ত্রের সঙ্গে বড় হয়। যন্ত্রের পুতুলের সঙ্গে

কথা বলে। সেও ধীরে ধীরে যান্ত্রিক হয়ে উঠে। তাই আজ বিপন্ন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, বিপন্ন ব্যক্তিসত্তা।

বিপন্ন ব্যক্তিসত্তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভারতীয় কৃষকের উত্তরোত্তর আত্মহত্যা। ভারতীয় কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়ে কখনও আত্মহত্যা করেছে এ রকম শোনা যায় নি। ঋণ তারা তাদের জীবনযাত্রার একটি অঙ্গ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে পঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, হরিয়ানা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র রাজ্যে বর্ধিত সংখ্যায় কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। আমাদের দেশের বর্তমান আমদানি-রপ্তানি নীতি অনুযায়ী ব্যক্তি কৃষকের পরিবর্তে কর্পোরেশনের স্বার্থরক্ষা সরকারের ঘোষিত নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়া এখন গর্হিত কাজ মনে করা হয়। ফলে ঋণগ্রস্ত কৃষকের বাঁচবার রাস্তা থাকছে না। আত্মহত্যার দিকে তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কৃষিতে শোষণ লক্ষ করে মার্কস লিখেছেন—

All progress in capitalist agriculture is progress in the art, not only of robbing the labourer but of robbing the soil.

বিশ্বায়ন এই শোষণকে অনেক ব্যাপক করেছে। ব্যক্তি কৃষক এখানে তুচ্ছ, ব্যক্তি কৃষকের জীবনও তুচ্ছ। বড় কথা জগতজোড়া মুনাফা। সেই জন্য ব্যক্তি কৃষককে অনুদান দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বাঞ্ছনীয় যারা অনুদান ছাড়া মুনাফা করতে পারবে তাদের কাজ। মুনাফা একমাত্র মানদণ্ড। চোখের সামনে থেকে ব্যক্তি আর ব্যক্তিসত্তা লুপ্ত হচ্ছে। সামনে কেবল নামহীন, পবিচয়হীন হাজার হাজার জনতা। সেই জনতার দেশ নেই, সংস্কৃতি নেই। কোন মূল নেই। ধীরে ধীরে কতগুলো কর্পোরেশন গড়ে উঠছে। জাতীয় নীতি লুপ্ত হবে, জেগে উঠবে বিশ্বায়নের বিশ্বনীতি। ব্যক্তি তারই মাঝে হারিয়ে যাবে।

বিশ্বায়ন ও আমাদের ছেলেমেয়েরা

স্নিগ্ধা সেন

বারীনবাবু বড় চিন্তায় পড়েছেন। চিন্তার কারণ? আজকের দুনিয়ার যা হালচাল তাতে চিন্তিত হবার একশো এক কারণ থাকতে পারে। তবে বারীনবাবুর চিন্তা আপাতত ঘুরপাক খাচ্ছে একটি সমস্যার চারপাশে। তাঁর নাতির স্কুলে যাওয়ার বয়স হলো। এবার স্কুল বাছাই করার এবং পছন্দসই স্কুলে ভর্তি করানোর সমস্যা। এর জন্য পারিবারিক যে বৈঠক পর্যায়ক্রমে চলছে তাতে সমস্যার ত্বরিত সমাধান হবে বলে বারীনবাবুর মনে হচ্ছে না।

নাটিকে নিয়ে বাড়ির সকলের অনেক স্বপ্ন, অনেক উচ্চাশা। এই শৈশব থেকেই তাকে তালিম দেওয়া হচ্ছে একটি ‘বস্তু’ হয়ে ওঠার জন্য, যার গুণমান অত্যুচ্চ। এমন একটি ‘বস্তু’র প্রস্তুতিকালে প্রয়োজনমত নির্দেশ এবং ধারণা যুগিয়ে যাবার জন্য দরকার গুরুশাহী’এর। বারীনবাবুর পরিবারের লোকেরা এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ গুরুশাহী বিবেচনা করছেন সম্প্রতি কেনা রঙিন কেবল্ টি ভি কে। বারীনবাবুর পুত্রবধু শিশুটিকে উৎসাহিত করেন বিদেশি কার্টুন দেখতে, বিদেশের জঙ্গলে বেড়ে ওঠা বিদেশি জন্তুজানোয়ারের নাম এবং চেহারা জানতে, এমন কি ইতিহাস বা বিজ্ঞানচর্চার অনুষ্ঠানগুলিও বিশদভাবে তাকে বোঝানো হয়—যাতে—মানবসভ্যতার বিকাশের পূর্বাপর গতির ধারণা এসে যায় তার মনে। শিশুটির বাবা তাকে ব্যবহারিক শিক্ষা দেন—ইংরেজি উচ্চারণের বিশুদ্ধতায় যেন তার কান তৈরি হয়, চলা ফেরায় যেন ওই বিদেশি শিশুদের সপ্রতিভতা থাকে। শিশুর ঠাকুরমা মানে বারীনবাবুর গিন্নি বলেন—দাদুভাই, এই সব না জানলে না দেখলে তো কুয়ের ব্যাঙটি হয়ে থাকতিস, যেমন আমরা আছি। এই টেলিভিশন যেহেতু দূরের, মানে লক্ষ্যযোজন দূরের বিশ্বকে একটা বাস্তবের মধ্যে এনে দিয়েছে—রিমোট-চাপের নিয়ন্ত্রণের আয়ত্তে—বারীনবাবুর পুত্র পুত্রবধুর কল্পনা এখন ওই বাস্তববদ্ধ বিশ্বচারী।

বারীনবাবু তাঁর এ সম্পর্কে ভাবনা বন্ধু সমর চৌধুরীর কাছে পেশ করলেন—একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে। তাঁর মতামতের মূল্য বাড়িতে কেউ দেয় না।

সমর চৌধুরী বললেন—আজকের পৃথিবীতে সবাই বেচাকেনা বোঝে—সব জিনিষের দাম ঠিক হয় বাজারে তার চাহিদা বুঝে। তোমার কথাবার্তা কেউ কিনছে কি? তবু তো তার দাম হবে।

বারীনবাবু বললেন—আমাদের ছেলেরা মনে কুরে তাদের বাচ্চাদের বাচ্চারের চাহিদা মত তৈরি করতে হবে। আমার বৌমা তো বলেছেন বেশি ঘরোয়া protection দিয়ে মানুষ করলে বড় হয়ে সেই বাচ্চা কেমন যেন দিশেহারা বোধ করে, একটা identity

crisis এ ভোগে অনেকেই। সমরবাবু বললেন—আমার ছেলে তো বলেছে ওদের নাকি আমরা confidence তৈরি করতেই শেখাই নি কখনও। জানো তো এখনকার বিচারে তোমার নিজের যা কিছু তা ভুলতে পারাটাই confidence অর্জন করবার প্রথম ধাপ। এই সেদিন কাগজে বার করেছে—একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একেবারে নোটস দিয়ে একটি-ভাষা (সুপরিচিত ভারতীয় ভাষা এবং সেই প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীর মাতৃভাষা) পাঠ্যবিষয়ের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। অভিভাবকেরা বিস্মিত। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বলছেন ওই ভাষায় পৃথিবীতে লেনদেন চলে না—অতএব তা লেখবার প্রয়োজন নেই। বারীনবাবু বললেন—সাবা বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গেলে তা হলে প্রথম বর্জন মাতৃভাষা। আর কি কি অর্জন বর্জন করা হবে তার লিস্ট তৈরি হয় নি?

সমর চৌধুরীর মনে পড়ল উনি একটা লেখা পড়েছেন কোনও এক বিদেশি পত্রিকায়। লেখক বলছেন—শিক্ষা ব্যবস্থার এবং পাঠ্যক্রমের সংস্কার হোক একথা বলছেন আধুনিক শিক্ষাবিদরা। এই প্রয়োজনকে ভিত্তি করে এক চতুর এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রচারে নেমেছে সে দেশের এক বিশেষ টি ভি চ্যানেল।

শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পরিকল্পিত হচ্ছে—স্কুলে সেই প্রোগ্রাম শোনা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে—বাইরে থেকে দেখলে অত্যন্ত সমন্বিতপন্থা এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর চেষ্টা। কিন্তু চেষ্টার কর্তা হলেন কিছু বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ী স্বার্থ। তথাকথিত শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে বা ওই প্রোগ্রামেই অর্থবহ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যায় ব্যবসায়িক পণ্যের সজ্জার। বিনিয়োগকারীর বিজ্ঞাপন পৌছে যায় target viewer এর কাছে—সুনিশ্চিত ভাবে প্রভাবিত হয় ক্রেতাবাজার। এই যে বিরাট ফাঁদ তৈরি হয় তার অমোঘ টানে হ্যামেলিনের শিশুদের মতো শ্রোতা শিশু এবং তার বিহ্বল পিতামাতা গহুরায়িত হয়। ‘বিশ্বায়িত’ হয় বলাটাই বোধহয় ভাল।

— সমর চৌধুরীর মনে আসছে আরও অনেক কথা। ওঁর একটি বন্ধুকন্যা সম্প্রতি চাকরি নিয়েছে এক বিদেশি ইউনিভার্সিটির রিক্রুটিং অফিসার হয়ে। তার কাছে উনি শুনেছেন এখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে ছাত্র নিয়ে ও দেশের ক্লাসরুম ভর্তি করা হচ্ছে। অবশ্যই স্কলারশিপ দিয়ে নয়, মাইনে নিয়েই। কাগজে কাগজে ফলাও বিজ্ঞপ্তি এই সুযোগের, প্রশস্তি বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থার। কি অটেল সুবিধে বিদ্যাচর্চার সেখানে। উন্নত প্রযুক্তির কি অবশ্য প্রয়োগ সেখানে! ছাত্র-ছাত্রীরা টোপ গেলে—গিলতে চায়। বাবা মাদের আর্থিক অসুবিধে তাদের হীনমন্যতার কারণ হয়। তবে এ ধরনের “উদার” সুযোগ তো ভুলবেসে দেওয়া হয় না—দেওয়া হয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। লাভের ঘরে সংখ্যাটি নিম্নমানের হলে বিনিয়োগকারী ব্যবসা গুটোতে চান। সমর চৌধুরীর বন্ধুকন্যা ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দাদের সুযোগ-ক্রয়ক্ষমতা সম্বন্ধে খুব আশাবাদী নয়। সমরবাবু মেয়েটির লাকবির ভবিষ্যত সম্বন্ধেও আশা রাখতে পারছেন না।

বারীনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করবাব সময় সমর চৌধুরীর মন্তব্যগুলি যতই ব্যঙ্গভিত্তিক হোক না কেন, উনি মনে মনে জানেন সবাই এখন একটা পথই বেছে নিয়েছে—বাজ্যবদর

জেনে বাজারদারির। ওঁর নিজের বাড়িতে সমরবাবু একটা স্পষ্ট-অস্পষ্ট অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু। সারা জীবন ধরে উনি নাকি একটা অনড় নীতিবাণীশ অনুশাসন ছেলেমেয়ের উপর চাপিয়ে রেখেছেন—বলেছেন নিজের যা আছে তা নিয়ে যেন তারা খুশি থাকে। ফলে প্রায় জেদ ধরে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের দেয়াল ভেঙে বাইরে বার করেছে—তাদের পোশাক দেশি নয়, পছন্দ দেশি নয়, গানের কান, পড়ার চোখ দেশি নয় এমন কি খরচের হাতও দেশি নয়। বিশ্বায়নের রাজ একেবারে অপ্রতিহত এখানে।

বারীনবাবু বন্ধুর মত নিরাশার শিকার হন নি। উনি একটু ঝাঁপায় পড়েছেন, আপনার, আমার, আরও অনেকের মত। এটুকু তাঁর কাছে জলের মত পরিষ্কার যে আজকের শিশু জন্মেই বিশ্ববাজারে নেমে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়। তাকে সাহায্য করবার জন্য টেলিভিশনের মস্তিষ্ক প্রক্ষালক বিজ্ঞাপন আছে, উদ্দেশ্যমূলক প্রচারকাহিনী সম্বলিত ছাপা ছবির বই আছে, দোকানে দামি খেলনা, পোশাক, উপভোগের হাজার উপকরণ আছে, —দেশ বিদেশ থেকে সংগৃহীত, স্কুলে পড়ার গন্ধমাদন চাপ আছে, উচ্চতর শিক্ষার প্রারম্ভে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাউন্সেলিং সেশন আছে এবং স্ব-উন্নতিকে মৎসচক্ষু বিবেচনায় লক্ষ্য ভেদ করবার ট্রেনিং আছে—পুরো ব্যাপারটাতে একটা পারিবারিক এবং সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হবে, এ আশ্বাসও আছে।

কিন্তু একটা কিছু নেই। তা যে কি বারীনবাবু সাহস করে ভাবতে পারছেন না। কারণ বিশ্বের বর্তমান নিয়মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর নাতিটি কৃপানির্বাসিত হোক তা নিশ্চয়ই তিনি চাইবেন না। কিন্তু কেন জানি তাঁর মনে হচ্ছে ঘরের দেয়াল ভেঙে দিয়ে বাইরের ঝোড়ো হাওয়ায় বার করে দিলে নাতির দুর্বল পা তাকে খাড়া করে রাখবে তো?

বিশ্বায়ন, পরিবার ও আমরা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন-এর ধারণা এখন আমাদের সমাজের একটি স্তরে, বলা ভাল তথাকথিত আধুনিক স্তরে শুধু যে ব্যাপ্ত তাই নয়, বিশেষভাবে প্রভাবশালী। আরও অনেক কিছু মতই আমাদের অনেকে 'আধুনিক' বা ধার করা ধারণায় বাঁচে আর ঐ ধারণার কাঁচের মধ্য দিয়ে নিজেদের জগৎকে বুঝতে চায়, এমনকি তার আধুনিকতার বোধও ঐ ধার করা। পশ্চিমি জগৎ বিশ্বায়নের যে ধারণা বিশ্ববাজারে ছাড়ল তা একান্তই তাদের পরিপ্রেক্ষিতে থেকে তৈরি। বিশ্বায়নের যে ধারণা আমাদের মত দীর্ঘদিন প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক ও অব-ঔপনিবেশিক বাস্তবে বাস করা দেশের পক্ষে শুভ হওয়ার কথা, ঐ পশ্চিমি বিশ্বায়নে তা নেই। ক্রমশ উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে অবস্থার ফারাক বর্ধমান, পশ্চিম আজ যে দ্বার খুলছে সেখান থেকে যে শত উপহার এসে আমাদের দরজা ভাঙছে তাতে অসহায় আমরা করুণ আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। বিশ্বায়ন অর্থনীতি রাজনীতিতেই আবদ্ধ নয় যুদ্ধের বিশ্বায়ন ঘটেছে। এর বিরুদ্ধে দমিত অপমানিত ক্ষুধার্ত দক্ষিণ শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসের বিশ্বায়ন ঘটাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত আঁধার। এই আঁধারে বিশ্বায়ন আমাদের সমাজের উপরের স্তরেই মূলত মূল্যবোধকেও আক্রমণ করেছে পালটাচ্ছে। আজকের সংখ্যালঘু উচ্চবর্ণীয়, মধ্যবর্ণীয় স্তরে পরিবার পারিবারিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধ ঐ বিশ্বায়নের ধাক্কা অনুভব করেছে। দেশের অর্থনীতির ভিত ক্রমশ ধসছে অথচ তার ওপর সফটওয়্যার, তথ্য-প্রযুক্তির প্রোমোটোররা সর্বনাশা ধ্বংসমুখী দুর্বল ভূমি নির্ভর বাড়ি তৈরি করেছে। পরিবার এই প্রক্রিয়ায় তার পুরনো মাত্রা হারাচ্ছে।

'বিশ্বায়ন' এই ধারণা আকস্মিকভাবে আসে নি। ধনতন্ত্রের আদি পর্ব থেকেই বিশেষত অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্র চেয়েছে পৃথিবীকে তার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ করতে। তখন এর নাম ছিল 'সাম্রাজ্যবাদ' 'ঔপনিবেশিকবাদ' ইত্যাদি। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে ঐ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সবাইকে অঙ্গীভূত করার যে শোষণমূলক প্রক্রিয়া তার বিরুদ্ধে বিশেষত এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় প্রতিবোধ গড়ে উঠতে থাকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে একদশকের মধ্যে এসব দেশ ঐ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকবাদের বাইরে আসে, আসতে চায়—ধনতান্ত্রিকরণের পুরনো রূপ বাধা পায়। এই ধনতান্ত্রিকায়নও একধরনের বিশ্বায়ন—ধনতন্ত্রের বিশ্বজয়, সর্বত্র শ্রেণীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নিজ পছন্দমত কাঠামো প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া তা বিশ্বায়নেরই উনিশ ও বিশ শতকীকরূপ। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া অন্যভাবেও হয়, গড়ে ওঠে প্রতিরোধ। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ মূলত ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শুরু হয়। সোভিয়েট রাশিয়া নাৎসীবাদ ফ্যাসীবাদের সাধারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক মিত্রপক্ষের সঙ্গে হাত মেলায়। এরপর ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদীরূপ আঘাত পেতে থাকে—সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ এসব শব্দ-অভিধা ক্রমশ বিকপতার সম্মুখীন। ৪৫-উত্তর পৃথিবীতে তখন আধিপত্য বিস্তারের জন্য নতুন ধারণা চাই—অর্থনীতিরও দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, বহুজাতিক সংস্থা, তথ্যপ্রযুক্তি ও শিল্প ধনতন্ত্রকে নতুন শোষণের রূপ দেখাচ্ছে। এল নতুন অভিধা—বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের এক প্রবল সমর্থকও একথা স্বীকার করলেন যে অকালে এল আমেরিকায়ন।

আমাদের দেশে বৃটিশ ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতা, পরিবার সম্পর্কে ধারণাকে পাল্টাতে শুরু করে। খণ্ডিত যে শিল্পায়ন ও নগরায়ন হয় তাতে সমাজের একটি বিশেষ স্তরে পরিবাস, পারিবারিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা আব আগের মত থাকে না। পরিবার সম্পর্কে ধারণার বদল মানেই নারী সম্পর্কে ভাবনা বদল, পরিবারের অন্তর্গত নারী পুরুষ সম্পর্কের ধারণার বদল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বৃহদায়তন শিল্প ভারতে দেখা যায়—এরপর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই শিল্পের অভিঘাত এদেশের পরিবারের ওপর পড়তে শুরু করে। পরম্পরাগত পরিবার যে অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল তা উটে দিল। পারিবারিক শ্রম ও শ্রমবিভাজনের ছকও আগের মত থাকে না। পিতার কর্তৃত্ব ধনতান্ত্রিক শোষণের স্তম্ভ নয়, শিশুসন্তানের শ্রমের ক্ষেত্রে। বরঞ্চ শোষণের ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি পিতার কর্তৃত্বের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আঘাত করে তার অপব্যবহারকে অনিবার্য করে তোলে। এটা যতই ভয়াবহ হোক বৃহদায়তন শিল্প নারী-শিশুদের ক্ষেত্রে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে আসে। তীব্র শোষণের মধ্যেও উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা সামূহিকতা আসে যা আরও উঁচু ধরনের পরিবারের সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হলো না। কারণ শুধু আমাদের পক্ষ ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রায়নেই নয়, পশ্চিমী বাস্তবেই এই ধনতন্ত্রায়নে স্ববিরোধিতা ছিল। এই প্রক্রিয়ায় বিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সমাজ দেখা দিল, তাকে কেউ আধুনিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বলেই অভিহিত করলেন। আমাদের বাস্তবে এই অভিধা তো প্রকটভাবে সত্য, পশ্চিমেও ধনতন্ত্রের প্রভু-প্রতিমায় এই স্ববিরোধিতা থেকে যায়। আর এর মধ্যেই পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। যে পরিবর্তনের মধ্যেই এই সামন্ত শিল্প টান আছে, আবার সামন্ততন্ত্রেব সামূহিক চেতনাও ভেঙে গেছে।

পশ্চিমের বিশ্লেষকরা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে, ষাট-সত্তর-আশির দশকে “পরিবার নিয়ে যুদ্ধ” “লিঙ্গগত দ্বন্দ্ব” “অন্তরঙ্গতার সন্দ্বাস” এসব দেখেছেন। দেখেছেন কান্ড-অর্থ, শিক্ষা, সচলতা সব ক্ষেত্রেই বিরাট পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু দেখেছেন যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে ছেড়ে দিলে, সব পরিবর্তনই চেতনায় ও কাগজেকলমে এসেছে, বাস্তবে নয়। শ্রমের বাজারে, সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও দেখেছেন নারী ও পুরুষের আচরণ ও পরিস্থিতির অপরিবর্তনীয়তা। এর ফল হয়েছে বিশ্ফোরক। শিক্ষার

সুযোগের ব্যাপ্তিতে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতায় নারী সমতা ও অংশীদারীর ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রত্যাশা করতে শুরু করে জীবিকায়, পারিবারিক জীবনে, কিন্তু শ্রমের বাজারে এর বিপরীত চিত্র। শিল্পসমাজে এভাবেই এক ব্যক্তিবিরোধ দেখা দেয়, একসঙ্গে বাস করবার ভিত্তিকেই টলিয়ে দেয়—নারীদের মধ্যেও যে ব্যক্তিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জন্মায়। এই পরিস্থিতিতে তির্যক হয়ে যায়। পুরুষেরা ধনতান্ত্রিক সমাজের নানা মূল্যবোধে জারিত হয়েও এখানে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধেই আটকে থাকে। আমাদের বাস্তবে এটা প্রচল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন মেয়েদের লেখাপড়া বিদ্যালয়ে শুরু হলো, তখনই চাকরির বাজারে লেখাপড়া জানা মেয়েরা এলে কি সংকট দেখা দেবে, এ নিয়েও ভাবনা শুরু হয়। এমন কি মেয়েরা যাতে পরীক্ষায় সাফল্য না পায় তার জন্যও চেষ্টা চলে ধনতন্ত্রে বাজারের যে মুক্তি ঘটে তাতে যোগ্যতমের উদ্ভব ও প্রতিযোগিতা বিশেষ শুরু হয়। পরিবারেও ঐ প্রক্রিয়া এলে নারীর ভূমিকা পাল্টায়—নারী-পুরুষের একসঙ্গে বসবাসের প্রশ্নটিও আর আগের মত থাকে না। ব্যক্তিগত, প্রাজ্ঞনিক যে মুখ পরিবারে দেখা যায়, তাতে পরিবর্তন আসে—পারিবারিক শ্রম বিভাজনও আর পরম্পরাগত সমাজের মত থাকে না। সন্তানের জন্য দায়িত্ব তখন আর পরিবারের ভেতরে নারীর ওপর একান্তভাবে থাকতে পারে না, কারণ নারীও তার নতুন ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু বাস্তবে ঐ প্রক্রিয়া বাধা পায়। কারণ মজুরি শ্রম গোড়া থেকেই গৃহকর্মকে মেনে নেয়। ধনতন্ত্রের আধুনিক যে শ্রেণীসংঘাত পরিবারে থাকে না—নারী-পুরুষের বিরোধ শ্রেণীসংগ্রাম নয়, আবার পুরনো সমাজের মতও নয়। দেখা যায়, উৎপাদনের ক্ষেত্র ও পারিবারিক ক্ষেত্রে পৃথক করা হচ্ছে। নারী-পুরুষ শ্রেণীজাত নয়, জন্মগত অস্তিত্ব। এক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিমূর্ত অর্থ, মুনাফা এসব থাকে না বা আড়ালে থাকে। যে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা ও সচলতা ধনতন্ত্রের উৎপাদনে প্রয়োজন তা পরিবারের দাবির বিপরীত : পরিবারে অপরের জন্য আত্মত্যাগ ও সামূহিক ভাবনা থেকেই যায়। ধনতন্ত্রের অণু-পরিবাবও এর ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ ধনতন্ত্রের বাহির ও পরিবারের ভেতরের এক বিচ্ছিন্নতা থেকেই যায়। নারীকে হয় যাবজ্জীবন গৃহকর্মে নয় শ্রমের বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলতে হয়। জন্মগতভাবেই নারী ধনতন্ত্রায়নের মূল সূত্রের বিপ্রতীপ স্থানে—অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জন্মভিত্তি সে এড়াতে পারে না।

আরও গুরুত্বপূর্ণ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পর্ক অসাম্য ও বৈষম্যের ওপর দাঁড়িয়ে। পারিবারিক ক্ষেত্রে যে নারী স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা অস্তুত চিন্তায়-কাগজে কলমে বলা হয় তার প্রাতিষ্ঠানিক বাইরের বাস্তবগত ভিত্তি তাই থাকে না। যে কাঠামোতে অসাম্যকে প্রথম থেকেই মেনে নেয়া হয় সেখানে পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীনতা, মুক্তির প্রসঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণ হতেই পারে না। গৃহকর্ম থেকে তার মুক্তি সম্ভব নয় যতক্ষণ পুরুষ ধনতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্রে থাকে—নারী কোন মূর্ত অর্থপূর্ণ কাজে নিজেই আবিষ্কার করতে পারে না যা হওয়া বাঞ্ছনীয়। গোলাম মুরশিদ-এর “নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বদরমণী” বইটিতে মেয়েদেব অর্থনৈতিক কার্যকলাপে

অংশগ্রহণের কারণ হিসাবে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও পরিবারের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপকে দেখেছেন। নতুনশিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা পারিবারিক দায়িত্বের অতিরিক্ত অন্য সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে চায়। পুরুষ-সমাজ ততদূর পর্যন্তই এসব সমর্থন করে। যতদূর তাদের স্বার্থ রক্ষিত হয়। পিতৃপ্রধান সমাজ কন্যার চাকুরি গ্রহণেও আপত্তি করেছে। এখানে বৃটিশ শাসন যে “আধুনিক যুগ”এর সূচনা করে, বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃহদায়তন শিল্প নিজেদের পুঁজিতে এদিকে ওদিকে গড়ে তোলে, তাতেই এই সমস্যা দেখা দেয়। নারী তার পরিবারের গণ্ডীর বাইরে আসতে চায়, বাইরের শ্রমের বাজারে নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চায়, পুরুষরাও, বলা ভালো, পুরুষদের একটি অংশও চিন্তায় ও লেখায় এসব সমর্থন করে আবার একটা বড় অংশ বিরোধিতা করে। কার্যত অবশ্য এ প্রক্রিয়া নানাভাবে বাধা পেতে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নানাভাবে নারীদের স্বাধীনতার বোধ ঔপন্যাসিকদের নিজনিজ বীক্ষা অনুযায়ী নারীর স্বতন্ত্র সত্তার কথা নানাভাবে থাকলেও এই শ্রমের বাজারে, জগতে নারীর সংলগ্নতার সমস্যা ও তার পারিবারিক মাত্রা আসেনি। এটা সাহিত্যে আসতেই সময় নিয়েছে অনেক। এর মূলে, আমাদের ধনতন্ত্রায়নের পদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা।

পশ্চিমি জগতের ধনতন্ত্রায়নের অবাধ প্রক্রিয়ায় এটা হওয়ার কথা। অণুপরিবার ছাড়া কাজ ও জীবনের ছক নিয়ে বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠতে পারে না—আমাদের দেশে এটাও সমাজের একটা বিশেষ স্তরে গত পঞ্চাশ বছর ধরে ধীরে ধীরে ভাবা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমেও বুর্জোয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল সমাজ মানবশ্রমের বিভক্ত বাণিজ্যিকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সামগ্রিক শিল্পায়ন সামগ্রিক বাণিজ্যায়ন এবং পরস্পরাগত পরিবার রূপে, ভূমিকায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বাইরের ব্যাপার। কিন্তু মজুরি শ্রম অর্থাৎ ধনতন্ত্রের একটা বিশেষ স্তর বৈষম্য নির্ভর ধনতান্ত্রিক সমাজ মজুরি শ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষ-নারীর অসম অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। অথচ ধনতন্ত্রের মার্কিন ও ফরাসী ঘোষণায় আধুনিকতার বাধা, বিরোধী এই অসমতা। ঐ স্ববিরোধিতা ধনতন্ত্রায়নের পারিবারিক রূপেও প্রতিফলিত।

আমরা পারিবারিক সম্পর্কের ওপর বিশ্বায়নের অভিঘাত কেমন, সেটি বোঝার জন্য ধনতন্ত্রায়নের কথা বলছি এই কারণে যে ধনতন্ত্রের সাম্প্রতিকতম পরিণতি এই বিশ্বায়ন। এ বিশ্বায়ন আমাদের বসুঁধেব কুটুম্বকম নয়, নয় রবীন্দ্রনাথের মহামানবের সাগরতীরের দেওয়া-নেওয়ার শুভ সম্পর্ক। বিশ্বায়ন ধনতন্ত্রের সংকট এড়িয়ে আবর্তনের একেলে ভাবনা। এ ধরনের ভাবনায় বিশ্বের অসমবিকাশ, গত কয়েকশ বছরের সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক পর্যায় আন্তীকৃত। ধনতন্ত্র তার শ্রেণী বৈষম্য, শ্রেণীশোষণের বাস্তবকে তথ্য প্রযুক্তির নতুন পর্যায়ে একদিকে তার জাতীয়সত্তার ধারণাকে খর্ব করে, অন্যদিকে ঐ ধারণাকেই নতুনভাবে প্রয়োগ করে “উন্নত” পশ্চিমের আধিপত্য কায়ম করতে চায়, বিশ্বায়নের ভয়ংকর ক্রোড়ে। এ এক নতুন ঔপনিবেশিকতা—পুরনো সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ নিজেদের প্রয়োজনে ও ধনতন্ত্রের বিকাশের স্বার্থে সঙ্গী সামঞ্জস্য রেখে

অনেকটা ফাঁক রেখেছিল। আজকের বিশ্বায়ন সে ফাঁকও রাখে না—দস্তোস্তি করে তার সঙ্গে না থাকলে ঘোর বিপদ। বহুজাতিকের যে ধারণা বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত, তা আসলে পশ্চিমের এক নতুন ধনতান্ত্রিক জাতীয়সত্তার প্রকাশ। বিশ্বায়ন ধনতন্ত্রায়নেরই প্রসারণ—উৎপাদন-সম্পর্কের আরেক স্তরবিন্যাস। তথাপ্রযুক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বায়ন ঢুকে পড়ে

মানুষের অন্দরমহলে, তার ভাষায় তার পরিবারের অভ্যন্তরে। ধনতন্ত্রায়ন-পারিবারিক কাঠামোকে সম্পূর্ণ ভাঙতে পারে না তার সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতায়। বৃহত্তর বাস্তবের প্রক্রিয়াকে যেন পরিবারের বাইরে রাখতে চায়। বিশ্বায়ন এই ভাঙটাকেই সম্পূর্ণ করতে চায়। ধনতন্ত্রের মধ্যেই এর বীজ নিহিত ছিল—শ্রমের বাজার যে সচলতা দাবি করে তাতে ব্যক্তিক ও পারিবারিক প্রশ্লেব স্থান নেই। ক্রমশ গৃহকর্মে বদ্ধ নারী বিচ্ছিন্নতায় ভোগে—নানা যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহারে সে আর ঐ কাজের আগেকার কেন্দ্রে নেই

—রান্না, কাপড়কাটা থেকে শুরু করে নানা কর্মই পশ্চিমে যন্ত্র অনেক সহজ করেছে, আমাদের দেশেও সমাজের একটা বিশেষ স্তরে এটা এসেছে। জন্ম নিরোধের নানা উপায় পরিবার পরিকল্পনা নারীকে তো বটেই, সমগ্র পরিবারকেই আগের সেই সন্তান পালনের ধারাবাহিক কর্মে রাখে না। অথচ জন্মনিরোধের ব্যাপারটা এখনও একপেশে—মূলত নারীর দিক থেকেই দেখা হয়। এসবের ফলে পরিবারের মধ্যে যে টেনশন-সংঘাত আসে তা

আগের থেকে আলাদা। নারীর কাছ থেকে পরম্পরাগত সমাজ যা চাইত, স্বাভাবিক এখনকার চাহিদা অন্য রকম। এই নতুন পরিস্থিতিতে একদিকে নারীর ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও চৈতন্য, প্রযুক্তিগত নানা কারণে পরিবারে তার বদলে যাওয়া ভূমিকা, শ্রমের বাজারে নিজেই ক্রমশ লগ্ন করা অন্যদিকে পুরুষের সামন্ততান্ত্রিক আধুনিকতা, পরিবাবে তার ভূমিকার কার্যত খুব বেশি ইতরবিশেষ না হওয়া, শ্রমের বাজারে নারীকে দমিত রাখার যে দ্বন্দ্ব্ব তা পরিবারে প্রতিফলিত হয়। নারীর মুক্তি নঞর্থক হয়ে যায়।

আগেকার যাবজ্জীবন যে পুরুষের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমর্থনে সে বাঁচত, তার পারিবারিক ভূমিকা ছিল নির্দিষ্ট ও তার জানা, সেসবের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। শ্রমের বাজারে তার পদক্ষেপ তাকে দুনৌকায় দাঁড় করায়। যেহেতু ধনতন্ত্রায়নের মধ্যেই থাকে সামন্ততান্ত্রিক মন ও পরিস্থিতি সেহেতু পুরনো পারিবারিক ভূমিকা থেকেও সে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না আবার তার নতুন ভূমিকাকেও সে অস্বীকার করতে পারে না। ফলে পারিবারিক সম্পর্কে ভাঙন ধরে; পরম্পরাগত ভাবে যে সম্পর্কের বন্ধন ভূমিকার নিশ্চিত বিভাজনে টিকে থাকতো, অনেক সময় যন্ত্রণা ও বিষাদকে সঙ্গে নিয়ে,

ধনতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়ার এই একপেশে বিকাশে তা ভাঙতে থাকে—ভূমিকার অনিশ্চিতিই এর মূলে। পুরুষও আর নিশ্চিত নয়—শ্রমবিভাজনের পুরনো পারিবারিক ছকের ওলটপালট হওয়ায় সেও অনিশ্চয়তার মধ্যে, তার সঙ্গে থাকে তার কর্তৃত্বের হাধা, কর্তৃত্ব-সম্পর্কে সংশয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ বাড়ে। মেয়েরা “স্বাধীন” এভাবে হয় ঠিকই কিন্তু এ স্বাধীনতায় ধনতন্ত্রায়নের দাগ বড় হয়ে জ্বলতে থাকে। পারিবারিক জীবন যথার্থ আধুনিক হয়ে উঠতে পারে না—মানবিক সম্পর্ক দাঁড়াতে চায় সাময়িক ক্ষণিক সম্পর্কের

ওপর। আর সন্তানরা হারায় পরিবারের পরম্পরাগত নিশ্চিত ভূমি। পরিবারের ঐ ভূমিচ্যুত হয়ে তারা যে বৃহত্তর কোন ভূমিতে অভিজ্ঞানে লগ্ন হয় তা নয়। কারণ ধনতন্ত্রায়ন তার সার্বিক স্ববিরোধিতা নিয়ে যে বিমূর্ত মুনামুখী অণুব্যক্তির জগৎ গড়ে তুলতে চায়, তাতে ঐ পারিবারিক বন্ধনের বিকল্প থাকে না ফলে ঐ সন্তান নিষ্কিণ্ড এক শূন্যতার মধ্যে—একাকী মা বা বাবা, অথবা মা-বাবার নতুন সঙ্গীসহ যে নতুন পরিবেশ তাতে কোন আশ্রয় থাকে না—কারণ এখনও সন্তান মা-বাবার ক্ষয়গতসূত্রেই বিবেচিত হয়।

ধনতন্ত্রায়নের ক্রমাগত প্রসার ও সংকট এড়ানোর চেষ্টার এসময়ের পরিণতি বিশ্বায়নের ধারণা। তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বকে অনেক ছোট করেছে—স্পেসের দিক থেকে নয়। বিশ্বের আকার ছোট হয়নি, হয়েছে সময়ের দিক থেকে। আজ আর বিশ্বের মথুরা দিন রাত্রির বিভাজন সেভাবে দেখে না সমাজের সুবিধাভোগী, বিশেষ করে। সে ঘরে রাত্রিতে অন্য গোলাধর্মের দ্বিপ্রহরকে দেখছে। ইরাকে বা আফগানিস্থানে সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে বর্বরতম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্বিচারে বোমাবর্ষণ দেখছে। যে দেখছে সে হয়তো তখন কর্মহীন থেকে ফিরে আরামে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। শ্রমের বাজারে যুক্ত স্ত্রী এসে ছেলের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের পড়া নিয়ে বসেছে। বিশ্বায়ন এটাই চাইছে—অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বের ওপর কর্তৃত্বকারী সাতটি দেশ, তাদের প্রধান আমেরিকার নেতৃত্ব ভয়াবহ বাস্তবকে আনছে পৃথিবীর গরীব দেশের মাথায় রঙ্গীন আড়াল করতে : এ যেন মুম্বাই-সিনেয়ার মারামারি হত্যা মর্ষকামিতা যা দেখে দর্শক আরাম পায়। সেইসঙ্গে বিশ্বায়ন খুলে দিচ্ছে সমাজের ঐ স্তরে ভোগ্যপণের চোরকুঠুরি। তথ্যস্রোত বিজ্ঞাপনের এক মায়াজগৎ তৈরি করেছে। এ মায়াজগতে পরিবারের সকলেই নিমজ্জিত হচ্ছে—বিজ্ঞাপনের হাতিয়ার এখন বৃদ্ধ থেকে শিশু সকলেই—দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপনে ছোট ছোটের অভিনয় আজ এক বিশ্বায়নের অভিঘাতেই দৃষ্টান্ত। এর প্রভাব অবশ্যই পড়ছে পরিবারে। বিজ্ঞাপন এখন আর মূলত নারী বা পুরুষকে পণ্য করেছে না, শিশুকেও অল্পবয়সীকেও। ধনতন্ত্রায়ন অবশ্যই বাজার ও পণ্যকে সমাজে মূল চালিকাশক্তি করেছিল। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি যুগের আগে তবু কিছু ফাঁক সে রেখে দিতে বাধ্য হয়েছিল। তথ্য প্রযুক্তি যে বিশ্বায়ন নিয়ে এল তাতে এই ফাঁক থাকে না। বিশ্বায়ন এমনই প্রক্রিয়া ও ধারণা যে বিশ্বের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে আড়াল করে বোঝাতে চায় সব দরজা খুলে বিশ্ব তোমাব দরজায়—পরিবার আজ ঐ বৈশ্বিক প্রক্রিয়ায়। আজ আর মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যে সব আপাত বাধা ছিল সেই ভাষা-সংস্কৃতি-স্বতন্ত্র ইতিহাস তা দূর হয়ে যাচ্ছে তথ্যের বন্যায়। বিয়ের পর অচেনা বাড়িতে হকিস প্রেসার কুকার চেনাকে আনে, গৃহবধূর হাতে চাবি তুলে দেন স্বশ্রমতা, নতুন পাড়ায় কেউ না মিশলে বিশেষ ধরনের চালের বিবিয়ানি খাইয়ে দাও। তথ্যপ্রযুক্তির এই চিত্রে বস্তু, পথ্য, বিমূর্ত এক বৈশ্বিক মাধ্যম, পরিবার এখন ঐ মাধ্যমের সম্পর্কের ভেতর।

আর এর ফল পরিবারের ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। বিশ্বায়ন ধনতন্ত্রায়নকে আরেকটি পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধনতন্ত্রায়ন অজ্ঞত তত্ত্বের দিক থেকে পরিবার ও

বহির্জগৎকে পৃথক রেখেছিল। বাইরের আগ্রাসী প্রতিযোগিতা পরিবারের অভ্যন্তরে দেখতে চাইত না—সন্তান নারীপুরুষের সম্পর্কের অপরিহার্য ফসল, বিনিময় অযোগ্য প্রাথমিক সম্পর্ক বলেই ধরা হতো। বিবাহবিচ্ছেদ এই সম্পর্কেরই ভাঙন। অণু-পরিবারে সন্তানের প্রতি অতি মনোযোগ, অতি স্নেহ কিংবা বিবাহবিচ্ছেদের পর সন্তানকে নিয়ে তিস্তসংঘাত যা আসলে ঐ স্নেহ-মনোযোগ-জাত নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন অবশ্যই এনেছে। অণুপরিবার পরিবার সম্পর্কে পরম্পরাগত ধারণাকেই শুধু ভেঙেছে তাই নয়, দায়বদ্ধতার গণ্ডীবদ্ধ স্বার্থের বাইরে দাঁড়ানোর ইচ্ছাকেও ভেঙেছে। বাইরের শ্রমের বাজাব এভাবে পরিবারেও এসেছে কিন্তু ঐ সন্তানের প্রতি বদ্ধমনোযোগে তার উন্টোচাপও থেকে যায়। বিশ্বায়ন আঘাত হানে অন্যত্র—এক অভূতপূর্ব সচলতা বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান শর্ত। ধনতন্ত্রায়নে শ্রমশিল্প সমাজে যে অভিজ্ঞান কাঠামো গড়ে উঠেছে, জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে পরিবারের যে চিহ্নায়ন তা ঐ সচলতায় হারিয়ে যায়। পরিবার তার স্বাভাবিক নিশ্চিতি হারায়। বৈশ্বিক অর্থনীতি, বিশ্বায়নের অরণ্যে, ধনতান্ত্রিক শিল্পসমাজের আত্ম-বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন যে অভিজ্ঞান তৈরি হচ্ছে, তাদের আবাসস্থল আর জাতীয়-রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পরিবেশে নেই। বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের কর্মচারীদের যেভাবে দাবার বোড়ের মত দেশ-দেশান্তরে পাঠায়, আবার সেখান থেকে আনে, আবার অন্য জায়গায় পাঠায় তাতে পারিবারিক যে অভিজ্ঞান ধনতন্ত্রায়নেও থেকে যায়, তা আর থাকে না। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে অনিবার্য সংলগ্নতায় আন্তর্জাতিক এক শ্রমশক্তি তৈরি হচ্ছে, ইন্টারনেট ব্যবহার করে সাংস্কৃতিক জাতীয় সীমা পেরিয়ে এরা কাজ করে। ভাবনটা বৈশ্বিকভাবে করা হচ্ছে—আবহাওয়াগত বিপর্যয়কে রোধ করার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনার কথা বলা হচ্ছে। বৈশ্বিক ব্যবস্থাপকের একটা অভিজ্ঞান ছক ও চিহ্ন গড়ে উঠতে চাইছে—জাতীয় টেকনোক্যাটদের আচরণ বিধি বৈশ্বিক ecocrat-এর দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যাতে আন্তর্জাতিক শুভবিবেক উদ্বুদ্ধ হয়। এর মধ্যেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কেনাকাটা থেকে ভোট দেওয়া, পরিবার বিদ্যালয়, সামাজিক ক্ষেত্রে সন্তানের লালনপালন পর্যন্ত ecological citizenship ক্রমশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু এই হতে চাওয়া বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে আন্তর্জাতিক নাগরিকতা, বাস্তববিদ্যাগত চেতনা শুদ্ধভাবে গড়ে ওঠার কথা, পরিবারের নতুন সচলতায় তার ভবনে ও ভুবনে যে স্বার্থরোধিতা কাটানোর কথা, তাকে বিকৃত করে দেয়। বিশ্বায়ন হয়ে ওঠে বিশ্বশাসন ও শোষণের নবরূপ। বুর্জোয়াসি ও citizen-এর স্ববিরোধে জাতীয়-রাষ্ট্রের চিত্রনাট্য ভেঙে ফেলে ঠিকই, আন্তর্জাতিক বর্গে ভাবেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতীয়-রাষ্ট্রের স্বার্থ ও আগ্রাসন থেকেই যায়। যার প্রমাণ আজ দিকে দিকে—পশ্চিমজগৎ অপ্রতিহত ক্ষমতায় দুমড়ে দিতে চাইছে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার মানুষকে পৃথিবীতে এখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার বাস। রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন, তার আইনি রূপ একেবারেই জাতীয়-রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঁধা—একটি সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে শাস্তি দিতে অনারাদ্বিকে নির্বিচারে বোমাবর্ষণে গুড়িয়ে দিতে দ্বিধা

নেই। সেখানে ঐ রাষ্ট্রের মানুষের বিশ্বনাগরিকতা, আন্তর্জাতিক মাত্রা ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় না—এর পেছনে থাকে জাতীয় ক্ষমতা-বিস্তারে স্বার্থ, তেলের স্বার্থ, নিজ যুদ্ধাস্ত্র শিল্পের স্বার্থ। একজন মানুষকে বিশ্বনাগরিকতার আদর্শের কথা বলা হয় কিন্তু কার্যত সে জাতীয় রাষ্ট্রের পুরুষ আধিপত্যের নিয়মরীতিতে বাঁধা। এই ধনতন্ত্রের দ্বিতীয় আধুনিকতায় পরিবার অন্যধরনের অভিঘাতে।

একদিকে সচলতার কেরিয়ারমুখিনতা অন্যদিকে সেই কেরিয়ার নির্মাণের জন্য বাবা-মার বিচ্ছেদ হলে একজনের প্রবল তাড়না, সন্তানদের প্রায় ভূমিদাসের পর্যায়ে নামিয়ে দিতে চাইছে ঐ অণু-পরিবারে। আমরা এখন যারা ষাট বছরের প্রৌঢ় তাদের ছোটবেলায় তিন-চারটি কখনও কখনও তারও বেশি সন্তান-বিশিষ্ট ছিল মধ্যবিত্ত পরিবার। এদের ঐ কেরিয়ার সচলতা বহুজাতিক বিশ্বায়নে তেমন ছিল না, আর বাবা-মার পক্ষে ঐ তাড়নাও সম্ভব ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে সেটিও অণু পরিবার, কিন্তু অণুর আকাব বড়। ক্রমে সমাজের বিশেষ স্তরে আর পরিবার পরিবেশ মুস্তিকাব শিকড়ের টান বাতিল হয়ে গেল। কখনও বিরাট দেশের কোন দূর অঞ্চলে, কখনও দেশের বাইরে একটি বড়জোর দুটি সন্তান চলে গেল। ছাত্রজীবনেই তারা পরিবার-সম্পর্কে ক্রমশ উদাসীন হয়ে যায়। সামন্ততান্ত্রিক ধনতন্ত্রায়নের মা-বাবারা এতে খুশি হয়, ছেলেমেয়ের কেরিয়ারের চমকানিতে একটা আত্মশ্লাঘা জাগে, আবার পুরনো মানসিকতায় বিষণ্ণ হয় নিঃসঙ্গ হয়, ঐ বিশ্বায়নের ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধ বা বোধহীনতা বোধ হয় সন্তানের আকর্ষণের অভাবে—একধিক বাংলা গল্প এ নিয়ে লেখা হয়েছে। কিংবা মনে পড়ে সেই নিঃসঙ্গ বাবা-মাকে, যারা বাড়িতে কেউ এলে, পরামর্শ দেন, সন্তানকে সাধারণ কর, যেন তোমার পরিবারেই থাকে, তাদের ছেলেমেয়ের মত সুদূর আমেরিকায় চলে না যায়। বিশ্বায়ন এভাবে শুধু পরিবারকে ভাঙে না, মানুষকে করে তোলে শিকড়হীন ভাসমান, অথচ বিশ্ব এখন জাতীয় রাষ্ট্রে প্রকটভাবে বিভক্ত। একজন ইংরেজ, একজন ফরাসী, একজন আমেরিকান, মনে বিকৃতভাবেই জাতীয়, খেলার সময় যার প্রকাশ ঘটে উগ্রভাবে। বাঙালির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও জটিল : ভারত বনাম বাংলাদেশ খেলা হলে, সে কার পক্ষে। রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞানে তার ভারতের পক্ষে যাওয়া দেখি, কিন্তু বাঙালি অভিজ্ঞান? বাংলাদেশের এগারোটি খেলোয়াড়ই তো বাঙালি। বিশ্বায়ন সৃষ্টি করেছে এক কিস্তৃত পরিবার, এমন পরিবার পশ্চিমিজগতে অনেক যেখানে বাবা-মা বাঙলা জ্ঞানেন বলেন, সন্তানরা জ্ঞানে না বলে না। ভাষা সন্তার বিশেষ উপাদান—বিশ্বায়ন ভাষার এই বহুমাত্রিক অস্তিত্বকে এখনও ধ্বংস করতে পারেনি। চেষ্টা হয়—বাংলা হরফ রোমান হরফে লেখার প্রস্তাব আসে আন্তর্জাতিক মান রাখতে গিয়ে বর্জিত লি'কার ও স্বাক্ষকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা আসে। একই পরিবারে ভাষার দীনতা নিয়ে আসে অনন্য বিচ্ছিন্নতা—এ পরিবারের সন্তান ইরাক বা আফগানিস্থানে বোমা মেরে নিরীহ মানুষকে মারলেও কোন চৈতন্যে অভিঘাত পায় না অথচ আমেরিকার বিরাট ছাত্রসমাজ ও সমাজের অন্যস্তর নেমে পড়ে রাস্তায় প্রতিবাদে। বিশ্বায়ন তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে পরিবারে এই দীর্ঘতা এনে, পশ্চিমের

আধিপত্যকে আরও কয়েম করছে। ধনতন্ত্রায়ন যা পারেনি, বিশ্বায়ন সেটাই পারছে। পরিবারকে করে তুলতে চাইছে তার কর্তৃত্ব বিস্তারের ভিত্তি। ধনতন্ত্রায়নের দ্রুপদী যুগে শ্রেণীকে ঔপনিবেশিকতার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ও সমর্থনের ভিত্তি ভাবা হতো। জমিদার, জোতদার ইত্যাদি, সেইসঙ্গে ১৮৬০-৭০ দশক পর্যন্ত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীও এই ভিত্তি হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল পশ্চিমি যোগাযোগ ইংবেজি ভাষার মধ্য দিয়ে অন্য ইতিহাস জানা মধ্যশ্রেণীকে এক প্রতি-চৈতন্যের দিকে নিয়ে যায়, তাদের নেতৃত্বে ক্রমশ ঔপনিবেশিকতা-বিরোধ আন্দোলন দানা বাঁধে। মধ্যবিত্তের বড় অংশ এর বাইরে থাকে, কিন্তু নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, একই সময় একই বাস্তব বিভিন্ন পরিবার থেকে ঐ প্রতি-চৈতন্যের শক্তিকে নিয়ে আসে আর গত প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে এটা দেখা দিচ্ছে মধ্য শ্রেণী, শ্রেণী হিসাবে নানা প্রতিবাদ বিক্ষোভ বিদ্রোহকে পেরিয়ে এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যে তাব কর্তৃত্ব আর নিঃসন্দ্বিগ্ন নয়। এখন শ্রেণী হিসাবে কোন ভিত্তি সম্ভবন কার্যকর নয়। তাছাড়া এটাও দেখা যাচ্ছে একই শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ পারিবারিক মন ও গঠন নানা টানাপোড়েনের মধ্যে চলে। পরিবার শ্রেণীর মধ্যে থেকেও, একটা স্বক্ষেত্রে স্থিত থাকে। বিশ্বায়নের অভিঘাত এই পরিবারের ওপর—ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে সমাজবদ্ধ হয় পরিবারে। ধনতন্ত্রায়নের একটা স্তরে শ্রেণীর মধ্যে যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, শ্রেণীর রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সামাজিক মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা, নিজ শ্রেণীর সীমা ছাড়িয়ে অন্য শ্রেণীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া ঐ পরিবারের বিশেষ ভূমি থেকে আসত—কখনও নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে, বোহেমিয়ান হয়ে আবার কখনও কমিউনিস্ট স্বপ্নে তারা ধনতন্ত্রায়নের বিপ্রতীপে দাঁড়াত। বিশ্বায়ন পরিবারকেই তাই শিকড়হীন করে তার সবলতার বহুজাতিকতায় তথ্যপ্রযুক্তির তরবারিতে। সমাজের মধ্যশ্রেণী আজ আমাদের দেশেও বৈশ্বিক হতে চায়, উন্নত পশ্চিমের বিপুল সম্পদসৃষ্টির ভোজের মধ্য দিয়ে বিশ্বের যত্রতত্র যায়—এরা তাদের ব্যয়মনস্কতায়, অমিতব্যয়িতায় অন্য জীব, অর্থ উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিবেকহীন, নিজ দেশ শুধু নয়, পরিবার সম্পর্কেও হিম-উদাসীনতায় এক বৈশ্বিক মনুষ্যপ্রতিম। আর যেহেতু তাদের ঐ অমিতব্যয়ী জীবন পশ্চিমভূমিতেই সম্ভব, তাই তারা পশ্চিমি সব কিছুকে মেনে নেয়, পশ্চিমি মূল্যবোধকেই চূড়ান্ত ভাবে। দেশীয় পরম্পরা তার কাছে ঘণার বস্তু। পরিচিত একজন পশ্চিম ভ্রমণে গিয়ে স্বদেশি বাঙালিদের সেখানে দেখে স্তম্ভিত, বাংলা তথা ভারতকে ঘৃণা করে একজন তো বলেই বসে ভারতের সব বাড়িতে কমোড না হলে সে ভারতে যাবার কথা ভাবতেই পারে না। ভাই-বোন, দাদা-দিদির আমেরিকা বাসের সুযোগে কয়েক মাস আমেরিকা ঘুরে আসাব পর চোখে ও মুখে মুগ্ধতা—পারলে তার পরিবার ছেড়ে এই প্রৌঢ় বয়সেও ঐ দেশে চলে যেতে যায়। এমনকি একজন বাঙালি কবির মতো “কলকাতা আমার আমেরিকা” এটাও আর বলতে পারে না তারা। আমেরিকা, আমার আমেরিকা—বিশ্বায়ন এটাই চায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বপ্নে, মাঝে মাঝে বাস্তবে এই অগন্তযাত্রা বিশ্বায়নের ফল। আজ পরিবারের যে রক্ষণশীলতা সমাজ-রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রকট, তাই এই

পরিবর্তনের হাতিয়ার—আর এ কারণেই আজকের মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিমুখ। উচ্চমাধ্যমিক মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশজনের যে সংক্ষিপ্ত কথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়, তাতে নানা পার্থক্য থাকলেও, একটি ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত—রাজনীতি খারাপ। বিশ্বায়ন পরিবারকে এভাবেই রাজনীতি বিমুখ করেছে তার তথ্যপ্রযুক্তির চাপে। নতুন প্রজন্ম এক অণু-অস্তিত্বের শূন্যতায় ভাসমান।

তবে ধনতন্ত্রায়নে যেমন স্ববিরোধ ছিল বিশ্বায়নেও তাই। বিশ্বায়নও তার দ্বিতীয় আধুনিকতায় ছাড়তে পারে না সামন্ততন্ত্রের স্মৃতিকে, তাই সে বলে গ্লোবালভিলেজ-এর কথা। যে অর্থেই বলুক ‘গ্রাম’ এই শব্দটির মধ্যেই নিহিত থাকে বিশ্বায়নের নিজের সম্পর্কে অনাস্থ। তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিক-উত্তর-আধুনিকে গ্রাম ও গ্রামবাসীর ধারণা বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া, বৈশ্বিক গ্রাম তৈরি করার যে উচ্চারণ ও ধারণা তাতেই বোঝা যায় বিশ্বায়নও নিজের বিরোধিতায় আক্রান্ত। বিশ্বায়নের সামরিক প্রযুক্তি এশিয়া আফ্রিকায় গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করেছে এমন কি পশ্চিম সাংবাদিকরাও তাতে স্তম্ভিত। আর তারা তৈরি করতে চাইছে গ্লোবালভিলেজ—পশ্চিমে চাষি, এই বগটিই অবলুপ্তপ্রায়, গ্রাম আর সে অর্থে নেই। সেখানে ঐ ‘ভিলেজ’ শব্দটিতে যে ভিলেনের আভাস। এ গ্রামে পশ্চিম, পশ্চিমের সাতটি দেশ আমেরিকার নেতৃত্বে জমিদার, মহাজন। তারা অন্য গ্রামবাসীদের অর্থ-খাদ্য-জীবনেব প্রয়োজনীয় জিনিস নিজেদের স্বার্থে ও ইচ্ছায় দেবে, কেড়ে নেবে। তাতে অনাহারে অপরিসীম হাজার হাজার মানুষ শেষ হয়ে গেলেও কিছু এসে যায় না। শত শত পরিবার শূন্য হয়ে যায়। যে আফগান শিশু বা বালক চোখের সামনে তার বাড়ি বা পরিবার ধ্বংস হতে দেখল, সে তো সেই শিশুর মত, বালকের মত যে দেখেছে জমিদারের মহাজনের ঠাণ্ডারে বাহিনী সঙ্গে পুলিশ তার বাড়ি ধ্বংস করেছে, পরিবারকে হত্যা করেছে। ‘গ্লোবালভিলেজ’ ঐ সামন্ততান্ত্রিক ধারণা থেকেই জন্ম। বিশ্বায়ন আজ অগণ্য পরিবারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে আর সেই ধ্বংসের লীলায় তৈরি করেছে ভয়ঙ্কর প্রবণতাকে। একই উপজাত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ—এ সন্ত্রাসবাদও নতুন চরিত্রের। বিশ্বায়ন যখন তার অর্থনীতি-বাজনীতি-প্রযুক্তিতে বিশ্বকে নিজের তাবেরদার গ্রাম-এ পরিণত করতে চাইছে, তখন তার প্রতিক্রিয়াও নতুনরূপে আসছে—মৌলবাদ সন্ত্রাসবাদ ধর্মীয় জেহাদের বেশে এবং এরও বিশ্বজুড়ে বিস্তার। পশ্চিমি বাস্তবের অভ্যন্তরে বসেই তার ক্রিয়াকলাপ। মজার বিষয়, স্বার্থপরতায় পশ্চিমী তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিক বিশ্বায়ন কোন কোন স্তরে একে মদত দিয়েছে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। তারপর এরই দাঁড়িয়েছে তাব বিরুদ্ধে—অস্ত্রের বিশ্বায়ন ঘটেছে। পশ্চিমি অস্ত্রেই এরা সজ্জিত। এর ফল পরিবারের পক্ষে তীব্র : ছোট ছেলেরাও নিভীক মৃত্যুর সামনে হাসিমুখে অস্ত্র নিয়ে খেলছে। বৈশ্বিক গ্রাম এভাবেই পরিবারকে ভাঙছে, দোমড়াচ্ছে ; সামন্ততান্ত্রিক মৌলবাদ, জেহাদকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছে।

কিন্তু পরস্পরাগত পরিবার কি তাহলে অবলুপ্ত? দেখা যাচ্ছে বিশ্বায়নের বোমায় সব গুড়িয়ে গেলেও আফগানিস্তানের পাহাড়-বরফ ঢাকা গুহাকন্দরের মত পরিবার

থেকেই যাচ্ছে। শত সহস্র বোমা মেরেও যেমন ভিয়েতনামীদের ধ্বংস করা যায় নি, তাদের প্রতিরোধে অগ্নি স্বপ্নময় হয়ে উদ্দীপিত থেকেছে। তেমনি পরিবারও। প্রথাগত বিবাহ না করেও শুধু যৌনসঙ্গী হিসাবে নারীপুরুষের সম্পর্ক শুরু হলেও, একটা পর্যায়ে পরিবারের মডেল বা আদবকেই মেনে নিতে হচ্ছে। সাম্যবাদীরা একদা কমিউনের কথা বলতেন—পরিবারের নতুন ও বিকল্প রূপের কথা। সে পরীক্ষা খুব সফল হয়নি। সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইয়ুরোপে সামরিক আমলাতান্ত্রিক, নতুনধরনের শ্রেণী ও দলভিত্তিক তথাকথিত সমাজতন্ত্র ১৯৮০-র দশকের একেবারে শেষে ভেঙে গেল অর্থাৎ বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যেই। এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা, যৌনসমতা ও স্বাধীনতা এসবের থেকে স্থিতিশীল বৈবাহিক সম্পর্ক, বড় পরিবার, পারিবারিক শৃঙ্খলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। পরিবারকে ত্যাগ করা যায় না—এ ধারণাই প্রবল হয়েছিল। পারিবারিকভাবে সন্তানের জন্ম, লালন, তার জন্য দায়িত্ববোধকেই বড় করা হয়। চিনেও বৃদ্ধ মা বাবার জন্য যে মনোযোগ রাষ্ট্রীয় আইনে দেওয়া হয়, তাতেও এই পারিবারিক মূল্যবোধ। যৌনসাম্য যে কেবল নারীকে সন্তানপালন ও গৃহস্থালীর কাজ থেকে মুক্তি দিলেই আসে না, এ কথাও ঐ পদু সমাজতন্ত্রেও বোঝা গিয়েছিল। পাবলিক ও প্রাইভেট জীবনের মধ্যে পৃথকীকরণ করা হয়, বলা হয় দ্বিতীয়টিই ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্ষেত্র। বলা হয়, অবসর সময়ে পরিবারের সকলে মিলে একসঙ্গে কাটানোই, পরম্পরের কাছাকাছি আসাই সমাজের পক্ষে শুভ। বলা হতে থাকে সাম্যবাদী নৈতিকতার কথা—‘ধনতন্ত্রায়ন’ ও বিশ্বায়নের বিকল্প হিসাবে পরিবারের একটা ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়, যাতে পরিবারকে তার সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো থেকে বার করে এনে আবার প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। বিশ্বায়নের অভিঘাতের বিবেচনায় এই দিকটিও বিবেচ্য।

কিন্তু দেখা গেল পরিবারের এই বিকল্প সমাজতান্ত্রিকায়ন সম্ভব হলো না। কারণ সমাজতন্ত্রই ঠিকমত জনসমাজে এলো না। রাষ্ট্র, আমলাতন্ত্র, দল, তার সঙ্গে অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিরাট সামরিক ক্ষমতার বিস্তার শেষ পর্যন্ত নিয়ে এল এমন এক ব্যবস্থা যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। নতুবা একধরনের শ্রেণী ও শ্রেণীবৈষম্য। প্রাক-ধনতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির উদ্ভট মিলে, যা বাস্তবে আনল তাকে কি বলে অভিহিত করা যায়, তা বোধহয় এখনও ঠিক হয় নি। ধনতন্ত্রায়নের মতই এই সমাজতন্ত্রায়নও সামন্ততান্ত্রিক টানাপোড়েনে পরিবারের ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের প্রবণতাও যেমন দেখা দিল, তার সঙ্গী হিসাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ থেকে আরও অনেক কিছু তেমনি পরিবারের ধারণায় নতুন চৈতন্য আনল। নৈতিকতার বদলে পরম্পরাগত টান, তার ওপর রাষ্ট্রের অবলুপ্তির পরিবর্তে আগাসী হয়ে ওঠায় ঐ পরিবার-চৈতন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনও বড় হয়ে উঠল। ধনতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও গৌণ হলেও সেই প্রাচীন গ্রীসীয় দাস-অর্থনীতি নির্ভর আর এক তন্ত্র, মিলেমিশে এক তথাকথিত সমাজতন্ত্র বলে প্রচারিত হলো। তার ফল ১৯৮০-র দশকের শেষে বিনা প্রতিরোধে এ ব্যবস্থার তাসের প্রাসাদের মধ্যে ভেঙে পড়া। বিশ্বায়ন এখানেও প্রায় একই ভূমিকা পালন করলো, যা করেছে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন

আমেরিকায়। ফলে, যেখানে বিকল্প পরিবার চেতনায় মুক্ত স্বাধীন মানুষ গড়ে ওঠার কথা ছিল, সেখানে তৈরি হলো লোভী সমাজ ও পরিবার। কালোবাজারিতে, মافیয়াতন্ত্রে ১৯১৭-র স্বপ্ন ডুবে গেল—সমাজতান্ত্রিক পরিবার ও প্রজন্ম হওয়ার স্বপ্নিক সাহসকে গিলে নিল এক লুম্পেন ধনতন্ত্র যাকে ত্বরিতগতি দিল বিশ্বায়নের দীর্ঘ বাহ। আমাদের বাস্তবে আজ আর কোন স্বপ্ন নেই। পরিবারের মধ্যে অন্তত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের মধ্যে এক স্বপ্নহীন, বিশ্বায়নের প্রবল ধাক্কায় বিধবস্ত, প্রজন্ম দিশেহারা। ধনতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়ায় যেটুকু মূল্যবোধের জমি ছিল, বিশ্বায়ন তাকে নির্মম করতে উদ্যত। মধ্যবিত্ত ধনতন্ত্রের পঙ্গু ও বিকৃত বিকাশে এখানে ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্নতার পথে গেছে, এখন সেই বিচ্ছিন্নতা বাইরের ধাক্কায় সচলতায় দ্রুত এক অভিজ্ঞানহারা সর্বনাশের পথে।

বিশ্বায়ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবারকে নিজের স্বার্থে শিকড়হীন ইতিহাসহীন করে তুলতে চাইছে। যে ইতিহাসের শেষ বিশ্বায়নের তাত্ত্বিক প্রবক্তারা দেখতে চেয়েছেন, সেই শেষ আমলে পরিবারের এই সার্বিক বিমূর্তায়ন। কিন্তু পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে ভাঙার ক্ষমতা এই প্রচণ্ড শক্তিশালী নানা অস্ত্র ও প্রযুক্তিতে সম্ভব বিশ্বায়নেরও নেই আর আমাদের বাস্তবে বিশ্বায়ন তার নিজ যুক্তি-শৃঙ্খলাতেই সমাজের সর্বস্তরের আজও পৌছাতে পারে নি। কখনোই হয়তো পারবে না। এক অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধেই পারবে না। আমাদের দেশের একশ কোটিরও বেশি মানুষকে তাদের পরিবারকে বিশ্বায়নের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় আসতে গেলে যে অর্থনৈতিক স্তর, পারিবারিক আর্থিক কাঠামো গড়তে হয় তা করতে হলে বিশ্বায়নের মূল উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যাবে। বিশ্বায়নের জন্য একটা ন্যূনতম স্তর দরকার, তথ্য প্রযুক্তির জন্য চাই সে ধরনের পরিবার যারা এই প্রযুক্তির ব্যয় বহন করতে পারে বিজ্ঞাপিত পণ্যকে ব্যবহার করার সামর্থ্য রাখে। এই সামর্থ্য আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারের মধ্যে সঞ্চারিত হলে, বিশ্বায়নের স্বার্থই ক্ষুণ্ণ হবে, আমেরিকাকরণের যে প্রক্রিয়া আরও ছটি সাতটি পশ্চিম দেশের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্বায়নের ধারণাকে বাজারে আনছে তার পক্ষে এই সার্বিক পারিবারিক স্তরের ধনতন্ত্রায়ন আত্মঘাতের সামিল হবে, এটা করতে হলে একটা প্রায় শিল্পকৃষিবিপ্লবের দরকার যা এ বিশ্বায়নের প্রবক্তাদের প্রাধান্যকেই ধূলিসাৎ করবে। এখন এদেশে বিশ্বায়নের আবর্তে এক পঞ্চমাংশ পারিবারিক স্তর—ফলে বিশ্বায়নের আন্তর্জালটি তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর পরোক্ষ কম্পন অন্যত্র ছড়াচ্ছে না তা নয়, কারণ সমাজ তো আর প্রাচীর দিয়ে সেভাবে আলাদা থাকে না। কিন্তু সে কম্পন ভূমিকম্পের মূল কেন্দ্র থেকে অনেক দূরের কম্পন। এ দেশের মধ্যবিত্ত একটা অংশ বিশ্বায়নের জালের বাইরে। তবে ঐ এক পঞ্চমাংশ পরিবারের দাপট আর্থিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্ব যেহেতু প্রকট সেহেতু বিশ্বায়ন এ দেশে চাপ সৃষ্টি করবেই। আমাদের ভরসা ঐ চারের পাঁচ অংশ—তাদের হাতেই আমাদের ভুবনের ভার ও ভবিষ্যৎ।

বিশ্বায়নের অনুষণে সম্প্রদায়ের প্রাথমিক প্রত্যয়

রূপা দত্ত

বিশ্বায়ন আশীর্বাদ অথবা কৌশল, এইরকম একপেশে সিদ্ধান্ত কেউ কেউ গ্রহণ করলেও অনেকেই ভাবতে পারেন, এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বিশ্ববাস্তব গঠনের মূলমন্ত্রটি। বিশ্বায়নের এই দিকটি খতিয়ে দেখার জন্য আমাদের শুরু করা উচিত একেবারে গোড়া থেকে। বিশ্ববাস্তব গঠনের আড়ালে জাতীয় রাষ্ট্রের গুরুত্ব হারাচ্ছে কিনা, ভাববার বিষয়। এসব সত্ত্বেও আমরা দেখছি—আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, জমি দখলের লড়াই, প্রভৃতি বেড়েই চলেছে। এইরকম পরিস্থিতিতে ‘সম্প্রদায়’ নিয়ে আলোচনা বেশ জরুরি। বিশ্বায়নকে যদি আমরা সামাজিক রূপান্তর বলে ধরে নিই, তাহলে দেখবো, এই রূপান্তরে সম্প্রদায়ের তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্ল মার্ক্স, দুরখেইম, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদরাও এই বক্তব্যকেই সমর্থন করেন।

আমরা ‘কমিউনিটি’র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘সম্প্রদায়’-কে গ্রহণ করেছি। ‘সম্প্রদায়’ শব্দটি বিবর্তিত অর্থে ধর্মভিত্তিক, এবং সেইজন্য নিন্দাবাদক হিসেবে এটি কোথাও কোথাও গৃহীত হয়। সেইজন্য কেউ কেউ ‘কমিউনিটি’র বাংলা প্রতিশব্দ করেন ‘সমষ্টি’ যার মানে হলো সমাক ব্যাপ্তি বা সমস্ততা। এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে ‘কমিউনিটি’র সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় অংশে কমিউনিটির ভিত্তি এবং পরিশেষে বিশ্বায়নের আলোকে কমিউনিটির ধারণার পরিবর্তন বিষয়ে কিছু কথা বলা হবে।

কমিউনিটি বা লোকসমাজ বলতে বোঝায় একটা জনসমষ্টি যাদের ভৌগোলিক সীমানা অভিন্ন, ঐ জনসমষ্টি একই অর্থনৈতিক ও বাজ্যনৈতিক ক্রিয়াকলাপে আবদ্ধ এবং যারা অনিবার্যভাবে তৈরি করে একটি স্বশাসিত সামাজিক ঐক্য। এই সামাজিক ঐক্যে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, অনুভব, সহানুভব জড়িত থাকে। একটি শহর, গ্রাম, নগর অথবা প্যারিশকে ‘কমিউনিটি’ বলা যেতে পারে। কমিউনিটি বা সম্প্রদায় হলো এমন গোষ্ঠী যেখানে মানুষ সবরকম সামাজিক সম্পর্কে যুক্ত পায়; মানুষের যুথচারী মানসিকতার চাহিদা মেটে।

সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক আইভার ও পেজ মনে করেন, কোনো ছোটো বা বড় গোষ্ঠীর সদস্যরা যখন এমনভাবে বসবাস করে যে তারা কোনো বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে একটি যৌথ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে অংশগ্রহণ করে তখন সেই গোষ্ঠীকে আমরা সম্প্রদায় বলি। জিম্মারম্যান সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা বলতে গিয়ে

সামাজিক ঘটনা, সুনির্দিষ্টতা, সংঘবোধ ও এলাকাগত সান্নিধ্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। হিলারি সম্প্রদায়ের চুবানবুইটি সংস্থা বিশ্লেষণ করে তিনটি উপাদানের উল্লেখ করেন—(১) সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, (২) অনেক বিষয়েই স্বাভাব্যবোধ, (৩) নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বাস করা এবং সে-সম্পর্কে সচেতনতা। এলাকাভিত্তিক স্বাভাব্যবোধকে কমিউনিটির একটি উপাদান হিসেবে ধরা হয়। অনেক সমাজবিজ্ঞানী (যেমন, বেনডেন) এলাকাবিহীন সম্প্রদায়ের কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

আমরা খুব সংক্ষেপে সম্প্রদায়ের কতকগুলো সংস্থা উল্লেখ করতে পারি—

১) সম্প্রদায় হলো স্বনির্ভরগোষ্ঠী যার মধ্যে ব্যক্তির চাহিদা পূরণ হয়।

২) ছোট বা বড় গোষ্ঠীর সদস্যরা যখন এমনভাবে বসবাস করে যে তারা কোনো বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে একটি যৌথ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে অংশগ্রহণ করে তখন সেই গোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলা হয়।

৩) সম্প্রদায় সবরকম সামাজিক সম্পর্কের সন্ধান দেয়।

ইদানিং একটা কথা প্রায় শোনা যায়—‘কমিউনিটি উইদাউট লোকালিটি’ আর ‘লোকালিটি উইদাউট কমিউনিটি’। দুটো কথারই যথেষ্ট ব্যঙ্গনা রয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে প্রবেশের জন্য আমাদের জানা দরকার, সম্প্রদায়ের ভিত্তিগুলো কী কী। সম্প্রদায়ের দুটি ভিত্তি নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত আলোচনা করেছেন। এদের প্রথমটি প্রাকৃতিক, যাকে আঞ্চলিকতা অথবা ‘লোকালিটি’ বলে অভিহিত করা যায়। দ্বিতীয়টি মনস্তাত্ত্বিক, যাকে বলা যেতে পারে সাম্প্রদায়িকবোধ, বা কমিউনিটি সেন্টিমেন্ট।

প্রথমটিকে ‘প্রাকৃতিক’ বলার অর্থ হলো, এই ভিত্তিটি সম্প্রদায়ের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। খুব স্বাভাবিক, সম্প্রদায়ের ব্যক্তির একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে। এমনকি যাযাবররাও একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। গ্রাম, শহর, জেলা বা আরও কোনও বড় অঞ্চলে যদি এক যৌথ অন্তরঙ্গ জনজীবন গড়ে ওঠে, তবে তাকে ‘সম্প্রদায়’ বলা যায়। বর্তমানে জেরুজালেম ও তার পাশাপাশি জায়গা ইহুদিদের বাসভূমি হয়ে উঠেছে বলে তারা পার্শ্ববর্তী আরব-অঞ্চলের জনগণ থেকে পৃথক সম্প্রদায়। আমেরিকার মোরমন বা পেনসিলভ্যানিয়ান ডাচরা প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় যারা অন্যান্যদের থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখে।

সম্প্রদায়ের গাঠনিক অনন্যতার জন্য অঞ্চলের ভূমিকা প্রাকৃতিক এই কারণে যে ঐ অঞ্চল বসবাসকারীদের স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য প্রাকৃতিকভাবে সাহায্য করে। ধরা যাক, কোনও অঞ্চলে পানীয় জলের ভীষণ অভাব, উষ্ম জমি, তাহলে সেখানে দূম করে কোনও সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারবে না। তবে আদ্যকাল জনসংযোগ এবং যানবাহনের উন্নতি যে স্তরে পৌঁছেছে, তার ফলে ব্যতিক্রম ছাড়া কোনও সম্প্রদায় একটি বিশেষ অঞ্চলে আবদ্ধ নেই। তবে তাদের সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনা করা যাবে কিনা, সেটা একটা আলাদা বিতর্ক।

দ্বিতীয় ভিত্তিটি হলো সাম্প্রদায়িক বোধ। বসে নেওয়া দরকার, সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বা বোধ কোনও নেতিবাচক ধারণা নয়। একই সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে একাত্মতার বোধ গড়ে ওঠে। ভাষা, ধর্ম, নৈতিক-বোধ এক প্রকারের হওয়ার জন্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিবিড় একীবোধ, একাত্মবোধ এবং পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংক্ষেপে সচেতনতার সমন্বয়ে যে জটিল মানসিকতা তৈরি হয় তাকেই সাম্প্রদায়িক বোধ বলা হয়।

তিনটি পৃথক অথচ সংযুক্ত উপাদানের সমন্বয় সাম্প্রদায়িক-মানসিকতায় খুঁজে পাওয়া যায়। এক, আমরা বোধ ; দুই, ভূমিকা বোধ এবং তিন, নির্ভরতা বোধ।

‘আমি’ থেকে ‘আমরা’-তে রূপান্তরিত হওয়া সামাজিকতার লক্ষণ। যে কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মধ্যে আমরা-বোধ অর্থাৎ মমত্ববোধ আছে বলেই তারা ‘আমি’-ব সঙ্গে ‘আমরা’-কেও ভাবতে পারে। রুচিগত মিল, রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের সমতা সম্প্রদায়গত ব্যক্তিদের এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে। গ্রাম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বোধের প্রকাশ লক্ষ করার মতন। পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্নরকম সম্পর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি কাছাকাছি আসে। এই সম্পর্ক প্রভুত্ব, বন্ধুত্ব, আবার বশ্যতারও হতে পারে। ‘আমরা এক’ এই চেতনা সম্প্রদায়ের প্রধান পরিচয় হয়ে ওঠে। আমরা-বোধ গ্রামের গণ্ডী অতিক্রম করে যখন দেশের গণ্ডী অন্দি বিস্তৃত হয়, তখন তাকে আমরা দেশপ্রেম বলি—যার প্রচ্ছন্ন ফল হয় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বৈরী মনোভাব। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে আমরা-বোধের ভূমিকা কতটা আলাদা পথে সম্প্রসারিত হতে পারে।

সম্প্রদায়ের জীবনে প্রত্যেকটি মানুষের একটা ভূমিকা আছে—এই বোধ সকলের মধ্যেই বর্তমান। ছোটবেলা থেকেই এই বোধ জাগিয়ে তোলা হয়, পুষ্টিলাভও করে। এই বোধের সদর্থক দিক হলো, সম্প্রদায়ের স্বার্থে ব্যক্তি নিজের স্বার্থকে ছোট করে দেখে এবং অন্যদের স্বার্থের প্রতি তার সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রদায়িক মানসিকতার এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির এই চেতনা যে সমাজের গঠনবিন্যাসে তার একটি বিশেষ স্থান আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের মানসিক ভিত্তি সবল হয়। আদিম সম্প্রদায়ের বিশেষ ভূমিকার দায়িত্ব খুব অনমনীয়ভাবে পালিত হয়, আবার আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের নিয়ম বেশ শিথিল। আমেরিকার আদিবাসী ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে এই অংশগ্রহণ অত্যন্ত নমনীয়।

সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষকে নিজের জীবনযাপন সুসংহতভাবে পরিচালনা করার জন্য সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করতে হয়। একজন ব্যক্তি মানুষ তার বিভিন্ন জৈবিক প্রয়োজনে, নিঃসঙ্গতার হাত থেকে পরিব্রাজে সম্প্রদায়ের অন্যান্য মানুষদের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তির এই নির্ভরতা-বোধ তার মধ্যে জাগ্রত থাকে। ব্যক্তির আত্মবিকাশে নির্ভরতা ভীষণ প্রয়োজনীয়। এই বোধের ফলে মানুষ নিরাপত্তা পায়, আস্থা আর বিশ্বাস পায় বেঁচে থাকার জন্য।

স্থায়ী অঞ্চল ছাড়া সম্প্রদায় হতেই পারে। ম্যাকমাইডার ও পেজ দেখিয়েছেন, যাযাবর সম্প্রদায় নিম্নস্তর প্রথা, ভাষা এবং লোকনীতির জোরে সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত। আবার কারাগার, আবাসিক বিদ্যালয় অথবা মঠ এগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট এলাকা থাকলেও এখনকার বসবাসকারীরা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় কিনা, সেই আলোচনা ভাবনার সুযোগ থেকেই যায়।

অতলাস্ত্রিকের ওপার থেকে আমরা কমিউনিটারিয়ানদের ‘নতুন মূল্যবোধ’-এর কণ্ঠস্বরও শুনতে পাই। তাদের ‘নতুন মূল্যবোধ’ কমিউনিটি-সেটিমেন্টেরই একটি ঘা-মাজা রূপ। এই মূল্যবোধের মানসিকতা দেশের জন্য কাম্য। কিন্তু যারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলেন তাঁদের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই কমিউনিটি-সেটিমেন্টের কথা নতুন করে বলা হয়। তবে ‘ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ’কে কোন নঞর্থক দৃষ্টিতে বিবেচনা না-করার কথা বলা হয়েছে। এই ভাবনাটা অবশ্য একটু পুরনো ধাঁচের অথবা আধুনিকতার একটি মৌলিক বিষয়। ম্যাক্স ওয়েবার দেখিয়েছেন, ব্যক্তি কীভাবে সম্প্রদায়ের গণ্ডি থেকে, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। কার্ল মার্ক্স ঠিকে-শ্রমিক সম্প্রদায়ের ‘দ্বিগুণ স্বাধীনতা’র কথা বলেছিলেন। জর্জ সিমেল দেখিয়েছেন, কীভাবে অর্থনৈতিক-সম্পর্ক আঞ্চলিকতার স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করছে, নতুন নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর জন্ম দিচ্ছে এবং এগুলো একটি গ্লোবাল নেট ওয়ার্ক তৈরি করছে যার ভিত্তি হলো সম্পূর্ণ বিমূর্ত স্থরে। কিন্তু বিষয়টাকে আমরা মূর্তভাবেই দেখতে চাই।

বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিকীকরণের নামান্তর। বিলুপ্ত উপনিবেশের প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদ তার আগ্রাসনের চেহারার পরিবর্তন করেছে। সারা দেশ জুড়ে তাই একটি অভিন্ন বাজার অর্থনীতি চালু করার কেতাবী নাম ‘বিশ্বায়ন’। এটা আরোপিত বিশ্বায়ন। অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক স্থরে এই প্রচেষ্টা চলছে। এতে করে সম্প্রদায়ের যে ধ্যানধারণা আমাদের মধ্যে পোষণ করা হয়, তা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। কেননা এই ক্ষেত্রে স্নির্ভরতা বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্থলে সুবিধাবাদ জন্মলাভ করলে, আর যাই হোক, সম্প্রদায়ের সদর্থক ধারণাটি বদলে যেতে বাধ্য। তবে সর্বটাই কি আরোপিত। বিশ্বায়নের স্বতঃস্ফূর্ততার একটু দিক আছে। বিশ্বজুড়ে যে মানবতাবাদী আন্দোলন চলছে, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন, দূষণ বিরোধী আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন প্রভৃতি, এর পেছনে রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বায়নের একটি চেহারা—যেখানে সুবিধাবাদীরা নেই, নেই ক্ষমতালোভী দান্তিকরা। এই মনোভাব তৈরি করছে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের ধারণার। গণচেতনতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং বিশ্ব-সাম্প্রদায়িক মানসিকতার মেলবন্ধন ঘটালেই আমরা একটি অখণ্ড সম্প্রদায় পেতে পারি—বাস করার অঞ্চল তো রয়েছেই। এমন ভাবনা কেউ কেউ করতে পারেন।

তবে আদর্শ সম্প্রদায় বলতে যে সুসংবদ্ধতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা আমরা সমাজতাত্ত্বিকদের লেখায় পাই, তার মূর্ত রূপ একমাত্র প্রাচীন সমাজে হয়তো বা ছিল।

উনিশ শতকের সমাজতাত্ত্বিকরা দু-ধরনের সামাজিক সুসংবদ্ধতার কথা বলেছেন। প্রথমটি হলো জেমিয়েনস্ফেট। এখানে আন্তর্ব্যক্তিক-সম্পর্ক নিবিড়, সহানুভূতিশীল এবং নির্ভরতাপোষক। দ্বিতীয়টি হলো জেলিসফেট। এখানে মানুষ অস্থিতিশীল আর আবেগহীন। বর্তমান দিনের ভাবুকরা মনে করেন, সামাজিক সম্পর্ক এখন জেলিসফেট, অতএব সম্প্রদায়ের আলোচনাও অর্থহীন। আসলে এর মূল লুকিয়ে আছে আরও গভীরে। বিশ্ব-সম্প্রদায়ের মতন অতবড় ধারণায় ব্রতী না হয়ে অনেকেই মহাত্মা গান্ধির গ্রামস্বরাজের ধারণাকে তুলে আনতে চাইছেন। গ্রামস্বরাজই ক্রমশ মহাজাগতিক সম্প্রদায় হবে, কিন্তু গ্রামের প্রাধান্য খর্ব হবে না। স্যুমেথারের ‘স্মল ইজ বিউটিফুল’ গ্রন্থে এর একটি সুন্দর বিবরণ আছে।

শিক্ষা ও বিশ্বায়ন : কিছু বিক্ষিপ্ত কথা

ইরাক্বতী মিত্র রহমান

প্রাচীনকালে মানুষ শিক্ষা বলতে বুঝতো কীভাবে খাবার সংগ্রহ করতে হবে, কীভাবে নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করা যায় এবং শত্রু ও প্রতিকূল অবস্থা থেকে কেমন করে নিরাপদ থাকা যায়। আদিম মানুষ তাদের শিক্ষাতে মূলত বিশ্বাস, কল্পনা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহারিক বোধকে কাজে লাগাতো। বিশ্বাস ও কল্পনার স্তর পেরিয়ে যখন মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করল, তখন ধর্মীয় বিশ্বাসে যেগুলো কিছু মানুষের সৃষ্টি, তার দ্বারাই তাদের শিক্ষা জীবন পরিচালিত হতো। ইউরোপে চার্চের অপ্রতিহত প্রাধান্য শিক্ষাকে সীমিত করে রেখেছিল। মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক কালে, যেখানে বিশ্বাসের স্থান দখল করেছে যুক্তি, সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে, চিন্তার জগতে মুক্তি এল। এই চিন্তার মুক্তিকে কেউ কেউ ধর্মীয় বিশ্বাসকেই অন্যভাবে সমর্থন করার কৌশল হিসাবে মনে করলেন। তাই, বেকন বা দেকার্তের বিরুদ্ধেও স্কলাসটিসিজম (Scholasticism)-এর অভিযোগ উঠলো। আপাতত আমরা এই তর্কে যাবনা। আধুনিক যুগ পেরিয়ে উত্তর আধুনিক যুগে ঢোকার মুহূর্তে আমরা শিক্ষা জগতে এক আমূল পরিবর্তন দেখতে পাই। জ্ঞান জগতের যুক্তি এখানে ভেঙে চুরমার। কল্পনা, বিশ্বাস, যুক্তি এবং যুক্তির ভাঙন এসব দিয়ে যুগ বিচার হলেও এদের উল্টো পিঠেই রয়েছে আলাদা চিত্র, যেটা অনেক বেশি মূর্ত—তাহলো যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।

এই সময়টাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যার বিস্তার ধ্বংস করে দিচ্ছে শিক্ষার বৈচিত্র্য, প্রয়োজনহীন বলে হারিয়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক সামর্থ্যহীন মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি। ডেভিড ক্রিস্টাল “Language Death” গ্রন্থে এর একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। ভাষাগত ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বৈচিত্র্য যে থাকবেই সেটা শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, মনুষ্যের প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভাষাভিত্তিকরা মনে করেন, এই পৃথিবীর ছ হাজার ভাষা ইংরাজির প্রভাবে এই শতাব্দীতেই ধ্বংস হয়ে যাবে। ডেভিড ক্রিস্টাল এও বলেছেন, আগামী ৫০ বছরের মধ্যে ইউনাইটেড আরব এমিরেটস-এর দুবাই শহরটির আরবি ভাষা নষ্ট হয়ে গিয়ে ইংরাজি ভাষাভিত্তিক এক নতুন উপভাষার জন্ম হবে। আমরা এসব কথা বলছি, তার মূল কারণ হলো শিক্ষার মাধ্যম হলো ভাষা। যদি সারা বিশ্ব জুড়ে একটি ভাষার আধিপত্য বিস্তার করা যায়, তাহলে শিক্ষার যে ট্রিলিয়ন ডলার ইণ্ডাস্ট্রি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তা গগনচুম্বী হতে পারে।

গোলকায়নের গোলকধাঁসায় প্রবেশ করলে আমরা যে ধনতাত্ত্বিক এবং ঔপনিবেশিক চিত্রটি দেখতে পাই, তার আসল পাণ্ডা হলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO)। এই WTO অসাবধানী এবং অনিচ্ছুক রাষ্ট্রের ওপরে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে তাদের নীতিগুলো চাপিয়ে দিচ্ছে। এই আক্রমণের ফলে WTO অবিস্কার করেছে চিন্তা উৎপাদনের সম্ভাব্যতা এবং এই উৎপাদিত চিন্তার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মনস্তত্ত্ব। রাষ্ট্র যেহেতু আক্রান্ত এবং রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ সমালোচিত, সেইহেতু রাষ্ট্রীয় শিক্ষা এখন প্রায় জেলে বন্দী। বহুজাতিক কম্পানিগুলো তাদের স্কুল ভাউচার প্রোগ্রাম, গণশিক্ষার ক্ষেত্রে কর্পোরেট অনুদান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্প (যেমন চ্যানেল ওয়ান টি. এম) চালু করে শিক্ষার জগতে নিজেদের অনধিকার প্রবেশের সুযোগ করে নিয়েছে। সাধারণত আমরা ছাত্র শিক্ষক এবং এদের মধ্যকার সম্পর্কে লাভজনক ব্যবসার ক্ষেত্র হিসাবে দেখিনা কিন্তু বহুজাতিক সংস্থাগুলোর শিক্ষাকেও বাজারি করে তোলার প্রচেষ্টায় আমাদের পরম্পরাগত ভাবনাটি হোঁচট খাচ্ছে। এটা ভাবলে ভুল হবে যে শুধুমাত্র আমেরিকা শিক্ষার বোচাকেনাতে জড়িত। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গোটা বিষয়টিকে হাতে নিয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক, আমেরিকা কেবলমাত্র ১৯৯৬ সালেই ৮.২ বিলিয়ন ডলার 'শিক্ষা' রপ্তানি করেছে এবং এতে তাদের লাভের পরিমাণ হলো ৭ বিলিয়ন ডলার। এটা একমাত্র আমেরিকাতেই সম্ভব।

১৯৯৪ সালে উরুগুয়ে রাউণ্ডে WTO স্থাপিত হয়। জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (গ্যাটস) এই উরুগুয়ে রাউণ্ডেরই ফসল। গ্যাটসের কাজ হলো শিক্ষাসমেত আন্তর্জাতিক বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা। সবচেয়ে অনুকূল জাতি (most favoured nation) এবং জাতীয় সেবা (national treatment) গ্যাটসের দুটি প্রধান নীতি। মোস্ট ফেভারড নেশনের বক্তব্য হলো, সমস্ত দেশকেই অভিন্ন ভাবে গণ্য করা উচিত—আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে। জাতীয় সেবা নীতিটির অর্থ হলো সমস্ত দেশগুলো বিদেশি কোম্পানিগুলোকে তাদের দেশীয় কোম্পানিগুলোর মতোই সুযোগ সুবিধা দেবে। এই দুটো নিয়মের পিছনে রয়েছে মুক্ত স্বাধীন বিশ্ববাজার তৈরি করা। শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্যাটসের এই দুটি আপাতনিরীহ নীতি বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার ছাতার নিচে নিয়ে এসেছে। গ্যাটসের চুক্তিতে চার রকমের সেবার কথা বলা আছে। এক, শিক্ষাক্ষেত্রে দূর-শিক্ষা চালু করা। দুই, বাইরের পাঠ্যক্রম অধিগ্রহণ করা। তিন, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যপদ্ধতিকে একই বৃত্তে ফেলা। চার, বিদেশি শিক্ষকদের মাধ্যমে বিভিন্ন পাঠ্যক্রম চালু করা।

বোঝা যাচ্ছে, গ্যাটসের এই নিয়ম এবং পদ্ধতি কার্যকরী হতো না, যদিনা বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি না ঘটত। কিন্তু আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা কতদূর। এখানে আমরা বই, দৈনিক সংবাদপত্র, রেডিও ও দূরদর্শনকে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম হিসাবে ধরব, কেননা দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ইন্টারনেটের সুযোগ

সুবিধা মানুষ ততটা পায়নি। ইউনেস্কো স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক ১৯৯৫ সালে একটি চিত্র পাওয়া যায়—

অঞ্চল	১০ লক্ষ লোক- প্রতি প্রকাশিত বই		দৈনিক সংবাদপত্র ১০০০ জনপ্রতি		রেডিও ১০০০ জনপ্রতি		টিভি ১০০০ জনপ্রতি	
	১৯৭০	১৯৯১	১৯৮০	১৯৯২	১৯৮০	১৯৯৩	১৯৮০	১৯৯৩
আফ্রিকা	২২	২০	১৬	১৬	১০৪	১৭৩	১৭	৩৯
আমেরিকা	৩৬৬	৩৬৫	১৫৯	১৪৩	৯২৬	৯৮২	৩৩১	৪০৬
এশিয়া	৫৯	৭০	৫৬	৬৩	৯৬	১৭৯	৩৭	৬৯
ইউরোপ	৫১৫	৮০২	১৯৩	২৬৭	৬০৪	৬২৮	৩৫০	৩৯০
উন্নতদেশ	৪২৮	৫১৩	২৪২	২৭৯	৮৭৯	৯৬৮	৪২২	৪৯৪
উন্নয়নশীল দেশ	৩৯	৫৫	৩৭	৪৪	৯৮	১৭৮	২৫	৬০
বিশ্ব	১৮২	১৬০	৮৮	৯৬	২৯৪	৩৫০	১২৫	১৫৪

এ বইতেই আরেকটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, যেখানে আমেরিকার সুযোগসুবিধাকে ১০০ ধরে নিয়ে অন্যান্য দেশের সুযোগের পরিমাণ দেখানো হয়েছে—

দেশ	দৈনিক সংবাদপত্র ১০০০ জনপ্রতি	টিভি সেট ১০০০ জনপ্রতি	রেডিও ১০০০ জনপ্রতি	প্রকাশিত বই
বসওয়ানা	১২	২.১	৫.৬	০.৩
বেনিন	০.৯	০.৭	১.৩	১.৩
ইথিওপিয়া	০.৪	০.৪	৯.৩	০.৫
মালি	১.৭	০.২	২.১	—
নাইজেরিয়া	৭.৬	৪.৭	৯.২	৩.২
জেইর	১.৩	০.১	৪.৬	০.১
আমেরিকা	১০০	১০০	১০০	১০০
নিকারাগুয়া	৯.৭	৮.২	১২.৩	—
ব্রাজিল	২৩.৩	২৬	১৮.৩	৫৫.৯
পেরু	৩০	১২	১১.৯	৪.৩
আফগানিস্তান	৫.১	১.২	৫.৬	—
চীন	১৮.২	৪.৬	৮.৭	১৮.৯
ভারত	১৩.১	৪.৯	৩.৮	২৬
ইরান	৮.৫	৭.৭	১০.৮	১৩.৮

দেশ	দৈনিক সংবাদপত্র ১০০০ জনপ্রতি	টিভি সেট ১০০০ জনপ্রতি	রেডিও ১০০০ জনপ্রতি	প্রকাশিত বই
পাকিস্তান	২.৫	২.২	৪.২	০.৬
আলবেনিয়া	৩৭.৮	১১.৪	৮.৩	০.৮
জার্মানি	১৩৭	৬৮.৫	৪২	১৩৬
সুইডেন	২১৭	৫৭.৬	৪১	২৬.২
ইংল্যান্ড	১৬২	৫৩.৩	৫৪	১৯৩

বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা বা প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অবস্থান ইত্যাদি প্রশ্নে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যখন এত বিভেদ, তখন সারা বিশ্ব জুড়ে একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ডব্লিও. টি. ও.-র প্রয়াস নিঃসন্দেহে নিজেদের স্বার্থবাহী। অথচ আমরা এতকাল জেনে এসেছি, ব্যাপারটা তেমন হওয়া উচিত নয়। অত্যন্ত সাধারণ বোধ আমাদের বলে দেয়, শিক্ষা সর্বজনীন হবে, সকলেরই অধিকার রয়েছে শিক্ষাতে।

উগান্ডা ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের সামালি নিয়ানজি কাম্পালা শহরের নোংরা গলিপথে দেখেছেন প্রচুর বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে, দৌড়ে বেড়াচ্ছে—অথচ ঠিক সেই সময়ে তাদের স্কুলে থাকার কথা। স্কুলে না-যাওয়ার প্রশ্ন করতেই দশ বছরের মারিয়া উত্তর দিয়েছিল, স্কুলের পয়সা নেই এমনকি বাবা-মা ঠিকমত খাওয়াতে পারে না তাদের। মারিয়াকে সামালি প্রশ্ন করেছিলেন, “তুমি কি মনে করো, স্কুলে যাওয়াটা জরুরি?” উত্তরে সে বলল, “হ্যাঁ খুব দরকারি, লেখাপড়া শিখতে পারা যায়, পারা যায় সন্ন্যাসিনী (নান) হতে।” অন্য আরেকটি বাচ্চা মেয়ে ফরিদা বলেছিল, পড়াশুনো করা দরকারি, পড়াশুনো করলে আরবি, ইংরেজি শেখা যায়, কোরান পড়া যায়, আর শিক্ষকও হওয়া যায়।”

এদের অভিভাবকরা জবাব দিয়েছেন, উগাণ্ডার সরকারি স্কুল খুব কম আর বেসরকারি স্কুলগুলোতে ফি দেওয়ার মতন রোজগার তাঁদের নয়। ঐ শহরে একটি চার্চ স্কুল আছে, মাটির তৈরি আর টিনের ছাউনি, কোনো জানলা বা দরজা নেই। সরকারি অথবা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল এবং স্বসাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয়ের চেয়ে বেসরকারি স্কুলগুলোর চেহারা অনেক ভাল।

বস্তুত একমাত্রিক ভূবনীকরণের প্রক্রিয়া শিক্ষাজগতটিকে কুক্ষিগত করতে চাইছে। পশ্চিম শিক্ষাব্যবস্থাকে মডেল হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া অথবা তাদের পুনরুৎপাদনযোগ্য সংস্কৃতিকে বিশ্বায়িত করার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া চলছে। গ্যাটসের নীতিগুলোর মধ্যেই নিহিত আছে, শিক্ষাসংস্কৃতির ‘ভূবনগ্রাম’ গড়ে তোলার নামে আসলে সেই বাজারটি গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে উন্নত দেশগুলোর ভূমিকা বিক্রেতার, ফলে লভ্যাংশও তাদেরই। কিন্তু দরিদ্র ক্রেতার কীভাবে কিনবেন তাদের পসরা, আর কেনই বা কিনবেন এই ভাবনা জরুরি।

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা এই ব্যাপারে কী ভাবছেন তা স্পষ্ট নয়। কর্মক্ষমতা বাড়লে দারিদ্র্য ঘুচবে, দারিদ্র্য ঘুচলে শিক্ষার বিস্তার ঘটবে—এই অতিসরল তত্ত্বের জালে বাস করাটা বোধহয় ঠিক হবে না। অথবা গরীবদের ধরে এনে পটাপট স্কুল-কলেজে ভর্তি করে দিলেও কোনো সমাধান হবে না। একদল লোক মনে করেন, শিক্ষাবিস্তারের জন্য সর্বাগ্রে জরুরি হলো, গরীবদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখানো—গ্রামে গঞ্জে গিয়ে শ্রম, শিক্ষা, পুষ্টি বিলিয়ে সেটা হতে পারে। কিছু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দেখাও যাচ্ছে। অন্য দলটি মনে করে, এইসব প্রচেষ্টায় ব্যক্তিগত প্রশান্তি ছাড়া আর কিছু হবে না, প্রয়োজন সরকারি হস্তক্ষেপের। দ্বিতীয় দলের ঝামেলাটাই বেশি।

আমির খানের প্রযোজনায় ‘লগান’ নামক বিখ্যাত সিনেমা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। অস্ত্র ভারতের ক্ষেত্রে। সেটা হলো ঝুঁকি নেওয়ার সাহস। আর এই ঝুঁকি নেওয়ার সাহসটা বেড়ে যাবে তখনই, যখন সম্মিলিত শক্তি বাড়বে, বাড়বে দক্ষতা। প্রতীকীভাবেই সিনেমাটিতে দেখেছি—অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ মানুষটির প্রতিবন্ধকতাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসাধন হয়। আমাদের অশিক্ষিত দেশে, ধর্মীয় হানাহানিতে আমরা যতটা ব্যস্ত (এর পেছনেও নাকি আমাদের কোনো ভূমিকা নেই, ভূমিকা রয়েছে আই. এস. আই আর যারা পার্থ বর্মনকে অপহরণ করেছিল এবং সেইসব বদলোকরা যারা আফগানিস্তানে অসভ্যতা করছিল, ট্রেড সেন্টার ভেঙে ফেলল)—তাতে করে স্বপ্ন দেখা ছাড়া আপাতত আমাদের কোনো পথ নেই।

বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা

শামিম আহমেদ

সাধারণভাবে মনে করা হয়, বুদ্ধিজীবীরা সমাজের এমন এক অংশ যাঁরা অন্যান্যদের চেয়ে দ্রুত যোগাযোগ রক্ষা বা ভাবপ্রকাশ করতে পারেন। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার বিষয় মানুষ, সমাজ, প্রকৃতি বা বিশ্বজগৎ হতে পারে। বুদ্ধিজীবীরা কেন তাঁদের মতামত জানান? এব উত্তর প্রথাগতভাবে দুটো। এক, ব্যক্তিগত প্রবণতা; দুই, পেশাগত ভূমিকার দায়বদ্ধতা। কোনো একজন বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে এই দুটো কারণ একই সঙ্গে কাজ করতে পারে, আবার কোনো একটি বোধ তাঁকে সিদ্ধান্ত গঠনের পথে নিয়ে যায়। বৌদ্ধিক প্রবণতা অথবা আগ্রহ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার। বৌদ্ধিক প্রবণতার তীব্রতা অনুসারে এই পার্থক্যের জন্ম। জরুরি কথা হলো, যাঁরা তথাকথিত অবৈদিক পেশার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের ভেতরেও বিভিন্ন মাত্রায় বৌদ্ধিক ভূমিকা পালন করার প্রবণতা দেখা যায়। এখানে ‘অবৈদিক পেশা’ কথাটায় আপত্তি থাকতে পারে। কেননা সেই অর্থে কোনো পেশাকে অবৈদিক বলা যায় না। সুতরাং গতানুগতিক ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে সব মানুষকে বুদ্ধিজীবী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু সব মানুষ কি বুদ্ধিজীবী?—এই প্রশ্নের দুটো উত্তর পাওয়া যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর দুজন চিন্তাবিদ এর ভিন্ন ভিন্ন উত্তরও দিয়েছেন। একজন অ্যাণ্টনিও গ্রামস্কি। অন্যজন জুলিয়েন বেন্দা। গ্রামস্কি ইটালীয় মার্কসবাদী, সক্রিয় কর্মী, সংবাদিক এবং রাজনৈতিক দার্শনিক। মুসোলিনি তাঁকে ১৯২৬ থেকে ৩৭ পর্যন্ত বন্দী করে রাখেন। ‘প্রিজন নোটবুকস্’-এ তিনি বলেছিলেন, “সব মানুষ বুদ্ধিজীবী, সুতরাং একজন বলতে পারেন : কিন্তু সমাজে সকল মানুষের কাজ বুদ্ধিজীবীর নয়।” গ্রামস্কির এই কথা থেকেই বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে দ্বন্দ্বিক ধারণাটি ধরা পড়ে যায়। যে কোনো কাজে, তা সে কায়িক শ্রম হোক, আর বৌদ্ধিক কাজ—সব রকম মানবিক কাজেই বুদ্ধির দরকার হয়। এই কথাটা আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই এবং কায়িক ও মানসিক শ্রমের বিরোধিতার মুখোমুখি হই। একজন লেখক শুধু বুদ্ধির জোরে লিখতে পারেন না, তাঁকেও কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। তেমনি যে-মানুষটি মাছ ধরেন অথবা লোহা পেটান তাঁকেও নির্ভর করতে হয় বুদ্ধির উপর। গ্রামস্কি সব মানুষকে বুদ্ধিজীবী বললেও তিনি জোর দেন এই কথাটায় —“সমাজে সকল মানুষের কাজ বুদ্ধিজীবীর নয়।” বুদ্ধিজীবীর একটা ভূমিকা থাকা দরকার, সামাজিক ভূমিকা। ইতিহাস পর্যালোচনা করে গ্রামস্কি বুদ্ধিজীবীর কাজ বা ভূমিকাকে দু’ভাবে দেখেছেন। একদলকে তিনি বলছেন গতানুগতিক, চিরাচরিত বা

ট্রাডিশনাল বুদ্ধিজীবী—যাঁদের মধ্যে শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, প্রশাসকরা রয়েছেন। এঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই ভূমিকা পালন করে আসছেন। এই বুদ্ধিজীবীরা বিশেষ কোনো শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন। দ্বিতীয় ধরনে গ্রামস্কি বলেছেন, অর্গ্যানিক বা সাংগঠনিক বুদ্ধিজীবীদের কথা, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে কোনো শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত। এঁরা উঠতি সামাজিক শ্রেণীর মুখপাত্র। ট্রাডিশনাল বুদ্ধিজীবীদের থেকেই বিকাশের উত্তরণে সাংগঠনিক বুদ্ধিজীবীরা আসতে পারেন। আবার শ্রেণীর ভাঙনে বা বিশৃঙ্খলায় অর্গ্যানিক বুদ্ধিজীবী চিরাচরিত বুদ্ধিজীবীতে রূপান্তরিত হতে পারেন। প্রতিটি সামাজিক শ্রেণী যখন পূর্বের অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে জন্ম নেয় তখন সেই শ্রেণী ট্রাডিশনাল বুদ্ধিজীবীদেরই পেয়ে থাকে। যাঁরা শত জটিলতা ও পরিবর্তনের মধ্যেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। একজন পুরোহিত একটা সময়ে সাংগঠনিক বুদ্ধিজীবী ছিলেন, কিন্তু ধনতন্ত্রের বিজয় অভিযানে তাঁদের এই ভূমিকা বাতিল হয়ে যায়। গ্রামস্কি বিশ্বাস করতেন অর্গ্যানিক বুদ্ধিজীবীরা সমাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন, তাঁরা মানসিকতার পরিবর্তন এবং বাজার-প্রসারণে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যান। অন্যদিকে শিক্ষক বা পুরুত এই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নন, তাঁরা বছরের পব বছর একই ধরনের কাজ করে যান; একই জায়গায় অবস্থানকে অপরিবর্তনীয় রেখে।

গ্রামস্কির কথা শুনে বৌদ্ধিক ভূমিকাকে উৎপাদনের উপকরণ বলে মনে হতে পারে। উৎপাদনের চারটি উপকরণের কথা অর্থবিদ্যায় পাওয়া যায়। জমি, শ্রম, পুঁজি ও উদ্যোগ। এদের মধ্যে দুটি—শ্রম আর উদ্যোগ (উদ্যোগের একটি ধর্ম হলো ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা) হলো সরাসরি বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত। শ্রমের মধ্যে বুদ্ধি ছাড়াও শরীর রয়েছে, কিন্তু উদ্যোগ বা ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতাটি সম্পূর্ণভাবেই বৌদ্ধিক। একালের কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন, ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা কীভাবে নির্ধারিত হয়, তা যথাযথভাবে হ্রি করতে পারলে আজকের অর্থনৈতিক তত্ত্বের চেহারাটা বদলে যেত। জমি, শ্রম, পুঁজি নিয়ে অনেকরকম তত্ত্ব আছে—কিন্তু ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা নামক উপকরণটি সম্বন্ধে কোনো তত্ত্বই নেই। অথচ এটা ভীষণ জরুরি—এটি ছাড়া উৎপাদনই সম্ভব নয়।

এই কথাগুলো শুনে মনে হতে পারে ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে যুক্তি জোরালো হচ্ছে। ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতার রাষ্ট্রীয়করণ কি আদৌ সম্ভব? গ্রামস্কির সাংগঠনিক বুদ্ধিজীবী বা উঠতি সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের ভূমিকা দেখে একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। জমি, শ্রম আর পুঁজি বিষয়ে সাম্য জোর করে আনলেও বৌদ্ধিক বৈষম্য ঘোচাবো কীভাবে? তাহলে বৈষম্য কি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া?

বিশ্বের কোথাও কোথাও অর্গ্যানিক বুদ্ধিজীবীদের দাপট বৃদ্ধিতে অথবা বৈষম্য নামক প্রক্রিয়ার স্বীকৃতিতে আমরা একমেরু বিশ্বের আধিপত্যের প্রাবল্য দেখতে পাচ্ছি। আমরা যাঁরা এই ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারছি না— বুদ্ধির জোরে অথবা আজন্ম সংস্কারের প্রভাবে, তাঁরা ফিরে তাকাতে পারেন বিংশ শতাব্দীর অন্য একজন বুদ্ধিজীবীর দিকে।

এঁর নাম জুলিয়েন বেন্দা। যিনি বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে অন্যমত পোষণ করেন। বেন্দার মতে, বুদ্ধিজীবীর বৃত্তা খুব ছোট। এঁরা হলেন সেই দার্শনিক-নৃপতি যারা মানবজাতির বিবেক হিসেবে বিবেচিত। বেন্দা সেইসব বুদ্ধিজীবীদের ‘বুদ্ধিজীবী’ হিসেবে গণ্য করার পক্ষপাতী নন যারা তাঁদের নীতিবোধ জলাঞ্জলি দিয়েছেন। বরং তাঁদেরকেই বুদ্ধিজীবী বলা হয়েছে, যারা বিধিবদ্ধভাবে বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের জীবন কাটান। তাঁর লেখায় সক্রোটাস, যীশুখ্রীষ্ট, স্পিনোজা, ভলতেয়ার, আর্নেস্ট রেনানের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এঁরাই হচ্ছেন সেই প্রকৃত বুদ্ধিজীবী যাদের ভূমিকা ব্যবহারিক লক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এঁরা তাঁদের বৌদ্ধিক ভূমিকাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, আধিবিদ্যাক অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে। এককথায়, তাঁদের ভূমিকা ইহজগতের নিজস্ব-প্রাপ্তিতে আবদ্ধ নয়, বরং সকলের মঙ্গলের জন্য, সবার প্রাপ্তির জন্য।

সক্রোটাসের সুযোগ্য শিষ্য প্লেটোর লেখা থেকে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু কথা পাওয়া যায়। বুদ্ধিজীবীদের কাজ হবে রাষ্ট্রের যথাযথ কল্যাণ কী তা জানা। তাঁদের আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং আদর্শ শাসনব্যবস্থার রীতিও জানতে হবে। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের নৈতিকতা অভিন্ন হবে। ব্যক্তি নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত এবং ব্যক্তি যাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে তার জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করবেন বুদ্ধিজীবীরা—প্লেটোব ভাষায়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বা দার্শনিকগণ। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে যে তিনটি শ্রেণী থাকবে, তাদের মধ্যে কারিগর ও যোদ্ধা শ্রেণীর উপরে থাকবেন বুদ্ধিজীবী বা অভিভাবকেরা। রাষ্ট্রের প্রজ্ঞা শাসক বা অভিভাবক শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান। যখন একজন আর একজনের কাজে হস্তক্ষেপ না করে যার যা কাজ তা মনোযোগ দিয়ে করে যায় তখনই পাওয়া যায় রাষ্ট্রের ন্যায়পরায়ণতা। হস্তক্ষেপ হলো রাজনৈতিক অনায়াস।

সক্রোটাসের জবানীতে প্লেটো বলেছেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির যদি রাষ্ট্রের কর্ণধার হন, তবেই আদর্শ, ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র বাস্তবে রূপ পেতে পারে। সক্রোটাসের আদর্শ রাষ্ট্র ছিল অভিজাততান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু, যদি উঁচু স্তরের লোকেরা সংযবদ্ধভাবে নিম্নস্তরের মানুষদের সম্পত্তি করায়ত্ত করে ও তাদের দাসশ্রেণীতে পরিণত করে তবে তা হবে টিমোক্রেসি। টিমোক্রেসি ধনিকতন্ত্রে পরিণত হতে পারে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং দরিদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অবশেষে দরিদ্ররা ধনীদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিলে গণতন্ত্র আসে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার প্রতি অতি-আকর্ষণ স্বৈরতন্ত্রের সূচনা করে। এই মত পোষণ করে সক্রোটাস (প্লেটোর ভাষায়) বলেছেন, বুদ্ধির প্রাধান্য-বিশিষ্ট দার্শনিক যেমন সর্বাপেক্ষা আনন্দিত ব্যক্তি, তেমনি প্রাজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত অভিজাততান্ত্রিক রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ এবং আনন্দিত রাষ্ট্র।

জুলিয়েন বেন্দা সক্রোটাসকে অন্যতম আদর্শ বুদ্ধিজীবী ঘোষণা করেছিলেন। আমরা সক্রোটাসের বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে যে কথা জেনেছি, তা জুলিয়েন বেন্দার আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। সমস্যা হলো, সক্রোটাস বা স্পিনোজা অথবা যীশু—এঁরা সকলেই বুদ্ধিজীবীকে পরলোকের দিকে মুখ করে, নজর দিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে গেছেন।

অথচ বেস্‌দা নিজেই স্বীকার করেছেন, বুদ্ধিজীবী গজদস্তমিনারে বাস করবেন না। তিনি শুধুই ধ্যানধারণা উৎপাদন করবেন, একথা ঠিক নয়। কিন্তু ভাববাদী দার্শনিকদের বক্তব্য লক্ষ করলে আমাদের ধারণার জালে আটকে পড়তে হয়।

ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব বা চীনের বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় বুদ্ধিজীবীরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা ভাববাদী দার্শনিকদের গড়া বায়ুভুক বা নিরালস্য প্রাণী নন। মার্কস বলেছিলেন, দার্শনিক ধ্যানধারণা উৎপাদন করে, কবি লেখে কবিতা, যাজক ধর্মোপদেশ দেয়, অধ্যাপক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক প্রভৃতি। অন্যদিকে একজন অপরাধী অপরাধ উৎপাদন করে, সেইসঙ্গে উৎপাদন করে অপরাধ আইনের অধ্যাপককে; অধ্যাপকের আইন-সংক্রান্ত বইগুলোকে; এমনকি, বিচারালয়ও উৎপাদন করে ঐ অপরাধী। মার্কসের এই কথা থেকে বোঝা যায়, অপরাধীর ভূমিকা দার্শনিক, কবি বা অধ্যাপকের মতন বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা থেকে খুব পৃথক নয়। বুদ্ধিজীবী ও উৎপাদক, আর পাঁচজনের মতন। বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাকে খুব কঠোর অর্থে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বুদ্ধিজীবীদের ধ্যান-ধাবণা নামক বিশেষ ক্ষেত্র সামাজিক কাঠামোতেই উৎপাদিত হয়। ব্যবহারের ভিত থেকেই উঠে আসে বুদ্ধিজীবীর চিন্তা ও ধারণা।

স্পিনোজাও বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃত রষ্ট্রগঠনে উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন। রষ্ট্রগঠনের প্রশ্নে তিনি প্রায় সব বিষয়ে হব্‌সকে অনুসরণ করেছেন। স্পিনোজা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা অথবা স্বৈচ্ছাতন্ত্রের বিবেচী সেই গণতন্ত্র বুদ্ধিজীবীদের কাম্য বলেছেন, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব-নির্ধারিত এবং স্বনিয়োজিত নিয়মকানুন মেনে চলে। এইরকম মত স্পিনোজার 'ট্র্যাকটেটাস থিয়োলজিকো পলিটিকাস' বইতে পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁর পববর্তী বই 'ট্র্যাকটেটাস পলিটিকাস'-এ তিনি সক্রিটস বা প্লেটোর অভিজাততন্ত্রের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, নিসর্গের সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণতা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষ তার কাছে যা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, সেটাকেই ভাল বলে সে মনে করে আর তা পাওয়ার চেষ্টাও করে। সকলেই সব জিনিসের মালিক। প্রত্যেকটি মানুষ তার বিদ্বেষ বা ঘৃণার বিষয়কে ধ্বংস করতে পারে। মানুষের বিভিন্ন ইচ্ছা ও আবেগের ফলে নিসর্গের স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ-মানুষে দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয়, নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। বুদ্ধিজীবীর কাজ হলো, এটা দূর করা। দূর করবার উপায় হচ্ছে এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাতে শান্তিবিধায়ক আইনের সাহায্যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য কতকগুলো কাজ করতে এবং কতকগুলো কাজ না করতে বাধ্য করা। সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ, বিচারবুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করাও বুদ্ধিজীবীর কাজ। প্রকৃত নীতিমত্তা ও স্বাধীনতা শুধু রাষ্ট্রজীবনেই সম্ভব। আইনে বাঁধা সমাজে বেশি স্বাধীনতা পাওয়া যায় বলে বুদ্ধিজীবী নির্ভনে থাকার চেয়ে সেখানেই থাকতে পছন্দ করেন।

ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম বুদ্ধিজীবী বা চিন্তাবিদকে দু'ভাবে ভাগ করেছেন। প্রথম দল মনে করেন মানুষ কিছু কাজ করাব জন্য পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে। বস্তুর মূল্য ও উপস্থাপনা অনুযায়ী মানুষ সেই বস্তুকে অনুসরণ ও পরিহার করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর

বুদ্ধিজীবী মানুষকে শুধু ক্রিয়াশীল না বলে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে করেন। এঁরা মনে করেন, মানুষ শুধু কোনো কিছুকে অনুসরণ না করে নিজস্ব বিচারবুদ্ধি অনুসারেই কাজ করে থাকে। এই বুদ্ধিজীবীরা মানুষের বিভিন্ন আচরণের উন্নতিসাধন করার চেয়ে ধীশক্তি গঠন করার জন্য সচেষ্ট হন। এঁরা মানুষের প্রকৃতিকে গবেষণার বিষয় বলে মনে করেন এবং অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সেগুলোকে পরীক্ষা করে জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণকারী কতকগুলো নিয়মের কথা বলেন। এই নিয়মগুলো জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও চিন্তাবৃত্তিগুলোকে উদ্দীপিত করে। ফলে আমরা বস্তু, কাজ বা ব্যবহারকে সমর্থন অথবা নিন্দা করতে পারি।

হিউম দু'ধরনের বুদ্ধিজীবীদেরই সমর্থন করেছেন। সাধারণ মানুষ প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের কাজকে গুরুত্ব দেবেন, কারণ তাঁদের কথাবার্তা সহজ ও স্পষ্ট। দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম ও দূরহ। হিউম এই দু'ধরনের কাজের সমন্বয়পন্থী। একজন প্রগাঢ় চিন্তাশীল যিনি জাগতিক সাধারণ কাজের সঙ্গে যুক্ত নন, বরং সাধারণ মানুষের বোধশক্তির অগম্য কতকগুলো নিয়ম ও ধারণা দিয়ে নিজেকে আবৃত রাখেন—তিনি জাগতিক স্বীকৃতি সামান্যই পেয়ে থাকেন। আবার সম্পূর্ণ অজ্ঞব্যক্তিও নিন্দনীয়। সর্বতোভাবে উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি এই দুইয়ের মধ্যবর্তী।

গ্রামস্কি বা জুলিয়েন বেন্দ্যাব বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়ার পূর্বে কার্ল পপারের বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা পরিচয় পাওয়া আবশ্যিক। পপারের এই আলোচনাটিকে প্রথমেই দার্শনিক তত্ত্বেব আলোকে দেখে নেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, পপারই একমাত্র দার্শনিক যিনি সমাজ ও রষ্ট্রবিষয়ক তত্ত্বকে জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে উপযুক্তভাবে যুক্ত করেছেন।

পদার্থবিদ্যার জগৎকে পপার 'প্রথম বিশ্ব' বলেছেন। শিলা, পাথর, বৃক্ষ এবং বিভিন্ন ভৌত বলের ক্ষেত্র এই জগতের অন্তর্গত। রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের জগৎ প্রথম বিশ্বের অন্তর্গত। 'দ্বিতীয় বিশ্ব' হলো মানসিক জগৎ। মানুষের মনের ফসল হলো 'তৃতীয় বিশ্ব'। বুঝতে অসুবিধা নেই, বই বা লাইব্রেরি একইসঙ্গে প্রথম ও তৃতীয় বিশ্বের সদস্য। যাবতীয় মূর্ত জিনিস প্রথম বিশ্বের অন্তর্গত। মনের সচেতন বা অবচেতন যে কোনো অবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বের অঙ্গ। কিন্তু বিমূর্ত জিনিস মাত্রই তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। যেমন জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, প্রশ্ন, যুক্তি, ভ্রান্ত যুক্তি ও তত্ত্ব।

বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাকে আমরা তৃতীয় বিশ্বের সদস্য হিসেবে গণ্য করতে পারি। প্রথম বিশ্ব বা ভৌত বস্তুর জগৎ সম্পর্কে পপার বলেন, এই জগতের অস্তিত্ব আছে—কারণ, ভৌত বস্তুকে 'লাধি কমানো' যায়। একটি পাথরকে লাধি মারলে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠতে হয় নিজেকে। পাথরের অস্তিত্ব তখনই থাকে যখন তাকে লাধি কমানো যায় এবং সেও ফিরে লাধি কমাতে পারে। বাস্তব অস্তিত্ব এখানে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রমাণিত। তৃতীয় বিশ্বটি অর্থাৎ মানুষের মনের ফসল দিয়ে গঠিত 'বিমূর্ত' জগৎটিও ভৌত জগৎ ও দ্বিতীয় বিশ্বের মতো বাস্তব।

তৃতীয় বিশ্বটি দ্বিতীয় বিশ্বের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বের উপর ক্রিয়া করে। এই হলো পপারের দার্শনিক অভিমত।

পপার বিশ্বাস করতেন, সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে সমাজের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মানুষদের নেতা হিসেবে স্বীকৃত মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধার আতিশায্যে ছেদ ঘটাতে হবে। মুক্ত সমাজ থেকে বদ্ধ সমাজে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে পপার সভ্যতার সংকট বলেছেন। পপার ছিলেন দার্শনিক উদারনীতিবাদী। বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ হলো মেধাগতভাবে উদার হওয়া। বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মূল্য দেবেন এবং সকল প্রকার ক্ষমতার ও কর্তৃত্বের অভ্যন্তরীণ বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। পপারের উদারনীতিবাদ কোনো বদ্ধ তত্ত্ব নয়। এই তত্ত্বটি প্রসারিত হতে পারে, উন্নত হতে পারে সামাজিক মানুষের ক্রমাগত প্রচেষ্টায়।

পপারের কয়েকটা কথা বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা প্রসঙ্গে গুরুত্ব অর্জন করতে পারে। কোনো একটা ভাবনা ভাষায় রূপ ধারণ করলে ব্যক্তিচেতনার বাইরে একটা ‘সত্তা’ হয়ে ওঠে। কোনো একটা ভাবনাকে নিজের মধ্যে রেখে দেওয়া এবং সেটাকে ভাষায় রূপ দেওয়া—এই দুটো পৃথক ব্যাপার। ভাবনা যখন মাধ্যম ঘূরপাক খায়, তখন সেটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভিটগেনস্টাইনের ‘ব্যক্তিগত ভাষা’র মতন সেটা প্রায় ‘অর্থহীন’। কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনা যখন ভাষায় রূপ পায় তখন সেটা পপারের ‘তৃতীয় বিশ্ব’র অঙ্গীভূত হয়ে যায়। ‘তৃতীয় বিশ্ব’র উপাদানগুলোর ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আলোচনা-সমালোচনা আমাদের বাস্তব জীবনে চলতে সহায়তা করে।

পপারের বুদ্ধিজীবী-প্রসঙ্গ তিনটি বিষয়ের উপর ভীষণভাবে নির্ভর করে। মানবিকতাবাদ, সমতাবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। বুদ্ধিজীবীর কাজকর্ম এই তিনটি ‘বাদ’-এর উপর নির্ভর করেই চলবে। সক্রটিসের মতন পপারও রাষ্ট্রগঠনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তিকে চূড়ান্ত মূল্য বলে গ্রহণ করা উচিত। পপার তাঁর উদারনীতিবাদে কান্টের ‘স্বনিয়ন্ত্রণ’ ও ‘আত্মসম্মত’কে ব্যক্তির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। পপারের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমগ্রতাবাদ বিরোধী মতবাদ। রাষ্ট্রকে তিনি একটি অনিবার্য মন্দ প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করেন। গণতন্ত্রকে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা না বললেও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে মানুষ সংঘবদ্ধ জীবন কাটাতে পারে বলে বিশ্বাস করতেন। গণতন্ত্র ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আর ঐতিহ্য সমাজের নৈতিক পরিকাঠামো গঠন করে। সামাজিক জীবনে ভাল মানুষ অপেক্ষা ভাল প্রতিষ্ঠানকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভাল মানুষকেও দুর্নীতি পরায়ণ করে তুলতে পারে। কিন্তু সমাজে যদি এমন প্রতিষ্ঠান থাকে যার মাধ্যমে শোষিত-অত্যাচারিত মানুষ নিজেদের দাবি তুলতে পারে তাহলে শাসকও তাদেব প্রতি মর্যাদা জ্ঞানতে বাধ্য হতে পারে। বুদ্ধিজীবীদেরই এই দায়িত্বটা গ্রহণ করতে হবে।

এডয়ার্ড শিলস্ মনে করেন বুদ্ধিজীবীর কাজ হলো মূলত ‘বৌদ্ধিক ক্রিয়া’ সম্পাদন।

সমাজে যে প্রচলিত সংস্কৃতি আছে তাকে বহন করা, বর্ধন করা এবং প্রয়োজনে আধুনিক করে তোলার জন্য চায় বৌদ্ধিক ক্রিয়া। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘকালীন ও ঘনিষ্ঠ মত-বিনিময়।

উচ্চ সংস্কৃতির পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্য ও তার উন্নতির জন্য বুদ্ধিজীবীদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। অবশ্য বুদ্ধিজীবী মাত্রেরই সহজাত প্রবণতা থাকে, এই ধরনের কাজে এগিয়ে আসার। এই প্রবণতা শুধুমাত্র প্রচলিত বুদ্ধিজীবীদের ধারণা দ্বারা নির্ধারিত হয় না—এই প্রবণতার উপর সামাজিক প্রেক্ষিতের প্রভাব থাকে যথেষ্ট। প্রাথমিক বৌদ্ধিক-উৎপাদনের একটি নিষ্ফল ক্ষেত্র আছে, যেটি কাজ করে প্রচলিত ব্যবস্থার উপর কিন্তু পুরনো ভাবনাকে উন্নত, পরিশোধিত ও বিবর্তিত করার ক্ষেত্রেও এটি ক্রিয়া করতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও নিজস্বতার স্বীকৃতি পাওয়া যায় অথবা নতুন আবিষ্কারকে উদার মানসিকতায় স্বাগত জানানো হয় সেইসব ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক-উৎপাদনের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের একপ্রকার দায়বদ্ধতা থাকা জরুরি। এমনকি যেসব সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না বা যেসব ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত যে-সমস্ত ক্ষেত্রগুলোকে নিয়ে কাজ হয় নি কিংবা যে প্রতিবন্ধকতাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, সেইসব ক্ষেত্রগুলোকে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মানসিক শক্তি দিয়ে অতীতের গহ্বর থেকে টেনে বের করে নতুন আলোয় আধুনিক ভঙ্গীতে দেখার চেষ্টা করবেন। বিস্মৃতির এই প্রক্রিয়ায় যেখানে সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন ব্যাপকতর হয়, সেখানে নতুন ও পুরনোর মধ্যকার বিরোধের পথ খুলে যায়। প্রতিটি বুদ্ধিজীবী-প্রজন্ম এই বিস্মৃতির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবেন তার নিজের ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

শিল্প আরও মনে করেন, একটি সমাজের এক প্রজন্মের খুব ছোট একটা অংশ সেই সমাজের সংস্কৃতি ও সাহিত্যভাণ্ডারকে আরও সম্পদশালী করে তোলে। উৎপাদনশীল বুদ্ধিজীবীকে যে-কোনো প্রজন্মেই পুনরুৎপাদনশীল হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়, যদিও তার মাত্রার তারতম্য থাকতে পারে। যেসব বুদ্ধিজীবীর স্বকীয়তা বেশি, তাঁরা দ্বিমুখী ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকেন—সংস্কৃতির সৃজন ও তার বিকাশ। প্রথমত, তাঁরা নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির সূচনা করেন; দ্বিতীয়ত, তাঁরা কতকগুলো মডেল তৈরি করে দেন যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা সেই মডেলকে সামনে রেখে নিজেদের কাজকে সংশোধন করতে পারেন ও নিজেদের প্রতি আস্থাশীল থাকতে পারেন। মনে হয়, শিল্প এখানে জুলিয়েন বেন্দার বুদ্ধিজীবী-প্রসঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

উৎপাদনশীলতা ও পুনরুৎপাদন এই দুই বিষয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য কিন্তু এদের বিস্তারে নয়। পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ে দেখা যায়, পুরনো বৌদ্ধিক ক্রিয়াকর্মকে অনুসরণ করা হচ্ছে। এই কথাটি সেইসব বুদ্ধিজীবী-ধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে বিবর্তনটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক প্রথা মেনে বিবর্তিত হয়। এর ফলে অপেক্ষাকৃত কম বৌদ্ধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ একধরনের নিষ্ফল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারেন এমনকি যে ক্ষেত্রে সৃজনশীলতাকে সক্রিয়ভাবে আক্রমণ

করা হয় না সে ক্ষেত্রে অতীতের প্রতি একনিষ্ঠতা নতুন কাজের গতিকে ও নতুন বিশ্বাসকে অনেকটাই ব্যাহত করে। অন্যদিকে, যেখানে শিক্ষণপদ্ধতি খুব যথাযথ নয় বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন ও পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষতা কম, সেসব ক্ষেত্রে স্বজনশীলতা খুব দ্রুত পুনরুৎপাদনশীলতার দিকে ঝুঁকে যায়। এইসব ক্ষেত্রে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে বিরোধ অপেক্ষাকৃত বেশি।

যে কোনো বৌদ্ধিক ক্রিয়ার প্রাথমিক শর্ত হলো তা শুধুমাত্র নিজের সমাজের সীমিত বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজনে ব্যবহার হবে না, তাকে হয়ে উঠতে হবে সর্বজনীন। অনেক জায়গায় দেখা যায় বুদ্ধিজীবীরা সচেতনভাবে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখেন, তার ফলে অন্য সমাজের প্রতিনিধি হওয়া দূরের কথা, নিজের সমাজেই তাঁরা নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেন। একই প্রজন্মেব বুদ্ধিজীবীরা যখন একই ধরনের বৌদ্ধিকক্রিয়া সম্পাদন করেন, তখন তাঁদের মধ্যে সেই ক্রিয়াবিষয়ক ভাব বিনিময় করাটা জরুরি। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সূচনাপর্বে—ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মধ্যপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে এই ধরনের বৌদ্ধিক বিনিময় ঘটানোর চেষ্টা করেছিল। রোমের রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রের যুগেও বুদ্ধিজীবীরা গ্রীক বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন। একসময় চৈনিক বুদ্ধিজীবীরা জাপানের পথপ্রদর্শক হয়েছেন। আধুনিককালে ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা, বিশেষত যারা অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ বা লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকসের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের আদর্শ সামনে রেখে কাজ করছেন আফ্রিকা ও ভারতের কিছু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ঊনবিংশ শতকের জার্মানির বুদ্ধিজীবীরা সারা বিশ্বের কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে শিল্প ও সাহিত্য-জগৎ সমগ্র বিশ্বের নন্দনতত্ত্বকে নতুন দিশা দেখিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি নবজাগরণ সমসাময়িক স্পেন, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও ইটালির ভাবজগতকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবনায় অনুপ্রেরিত করেছে।

‘সর্বজনীন সংস্কৃতি’ কথাটি সমাজের নৈতিক একাত্মতার বোধের সঙ্গে জড়িত। যদিও বেশিরভাগ সমাজ বস্তুতপক্ষে পরিধি ও জনসংখ্যার নিরিখে এতটাই বিশাল হয় যে সরাসবি সংযোগ সেখানে প্রায় অসম্ভব; সেক্ষেত্রে সর্বজনীন সংস্কৃতির বিকাশ নির্ভর করে মূলত পুনরুৎপাদনশীল বৌদ্ধিক প্রতিষ্ঠান যথা, স্কুল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সংবাদপত্রের উপর। এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এক-একজন মানুষ সমাজের অন্য ব্যক্তিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। একই সমাজের সদস্য হিসেবে তাদের অস্তিত্ব গড়ে ওঠে, যার থেকে তৈরি হয় জাতীয় সমাজভাবনার সূত্র। সর্বোপরি, এইসব বৌদ্ধিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে প্রাপ্ত বয়স্ক ও অল্পবয়সীবা কিছুটা হলেও প্রাতিষ্ঠানিক প্রথা সম্পর্কে বা তার উপাদান সম্বন্ধে বুঝতে ও বিশ্বাস করতে শেখে। এইভাবে বক্তৃতা, শিক্ষাপ্রদান বা লেখনীর মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী সমাজের সেই শ্রেণীর মধ্যে কিছুটা অন্তত চিন্তার বীজ বপন করতে পারেন, যাদের মধ্যে চিন্তার প্রবণতা ততটা নেই বা নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি যাদের কোনো কারণে আস্থা তৈরি হয় নি। পড়ালেখা ও

হিসেব করার প্রযুক্তির মাধ্যমে অমজ্জনতা বৃহত্তর বিশ্বে প্রবেশের সুযোগ পায়। গোষ্ঠী, গ্রামীণ বা আঞ্চলিক সংস্কৃতির কথা বাদ দিয়ে যদি জাতীয়তাবাদী সৃষ্টির কথা ধরা যায় তবে দেখা যাবে, আধুনিকযুগের গোড়ার দিকে শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিকরা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয়তাবাদের ধারণাকে গড়ে তুলেছে; এমনকি ছোট ছোট গোষ্ঠীর বিভেদ ভেঙে আমেরিকা যে একটি জাতি হিসেবে নিজেকে দাঁড় কবতে পেরেছে তার পিছনে চিরাচরিত বুদ্ধিজীবী (শিক্ষক, পাদ্রী প্রভৃতি) ও সাংগঠনিক (অর্গ্যানিক) বুদ্ধিজীবীদের অবদান ছিল প্রধান।

কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি অথবা আপত্তির ওপর বৌদ্ধিক ভাবনার অস্তিত্ব অনেকখানি নির্ভরশীল। সমাজে প্রচলিত প্রথাসমূহ যদি না থাকতো তাহলে সৃজনশীলতা কাকে চ্যালেঞ্জ জানাতো? আসলে কর্তৃপক্ষ বুদ্ধিজীবীর ভাবনাকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত করে; বিশেষত তাঁদের, যাঁবা প্রাথমিকভাবে বৌদ্ধিক উৎপাদনে সক্ষম। কর্তৃপক্ষ চায় এমন সব ক্রিয়াকর্ম যা অবশ্যপ্রয়োজনীয় ও দৃষ্টিক এবং এইসব ‘পবিত্র’ ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কাজকেই স্বীকৃতি দেয়। রাজনৈতিক পাণ্ডুরা চায় বুদ্ধিজীবীদের স্বীকৃতি, সমর্থন ও সাহায্য। তারা কিন্তু উচ্চ পরিচালনক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীর নাকগলানো চায় না, এমনকি তাঁদের কার্যপরিচালনার সমালোচনা শুনতেও রাজি নয়। এখানেই বুদ্ধিজীবী ও কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব কেন্দ্রীভূত হয়। উন্নত সংস্কৃতি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রথার সঙ্গে যেসব বুদ্ধিজীবী সক্রিয়ভাবে যুক্ত, তাঁরা বিচারব্যবস্থা ও রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষত চীন, ব্রিটেন, স্বাধীন ভারত, ওটোমান সাম্রাজ্য এবং আধুনিক ইউরোপের ক্ষেত্রে এই ভূমিকাটা খুব সক্রিয়। অবশ্য এব বিপরীত উদাহরণও আছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে বুদ্ধিজীবীদের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হতো না; বুদ্ধিজীবীরা ব্যবসায় উদ্যোগ নিতেন না, ঝুঁকি নিতেন না বলাটাই সম্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে দেখা যাচ্ছে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথমে জার্মানিতে, পরে আমেরিকা ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানীদের গবেষণার কাজে লাগাতে শুরু করলো এবং কিছু কিছু জায়গায় বুদ্ধিজীবীরা সাংগঠনিক কাজেও নেমে পড়লেন, যাঁরা গ্রামস্কির ভাষায় অর্গ্যানিক ইন্টেলেকচুয়াল নামে পরিচিত হলেন। শিল্পকেন্দ্রিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা শিল্পক্ষেত্রের পরিস্থিতি আমূল বদলে দিয়েছে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। রাজ্য পরিচালনার কাজ সম্ভ্রমজনকভাবে কবতে গেলে কলাবিভাগ-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-আইন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন এবং সেইসূত্রে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা পরীক্ষার ব্যবস্থা যে প্রয়োজনীয় তা সব সার্বভৌম রাষ্ট্রই অনুধাবন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতিমগ্ন মানুষকে নিয়োগ করা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা সর্বজনস্বীকৃত না হয়ে উঠলে বোধহয় আধুনিকতার বিকাশ এত ত্বরান্বিত হতো না।

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্বিমুখী—একদিকে তাঁকে পুরাকাল সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, পাশাপাশি তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা হতে হবে

প্রশ্নাতীত। তবেই তিনি এই জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নির্দেশক, শিক্ষক বা ব্যক্তিগত প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করতে পারবেন। সিরাকুসের সঙ্গে প্লেটো, অ্যারিস্টটলের সঙ্গে আলেকজান্ডার, অ্যালকুইনের সঙ্গে Charluseghe, শার্লম্যান ক্যালেরডস-এর সঙ্গে চার্লস (প্রথম), দ্বিতীয় চার্লসের সঙ্গে হব্‌স-এর ভাববিনিময় প্রাথমিকভাবে মনে পড়ে যায়। মিন্টেনের সঙ্গে ক্রমওয়েল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তী সময়ে লর্ড কেইনসের অভিজ্ঞতা ভাণ্ডার এবং সর্বোপরি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডির যে পারিষদবর্গ—এদের দেখে একটিই সত্যি উঠে আসে তা হলো গোটা বিশ্বের ইতিহাস জুড়ে আমরা দেখতে পাই বুদ্ধিজীবীদের ভাবনা, উপেক্ষা, অভিজ্ঞতা বাজনীতির ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে এবং তাদের স্বীকৃতি যথার্থ মূল্যও পেয়েছে। অপরপক্ষে বহু দেশ এবং বহু যুগে দেখা গেছে, বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। Wilhelm II-এর সময় শিক্ষিত শ্রেণীকে কোনও ভাবেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, চিনের ইতিহাসেও দেখা গেছে বুদ্ধিজীবীদের ভাবনা ও চিন্তাকে শাসকগোষ্ঠী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন। আমেরিকার ইতিহাসেও জ্যাক্সোনিয়ান বিপ্লব থেকে উড্রো উইলসনের ‘নয়া উদারনীতি’র সূচনার আগে পর্যন্ত সরকারের উচ্চ পরিচালন গোষ্ঠী বা আইনি শাখায় বুদ্ধিজীবীদের ন্যূনতম জায়গাটুকুও দেওয়া হয়নি।

রাষ্ট্র ও সরকারের উপর মহলে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান রাজতন্ত্রে তেমন ভাবে দেখা যায়নি, যতটা গণতন্ত্রে তার ছাপ পড়েছে। রাজতন্ত্রে মাঝেমাঝে বুদ্ধিজীবীদের প্রবেশ ঘটেনি এমন নয় তবে তা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র, কখনোই সচেতন নির্বাচন নয়। অশোক, মার্কাস, অরিলিয়াস এবং ইখনটন হলেন সেই সব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি যারা আকস্মিকভাবে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। উনবিংশ এবং বিংশ শতক জুড়ে আমরা দেখি যে উদারনৈতিক দলীয় গণতন্ত্রে এমন অনেক উৎপাদনশীল বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটেছে যারা শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান তৈরী করে নিয়েছেন তাই নয়, তাঁদের এই অবস্থানটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে দেশীয় রাজনীতিতেও। এঁদের মধ্যে নাম করতেই নয় বেঞ্জামিন ডিজারেলী, উইলিয়াম গ্র্যান্ডস্টোন, Grancois Guizot, উড্রো উইলসন, জওহরলাল নেহরু, Thomas Masaryk, Luigi Einandi, Emintore, Fanfani, হ্যারল্ড উইলসন এবং Ludwig Erhard-এর। এইসব নামগুলি কিন্তু আদৌ আকস্মিকভাবে রাজনীতিতে আসেনি। উদারনৈতিক সংসদীয় আধুনিক রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে এবং ঔপনিবেশিক অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে তাই নয়—এই ধরনের আন্দোলনকে বুদ্ধিজীবীর রাজনীতি বললেও অত্যাুক্তি হবে না। আসলে এগুলি ছিল আদর্শবাদী কিছু কর্মসূচি যাতে অহেতুক রাজনীতির রঙ চড়ানো হয়েছে।

আধুনিককালের প্রথম দিকে পশ্চাত্যে, উনবিংশ ও বিংশ শতকে প্রাচ্য ও পশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের যে কণ্ঠস্বর আমবা শুনি তা আসলে রাজনৈতিক ভাষণ নয়—তার পিছনে প্রকাশিত হয়েছে আদর্শগত মতবাদ। আসলে আধুনিক সাংবিধানিক

ও উদারনৈতিক রাজনীতির জন্ম দিয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা যাতে তাঁরা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন সেইসব সমাজব্যবস্থার প্রতি যেখানে শাসকগোষ্ঠী জমি দখল করে নেয় অথবা যেখানে রয়েছে মিলিটারি রাজ। বুদ্ধিজীবীদের এই প্রয়াসটা আসলে নিজেদের আদর্শকে প্রকাশ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

কখনো বুদ্ধিজীবীরা ভাববাদী রাজনীতিকে জনসমক্ষে প্রচার করেন এবং তাকে উৎসাহিত করার মধ্যে দিয়েও নিজেদের আদর্শকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন, যেমন অনেকক্ষেত্রে তাঁরা প্রথাগত সাংবিধানিক নিয়মকে ভেঙে বিপ্লবের কথা বলেছেন। এই ধরনের ভাববাদী রাজনীতির চরিত্র মূলত বৈপ্লবিক, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ষড়যন্ত্র, প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যহীনতা এবং তাকে ধ্বংস করার প্রবণতা—এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের জড়িয়ে ফেলা হয় ঠিকই কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের ধারণা আর ভাববাদী বিপ্লববাদ—এই দুইয়ের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট সামঞ্জস্য স্পষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজনীতিকে ও জনজীবনকে সম্পূর্ণ ভাববাদের দ্বারা চালনা করা এবং অবিরত নতুন প্রথা ও ভাবনাকে দিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও বিরোধিতা চলতে থাকে। এই ধারণার বাহক হলো সেইসব তরুণ বা যারা এখনও কোনও স্থায়ী বৌদ্ধিক পেশায় যুক্ত নয় সেই বোহেমিয়ান বুদ্ধিজীবীরা, সেইসব শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় যারা অনুন্নত দেশে বাস করে এবং বেকার, পুঁজির কিছু এমন ব্যক্তি যারা স্বক্ষেত্রে ইতিমধ্যে নিজেদের স্থাপন করতে পারলেও তাদের ‘অস্বাভাবিক’ চেতনা তাদের নৈতিক বিবেককে ভীষণ ভাবে আলোড়িত করে।

একথাও ঠিক যে, সব বুদ্ধিজীবীরা মোটেই এই ভাববাদী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন না। রাজনৈতিক নিয়মকানূনের প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্য ও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, নিষ্ক নিষ্ক বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে অরাজনৈতিকভাবে মনোযোগী হয়ে কাজ করা এবং প্রচলিত ধারার প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রেখে কাজ করে যাওয়া—এসব বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আবার অনেকেই ভাববাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকে তাদের কাজের চরম পরিপূর্ণতা বলে মনে করে থাকেন। একথা বলা আবশ্যিক যে বৌদ্ধিক ক্রিয়ার মূলস্রোত সঙ্কানের কাজ আজও অব্যাহত। সম্ভবত সেটা হলো দর্শনের কাজ। ইমানুয়েল কাণ্ট যার চেষ্টাও করেছিলেন।

মার্কিন বুদ্ধিজীবী এডয়ার্ড সাইদ মনে করেন, গ্রামস্কি যেভাবে একজন বুদ্ধিজীবীকে একজন ব্যক্তি হিসেবে সমাজে তার নির্ধারিত কতকগুলো কাজের জন্য সামাজিকভাবে যাতায়াত করার চেষ্টা করেছেন তা জুলিয়েন বেন্দার ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব। স্ত্রুত একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যেখানে অনেক বেশিসংখ্যক নতুন পেশার উদ্ভব হয়েছে—যেমন শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পেশা, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ সংবাদ সম্প্রচারক, কীড়া-সংক্রান্ত আইন-বিশেষজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট, বিমা-বিশেষজ্ঞ, সরকারি ঠাপস্টা, অর্থনৈতিক বাজারবিশেষজ্ঞ, এককথায় যেখানে গণমাধ্যমের বিভিন্ন দিক খুলে যাচ্ছে এবং নিত্যানতুন পেশার উদ্ভব হচ্ছে সেখানে গ্রামস্কির দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক বলে বিবেচিত হয়।

গ্রামস্তির মতে, আজকের দিনে যে কোনো কাজ, যাতে ব্যক্তি কোনো-না-কোনোভাবে বৌদ্ধিক উৎপাদন বা বিতরণের সঙ্গে যুক্ত, তাকেই বুদ্ধিজীবী বলা চলে। অধিকাংশ শিল্পনির্ভর পাশ্চাত্যসমাজে প্রজ্ঞাশিল্প বা নলেজ-ইনডাস্ট্রি ও কায়িক শ্রমের মধ্যে আনুপাতিক তুলনা করলে দেখা যাবে প্রজ্ঞাশিল্পের পাল্লাটা একনাগাড়ে ভারী হচ্ছে। আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক অলভিন গাউন্ডনার উদ্ভবের আগেই বুদ্ধিজীবী-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এঁরা এক নতুন শ্রেণী যারা খুব সুন্দরভাবে পুঁজিবাদীদের বাদ দিয়ে সমাজে স্থান করে নিচ্ছেন। তবে তিনি বুদ্ধিজীবীদের উত্থান প্রসঙ্গে এও বলেছিলেন যে, এঁরা কিন্তু বৃহৎ জনগোষ্ঠী নয়, এঁরা হলেন একটি সমালোচনামূলক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য। প্রত্যেকটি বুদ্ধিজীবী—সম্পাদক অথবা লেখক, সামরিক কৌশল বিশেষজ্ঞ বা আন্তর্জাতিক আইনবিশেষজ্ঞ যাই হোন না কেন, এমন একটি ভাষায় কথা বলেন ও নিজের ভাবনাকে ব্যাখ্যা করেন যা তিনি বিশেষ শিক্ষার মাধ্যমে নিজেই রপ্ত করেছেন এবং তাঁর ঐ ভাষা-তাঁর বৃত্তের অন্যসব সদস্য অনুধাবন করতে পারলেও সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় না।

ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো বলেছেন, তথাকথিত আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী যারা (সম্ভবত তিনি জাঁ পল সার্ত্রের কথা বলতে চেয়েছেন) তাঁরা নিঃসন্দেহে একটি নির্দিষ্ট বিষয়েই বিশেষজ্ঞ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা অন্য কোনো জায়গায় বা মাধ্যমেও কাজে লাগাচ্ছেন। ফুকো বিশেষভাবে ভেবেছিলেন মার্কিন পদার্থবিদ রবার্ট ওপেনহেইমারের কথা যিনি তাঁর নির্ধারিত ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে কাজ করেছেন—১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল অবধি ওপেনহেইমার আগবিক বোমা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অথচ পরবর্তীকালে তিনি আমেরিকার বৈজ্ঞানিক মহলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করেন।

সাইদের মতে, প্রতিটি বুদ্ধিজীবী হলেন একজন ব্যক্তিমানুষ যাঁর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করার এবং নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে, তা কথাবলা বা শিক্ষাপ্রদান অথবা দূরদর্শনে বক্তৃতা প্রদান কিংবা লেখনীর মাধ্যমে ঘটতে পারে। নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা ব্যাপারটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমেই জনগণের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠা যায়—এটার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে দায়বদ্ধতা, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, দৃঢ়তা ও আঘাত করার শক্তিকে। সাইদ যখন সার্ত্রের অথবা রাসেলের লেখা পড়েন, তখন তাঁদের লেখার মধ্যে যে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ফুটে ওঠে, তা একজন শিল্পোদ্যোগী বা আমলার কাজের মধ্যে তিনি দেখতে পান না।

আজকের দিনে বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে নিজেদের তুলে ধরছেন—এই প্রশ্নের একটি সং ও ভাল উত্তর পাওয়া যায় আমেরিকার সমাজতত্ত্ববিদ সি. রাইট মিলসের বক্তব্যে। মিলস একজন তীব্র সামাজিক সচেতন বুদ্ধিজীবী যিনি স্পষ্টবাদী ও আবেদনপূর্ণ রচনার দ্বারা অত্যন্ত সূচারুভাবে নিজের বক্তব্যকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেন। ১৯৪৪ সালে তিনি লিখেছিলেন, স্বাধীনভাবেই একজন বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হন ;

কখনও কখনও এইসব বুদ্ধিজীবীরা জীবনের প্রান্তসীমায় এসে ক্ষমতাহীনতার বোধে জর্জরিত হন। আবার কোনো সময়ে তাঁদের সামনে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাতে তাঁদের কোনো প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দিতে হয়—সরকার অথবা পুরসভার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট দলে ঢুকে কিছু জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে হয় যাতে অন্য কারো প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে না। একজন ডাড়াটে লোক হিসেবে কোনো তথ্যশিল্পে (Information industry) কাজ করায় তাঁদের মানসিক সঙ্কট বেড়ে যায়।

মোন্দা কথা হলো, অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রচারের উপকরণগুলি বুদ্ধিজীবীদের অস্ত্র এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা এগুলোকে ব্যবহার করেন নিজেদের প্রয়োজনমুতক। মিলসের মতে, একজন স্বাধীন শিল্পী বা একজন বুদ্ধিজীবী হলেন সেইসব অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক মানুষের প্রতিভা যাঁরা প্রকৃত জ্যাস্ত বস্তুর একঘেয়ে ও নিরন্তর ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ও লড়াই করতে সক্ষম। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনা প্রচারমাধ্যমকে সাবলীল করে তুলছে এবং তা ক্রমাগত একঘেয়ে ও যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে, স্ত্রানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে তথ্য। গণশিল্প ও গণচিত্রের এই জগৎ রাজনীতিকেও প্রভাবিত করছে। রাজনৈতিক সংগ্রামকে সততার মূল্যের সঙ্গে একাত্ম কবটি জরুরি কাজ।

মিলসের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরোধ। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও ক্ষমতার সঙ্গে সংখ্যালঘু, নিম্নপদস্থ, কম সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীসমূহের একটা মৌলিক প্রভেদ আছে। এডওয়ার্ড সাইদ অবশ্য মনে করেন না, বুদ্ধিজীবীরা ঐ দ্বিতীয় দলের সঙ্গেই আছে। অনেকটা রবিন হুডের মতো। তবে এই ভূমিকাটাও অতটা সরল নয় যে তাকে রোমাণ্টিক ভাববাদের নাম দিয়ে সহজেই বাতিল করা সম্ভব। বুদ্ধিজীবীরা না পারে কোনো কিছু শাস্ত করতে, না পারে কোনো কিছু সচেতনভাবে গড়তে, বরং বলা ভাল তারা সবসময় একটা জটিল মানসিক অবস্থার মধ্যে ঘুরপাক খায় যেখানে প্রচলিত ধারণা ও ক্ষমতাসালী গোষ্ঠীর চাপিয়ে দেওয়া সহজ সমাধানসূত্র, ক্রিশে ধারণা, আপাত আরামদায়ক সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে মেনে নিতে মন চায় না। শুধু মন চায় না, তাই নয়—সেই মেনে না-নেওয়াটাকে তাঁরা সোচ্চারে জনগণের কাছে প্রকাশও করে থাকেন।

বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা তৈরি হয় কোনো একটা প্রেক্ষিত থেকে, প্রয়োজন থেকে। তাঁদের যে ধারণা থেকে ভূমিকা তৈরি হয় সেই ধারণাগুলোও নির্মিত। তাঁদের ধারণার অথবা আদর্শের অথবা তত্ত্বের আবেষ্টন থেকে বেরনো জরুরি, কারণ প্রেক্ষিত ও প্রয়োজন বদলায়। তত্ত্ব অথবা ধারণা কালাতীত নয়, পরিপ্রেক্ষিত আর অনুযায় বদলের সঙ্গে সঙ্গে ধারণা বদলায়। সুতরাং বুদ্ধিজীবীদের অনড় ধারণা এবং তত্ত্বেরও বদল দরকার, বেরনো দরকার মনগড়া আবেষ্টন (ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন দেশে) থেকে। বুদ্ধিজীবীর একটা নিটোল-ভূমিকা আছে, একথা মনে করার হেতু নেই, বরং তাৎক্ষণিক-ভূমিকাটি তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে গড়ে তোলা দবকাব। বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা হবে মূলত গণতান্ত্রিক, যেখানে থাকবে ‘যত মত, তত পথ’। এই নব্য-প্রয়োগবাদ অথবা

‘বিনির্মাণ’কে বুদ্ধিজীবীদের গ্রহণ করে এগনো খুব দরকার, বিশেষত বিশ্বায়ন নামক একটি জটিল প্রক্রিয়ার দিকে যখন আমরা এগোচ্ছি। যুক্তির সাহায্যেই বুদ্ধিজীবীদের প্রাচীন অকেজো যুক্তির আবেষ্টন খুলে ফেলতে হবে। রিচার্ড রোরটি বলেছিলেন, “The result of genuinely original thought, on my view, is not so much to refute or subvert our previous beliefs as to help us to forget them by giving us a substitute for them.” [“Is Derrida a Transcendental Philosopher ?” : Essays on Heidegger and Others, Philosophical Papers, Vol. II, Cambridge, 1991, P. 121]। সাম্প্রতিক সমস্যার সমাধান-প্রসঙ্গে বেশি ইতিহাস না-ঘাঁটাই শেষ বলেই রোরটি মনে করেছেন। তবে সমাধান-প্রসঙ্গে আধুনিকোত্তর হওয়া মানে যুক্তি, চিন্তা, তত্ত্ব, ধারণা—এক কথায় দর্শনচর্চা ছেড়ে দেওয়াটা বুদ্ধিজীবীর কাজ হতে পারে না। দেরিদা একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “আমি মনে করি না দর্শনের দিন শেষ।... দর্শনের ক্রোজার আমাদের ভাবনার সুযোগ এনে দেয় ; মৃত্যুর সঙ্গে এটা তুলনীয় নয়, নয় অস্তিমের সঙ্গে...দক্ষতা প্রদানের জন্য...আমাদের চাই দার্শনিক প্রতিষ্ঠান।” [Raoul Mortley (Ed.) French Philosophers in Conversation]। কার্ল পপারও ভাল ব্যক্তির চেয়ে ভাল প্রতিষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। যে প্রতিষ্ঠান হতে পারে মুক্ত সমাজের বিবেক।

বিশ্বায়ন : বিজ্ঞান ও কৌশল

বিশ্বায়ন ও বাণিজ্য । সবিতা গুহ

বিশ্বায়ন ও চিন । নারায়ণ সেন

হিপ হপের মাধ্যমে আফ্রিকার চ্যালেঞ্জ । ক্যাথারিন হেন্ডারসন

অন্ধকার আফগানিস্তান : আলোকিত বিশ্ব । মহসীন মরমলবাহ

চতুর্থ

বিশ্বায়ন ও রাশিয়া

সবিতা গুহ

অর্থনীতিশাস্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা Adam Smith দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য অবাধ বাণিজ্য নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনগোষ্ঠীর রূপ বিভিন্ন। প্রত্যেক দেশ যদি তার কাঁচামাল, কর্মদক্ষতা ও প্রযুক্তি কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে তবে তার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা খোলা অবাধ বাণিজ্যনীতি বিভিন্ন দেশের সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহার আনবে। প্রতিযোগিতা দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে সামগ্রিক ভাবে। সুতরাং মানব জাতি উপকৃত হবে। এই নীতির আংশিক প্রয়োগ এক সময় Smith এর জন্মভূমি ইংল্যান্ডে প্রগতির দ্বারা খুলে দিয়েছিল। অবশ্য এর মূলে ছিল সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ থেকে সুলভে কাঁচামাল নিয়ে আসা ও শিল্পদ্রব্যগুলি সেখানে অবাধে বিক্রয় করা। অর্থাৎ নীতিগতভাবে বলতে গেলে এই বাণিজ্যের মধ্যে উভয়ত দিক থেকে ‘অবাধ’ ব্যাপারটি অনুপস্থিত ছিল।

পুরানো ইতিহাসকে পিছনে রেখে পববর্তীকালের বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সব দেশেই এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ রয়েছে। নিজের দেশের বাজারে বিদেশি দ্রব্যের ঢালাও অনুপ্রবেশে বাধা দেবার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। আর বাধাহীন বাণিজ্য দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেবার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব বিধি নিয়ম বারে বারে রচিত হচ্ছে সেগুলি উন্নতদেশের পক্ষেই বেশি সুবিধাজনক।

১৯৯০ এর দশকে বিশ্বায়নের একটি নতুন ঢেউ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলি ছিল দুটি গোষ্ঠীতে ভুক্ত—ধনতান্ত্রিক দেশ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। প্রথম শ্রেণীভুক্ত দেশগুলিতে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানায় লভ্যাংশের দিকে নজর রেখে গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্যের বাধা নিষেধ ছিল না। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর দেশগুলির উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ছিল। নীতিগতভাবে বলতে গেলে লাভের আশা নয় সমাজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদন। বিভিন্ন জিনিসের যোগান অচেল নয়, তাই লেনদেনের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কোন কোন বিষয়ে বিশেষ পাবদর্শিতা লাভ করলেও সামগ্রিকভাবে এদের ভোগস্বত্ব ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় অনেক নিচে ছিল। এসব দেশে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নানা জিনিষ তৈরি হয় না—সুতরাং ভোগেব প্রাচুর্য আসবে কেমন করে? ভোগের স্বল্পতা আব সেই সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাবই বলতে গেলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের মুখ্য কারণ। এই ভাঙনের স্রোত সোভিয়েত রাশিয়াকে ভেঙেচুরে ছোট বড় নানান রাজ্যের রূপ দিল।

আধুনিক রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর কাছে সোভিয়েত রাশিয়ার উত্তরসূরী। নতুন রাশিয়া বিভিন্ন দেশের পণ্য আহরণ করে ভোগ-স্তর বৃদ্ধিতে উৎসুক। সেজন্যই লৌহ যবনিকা ভেঙে পৃথিবীর দরবারে সে হাজির।

১৯৯১ এর আগস্ট মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন বর্তমান যুগের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৯১ এর ডিসেম্বরে গোরবাচব রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিলেন। রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অস্থিরতা এনে দিল। পুরানো সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজ্যগুলি এক উৎপাদন কাঠামোর অঙ্গীভূত ছিল। তাদের নিজস্ব পরিকাঠামোর ভিতর একধরনের লেনদেন পদ্ধতি বিগত সত্তর বছর ধরে চালু ছিল। এখন প্রত্যেকে স্বশাসিত হয়ে কিভাবে উৎপাদন ও বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলবে সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিল। বিশেষত আর্থিক বাণিজ্য সম্বন্ধে এদের অভিজ্ঞতা ছিল না।

বিশ্ব আর্থিক সংস্থার সঙ্গে রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হলো ১৯৯২ সনে—ওই বছর ১৬ই জুন রাশিয়া বিশ্বব্যাংকের সদস্য হলো। দেশকে ধনতান্ত্রিক ধাঁচে ঢেলে গড়ে তোলার জন্য শুরু হলো বিদেশি মূলধনের অবাধ প্রবেশ। রাশিয়ার উৎপাদন কাঠামো অনমনীয় হলেও অদক্ষ ছিল না। নানা প্রকৃতিক সম্পদে দেশটি সমৃদ্ধ। যানবাহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা যে কোন উন্নত পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে তুলনীয়। তবুও আর্থিক পরিকাঠামো গড়ে তুলে বিশ্বের বাজারে লেনদেনের সুযোগ নিতে পেয়ে রাশিয়া কিছু বিপত্তির সম্মুখীন হলো।

আগেই বলেছি ৯০ এর দশকের শুরুতেই এসেছে পৃথিবী জোড়া বিশ্বায়নের এক নতুন ঢেউ। ‘বিশ্বায়ন’ বা ভুবনীকরণ কথাটি অর্ধশাস্ত্রে ঠিক কিভাবে প্রয়োগ করা যায়? ‘বিশ্বায়ন’ বিশ্ব মানবতাবাদ নয়। বলতে গেলে বিশ্বায়নের অর্থ কতকগুলি আন্তর্জাতিক নিয়ম কানুন মেনে নিয়ে বিশ্বের বাজারে অবাধে লেনদেন করা। বিশ্বায়নের এখন দুটি দিক—দেশে অবাধে বিদেশি পণ্যের আমদানি ও সেই সঙ্গে বিদেশি পুঞ্জিরও আমদানি। এইভাবে দেশকে গড়ে তুলে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় স্থান করে নেওয়া। বর্তমানে খবর সম্বলন ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত, তাই বাণিজ্যের রূপও পরিবর্তিত। Information Technologyর কল্যাণে বিভিন্ন দেশের পণ্য সামগ্রীর বাজার ও অর্থের বাজার সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা এখন অতি সহজ। বাজার এখন দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়।

কিন্তু বিশ্বের দরবারে ঠাই করে নিতে হলে আগে দেশের পরিকাঠামোকে সুদৃঢ় করতে হবে। তাই বিশ্বায়ন বা Globalisation এখন একটি পদক্ষেপ নয় একটি সম্মিলিত নীতি LPG—Liberalisation, Privatisation ও Globalisation; অর্থাৎ আর্থিক নীতির উদারীকরণ, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার বেসরকারিকরণ ও অতঃপর বাণিজ্য ব্যবহার ভুবনীকরণ। যারা এই নীতির পক্ষে তারা বলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই নতুন নীতির প্রয়োগ এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। ভারতের মতন অনুন্নত দেশে দারিদ্র্য

দূরীকরণ এ পথেই সম্ভব। যদিও গত দশ বছর নানাভাবে এই নীতি প্রয়োগ করে এদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হয় না।

একটা কথা মনে রাখতে হবে প্রত্যেক দেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নীতিগত পরম্পরা বজায় রাখতে হয়। নতুন কোনও নীতি প্রবর্তন করতে হলে প্রতিপত্তি কাঠামোতে তা কতটা গ্রহণযোগ্য সেদিকে নজর দিতে হবে। ভারতে LPG নীতি গ্রহণ অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ পরিকল্পিত অর্থনীতির একটা কাঠামো গড়বার চেষ্টা হলেও বিভিন্ন ধরনের খোলা বাজারে লেনদেনের অস্তিত্ব এখানে চলে আসছে। আর এদেশের আর্থিক কাঠামো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুগামী। রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই দৃষ্টি অনুপস্থিত। তাই LPG নীতি গ্রহণ করতে হলে তার অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। যে কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষেই প্রথম দুটি ধাপ এড়িয়ে বিশ্বায়নের আহ্বান করা সম্ভব নয়।

দেখা যাক LPG নীতি গ্রহণের প্রতিক্রিয়া এ ধরনের দেশে কেমন হয়েছে? শুরু করা যাক অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশ আলবেনিয়াকে দিয়ে। বিশ্বায়নের গোড়ার দিকে আলবেনিয়ার মানুষ Ponzi বিনিয়োগে মেতে উঠেছিল—যার মূলকথা বিদেশে নানাভাবে বিনিয়োগ করে (হোটেল ব্যবসা, খনির মালিকানা ইত্যাদি) লাভবান হওয়া। অর্থের বাজার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীরা কোথায় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, পিছিয়ে আসতে হবে এ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। তাই ৯০এর দশকের গোড়ার দিকে যে প্রগতির স্বাদ আলবেনিয়ার মানুষ পেয়েছিল তা ক্ষণস্থায়ী হলো। ১৯৯৭ এর মধ্যেই এসে পেল নিম্নগতি যা থেকে এখনও দেশটি মুক্ত নয়।

আরেক সীমানায় রয়েছে বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চিন। এখানে উদারনীতি গ্রহণের ঢেউ আগেই এসেছে কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পরিচালন নীতির পরিবর্তন হয় নি। উন্নয়ন বা আরো সোজা ভাষায় ধনী হওয়ার লক্ষ্যে চিন এখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। তবে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বৈষম্যের রূপ জানা যায় না। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চিনের সম্ভার ভোগ্য দ্রব্য বিভিন্ন দেশের বাজার ছেয়ে দিচ্ছে। লভ্যাংশ আহরণ চলেছে, বিদেশি পুঞ্জি বিনিয়োগের বাধা নিষেধ শিথিল। উদারীকরণ নীতির সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারিকরণ কতটা তাল মিলিয়েছে জানা নেই। তবে চিন এখন বিশ্বের একটি অর্থনৈতিক মর্যাদা সম্পন্ন দেশ। ১৫ বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে গত ১১ই ডিসেম্বর চিন World Trade Organisation (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা)র ১৪৩ তম সদস্য রূপে গৃহীত হয়েছে।

রাশিয়া কিন্তু এখনও এই মর্যাদা পায়নি। রাষ্ট্রপতি পুটিনের আক্ষেপ WTO রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নানা বিধি নিষেধ চাপাচ্ছে। সংস্থার বক্তব্য রাশিয়াকে এই সংস্থার সব নিয়ম আগে থেকে মেনে নিতে হবে। আগে সে তার বাজারকে খুলে দিক তবেই পাবে বিশ্ব সংস্থার আমন্ত্রণ। আমরা জানি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সময় রাশিয়া বিদেশি পণ্য ও পুঞ্জি অবাধে আমদানির নীতি নিয়েছিল। কিন্তু এ পথে বিশ্বায়ন সম্ভব নয়। বিশ্বের দরবারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আগে নিজের অর্থনৈতিক

কাঠামোকে সুদৃঢ় করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে ধনতান্ত্রিকে রূপান্তরিত করতে হলে প্রথম প্রয়োজন অর্থ ব্যবস্থার সংস্কার ও অর্থের বাজার সৃষ্টি। দেশের অভ্যন্তরে পরিপূর্ণভাবে খোলা বাজার সৃষ্টি করতে হলে একই সঙ্গে মুদ্রার যোগান, মুদ্রার মূল্য → সবদিকে নজর রাখতে হবে। সেই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মজুরি ও সুদের হার ধার্য করতে হবে। আর্থিকীকরণ সুষ্ঠুভাবে না করে বিশ্বায়নের পথে পা বাড়ান বোধহয় রাশিয়ার প্রধান ভ্রুটি। দেশে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা ও পণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটছে—কিন্তু সরকারের কোন সঠিক মুদ্রানীতি নেই। মুদ্রার বাজার মূল্য কী হবে তা নিয়ে দ্বিধা ও নানা পরিবর্তন। সাধারণ মানুষের আয় ও সঞ্চয়ের অবমূল্যায়ন। অন্যদিকে প্রবল মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, শিল্পে কাঁচামালের অভাব, উৎপাদনে পরিকাঠামো বজায় রাখার মতন মূলধনের অভাব। ১৯৯১-৯২ সনে খুচরা জিনিসের বাজার দর শতকরা ১৪২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অপরদিকে উৎপাদন শতকরা ৯ ভাগ হ্রাস পায়। প্রকৃত বিনিয়োগ হ্রাস পেল শতকরা ২৫ ভাগ। ১৯৮৯ সন পর্যন্ত বাশিয়ার বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ছিল। ১৯৯১-এ এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। বাণিজ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, fiscal deficit মোট উৎপাদনের শতকরা ৩১ ভাগে এসে ঠেকল। পূর্বতন অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রের তৎকালীন কর্তৃপক্ষরা এই ঘটতি কমাবার জন্য মজুরি হ্রাস ও বিনিয়োগ সংকোচন নীতি গ্রহণ করলেন। উৎপাদন ও ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে এ নীতি বিপর্যয় আনল।

রাশিয়ার মতন একটি বৃহৎ শক্তিশালী দেশে এ ধরনের অব্যবস্থা অনিদিষ্টকাল চলতে পারে না। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে রাশিয়ার বর্তমান শাসকগোষ্ঠী দেশের বৃন্যাদকে সুদৃঢ় করতে আগ্রহী। অবশ্য ৯০এর দশকের প্রথম দিকের পরিচালন ব্যবস্থার কিছু ফলশ্রুতি এখনও রয়ে গেছে। প্রথমই আসছে বৈদেশিক ঋণ, যার সুদ আসলে প্রতারণা দায় অদূর ভবিষ্যতে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় একান্ত প্রয়োজন। বেসরকারিকরণ নীতি গ্রহণের ফলে বড় বড় সংস্থা যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজতেল, বিমান পরিবহন এখন মুষ্টিমেয় মালিকের হাতে। অথচ ছোট শিল্পের বেসরকারিকরণ সম্ভব হয় নি উদ্যোগীর অভাবে। তবুও ২০০০ সনে কিছুটা স্থিতিবস্তুর আভাস পাওয়া গেছে। এরই উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে বিশ্বায়নের পথে রাশিয়াকে পা বাড়াতে হবে।

প্রথম সুলক্ষণ কৃষি উৎপাদন। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০১ সনে মোট ৮৩ মিলিয়ন টন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয়েছে। এর ফলে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করেও কিছু শস্য রপ্তানি করা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়েছে—যেমন ইজরায়েলে গম ও সৌদি আরবে যব রপ্তানি করা হয়েছে। সেই সাথে শিল্প উৎপাদনও গত বছরের তুলনায় শতকরা ৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকার নীতিগতভাবে মজুরি হ্রাসের বিরোধী। পেনশন সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে—বেকারত্ব সামান্য হ্রাস পেয়েছে (শতকরা ০.৯ ভাগ)। সরকার মনে করেন এইভাবে আয়স্তর বৃদ্ধি পেলে জনগণের ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাবে ও

চাহিদা বৃদ্ধি পেলে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের সুযোগ বাড়বে। দেশের অর্থনীতিতে ভারসাম্য এলেই বিশ্বায়নের লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

বিশ্বের বাজারে রাশিয়ার দুই প্রধান পণ্য প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল। তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে রাশিয়াকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হয়। বাজারে তেলের যোগান বাড়িয়ে দিয়ে রাশিয়া একক মালিকানা আনতে পারে না। কারণ অন্য তেল রপ্তানিকারী দেশগুলিও তাদের স্বার্থ দেখবে। আর তেলের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভরশীল। রাশিয়ার অর্থনীতিতে এই তেল রপ্তানির গুরুত্ব কতখানি বুঝতে হলে জানতে হবে ভবিষ্যৎ আনুমানিক তেলের বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ওদেশের সরকারি বাজেট রচিত হয়। রপ্তানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ কিছুটা দেশের হাতে। ১ জানুয়ারি ২০০২ থেকে রাশিয়া প্রতিদিন ১৫০,০০০ ব্যারেল তেল রপ্তানি হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য OPEC বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পরামর্শ করে পৃথিবীতে তেল জোগায়। ১ জানুয়ারি ২০০১ সনে রাশিয়ায় এই হ্রাসের পরিমাণ ছিল ৫০০০০ ব্যারেল। ঠিক হয়েছে ২০০২ থেকে দিনে ২ মিলিয়ন টন হ্রাস করবে। এভাবে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পেলে তেলের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য প্রতি ব্যারেল ২০ থেকে ২৫ ডলারের মধ্যে থাকবে আশা করা যায়। বিশ্ব পেট্রোলিয়াম কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট স্টের মতে বর্তমান অবস্থায় এটি তেলের ন্যায্য মূল্য। রাশিয়ার ভবিষ্যতও এখন তেলের বিক্রয়লব্ধ আয়ের উপর নির্ভরশীল। এখানেই সাস্থ্য করে তাকে বৈদেশিক ঋণ প্রত্যাণ করতে হবে। আবার তেলের মালিকানা এখন বেসরকারি। সুতরাং এইসব মালিক নীতিভ্রষ্ট হলে সমূহ বিপদ। বিশ্বব্যাংকের ঋণ নিয়ে রাশিয়ায় বিনিয়োগ ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি দেখা গেছিল সে ধরনের পুনরাবৃত্তি হলে ভরাডুবির সম্ভাবনা।

রাশিয়ায় তথাকথিত বিশ্বায়নের শুরুতে ৯০এর দশকে USA ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অর্থ বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র পেয়ে উদ্যোগী হয়েছিল। U.S.A র উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। ২০০০ সনে রাশিয়ায় মোট বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ৩২ মিলিয়ন ডলার। দেশগত ভাবে U.S.A এর স্থান সর্বোচ্চ, মোট বিনিয়োগের শতকরা ২২ ভাগ। এরপরেই রয়েছে জার্মানি, যার বিনিয়োগের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ। ধনাত্মক দেশের এ ধরনের বিনিয়োগকে নিজের দেশের পক্ষে লাভজনক করে গড়ে তোলার মতন অভিজ্ঞতা রাশিয়ার এখনও হয়েছে বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক সমঝোতায় ৬টি দেশের ১১টি কম্পানির মিলিত প্রচেষ্টা—Caspian Pipeline Consortium—রাশিয়া ও কাজাকস্থানের মধ্যে দিয়ে তেলের পাইপ লাইন পাতে, তেল সরবরাহ করা যার কাজ। ওই সংস্থা রাশিয়ার পক্ষে কি ততটা লাভজনক যতটা U.S.A -র কোম্পানিগুলি পাবে? মুনাফাভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক সংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এখনও রাশিয়া পিছিয়ে। উন্নত ধনাত্মক দেশগুলির বিশ্বায়নের কর্মসূচি কিন্তু এটাই।

সুখের বিষয় রাশিয়া সম্প্রতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার পুরানো অঙ্গরাজ্যগুলির দিকে নজর

দিচ্ছে। নভেম্বর মাসে Commonwealth of Independent States (CIS) এর অধিবেশন হয়ে গেল। রাষ্ট্রপতি পুটিন CIS অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির ভিতর অবাধ বাণিজ্য শুরু করার প্রস্তাব রাখলেন। তিনি এই আশ্বাসও দিলেন যে রাশিয়া WTO র সদস্য হলেও বেলারুস ও মধ্য এশিয়া রিপাবলিক দেশগুলির সঙ্গে যে বিশেষ বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে তা বলবৎ থাকবে। CIS ভুক্ত দেশগুলি যদি নিজেদের ভেতর অবাধ লেনদেনের সুযোগ গড়ে তোলে তাহলে তাদের পূর্ব কাঠামোর অনুগামী হবে। রাশিয়ার অধীন না হয়ে অনুগামী রূপে নিজেদের অর্থনীতিকে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা দুটি এখন বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে পাশাপাশি চলেছে। পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ এখন এক মুদ্রা চালু করেছে। রাশিয়াকে তারা অপান্তক্ষেত্রে ভাবে না। বৃহৎ ধনতান্ত্রিক USA যাতে অর্থনৈতিক দিক থেকে সর্বগ্রাসী না হতে পারে ইউরোপীয় দেশগুলির তাই চিন্তা। এইভাবে নানা স্বার্থের দিকে নজর রেখেই রাশিয়াকে সাবধানে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সবচেয়ে আগে প্রয়োজন নিজের দেশের বাজার সামলানো। উদারীকরণের প্রথম ঝোঁকেই যদি এক মালিকানা দেশকে গ্রাস করতে থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে নতুন সামাজিক বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে গড়ে তুলে দেশের অর্থনীতিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধিকে বজায় রাখতে হবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার আগে রাশিয়ার কৃষক সমাজ ব্যক্তিগত মালিকানায় লাভজনক উৎপাদনের বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিল। অবশ্য ধনী ভূস্বামী শ্রেণীর বিলাসিতা পরবর্তীকালে সামাজিক অসন্তোষ আনে। ভূমিব্যবস্থাতে বৃহৎ মালিকানা না এনেও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। ক্ষুদ্র শিল্পের বর্তমান অবস্থা নৈরাশ্যজনক। সরকারি পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে ১৯৯৬ সন থেকে দেশে আর কোনও ছোট উদ্যোগ গড়ে ওঠেনি। বরং পুরানো শিল্পগুলি ধীরে ধীরে বিনষ্ট হতে চলেছে। রাষ্ট্রপতি পুটিন এদিকেও সম্প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি মনে করেন ছোট উদ্যোগীদের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে এবং এখানেই সরকারের উদারীকরণ নীতি প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আশা করা যায় সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার জনগণও যদি নিজেদের অর্থনীতিকে নতুন ধাঁচে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন তবে বিশ্বের দরবারে রাশিয়াকে সুদৃঢ় স্থান করে নিতে বেগ পেতে হবে না। তখনই বিশ্বায়নকে আমন্ত্রণ জানান সার্থক হবে।

বিশ্বায়ন ও চিন

নারায়ণ সেন

মুখবন্ধ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ‘globalisation’ বা বিশ্বায়ন অনেক উন্নয়নশীল দেশের কাছে “dirty word” আর তাদের শ্লোগান “globalisation go back” হলেও এ-বিষয়ে চিন দেশের মনোভাব ইতিবাচক এবং উদ্যমশীল। চিন মনে করে, বর্তমান বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি উভয়ই স্বদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বিকাশলাভে পরস্পরের প্রতি উত্তরোত্তর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এক দেশের ঘাটতি অন্য দেশ পূরণ করছে। এ-ঘটতি উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ এমন কি শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রেও বিদ্যমান।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন সম্পর্কে এক আলোচনা প্রসঙ্গে চিনের এক অর্থনীতিবিদ বলেছেন : “globalisation means a huge market. But it’s also a matter of grabbing the opportunity.”^১

চিন দেশের নীতিনির্ধারক এবং অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন বিশ্ববাজারের উদ্ভব ও অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন কোন নতুন ঘটনা নয়। সামাজিক উৎপাদিকা শক্তিসমূহের অগ্রগতি ও বিকাশ এবং এক বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কাঠামোর আবির্ভাবের সাথে সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার সমাজীকরণ দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বজনীনতার রূপ নিচ্ছে। সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক জীবনের উন্মুক্তীকরণ জোরদার ও গভীরতর হচ্ছে। বিশ্ববাজারের আবির্ভাবের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীল অর্থনৈতিক সম্পর্ক, আর উদ্ভূত হয়েছে পণ্যদ্রব্য বিনিময় সম্পর্কের আন্তর্জাতিকীকরণ। উৎপাদিকাশক্তিসমূহের অগ্রগতির ফলে ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন সম্পর্কের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে অবাধ প্রতিযোগিতা একচেটিয়া অধিকারের দিকে চালিত হয়েছে, পুঁজি রপ্তানি সারা বিশ্বে বাজার বিস্তারলাভের এক শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, আর এর থেকেই উদ্ভূত পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের ধারা বিভিন্ন দেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও নিবিড় কবে তুলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নতি এবং উদ্ভাবনের ফলে নতুন নতুন শিল্পের আবির্ভাব হয়েছে। সেই সাথে, অত্যাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম ক্রমশ আধুনিকীকরণের ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জীবন সময় ও পবিধির ব্যবধানকে বিরাটভাবে সঙ্কুচিত করেছে। বর্তমান বিশ্বে, উৎপাদন, সঞ্চলন, ভোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রের প্রসাবতা এবং সম্পদ, শ্রমশক্তি,

পরিসেবা, প্রযুক্তি, পুষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অর্থনৈতিক জীবনকে আন্তর্জাতিকীকরণের প্রবল স্রোতের দিকে ধাবিত করেছে। আর, এই স্রোতের সঙ্গে চলাই একটি বাস্তবমুখী কর্তব্য।^২

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে ব্যক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক সংস্কার এবং বিশ্বায়নের প্রতি চিনের দৃষ্টিভঙ্গি।

চীন অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ইতিবাচক দিক ও সুফলগুলির সুযোগ সদ্ব্যবহার করে এক শিল্পভিত্তিক উন্নত দেশে পরিণত কবাব দিকে এগিয়ে যাবার সংকল্প নিয়েছে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১৯৭৮ সাল থেকে।

উল্লেখ্য, বিগত দুই দশকের মধ্যে চীন ইম্পাং, কয়লা, সিমেন্ট, খাদ্যশস্য, তুলা এবং মাংস উৎপাদনে সারা বিশ্বের তালিকায় উচ্চ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। এই সময়বর্তীকালে চিনের গড়পড়তা GDP বৃদ্ধির হার হয়েছে ১০%, (২০০১ সালে হয়েছে ৭.৩%), মাথাপিছু আয় বার্ষিক ৮০০ মার্কিন ডলার, সর্বনিম্ন মজুরি বর্তমানে মাসিক ৪৪৫ চীনা মুদ্রা ইউয়ান বা প্রায় ৫২ মার্কিন ডলার, দাবিদ্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ২৫ কোটি থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৩ কোটি। জনগণের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। মোটর গাড়ির মালিক হওয়া চীনবাসীদের কাছে ছিল এক স্বপ্ন। বর্তমানে, ১০ লক্ষেরও অধিক ব্যক্তি মোটর গাড়ির মালিক হয়েছেন। ২০০১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত চিনের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের পরিমাণ ছিল ১৮৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কিন্তু, বিশ্ববাজারে সক্রিয় ও যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশের অর্থনৈতিক সংস্কার আরও ব্যাপক ও গভীরতর করা এবং সর্বপ্রকার মতান্বিতা কাটিয়ে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা। চিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য চিনেব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সমাজতন্ত্রের পথ ধরে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা। তবে, অর্থনৈতিক সংস্কার রূপায়ণে এবং অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন সম্পর্কে চিনের কয়েকটি পদক্ষেপ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কিছু মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ ও ব্যক্তিবিশেষ কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলেছেন যার ব্যাখ্যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি।

তাত্ত্বিক অবস্থান

প্রায় ১৫০ বছর আগে, মার্কস ও এঙ্গেলস বিশ্ববাজারের উদ্ভব এবং স্থানীয় বা জাতীয় স্বনির্ভরতা ও বিচ্ছিন্ন অর্থনীতির পরিবর্তে সম্পদের বিশ্বব্যাপী আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সপক্ষে তাত্ত্বিক যুক্তি হিসেবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কারপন্থী নেতৃবৃন্দ ও অর্থনীতিবিদদের 'Communist Manifesto' থেকে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করেছেন :

Urged onward by the need for an ever-expanding market, the

bourgeoisie invades every quarter of the globe. It occupies every corner ; forms settlements and sets up means of communication here, there, and "everywhere

By the exploitation of the world market, the bourgeoisie has given a cosmopolitan character to production and consumption in every land. To the despair of the reactionaries, it has deprived industry of its national foundation. Of the old-established national industries, some have already been destroyed and others are day by day undergoing destruction. They are dislodged by new industries, whose introduction is becoming a matter of life and death for all civilised nations : by industries which no longer depend upon the homeland for their raw materials, but draw these from the remotest spots, and by industries whose products are consumed, not only in the country of manufacture, but the wide world over. Instead of the old wants, satisfied by the products of native industry, new wants appear, wants which can only be satisfied by the products of distant lands and unfamiliar climes. The old local and national self-sufficiency and isolation are replaced by a system of universal intercourse, of all-round interdependence of the nations. We see this in intellectual production no less than in material.... National exclusiveness, and particulations are fast becoming impossible... "°

সম্পদ এবং উৎপাদন উপকরণের ওপর মালিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তন চিনের অর্থনৈতিক সংস্কারে এক সাহসী পদক্ষেপ। রাষ্ট্রীয় এবং গণমালিকানা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে চিন বেসরকারি মালিকানা, ব্যক্তিগত মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা, বিদেশি-চিন যৌথ মালিকানা, সম্পূর্ণ বিদেশি পুঁজির মালিকানা এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের দ্বারা গঠিত শেয়াব হোল্ডিং কোম্পানির মালিকানা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী চিন প্রতিষ্ঠার পূর্বে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার সাংস্কৃতিক বিপ্লব পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রায় সব প্রকার উৎপাদন উপকরণের ওপর মালিকানা স্বত্ব, রাষ্ট্র এবং গণমালিকানার আওতায় এনেছিল। কিন্তু, "উৎপাদিকাশক্তি বিকাশের বাস্তব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একরূপ ইচ্ছামতো বণ্টনকরণের মাত্রা সম্প্রসারণ করার ভুল কর্মনীতি শ্রমজীবী জনগণের উৎসাহকে গুরুতবরূপে বাহত করে "পূর্ব উৎপাদিকাশক্তি বিকাশের ক্ষতিসাধন করে।" ° এই বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৮০ সালে উৎপাদন উপকরণের মালিকানা ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় এবং গণমালিকানাকে জাতীয় অর্থনীতির মূল অঙ্গ রেখে ব্যক্তিগত মালিকানাকে "আবশ্যিকীয় সম্পূরক" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এরপরই, বিদেশি পুঁজি এবং বেসরকারি পুঁজির অধীন মালিকানা ব্যবস্থাও অনুমোদন করা হয়।

১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত চিনা কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে

ঘোষিত হয় যে, রপ্তানী মালিকানা ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়ার শর্তধীনে বিভিন্ন ধরনের মালিকানা ব্যবস্থা সমন্বিত অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে হবে। এই কংগ্রেসে ঘোষিত হয় : “চিনা এবং বিদেশিদের যৌথ উদ্যোগ, সমবায় উদ্যোগ এবং সম্পূর্ণ বিদেশি মালিকানার উদ্যোগসমূহও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির এক প্রয়োজনীয় ও কার্যকর সম্পূরক।”

মালিকানা ব্যবস্থায় এরূপ পরিবর্তনের সপক্ষে যুক্তি হলো : “চিনের সমাজতান্ত্রিক সমাজ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই বাস্তবতা থেকেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে, এই পর্যায় ডিঙিয়ে গেলে চলবে না। সাম্প্রতিক চিনের বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি একথা স্বীকার না করা হয় যে, চিনা জনগণ ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের পর্যায় ব্যতিরেকেই সমাজতন্ত্রের পথে এগুতে পারবে তাহলে তা হবে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে এক যান্ত্রিক তত্ত্ব, আর তা হলো দক্ষিণ-ভূলের প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অন্যদিকে, এ কথা যদি বিশ্বাস করা হয় যে, উৎপাদিকাশক্তিসমূহের বিরাট বিকাশ না ঘটিয়েই সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায় ডিঙিয়ে যাওয়া চলে তা হলে তা হবে বিপ্লবকে এগিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে এক স্বপ্নবিলাসী তত্ত্ব আর তা হলো ‘বাম’ ভূলের প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।”

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যুগে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ চিন সাম্যবাদের দোরগোড়ায় এসে গেছে বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু, সংস্কারপন্থীদের মতে এরূপ দাবি ছিল অযৌক্তিক এবং বাস্তব অবস্থার পরিপন্থী, আর প্রকৃতপক্ষে তখন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিপক্বতা লাভ করেনি এবং উন্নতও হয় নি। সংস্কারপন্থীদের এই বক্তব্যে যে সঠিক তা স্বীকার করা যায় না।

মোন্দা কথা, সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ে রপ্তানী মালিকানা ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যান্য মালিকানা ব্যবস্থাকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার অধিকার দেওয়া চিনের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী নয়। ১৯৯৯ সালে, চিন রাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করে একটি ধারা যোগ করেছে যাতে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোগ ও শিল্প রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ সত্তারূপে উল্লিখিত হয়েছে। এরূপ মিশ্র অর্থনীতি পালনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি চিন দেশে ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের সহায়ক হবে বলে অনেকে মনে করেন।

বিশ্ববাজারে সক্রিয় অংশীদার হতে হলে বর্তমানে প্রচলিত দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারব্যবস্থার পরিবর্তন এক আবশ্যকীয় শর্ত বলে চিনা নেতারা স্বীকার করেন। অনেক বিদেশি অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিকল্পিত অর্থনীতিব সঙ্গে বাজার অর্থনীতি অচল। তারা চীনকে “non-market economic country” বলে আখ্যা দেন। এই বিষয়ে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ও নীতিনির্ধারকদের বক্তব্য স্পষ্ট এবং আমাদের বিবেচনার বিষয় :

“Correct understanding and handling of the relations between planning and market regulations is crucial. According to conventional

thinking, a market economy is peculiar to capitalism and a planned economy is the basic feature of socialism. Since the Third Plenary Session of the 11th Central Committee and with the deepening of the reform, we have gradually freed ourselves from those conventional ideas and acquired a new understanding of this question.

...The 12th National Congress declared that in a socialist economy planning was primary and market regulation secondary. At the Third Plenary Session of the 12th Central Committee, the Party stated that a commodity economy was a state that could not be bypassed in socio-economic development and that China's socialist economy was a planned commodity economy based on public ownership. The 13th National Congress held that the socialist planned commodity economy should be a system that integrated planning with market regulation. After the Fourth Plenary Session of the 13th Central Committee it said that to facilitate the development of socialist planned commodity economy, we should establish an economic structure and an operating mechanism that combined planning with the use of market forces. In the important talks he gave earlier this year, Comrade Deng Xiaoping particularly pointed out that a planned economy was not socialism, there was planning under capitalism too. A market economy was not capitalism, there was market regulation under socialism too. Planning and market regulation, he said, were both means of controlling economic activity. Whether the emphasis was on planning or on market regulation was not the essential distinction between socialism and capitalism. This brilliant thesis has helped free us from the restrictive notion that the planned economy and the market economy belong to basically different social systems, thus bringing about a breakthrough in our understanding of the relations between planning and market regulation....

Establishing and improving a socialist market economy will be a long process, because it is a difficult and complex feat of social systems engineering.

..We are convinced that a market economy established under the socialist system can and should operate better than one under the capitalist system.” *

রাষ্ট্র কর্তৃক মূল্য নির্ধারণ এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে : “আমরা ধাপে-ধাপে এমন এক ব্যবস্থা স্থাপিত করব যাতে রাষ্ট্র কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের এবং পরিসেবার মূল্য নির্ধারণ করবে আর বাদবাকিগুলির মূল্য বাজারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ধারিত

হবে। মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার সংস্কারকে আয়ব্যবস্থার নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে যাতে সংস্কারের সময় জনগণের প্রকৃত জীবনযাপনের মানের অবনতি না হয়, বরঞ্চ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।”^১ ধনতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতিতে ধনী-আরও ধনী হয়, গরিব আবশ্য গরিব হয়। আর, সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতিতে দেশের বিভিন্ন শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই আয়ের মাত্রায় তারতম্য থাকলেও দরিদ্রশ্রেণীর লোপ এবং অতি-ধনী শ্রেণীর উদ্ভব রোধ করে সমতা বক্ষাই মুখ্য লক্ষ্য।

রুদ্ধ দ্বার থেকে মুক্ত দ্বার ও অর্থনৈতিক সংস্কার

পঞ্চাশের দশকে, নয়া চিন মুখ্যত পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলির সহায়তায় আধুনিক শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়, এবং মূলত এই দেশগুলির সঙ্গেই ছিল চিনের অর্থনৈতিক ও বহির্বাণিজ্যের সম্পর্ক। কিন্তু ষাটের দশকের শুরু থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চিনের মতাদর্শগত পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠলে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়। ষাটের দশকের শেষের দিকেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে চিনের অর্থনৈতিক আদান-প্রদানও প্রায় স্তব্ধ হয়। দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতির আশায় ১৯৫৮ সালে ‘বিরাট উল্লস্ফন’ নীতি, এবং কৃষি সমবায় প্রথা সারা দেশে উন্নতি ও দৃঢ়ীকরণের আগেই এবং বৈষয়িক অবস্থা উপেক্ষা কবে গ্রামীণ গণ কমিউন প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়বর্তীকালে (১৯৬৬-১৯৭৬) হাট-বাজারে কেনা-বেচা ব্যবসা, ব্যক্তিগত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন, বাস্তুভিটায় শাকসবজি রোপণ নিষিদ্ধ করার সঙ্গে প্রায় সব প্রকার উৎপাদন উপকরণের মালিকানা রাষ্ট্র ও গণমালিকানাধীন ব্যবস্থার অধীনে আনা ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। একপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই চিনা কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন নেতৃবৃন্দ চিন সাম্যবাদ সমাজব্যবস্থার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে বলে দাবি করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং উৎপাদিকাঙ্ক্ষিসমূহের বিকাশের তৎকালীন বাস্তব অবস্থার বিচারে চিন কয়েকটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি তো বটেই এমন কি ভারতসহ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশেরও সমকক্ষ হতে ব্যর্থ হয়। তখনকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে পরবর্তীকালে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মন্তব্য হলো : “দরিদ্রতার সমবন্টন সাম্যবাদের লক্ষ্য নয়।” ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, চেয়াবম্যান মাও-এব তিরোধানের পর চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পদাধীশ হন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় “পুঁজিবাদী পথের দুই নম্বর অনুসারী” বলে খিঙ্কৃত তং শিয়াওফিং। এই পোডখাওয়া প্রবীণ চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কাবপন্থী নেতা সর্বপ্রকার মতান্ত্রতা কাটিয়ে “বাস্তব অবস্থা থেকে সত্যের সন্ধান” এবং “মনের বন্ধন থেকে মুক্ত” হয়ে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে চিনকে উন্নত দেশগুলির

সমকক্ষ একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত চিনা কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় অধিবেশনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্ত দ্বার এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৯ সালে, চিনের কেন্দ্রীয় সরকার দক্ষিণ-চিনের কুয়াংতুঙ এবং ফুচিয়েন প্রদেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে বিদেশি বিনিয়োগ এবং উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় এবং এ বিষয়ে নমনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই ঘোষিত নীতি অনুযায়ী হংকং-এর সংলগ্ন কুয়াংতুঙ প্রদেশের শেনচেন, চুহাই, শানধৌ এবং দক্ষিণ ফুচিয়েন প্রদেশের শিয়ামেনে আনুষ্ঠানিকভাবে চারটি “বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল” স্থাপিত হয় ১৯৮০ সালে। এই নীতি ফলপ্রসূ হতে থাকলে এবং অনেক বিদেশি, বিশেষ করে হংকং ও সিঙ্গাপুরে প্রবাসি চিনা ব্যবসায়ী মহল থেকে বিপুল সাড়া পেলে চিনা সরকার, ১৯৮৪ সালে, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-চিনের সমুদ্রোপকূলবর্তী ১৪টি শহরকে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। আবার, ১৯৮৫ সালে চিন ইয়াংসী নদী এবং চুহাই বদ্বীপ অঞ্চল ও দক্ষিণ ফুচিয়েন প্রদেশের শিয়ামেন...চাংটো...ছুয়ানটো ভূখণ্ড “অর্থনৈতিক বিকাশ অঞ্চল” বলে ঘোষিত করে। এরপর ১৯৮৮ সালে, চিন হাইনান দ্বীপকে একটি পৃথক প্রদেশ এবং “হাইনান বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল” স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯০ সালে, চিনের সর্ববৃহৎ শিল্পনগরী শাংহাই-এর উপকণ্ঠে অবস্থিত ফুথুং অঞ্চলকেও বিদেশি বিনিয়োগ ও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এরপর ৫টি নদী বন্দর, ১৪টি প্রাদেশিক রাজধানী শহর এবং ১৩টি আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী শহরকে বহির্বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

২০০১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত চিন সর্বমোট ৩,৭৮,৪০৩টি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে শিল্প প্রতিষ্ঠার চুক্তি অনুমোদন করে। চুক্তিবদ্ধ বিনিয়োগ পরিমাণ ছিল ৭১৭.০১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে বাস্তবে বিনিয়োগের পরিমাণ হয়েছে ৩৭২.৮৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিনে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ পরিমাণ, উৎস এবং কোন কোন শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয়েছে তার তালিকা নিয়ে বর্ণিত হলো :

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ

(১) বিলিয়ন মার্কিন ডলার হিসেবে)

স্বাক্ষরিত চুক্তিবদ্ধ সংখ্যা

বাস্তব বিনিয়োগ সংখ্যা

১৯৯২

৫৮.১

১১

১৯৯৩

১১১.৪

২৭.৮

১৯৯৪

৮২.৭

৩৩.৬

১৯৯৫	৯১.৩	৩৭.৩
১৯৯৬	৭৫.২	৪২.৩
১৯৯৭	৫১.৮	৪৫.৩
১৯৯৮	৫২.১	৪৫.৩
১৯৯৯	৪০.৪	৪১.২
২০০০	৫০	৪৮.৮
২০০১	৪০.২৯৩	২৪.২০৯

(জুলাই মাস পর্যন্ত)

প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকারী অঞ্চল ও দেশ
(শতকরা হিসেবে)

হংকং	৪১%	দক্ষিণ কোরিয়া	১৭%
যুক্তরাজ্য	১১%	তাইওয়ান	৮%
জাপান	৭%	সিঙ্গাপুর	৭%
জার্মানি	৩%	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩%
অন্যান্য . ৩%			

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্র
(শতকরা হিসেবে)

যান্ত্রিক শিল্প	৮১%	প্রযুক্তি	২%
ভূসম্পত্তি ও গৃহনির্মাণ	৪%	সিমেন্ট	৪%
ভোগ্য পণ্য	২%	বাণিজ্য	২%
কৃষিপণ্য, ফল ইত্যাদি	১০%	অন্যান্য	১২%

অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্য ও বিশ্বায়ন

মূলত কৃষিনির্ভর দেশ হলেও চীন দেশের সমগ্র ভূখণ্ডের মাত্র আট শতাংশ ভূমি চাষাবাদের যোগ্য। চিনেব মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বাস করে গ্রামাঞ্চলে। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, ১২০ কোটি জনসংখ্যার দেশের পক্ষে কৃষি ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে দরিদ্র্য মোচন, জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং গ্রামাঞ্চলের বাড়তি শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

চীনের কৃষকদের পক্ষে একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের আয়বৃদ্ধি বাস্তবসম্মত নয়। কৃষকদের আয়ের মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সরকারকে সাধারণত কৃষিপণ্যের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি করে এই দায়ভার নিতে হয়। কিন্তু, দীর্ঘকাল এরূপ অনুদানের ভার বহন করা জাতীয় অর্থনীতির পরিপন্থী। সুতরাং, প্রয়োজন হলো গ্রামেগঞ্জে বিভিন্ন

শিল্প প্রতিষ্ঠা করে কৃষক ও গ্রামের বাড়তি শ্রমশক্তিকে অ-কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত করার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং চিনকে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করা।

১৯৮৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত চিনা কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ জাতীয় কংগ্রেসে এই লক্ষ্যমাত্রা তিনটি পর্যায়ে অর্জনের পরিকল্পনা এবং ইতিমধ্যেই প্রবর্তিত বাস্তব পদক্ষেপের কথা ঘোষিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৯৯০ সালের মধ্যে চিনের মাথাপিছু GDP ১৯৮০ সালের ২৫০ ডলার থেকে ৫০০ ডলার বৃদ্ধি; দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০০০ সালের মধ্যে এই বৃদ্ধির মাত্রা হবে দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০০০ ডলার, আর তৃতীয় পর্যায়ে ২০৫০ সালের মধ্যে এই বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ৪০০০ ডলার। চিন আশা রাখে, ২০৫০ সালের মধ্যে উৎপাদিকাশক্তিসমূহের পূর্ণ বিকাশের পর সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে এক আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়ে অন্ততপক্ষে মাঝারি সাবির উন্নত দেশের সমকক্ষ হবে। উল্লেখ্য, চিন তিন বছর বাকি থাকতেই প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ১৯৯৫ সালে, অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের পাঁচ বছর আগে; আর বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এগিয়ে চলেছে দৃঢ় পদক্ষেপে। চিনের এবং বিদেশের অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন চিন ২০৫০ সালের অনেক আগেই এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে এক বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবে।

চিন একদিকে যেমন বিদেশি শিল্প সংস্থাকে আহ্বান জানিয়েছে অন্যদিকে স্বদেশের সরকারি ও বেসরকারি শিল্প সংস্থাকেও বিদেশে বিনিয়োগ ও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, রাশিয়া এমন কি ভারতেও চিন ইতিমধ্যেই কয়েকটি শিল্প স্থাপন করে এসব দেশে স্থানীয় তৈরি পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। উন্নত দেশগুলি থেকে উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করে চিন স্বদেশে কয়েকটি শিল্প গড়ে আবার একই প্রক্রিয়ায় উন্নত দেশগুলিতে অনুরূপ শিল্প স্থাপন করে বিশ্বায়নের পূর্ণ সুযোগ নিতে সচেষ্ট হয়েছে। এই সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৫৬ সালে কুয়াংতুঙ প্রদেশে একটি পিয়ানো তৈরি কারখানা স্থানীয় সরকারের অর্থে স্থাপিত হয়। প্রায় ১০০ জন শ্রমিক এই কারখানায় কাজ করত এবং শহরের একটি সর্দীর্ণ গলিতে ছিল এর অবস্থান। এখানে, বছরে ১৩ থেকে ১৫টি পিয়ানো তৈরি হতো। মুক্তদ্বার নীতি ও অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হলে এই সংস্থা উন্নত বিদেশি প্রযুক্তি এবং বিদেশের কারিগরের সহায়তায় আন্তর্জাতিক মানের পিয়ানো তৈরি শুরু করে। বর্তমানে, এখানে বছরে ‘চুচিয়াং পিয়ানো’ ট্রেডমার্কের ৮০,০০০ পিয়ানো তৈরি করে সারা বিশ্বে পিয়ানো উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। প্রায় ৭০টি দেশে এই পিয়ানো বণ্টন করা হয়। বর্তমান বছরে, এই সংস্থা ইংলণ্ডে একটি উৎপাদন শাখা স্থাপন করার প্রস্তুতি নিয়েছে।

চিনের টেলিফোন, রঙিন টেলিভিশন, কম্পিউটার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিন

ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের যৌথ উদ্যোগ সংস্থা TCL Group মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, সিঙাপুর, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন এবং ভারতে উৎপাদন ও ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ২০০০ সালে চিন থেকে এই কোম্পানির পণ্যদ্রব্য রপ্তানির মূল্য ছিল ৫১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত রঙিন টেলিভিসন ও মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারক “Kongka Group Co. Ltd”-এর ‘Kongka’ ট্রেডমার্কের রঙিন টেলিভিসন ভারত সহ অন্যান্য কয়েকটি দেশে তৈরি ও বাজারজাত হচ্ছে।

কুয়াংতুঙ প্রদেশের তুংকুয়ান নামে একটি ছোট শহর বিগত ২০ বছরের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক শিল্প নগরে পরিণত হয়েছে। Nokia, Motorola, Siemens, Ericsson, General Electronic, Philips, Hitachi ইত্যাদি বহুজাতিক সংস্থা এখানে কারখানা স্থাপন করেছে। Motorola আগামী পাঁচ বছরে আরও ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং Ericsson এই সময়ে বর্তমানের ২.৪ বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি করে ৫.১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তুংকুয়ানে তৈরি কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ আন্তর্জাতিক বাজারে এক বিশেষ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। অনেক খ্যাতনামা কোম্পানির তৈরি কম্পিউটারে এখানকার তৈরি যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়। ২০০০ সালে এখানকার কম্পিউটার ও তার যন্ত্রাংশের বিদেশে রপ্তানি মূল্য ছিল ৭.৬ বিলিয়ন ডলার।

এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যে, চিন দেশের একমাত্র কুয়াংতুঙ প্রদেশেরই কয়েকটি শিল্প সংস্থা হংকং ও ম্যাকাও সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স এবং অস্ট্রেলিয়াতে ২০৩টি শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

গ্যাট থেকে ডব্লু টি ও

অর্থনৈতিক সংস্কার এবং মুক্ত দ্বার নীতি ফলপ্রসূ করতে চিন বিশ্ববাজারে প্রবেশের একটি মাধ্যম হিসেবে GATT-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পদক্ষেপ নেয় ১৯৮০ সালে। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালের মে মাসে প্রজাতন্ত্রী চিন GATT-এর প্রতিষ্ঠাতা দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু, গণ প্রজাতন্ত্রী চিন প্রতিষ্ঠার পর তাইওয়ান দ্বীপে অপসারিত কুওমিনতাও সরকার ১৯৫০ সালে GATT-এর সঙ্গে চুক্তিপত্র প্রত্যাহার করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গেই অধিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকায় গণ-প্রজাতন্ত্রী চিন তখন GATT-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেনি। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে, চিন সরকার GATT-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আবেদনপত্র পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

এরূপ সিদ্ধান্তের কাণ, চিন উপলব্ধি করে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রবণতার দৃষ্টিতে “পারস্পরিক অনুপ্রবেশ, একীকরণ এবং নির্ভরশীলতা দিন দিন গভীরতর হচ্ছে। সুতরাং কোন একটি দেশের পক্ষে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে অবস্থান করে সমৃদ্ধি লাভ সম্ভব নয়। GATT-এ পুনঃপ্রবেশ হলে স্বদেশের

শিল্পোদ্যোগসমূহের কাছে নিজস্ব উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের দুইটি বাজার উন্মুক্ত হবে...একটি অভ্যন্তরীণ বাজার আর একটি আন্তর্জাতিক বাজার। তখন প্রথমোক্ত বাজার ক্রমশ শেখোক্ত বাজারের সঙ্গে একীভূত হবে আর শিল্পোদ্যোগগুলিকে তাদের ব্যবস্থাপনা ও পণ্যদ্রব্যের গুণগতমান উন্নত এবং প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সচেতনতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্বীপিত করবে।”

১৯৮৪ সালে, চিন উরুগুয়ে আলোচনা সভায় “পর্যবেক্ষক” হিসেবে যোগদান করে। তখন, চিন আনুষ্ঠানিকভাবে “তৃতীয় আন্তর্জাতিক বয়নজাত দ্রব্য ব্যবসা চুক্তি” স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির পর চিনের এরূপ দ্রব্যের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে, জেনেভাতে চিন আনুষ্ঠানিকভাবে GATT-এ পুনঃপ্রবেশের জন্য আবেদন জানালেও তা সফল হয়নি। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা WTO গঠিত হলে চিন এই সংস্থার সদস্যপদ লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করে, এবং ১৯৯৬ সাল থেকে এই বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করে। কিন্তু কয়েকটি দেশের মানবাধিকার প্রশ্নে বাধাদানের ফলে চিনের WTO-এর সদস্যপদ লাভে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েক বছর চিন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনার পর দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে, এবং শেষ পর্যন্ত ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলে চিনের WTO-এর সদস্য হওয়ার পথ সুগম হয়। ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে, WTO-এর দোহা সম্মেলনে চিনকে সদস্যরূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবং ১১ ডিসেম্বর গণ প্রজাতন্ত্রী চিন আনুষ্ঠানিকভাবে WTO-তে ১৪৩তম সদস্যরূপে প্রবেশ করে।

WTO-এর সদস্যপদ লাভের সংবাদ প্রচারের পব চিন দেশের বিভিন্ন মহলে উল্লাসের ধ্বনি উঠেছিল। চিনের অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, WTO-এর সদস্য হওয়াব ফলে দেশের GDP ০.৫ থেকে ১% বৃদ্ধি পাবে।

WTO-এর শর্তবলী ও সদস্য দেশগুলির বাধ্যবাধকতা এবং সেই সঙ্গে উন্নত দেশগুলির চাপে স্বদেশের কোন কোন শিল্প সেক্টরের সম্মুখীন এমন কি লুপ্তও হতে পারে বলে অনেক উন্নয়নশীল দেশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। এরূপ সেক্টর সম্পর্কে চিনও সচেতন এবং বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে বিকল্প প্রতিক্রিয়ার পর্যালোচনা ও সমীক্ষা করে উপযুক্ত পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।*

চিন দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবস্থান এখনো গুরুত্বপূর্ণ। WTO-এর সদস্য হওয়ার ফলে দেশের খাদ্যশস্যেব ও কৃষিজাত অন্যান্য পণ্যের বাজার বিদেশের প্রতি উন্মুক্ত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের এই পণ্যগুলির আমদানি বৃদ্ধি পাবে। বিগত দুই বছরে চিন খাদ্যশস্য উৎপাদনে মোটামুটি স্বয়ংস্বত্ব হলেও এর পূর্ববর্তী দশধিক বছর বহু পরিমাণে খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি কবতে হয়েছে। কিন্তু চিনের বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যের তুলনায় অনেক বেশি। বিদেশজাত খাদ্যশস্যেব মূল্যের সমকক্ষ হতে না পারলে দেশের কৃষকেরা সেক্টেব মুখে পড়বে এবং

কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাবে। সুতরাং, কৃষি ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগ, উন্নত বীজ রোপণ, চাষে যান্ত্রিকীকরণ, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং কৃষি ব্যবস্থাকে আরও সজ্জাটিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে যাতে চিনের কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের মূল্য আন্তর্জাতিক মূল্যের নিম্নে বা সমান সমান হতে পারে। তবুও, খাদ্যশস্যের জন্য যে বিদেশ থেকে আমদানির ওপর নির্ভর করতে হবে সে বিষয়ে চিন সচেতন। এক হিসাব অনুযায়ী, ২০১০ সালে চিনের খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ বর্তমানের তুলনায় ১০% বৃদ্ধি পাবে। একপ পাবিস্থিতির জন্য চিন আদৌ বিচলিত নয়। কারণ, আগামী এক দশকের মধ্যে চিনের অন্যান্য শিল্প উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি লাভ করবে এবং বিদেশ থেকে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য আমদানি করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদেশি মুদ্রা মজুত থাকবে। গ্রামেগঞ্জে বিভিন্ন শিল্প ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অগ্রগতির জন্য কৃষক ও গ্রামের বাড়তি শ্রমশক্তির চাষাবাস ছেড়ে শ্রমিকে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ বাস্তবায়িত হবে। কৃষিকার্যে নিয়োজিত জনসংখ্যা হ্রাস পেলে চিনে মাথাপিছু কর্ভিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা আরও সজ্জাটিত করা সহজ হবে।

WTO-তে প্রবেশের ফলে কৃষিরই একটি অঙ্গ তামাক শিল্প বিরাট সঙ্কটের মুখে পড়বে বলে চিনের অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী চিন দেশে ধূমপায়ীদের সংখ্যা ৩০ কোটি। সারা বিশ্বে তৈরি সিগারেটের এক-তৃতীয়াংশ বিক্রীত হয় এ দেশে। WTO-তে প্রবেশের ফলাফল বিবেচনা করে চিনা সরকার ২০০০ সালের আগস্ট মাসেই রপ্তান্যন্ত তামাক শিল্পের পরিচালনা ব্যবস্থা পরিবর্তনের এক ত্রি-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে যাতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মোকাবিলা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যায়। “The Chinese tobacco industry is ready for the challenge,” লিখেছেন চিন হাইইয়েন।

ইস্পাং উৎপাদনে সারা বিশ্বে চিনের স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু WTO-তে প্রবেশের ফলে চিনের ইস্পাং শিল্পও সঙ্কটের মুখে পড়বে বলে চিনের অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন। ইস্পাতের ওপর আমদানি শুদ্ধ হ্রাস করার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তনের ইস্পাং তৈরি কারখানাগুলি। এর মধ্যে যে সব কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যের মান নিম্ন অথচ বিনিয়োগ বেশি সে-সব কারখানা দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হবার সম্ভাবনা আছে। মূলত ইস্পাং আমদানিশুদ্ধ অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি করে এ-সব কাবখানার স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে।

বিশ্ববাজারে, ইস্পাতজাত পণ্যদ্রব্যের মূল্য চিন দেশের অনুরূপ দ্রব্যের মূল্যের তুলনায় অনেক কম। যেমন, দক্ষিণ চিনের বাজারে গহনির্মাণে ব্যবহৃত লোহার রডের প্রতি টনের মূল্য ২৮০০ ইউয়ান (প্রায় ৩৬০ মার্কিন ডলার)। কিন্তু নিকটবর্তী হংকং-এর বাজারে এর মূল্য ১৯০০ ইউয়ান (প্রায় ২৫০ মার্কিন ডলার)। বিদেশ থেকে সরাসরি আমদানি করলে এই পণ্যদ্রব্যের মূল্য হবে ২৮০ মার্কিন ডলার। এর সঙ্গে জাহাজ ভাড়া, আমদানি শুদ্ধ ও অন্যান্য কর যোগ করলেও মোট মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হবে।

ইস্পাৎ শিল্পের সম্ভাব্য সঙ্কট দূর করতে চিন কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা করেছে। প্রথমত, বিভিন্ন প্রকার ইস্পাৎ পণ্যদ্রব্যসমূহের আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রমশ মোট আমদানি পরিমাণ হ্রাস। দ্বিতীয়ত, ইস্পাৎ শিল্পের আন্তর্জাতিক মান অর্জন। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জনের লক্ষে ইস্পাৎ দ্রব্য উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ; আর এর জন্যে আবশ্যিক : (১) প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, গবেষণার জন্য প্রযুক্তিবিদদের সক্রিয় করে তোলা, (২) গ্রহণযোগ্যতা শক্তিশালী করতে প্রযুক্তির স্বদেশীকরণ, (৩) গবেষণালব্ধ ফল উৎপাদিকাশক্তিতে রূপান্তর, (৪) নতুন নতুন ইস্পাৎ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা এবং গুণগত মানোন্নয়ন।

ইস্পাৎ উৎপাদনে চিনের প্রধান অন্তরায় আকরিক লৌহার অভাব। ইস্পাৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অব্যাহত রাখতে চিনকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে এই খনিজ পদার্থ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় এবং এর জন্যে বিদেশি মুদ্রার খরচও নিত্যন্ত কম নয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে চিন মুখ্যত দুটি পন্থা অবলম্বন করেছে। এক, স্বদেশের লৌহখনিগুলির উন্নতি এবং সুপরিকল্পিতভাবে আকরিক লৌহ নিষ্কাশন। দুই, বিদেশ থেকে আমদানি করে ঘাটতি পূরণ। সেই সঙ্গে, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে আকরিক লৌহ নিষ্কাশনের জন্য যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে চিন।

WTO-এর সদস্যরূপে চিনকে বিদেশি মোটরগাড়ির প্রতি আমদানি শুদ্ধ মাত্র ২৫% ধার্য করতে হবে। ফলে, চিনের অপেক্ষাকৃত নতুন অটো-শিল্পকে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। পঞ্চাশের দশকে চিন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় দুটি মালবাহী ট্রাক তৈরি কারখানা এবং শাংহাইতে একটি মোটর গাড়ি তৈরি কারখানা স্থাপন করে। বছরে একশোটি মোটরগাড়ি তৈরি শুরু করে বহু বছর পর্যন্ত উৎপাদন এক হাজারের বেশি যেতে পারে নি। কিন্তু ১৯৮০ সাল থেকে General Motors, Honda সহ কয়েকটি বিদেশি মোটর প্রস্তুতকারকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে কারখানা স্থাপন করে চিন ১৯৯৫ সালের মধ্যেই দশ লক্ষ মোটর গাড়ি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে, চিন মোটর গাড়ির মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্যের তুলনায় কম কিংবা সমান রাখার চেষ্টা করেছে যাতে কিছু সংখ্যায় মোটর গাড়ি বিদেশ থেকে আমদানি করলেও অধিক সংখ্যক রপ্তানি সম্ভব হয়।

১৯৯৮ সাল পর্যন্ত চিন ১৭২টি বিদেশি ব্যাঙ্কে সে-দেশে ব্যবসায়ের অনুমতি দিয়েছিল, এবং তখন চিন ও বিদেশি বিনিয়োগে যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৭। ১৯৮০ সালে, চিন দেশে বিদেশি ব্যাঙ্কের শাখা কেবলমাত্র “বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল” জিন্মাকলাপের অধিকারী ছিল। নব্বইয়ের দশকে, প্রথমে সমুদ্রোপকূলবর্তী শহর এবং পরে কয়েকটি বৃহৎ বাণিজ্যিক শহরে বিদেশি ব্যাঙ্কে শাখা খুলবার অনুমতি দেওয়া হয়। বর্তমানে, ১৮টি দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক চিন থেকে ১৫৭টি শাখা স্থাপন

করেছে। উল্লেখ্য, এ সব বিদেশি ব্যাঙ্ক চিনে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকারী দেশ বা অঞ্চল থেকে এসেছে।

নব্বই দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিদেশি ব্যাঙ্কগুলি শুধু মাত্র বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যবসায়েরই অধিকারী ছিল। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে, শাংহাইতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন বিদেশি ব্যাঙ্কগুলিকে চিনা মুদ্রায় ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া হয়। বর্তমানে এই শহরে Citibank, Bank of America, Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd. সহ ২৪টি বিদেশি ব্যাঙ্কের শাখা চিনা মুদ্রায় ব্যবসার অধিকার ভোগ করছে।

কিন্তু, WTO-এর সদস্যরূপে চিনকে বিদেশি ব্যাঙ্কগুলিকে নিজস্ব ব্যাঙ্কের সমান সুবিধাভোগের অধিকার দিতে হবে। ফলে, এ-সব ব্যাঙ্ক তাদের ক্রিয়াকলাপ প্রসারে সচেষ্ট হবে আর চিনের ব্যাঙ্কগুলিকে প্রবল প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তাতে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ ক্ষতি হবে না বলে চিনের অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন।

প্রথমত, স্থানীয় মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যবসায়ে বিদেশি ব্যাঙ্কগুলি দেশীয় ব্যাঙ্কের তুলনায় সর্বদাই পিছিয়ে থাকবে। দেশীয় ব্যাঙ্কে সঞ্চয় জমা রাখার সুযোগ সারা দেশে বিস্তৃত। কিন্তু বিদেশি ব্যাঙ্কের শাখা মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে অর্থনৈতিক কারণে। তাছাড়া বিদেশি ব্যাঙ্ক সম্পর্কে অনেকে সন্দেহান, এতে সঞ্চয় জমা রাখতে ভরসার অভাব বিদ্যমান। উল্লেখ্য, নব্বই দশকের শেষের দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা অবস্থা থাকার দরুন Hokkaido Takushoku Bank Ltd. সহ কয়েকটি বিদেশি ব্যাঙ্ক চিন দেশে অবস্থিত তাদের শাখাগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, চিনা মুদ্রায় লেনদেনের ব্যবসায় দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি তাদের জাতীয় সঞ্চয় আকাউন্টের সুবিধা পাবে আর ঋণদানের পরিসেবার সুযোগ পাবে বেশি। বিদেশি ব্যাঙ্কের শাখাগুলির চিনা মুদ্রা অর্জনের উৎস মুখ্যত দুটি : একটি তাদের নিজস্ব সীমিত চলতি মূলধন, আব অপরটি চিনা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ। চিনা সরকার বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে চিনা মুদ্রায় ব্যবসার প্রসার রোধ করার কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবছে। যেমন, চিনা মুদ্রায় ঋণদানের সর্বোচ্চ পবিমাণ এ-সব ব্যাঙ্কের চলতি মূলধনের চার অথবা আট গুণের মধ্যে সীমিত রাখা হবে।

তৃতীয়ত, বিদেশি ব্যাঙ্কগুলি মুখ্যত বিদেশি বিনিয়োগকারী দেশগুলির শিল্পসংস্থারই সেবা করবে। আর দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্নক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার দরুন এ-সব শিল্পসংস্থাকে বেশি করে আকৃষ্ট করার দিকে সচেষ্ট হবে।

এ-সব কারণে, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বিদেশি ব্যাঙ্কের উপস্থিতিতে চিনের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না বলেই অনেকে মনে করেন।

চিনের ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সে-দেশের বিভিন্ন শিল্প সংস্থা বিদেশে উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে চিনের Bank of China ছাড়া আরও কয়েকটি ব্যাঙ্ক বিদেশে শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চিন দেশে বীমা শিল্প বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। চিনের অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, WTO-তে প্রবেশের ফলে দেশের বীমা শিল্প উন্নত হবে এবং অগ্রসর লাভ করবে; আর কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে বিদেশি বীমা কোম্পানির উপস্থিতিতে ক্ষতির তুলনায় লাভবানই হবে বেশি। কয়েক বছর আগে, কয়েকটি বিদেশি বীমা কোম্পানিকে শেনচেন ও শাংহাই সহ কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবসায়ের অনুমতি দিয়েছে। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, চিনের Insurance Regulatory Commission “Gerling Insurance Group”কে চিনের উন্মুক্ত বাণিজ্যিক শহরগুলিতে অবধি ব্যবসায়ের অনুমতি দিয়েছে। ১৯৯৫ সালে, এই কোম্পানিকে একমাত্র পেইচিং শহরে কার্যালয় খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ২০০০ সালে এই কোম্পানি শাংহাই শহরে “Gerling Credit Information Consultancy (Shanghai) Co.” নামে একটি সংস্থা স্থাপনা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের C.G.N.U. Plc, Royal & Sun Alliance, ফ্রান্সের CNP, নেদারল্যান্ডের Aegon, আর জার্মানির Allianz বীমা কোম্পানিগুলিকেও ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবেদনের চাব মাসের মধ্যে বিদেশি বীমা কোম্পানিগুলিকে অনুমতিপত্র দেওয়া হবে বলে চিনা সরকার ঘোষণা করেছে। যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানিতে বিদেশি কোম্পানি ৫১% শেয়ারের অধিকারী হতে পারবে, আর দুই বছর পর বিদেশি অ-জীবন বীমা কোম্পানি নিজেদের একমাত্র মালিকানাভিত্তিতে ব্যবসায়ের অধিকার লাভ করবে বলে চিন ঘোষণা করেছে।

WTO-এর সদস্যরূপে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চিন লাভবান হবে বলে মনে করে। বহু দেশের বাজার চিনের কাছে মুক্ত হবে, এবং বিভিন্ন কারণে সে-সব দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপিত হলে চিনের বহির্বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হবে।

১৯৭৮ সালে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংস্কার ও মুক্ত দ্বার নীতি ঘোষণার বছরে, চিনের বণ্টনি মোট মূল্য ছিল ৯.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, আর আমদানির মোট মূল্য ছিল ১০.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০০ সালে, চিনের বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট মূল্য হয় ৪৭৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩১.৮% বৃদ্ধি। এর মধ্যে রপ্তানির মোট মূল্য ২৪৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৭.৮% বৃদ্ধি, আর আমদানির মোট মূল্য হয় ২২৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৫.৮% বৃদ্ধি। চিনের দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০০১-২০০৫) অনুসারে দেশের রপ্তানি ও আমদানির মোট মূল্য ৬৮০ মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে। চিন ইতিমধ্যে বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের সপ্তম স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রপ্তানি ও আমদানি ব্যবসায়ে চিন প্রায় এক দশকের মধ্যে জাপানকে অতিক্রম করে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে এক নজির সৃষ্টি করেছে।

চিনের এক অর্থনীতিবিদ মন্তব্য করেছেন : “China’s entry into the WTO will represent a further step in its long march towards integration into

the global economy. Which Chinese products will have more secure access to international markets, foreign goods and services will be able to penetrate the Chinese markets much easier than before.”^{১০}

উপসংহার

পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন “(China) is widely expected to replace Japan as Asia’s economic powerhouse.”^{১১} আবার, কেউ কেউ চিনকে “Next economic superpower” বলে আখ্যা দিয়েছেন।^{১২} উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে তাদের এরূপ মন্তব্য নেহাৎ অমূলক নয়।

অনেকের প্রশ্ন মাত্র দু’দশকের মধ্যে চিন এরূপ অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হলো কি করে? এ-প্রশ্নের উত্তর : অর্থনৈতিক সংস্কার এবং বিশ্বায়ন। সাম্যবাদ অর্জনে প্রয়াসী চিন অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণেরই ফলশ্রুতি স্বল্প সময়ের মধ্যে অবিস্বাস্য সাফল্য ও অগ্রগতি। সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল ও পূর্ব প্রান্তে মুক্তদ্বার নীতি আশানুরূপ ফলপ্রসূ হওয়ায় চিন বর্তমানে পশ্চিমাঞ্চলের অনুল্লত প্রদেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি ও শিল্প বিকাশের জন্য বিশেষ সুবিধাদানের কথা ঘোষণা করে বিদেশি ও স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রাধান্য থেকে মুক্ত করে একটি শিল্পায়িত উন্নত দেশে পরিণত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চিন বন্ধপরিকর। কৃষকেরা ক্রমশ ক্ষেতখামার ছেড়ে অ-কৃষি শিল্পে নিয়োজিত হচ্ছে। গ্রামে বিভিন্ন শিল্প স্থাপন ও বিকাশের ফলে চিনের প্রায় সব প্রদেশের নগরায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে। এ-সব স্থানে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য আঙ্গ বিশ্ববাজারে ঠাই পাচ্ছে। পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে আধুনিকীকরণ উদ্ভাবন এবং অধিক উৎপাদনশীলতা নীতি একদিকে চিনের বহু পণ্যদ্রব্যকে বিশ্বমুখী করেছে, অন্যদিকে কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশেরও শিল্প সংস্থাকে আকৃষ্ট করেছে চিনের ভূখণ্ডে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে নিজের নিজের দেশে অথবা অন্য দেশে বাজারজাত করতে।

বিশ্ববাজারে স্থান করে নিতে এবং বিশ্বায়নের ফলে উন্নত দেশগুলির আধিপত্য হ্রাস ও প্রতিযোগিতায় সমকক্ষতা অর্জনে চিনের শিল্প সংস্থাগুলিকে সক্রিয় হতে আহ্বান জানিয়েছেন চিনের সরকার এবং অর্থনীতিবিদরা। চীনের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লি ইনিং বলেছেন : “Only by raising the competitiveness of enterprises will we be able to ward off foreign businesses coming in en masse... Integrating market positioning with industries upgrading will definitely see a huge improvement in the competitiveness of China’s enterprises.”^{১৩}

অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে একটি মাধ্যমরূপে চিন তার মূল লক্ষ্য উপলব্ধি করায় ব্রতী হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে দেশের অর্থনীতির একীকরণ ঘটাতে চিন ইতিমধ্যেই যে-

সব বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। WTO-এর সদস্যপদ লাভের পর চিন আরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ঘোষণা কবেছে।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে স্বাগত জানিয়ে চিনের এক উপ-প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

“We will also carry out the open strategy of ‘going global’ and encourage qualified (Chinese) companies with competence to make overseas investment. In this way, we can integrate ‘Attracting Foreign Investment’ with ‘Going Global’ and participate in international economic cooperation in a more comprehensive way”^{১৪}

স্পষ্টতই, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও ব্যাপক শিল্পায়নের জন্য চিন দেশের এখন মূলমন্ত্র : বিশ্বায়ন।

তথ্য সূচী

১. Xing Houyuan, News From China, August 29, 2001, New Delhi, p. 14.
২. Wu Jianping, Wu Chungang, “Quanqiu hua yu Zhongguo xirde fazhan moshi”. (বিশ্বায়ন ও চিনদেশের অগ্রগতির নতুন মডেল), Shijie jingji yu zhengzhi (বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতি), No 4, 2001, পেইচিং, p. 45-50.
৩. D. Ryaznaff, The Communist Manifesto of Karl Marx and Frederick Engels, New Book Centre, Calcutta, 1986. p. 31
৪. Wu Shuqing এবং অন্যান্য সম্পাদনা, Zhongguo Shehuizhuyi Jianshe (চিনের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ), Liaoning Renmin Chubenshe (লিয়াওনিং গণ-প্রকাশনালয়) শেনইয়াং, 1995, p. 100
৫. Zhao Ziyang, চিনের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সমাজতন্ত্রের পথ ধরে এগিয়ে চলুন”, চিনা কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট, অনুবাদ সেন নানান, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পেইচিং, 1987, p. 8
৬. Jiang Zemin, “Accelerating Reform and Opening-up”, Political Report to the XIV Congress of the Communist Party of China, প্রকাশক Sushil Choudhury, Calcutta, 1992, p. 17.
৭. Zhao Ziyang, ঐ p. 35.
৮. Chen Yuming, সম্পাদনা, Zhongguo Jiaru WTO...ge Hengye Qianjin Fengxi (চিনের WTO-তে প্রবেশ...বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্লেষণ), Jingji Ribao Chubanshi (অর্থনৈতিক দৈনিক প্রকাশনালয়), পেইচিং, 2000.
৯. China Today, July 2001, পেইচিং p. 75.

১০. C. H. Kwan, "The Rise of China as an Economic Power : Implications for Asia", World Economy and China, No. 3. 2001, পেইচিং, p. 37
১১. Economic Times, 28 November 2001, p. 10.
১২. William H. Overholt, China : The Next Economic Superpower, Weidenfed & Nicolson, London, 1993.
১৩. Li Yining, "Divergent Views Concerning China's Economic Issues", World Economy & China, No. 3, 2001, পেইচিং, p. 6-7.
১৪. Wu Bangguo, News From China, October 1, 2001, New Delhi, p. 20.

হিপ হপের মাধ্যমে আফ্রিকার চ্যালেঞ্জ

ক্যাথারিন হেন্ডারসন

আফ্রিকাতে হিপ্-হপ্ সঙ্গীত বহুল প্রচারিত। মাত্র এক সপ্তাহে আমি তিনটে নতুন আলবাম শুনেছি যার গায়করা হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত হিপ্-হপ্ শিল্পী। হিপ্-হপ্ এমন এক সঙ্গীতের ধারা যা একদম সাধারণ অবস্থাতেও যথেষ্ট বিতর্কিত। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো এও দেখা যায় যে একে এর সামাজিক উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না, আবার কখনো এর নৈতিকতা নিয়েও প্রশ্ন জাগে। সাধারণ মানুষের মনে (সেই দলে আমিও আছি) এই প্রশ্ন বারবার আসে এবং তাঁরা নিজেরা তার নানারকম উত্তর তৈরি করে নেন যে কারা এবং কেন এই সঙ্গীত সৃষ্টি করে। এই ধারণাগুলি তৈরির মূলে আছে অঞ্চল বিশেষে পোশাকের বিশিষ্ট শৈলীর সঙ্গে গানকে জুড়ে দেওয়া অথবা দক্ষিণ ব্রং (Bronx) আমেরিকার বিভিন্ন আফ্রো-আমেরিকান গোষ্ঠীর উৎস সম্পর্কে ভাবনাগুলিকে সূত্র হিসাবে কাজে লাগানো। সেইসব জনসাধারণের মধ্যে আর একটি ভিত্তিহীন ভাবনা বা ধারণা আছে যাঁরা এটাকে আমেরিকান, কৃষ্ণাঙ্গ এবং পুরুষতান্ত্রিক বলে অপছন্দ করেন।

আমি যে তিনটি সিডির কথা বলছিলাম, প্রথমবার শুনলে দেখা যাবে তা মূলত আফ্রো আমেরিকার স্থানীয় ভাষায় রচিত যাতে গোষ্ঠী-সংঘর্ষ আর ব্যক্তিগত আক্রোশের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। প্রচলিত যে ধারণা হিপ্-হপ্ সম্পর্কে সেই একঘেয়ে ধারণা, মদ ও নারীর কথাই শ্ববনিত হয় গানের মধ্যে। তবে শিল্পীদের ছবি আমার সেই ধারণাকে ঝাপসা করে দিয়েছে—সেখানে দেখা যায় তরুণ ছেলেরা আমেরিকান স্টাইলে খেলার পোশাক পরেছে, পায়ে দামি মিকার, আর মাথায় বেসবল খেলার টুপি। গানের কথায় এসেছে এইচ. আই. ডি/এইডস, জাতিবিদ্বেষ বা শহর কেন্দ্রিক জীবনের কথা, যা আমেরিকার দলগুলিরও গানের বিষয়। তাহলে আমরা কি ধরে নেব, দক্ষিণ আফ্রিকার হিপ্-হপ্ সঙ্গীত সেই তথাকথিত ভাবনারই প্রকাশ, যাকে বিশ্বায়ন-বিরোধী গোষ্ঠীরা নাম দিয়েছেন “ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন” (Mc Donaldisation)?

যত বেশি করে শুনছিলাম, ততই অনুভব করছিলাম আমেরিকার দলগুলির সঙ্গে হিপ্-হপ্ সঙ্গীতের প্রভূত পার্থক্য। হিপ্-হপ্ গানে স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র আর আঞ্চলিক ইতিহাস উপস্থিত। আবার অন্যদিকে দুধরনের সঙ্গীতে একটা মিলও আছে, সেই মিলটা অনেকটাই পরিস্থিতিগত সাদৃশ্য যা আশির দশকের গোড়ার দিকে দক্ষিণ ব্রং-এর গোষ্ঠীগুলি পেরিয়ে এসেছে আর অন্যদিকে কেপ টাউন শহরের দরিদ্র অধিবাসীরা বা

আফ্রিকার অন্যান্য বড় শহরের মানুষরা অনুভব করেছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। হিপ্ হপ্ গানে যেমন স্থানীয় সময় ও আঞ্চলিক এলাকার গল্প উঠে এসেছে তেমনই উঠে এসেছে এলাকার মানুষদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথা। আমি বিস্মিত হতাম এই ভেবে যে, কি সেই যাদু যা হিপ্ হপ্ সঙ্গীতকে এতখানি জনপ্রিয় করেছে? বিশ্বায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে এই সঙ্গীতের ধারাটিতে কী এমন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে যা গোটা বিশ্ববাসী কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে? এই ধবনের গানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ছবি পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কুফল সম্পর্কে যেখানে সবাই ওয়াকিবহাল, আমি সেখানে চিন্তা করি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সুফলগুলি সম্পর্কে।

বিশ্বায়নকে বিরোধীরা সর্বদাই ‘ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন’ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিকে একই ধরনের সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে এনে একজাতীয় করে তোলা, ঠিক যেমনটি বিশ্ব জুড়ে ‘ম্যাকডোনাল্ড’ এই নামের ছত্রছায়ায় আনা হয়েছে বিভিন্ন দেশের খাদ্যসমূহকে এবং তার প্রতিমূর্তি হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে ম্যাকডোনাল্ড খাদ্যশৃঙ্খল। কেউ কেউ বলে থাকেন হিপ্-হপ্ শিল্পীদের গান থেকে বোঝা যায় তাদের ওপর পাশ্চাত্য প্রভাব কতখানি আর তারা নিজেদের ঐতিহ্য থেকে কতখানি দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। আর এক দলের মতে, হিপ্-হপ্ সঙ্গীতে আফ্রিকার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সার্থক রূপ ফুটে উঠেছে। আমি এদের কারোর কথাই সঙ্গে একমত নই কারণ এরা কেউই সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতাবাদ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আসলে ব্যক্তি মানুষকেই শেষ অবধি স্থির করতে হবে তাঁরা কেমন গান তৈরি করবেন, কেমন গান শুনবেন, কী পারবেন অথবা কী বলবেন অথবা কীভাবে বলবেন? দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গীতের ওপর আমেরিকার সঙ্গীতের প্রবল প্রভাব অত্যন্ত দুঃখজনক—কিন্তু একইসঙ্গে তা এও প্রমাণ করে যে দক্ষিণ আফ্রিকার নিবাসীরা কোনও ভাবেই তাদের নিজেদের জ্ঞান সঠিক চাহিদার বস্তুটি নির্বাচন করে নিতে পারেনি বা সেখানে যারা সঙ্গীত প্রযোজনা করে তারাও এবিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নয়। আমার কিন্তু বিশ্বায়ন বিরোধীদের বিরুদ্ধে সেভাবে কিছু বলার নেই, কারণ আমি ওঁদের অবস্থাটা অনুধাবন করতে পারি—যাঁরা বিশ্বায়ন সমর্থন করেন না তাঁরা এমন একটা দ্বিমুখী টানাপোড়েন অনুভব করেন যাতে তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা কোনও সঠিক সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র সামগ্রিক বিশ্বনিয়ন্ত্রণহীনতার সপক্ষে যে প্রচেষ্টা তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে—আমার মতে বিশ্বায়ন বিরোধিতার ক্ষেত্রটি কোনওভাবেই নব্বু উদারতাবাদের সমর্থক নয়। বিশ্বায়ন বিরোধীরা নিজেদের যুক্তির জোরে হিপ্-হপ্ সঙ্গীতের ঐশ্বর্যময় দিকটিকেও অস্বীকার করছেন। আর আমরা তার ভাল-মন্দ কোনকিছুই ভালমতো যাচাই না করে বিশ্বায়নের সুযোগকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছি এবং তাদের চ্যালেঞ্জগুলোকে ভুলভাবে তুলে ধরছি।

বিশ্বায়নের অজ্ঞান দিক আছে। সরকার, পৌরসভা, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এমন সব

অসংখ্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যা স্থানীয় সময় ও মানুষকে ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশ্বায়ন এই পৃথিবী নামক গ্রহে বসবাসকারী সমস্ত মানুষকে ব্যবসা, জনসংযোগ, হৃদযন্ত্রচলন, ভ্রমণ, উৎপাদন তথা রাজনীতির মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। বিশ্বায়ন কেবল স্থানীয় ধারণা ও অস্তিত্ব ও জীবনধারণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের অস্তিত্ব-চিন্তা নয়, নব্য উদারতার ব্যক্তিগত সংস্কার লড়াই নয়। ব্যাপারটা এত সরল করার কোনও অর্থ নেই। যদিও একে খুব সহজেই অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বা সংস্কৃতির পাশ্চাত্যকরণ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বায়ন সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার কারণ তা ব্যক্তি ও জাতিকে প্রভাবিত করে। বিশ্বায়ন অর্থনীতির চেয়ে অনেক ব্যাপক ও গভীর বিষয়। বিশ্বায়ন মানে কেবল অর্থনৈতিক স্বয়ংস্বরতা নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। তবে আফ্রিকার জন্য বিশ্বায়ন কী করতে পারে এবং তা কীভাবে হিপ-হিপকে বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত করে—এই আলোচনা জরুরি।

বিশ্বায়ন আফ্রিকাকে স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত করেছে—একদিকে ক্রমাগত সুযোগ সুবিধার আশ্বাস এবং অন্যদিকে বিপদ সম্পর্কে সতর্কীকরণ—আফ্রিকাবাসীকে নিশ্চিত হতে দেয়নি। একদিকে প্রভাবিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব, যা থেকে দেখা যাচ্ছে আশির দশকে, উন্নতির বদলে আফ্রিকাবাসীর গড় মাথাপিছু আয় প্রায় ৩০ শতাংশ কমে গেছে। এই ধরনের তথ্যের আলোয় বিশ্বায়নের ধারণাকে আক্রমণ করাটা তাদের পক্ষে দোষ বলে গণ্য হওয়া উচিত নয়। যদি সত্যিই অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন উন্নয়ন আনতে পারে এবং দারিদ্র্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে, তবে বিশ্বায়ন চালু হবার পরও পৃথিবীর বেশ কিছু অংশের মানুষ দারিদ্র্যের কারণে কেন কষ্ট ভোগ করছে। অন্যদিকে একথা অবশ্যই সত্যি যে স্থায়ী ও সাম্যানির্ভর অর্থনৈতিক উন্নতি দারিদ্র্য দূর করতে পারে এবং এই ধরনের সুস্থিতি বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নতি এনে দিতে পারে। এটা যেহেতু রাখতে হবে যে বিভিন্ন নেতিবাচক কারণে আফ্রিকায় বিশ্বায়নের গতি ব্যাহত হয়েছে—কখনো তা গৃহযুদ্ধ, কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতা আবার কখনো তা এইডস জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব। তবে আফ্রিকায় অনেক লুকনো প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ রক্ষিত আছে। যেমন এই মহাদেশে অজস্র গুরুত্বপূর্ণ আকরিকের খনি আছে—সোনা, হীরে, প্লাটিনাম, কোবাল্ট ও ক্রোমিয়াম। পাশাপাশি আছে মানব সম্পদ যার একটি উদাহরণ হলো হিপ-হপ গোষ্ঠীর সঙ্গীত। অবশ্য আফ্রিকার অনেক জায়গায় একনাযকতন্ত্র চালু ছিল, যার বিকল্পে নব্বই-এর দশকে তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে এবং গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা হয়েছে। এইসবের ফলে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অনেকখানি বেড়ে গেছে; শুধু তাই নয় মানবিক সম্পদগুলির যথাযথ মূল্যায়নের ব্যবস্থাও ত্বরান্বিত হয়েছে। হিপ-হপ এখনে একটা রাজনৈতিক কণ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে যারা কিনা তরুণ, দরিদ্র ও প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের হয়ে কথা বলতে পারে বা তাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন ওঠাতে পারে। আফ্রিকার বহু দেশ সংস্কারমূলক কর্মসূচি চালু করেছে যাতে তাদের অর্থনীতিতে ভারসাম্য ফিরে আসে, প্রাকৃতিক ও মানবিক

সম্পদগুলির যথার্থ ব্যবহার হয় এবং উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়। বেসরকারিকরণের ফলে দেশি ও বিদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য দরজা খুলে যাচ্ছে আর পাওয়া যাচ্ছে উন্নত পরিসেবা। দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু দেশ বিনিয়োগের জন্য বিবিধ বৈদেশিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। প্রায় চল্লিশটি আফ্রিকার দেশ এখন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (World Trade Organization) সদস্য এবং আরো বহু দেশ এর সদস্য হতে চলেছে। সুতরাং বলা চলে চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং আফ্রিকার অবশ্যই ক্ষমতা আছে যাতে তারা উন্নয়নের এই চ্যালেঞ্জটির মোকাবিলা করতে পারে।

বিশ্বায়নের বিবিধ সুবিধার একটি হলো, এর ফলে মানুষ তার নিজের কথা বিশ্বের সামনে বলার সুযোগ পাচ্ছে। “ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন” তত্ত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমি বলব, বিশ্বায়ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সংস্থানির্ভর কাজের সুযোগ বাড়িয়েছে। তাছাড়া বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠী, ব্যক্তি বা সরকার সুযোগ পাচ্ছে তার কথাকে, তার ভাবনাকে উন্নত বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার, আর ধনী ও দরিদ্র এই দুই বিশ্বের মধ্যে গ্রথিত হচ্ছে এক যোগসূত্র। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের যারা বিরোধী তাদের বক্তব্য, WTO বা TNC-র মতো সংস্থাগুলি যোগাযোগের জন্য যে প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তা সঠিক নয়—কিন্তু আমার মতে পাশাপাশি এও মনে রাখা দরকার যে এই প্রযুক্তিই কিন্তু আফ্রিকা জাতিকে এক স্বতন্ত্র কণ্ঠ দিয়েছে, নিজেদের প্রকাশ করার জন্য।

বিভিন্ন অসাম্য ও মত পার্থক্য সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক উন্নয়নের যে শৃঙ্খলা তাকে একসূত্রে বেঁধেছে সংযোগকারী প্রযুক্তিই। মাত্র কুড়ি বছর আগে বায়াফ্রান (Biafran)-এর আকাল গোটা বিশ্বের কাছে এক ভয়ঙ্কর, মর্মভেদী সংবাদ ও বার্তা এনে দিয়েছিল আফ্রিকা সম্পর্কে। ধনী বিশ্ব জেনেছিল আফ্রিকাকে তাদের দেশলাই কাঠির মতো ঠ্যাঙালা, পেট বার করা শিশুদের ছবির নিরিখে, গত কুড়ি বছর ধরে বিশ্বের সমস্ত ধনীদেশের কাছে এইভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে দরিদ্র দেশ আফ্রিকা। বিশ্বায়ন তাদের অন্তত এটুকু সুযোগ দিয়েছে যাতে তারা নিজেদের কাহিনী নিজেরাই বলতে পারে আর বিশ্ববাসী তা সঠিকভাবে শোনার সুযোগ পায়। হিপ-হপ্ একটি প্রচলিত সঙ্গীত মাধ্যম যা অতীতে ব্যস্ত আফ্রিকার গল্পকে নিজেদের সঙ্গীতের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে, ভুল প্রমাণ করতে পারে। আর ঠিক সেইজন্য আমার মনে হয়, হিপ-হপকে ম্যাকডোনাল্ডাইজেশনের করাল গ্রাসে আবদ্ধ না করে তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি লোকসঙ্গীতের শাখা হিসাবে গণ্য করাই শ্রেয়।

শান্তি, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং স্থায়ী উন্নয়নের পথে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষকে এখনও অনেকটা এগোতে হবে। নীতিবাদ আর অর্থনীতি, সহযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এইসব শব্দ যুগলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে তাদের পৌঁছতে হবে কান্ডিত লক্ষ্যে। আফ্রিকা নামক মহাদেশটি এখনও শারীরিক ও মানসিকভাবে তাদের পর্যুদস্ত অবস্থার জন্য শক্তি, গোটা মহাদেশ জুড়ে অনেক গ্লানি আর ব্যর্থতার ইতিহাস। উন্নতির পথে হেঁটে স্থায়ী উন্নয়নের

চূড়ায় পৌঁছে দেশের ভ্রান্ত ইতিহাসকে নতুন সাজে সজ্জিত করতে হলে বিশ্বায়নের পদ্ধতিকে আরো অনেক সময় দিতে হবে। যাই হোক, মন্ত্রণ গতিতে হলেও একটি জটিল অর্থ উদ্ভীপক আফ্রিকার ছবি ক্রমশ বিশ্ববাসীর সামনে ভেসে উঠছে। হিপ-হপ হলো আজকের আফ্রিকার কণ্ঠস্বর। আমরা যদি এই সঙ্গীত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, তাহলে আমরা কোনদিন জানতে পারব না এর মূল উদ্দেশ্য কী। এরা কী বলতে চায় সংস্কৃতির বিকাশ নিয়ে—বরং যদি একটু মন দিয়ে এদের কণ্ঠস্বর শুনি আমরা একটা নতুন আফ্রিকার কাহিনী শুনতে পাব, দেখতে পাব এক নতুন আফ্রিকার ছবি।

[ক্যাথারিন হেন্ডারসন (Katherine Henderson) : অস্ট্রেলিয়ার ওলোনগঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রী। গবেষণা ও লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত, যার বিষয় হলো বিজ্ঞাপনের ভূমিকা, বিশেষ করে বিজ্ঞাপন কীভাবে এন. জি. ও. গুলোকে পাদপ্রদীপে নিয়ে আসতে পারে। ক্যাথারিন অক্সফোর্ড স্বেচ্ছাসেবিকা, নীল ফুল ভালবাসেন, ভালবাসেন সঙ্গীত আর মোটর সাইকেল। ক্যাথারিনের লেখাটি এনেছেন ওঁর শিক্ষক, শ্রয়ণের বন্ধু রুচিরা গঙ্গোপাধ্যায়-ফ্রেস, লেখাটি অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক শামিম আহমেদ।]

বিচ্ছিন্ন আফগানিস্তান : বিশ্বের ঔদাসীন্য

মহসীন মখমলবাক

এই নিবন্ধটি পড়তে লাগবে প্রায় একঘণ্টা। এই এক ঘণ্টায় আফগানিস্তানে যুদ্ধে ও খাদ্যাভাবে মারা যাবেন আরও ১৪ জন আর অন্তত ষাটজন লোক এই সময়ের মধ্যে গৃহহারা হয়ে চলে যেতে বাধ্য হবেন অন্য দেশে—শরণার্থী হয়ে। এই তিস্ত বিষয়টি যদি আপনাদের সুন্দর জীবনের সাথী না হয়—তা হলে এটা না পড়াই ভাল।

আফগানিস্তান সম্পর্কে বিশ্বের দুটিভঙ্গি

গত বছর আমি পুসান চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে গেছিলাম দক্ষিণ কোরিয়া। সেখানে আমাকে বারবার প্রশ্ন করা হচ্ছিল আমার পরের ছবি নিয়ে। আমার স্থির উত্তর ছিল, আফগানিস্তান। এর পরের অবশ্যস্বার্থী প্রশ্ন “আফগানিস্তান কী?” আমার প্রশ্ন, এইরকম হবে কেন? একটি রাষ্ট্র এতখানি গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে কেন যে অপর একটি এশীয় দেশ (দঃ কোরিয়া) তার অস্তিত্ব সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হবে না?

কারণটা খুব স্পষ্ট। সাম্প্রতিক বিশ্বে আফগানিস্তানের কোনওরকম ভূমিকা নেই। না তাদের কোনও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হয়েছে, না তারা কোনও বিশেষ পণ্য উৎপাদন করে, এমনকি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্মানিত হবার মতো কোনও কাজ এদেশের নেই। আমেরিকা, ইউরোপ এবং মধ্য প্রাচ্যের কাছে অবশ্য চিত্রটা একটু ভিন্ন—তারা আফগানিস্তানকে চেনে এক আঙ্গুর দেশ হিসাবে।

এই বিশ্বয়ের কোনওরকম সদর্থক যথার্থতা নেই। যারা এই দেশের নাম জ্ঞানেন তাবা একে যুক্ত করেন স্মাগলিং, তালিবান, ইসলামি মৌলবাদ, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ—দীর্ঘকালীন গৃহযুদ্ধ, আকাল আর অতিরিক্ত মৃত্যুহারের সঙ্গে। এই চিত্রের কোথাও এতটুকু শান্তি, স্থিতি বা উন্নতির রেখামাত্র নেই। তাই, খুব সঙ্গত ভাবেই ভ্রমণবিলাসীরা এখানে বেড়াতে যেতে চাননা এমনকি ব্যবসায়ীরাও এদেশে বিনিয়োগে উৎসাহী নন। তবে বিশ্ব যদি এদেশের ব্যাপারে বিস্মৃত হতে চায়, তাদের কী দোষ? অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে, খুব শিগগীর ‘আফগানিস্তান’ শব্দের পাশে অভিধানে বোধহয় লেখা হবে মাদক উৎপাদনকারী রাষ্ট্র যার বাসিন্দারা রুক্ষ, অক্রমণাত্মক এবং মৌলবাদী—যারা নারীদের বোরখা পরানোতেই তাদের পৌরুষের প্রকাশ খুঁজে পায়।

সবকিছুর ওপর বৃহত্তম বৌদ্ধমূর্তির বিনাশ গোটা বিশ্বকে ব্যথিত করেছে, শিল্পপ্রেমী মানুষ এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন প্রবলভাবে, কিন্তু এক মিলিয়ন আফগান যখন দুর্ভিক্ষে বঞ্চিত জন্ম মারা গেল তখন জাতিসংঘের হাই কমিশনার (উদ্বাস্তুদের জন্য) সাদোকো ওগাতো ছাড়া আর কেউ কি একটুও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন? এই মৃত্যুর কারণ নিয়ে কেন সবাই নীরব ছিলেন? বুদ্ধমূর্তির জন্য গোটা বিশ্ব কেঁদেছে—এক ফোঁটা চোখের জলও কি পড়েছিল অনাহারে মৃত আফগানদের জন্য? আধুনিক বিশ্বে কি মূর্তির দাম মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি?

আমি গোটা আফগানিস্তান ঘুরে প্রত্যক্ষ করেছি তাদের বেঁচে থাকার রূঢ় বাস্তবতা। একজন চিত্রনির্মাতা হিসাবে আমি তেরো বছরের ব্যবধানে দুটি ছবি তৈরি করেছি আফগানিস্তানের উপর (The cyclist—1988 and Kandahar—2001)। এই ছবি তৈরির জন্য আমি অন্তত দশ হাজার পাতা বই এবং তথ্য পড়েছি ও জেনেছি, যাতে আমার ছবিতে তথ্যগুলি সঠিক থাকে।

এইসব কাজ কবতে করতে আমি জানতে পেরেছি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আফগানিস্তানকে, যার সঙ্গে চলতি বিশ্বের কোনও পরিচয় নেই। এই ছবিটা আরও জটিল, ভিন্ন ও ট্রাজিক কিন্তু নিঃসন্দেহে আরও তীক্ষ্ণ ও সদর্থক। এই চিত্র বিশ্ব্য়িত দাবি করেন। দাবি করে আরও বেশি মনোযোগ ও একাত্মতা। কিন্তু কোথায় সাঁদি যিনি দেখতে পেতেন এই বেদনা, যিনি লিখেছিলেন, “সব মানুষ একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ”।

সংবাদ শির্বোনামে যখন একটি দেশের নাম আসে, তখন তা খতিয়ে দেখা হয়। একটি দেশের যে চিত্র গণমাধ্যমে প্রচারিত হয় তার দুটি দিক—একটি হলো সেই দেশের প্রকৃত অবস্থা, অপরটি সেই দেশ সম্পর্কে কাল্পনিক চিত্র যা বিশ্ববাসী প্রত্যাশা করে।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এই যে আজকের আফগানিস্তানের কাছে আফিম চাষ ছাড়া আর করার মতো কিছুই নেই। সেইজন্যই বিশ্বের কাছে তাদের অস্তিত্ব অত্যন্ত নগণ্য বা না থাকার সামিল এবং সেই কারণেই এদের সমস্যার সমাধানের আশাও অতীব ক্ষীণ। যদি কুয়েতের মতো আফগানিস্তানের কাছে জ্বালানি তেল এবং উদ্বৃত্ত আয় থাকতো, তাহলেও তিনদিনে তা চলে যেতো আমেরিকার হাতে, আর আমেরিকা তাকে ব্যবহার করতো তাদের সেনাবাহিনীর পিছনে।

যখন সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্ব ছিল, তখন পাশ্চাত্যের নজর পড়েছিল আফগানিস্তানের ওপর কাবণ তারা তখন লড়াই করত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। সোভিয়েত রাশিয়ার পরাজয় এবং খণ্ডিত রাশিয়ার দুর্বলতা নিয়ে কি ভেবেছে আমেরিকা? আমেরিকা, যারা মানবাধিকারের সপক্ষে আওয়াজ তোলে তারা কেন দশ লক্ষ নারীর শিক্ষা ও সামাজিক কার্যকলাপের ব্যাপারে উদাসীন রইল, কেন তারা সচেষ্ট হলো না দারিদ্র্য আর দুর্ভিক্ষ দূর করতে, যে দারিদ্র্য কেড়ে নিয়েছে অসংখ্য মানুষের জীবন?

উত্তর এটাই, আফগানিস্তান বিশ্বকে দেয়নি কিছুই। আফগানিস্তান সেই সুন্দরী নারী নয় যে কিনা বিশ্বের তাবৎ পুরুষের হৃদয়ে ঝড় তুলতে পারে। এবং, আমরা জানি, সাদি আমাদের সময়ের কথা বলেননি, যখন তিনি বলেছিলেন, “সব মানুষ একই দেহের অঙ্গ”।

সংখ্যাভেদ ও আফগান ট্রাজেডি

শেষ দুদশকে আফগানিস্তান সম্পর্কে তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্ব বজায় রাখা হয়নি। তাই সব তথ্যই আনুমানিক, আপেক্ষিক। সেই সূত্রানুযায়ী, ১৯৯২তে আফগানিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ২০ মিলিয়ন। শেষ কুড়ি বছরে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন আফগান মারা গেছেন যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে—যেমন সেনা নিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ অথবা চিকিৎসার অভাবে।

অন্যভাবে বললে, প্রতি বছর ১ লাখ ২৫ হাজার বা ৩৪০ জন প্রতিদিনে অথবা ঘন্টায় ১৪ জন অথবা আরো ভয়ঙ্করভাবে বললে প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন এখানে নিহত হচ্ছে বা মারা যাচ্ছে। এই বিশ্ব সেই রাশিয়ান ডুবোজাহাজের ধ্বংসের ছবি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়েছে মাত্র কয়েকমাস আগেও। এই পৃথিবী বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের অবিরত খবর দিয়ে গেছে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে। কিন্তু কেউ একটি কথাও বলেনি যখন গত কুড়ি বছর ধরে আফগানিস্তানে প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন করে মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আফগান শরণার্থীদের অবস্থা তো আরো শোচনীয়। আফগান শরণার্থী যারা আছে ইরান ও পাকিস্তানে, তাদের সংখ্যা প্রায় ৬.৩ মিলিয়ন। যদি এই সংখ্যাটাকে বিগত কুড়ি বছর, দিন, ঘন্টা এবং মিনিট দিয়ে ভাগ করা যায়, তবে দেখা যাবে প্রতি মিনিটে একজন আফগান গৃহহারা হচ্ছে। এই সংখ্যাভেদের মধ্যে কিন্তু তাদের ধরা হয়নি যারা অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের জন্য প্রতিদিন উত্তর থেকে দক্ষিণ বা উল্টোপাথে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন কোনও দেশের কথা মনে করতে পারিনা, যাদের জনসংখ্যা মৃত্যুর কারণে ১০ শতাংশ এবং গৃহত্যাগের ফলে ৩০ শতাংশ কমে গেছে। শুধু তাই নয়, এই ভয়ঙ্কর ক্ষতি সম্পর্কে বিশ্বমানস উদাসীন, এমন আর কোনও দেশের ভাগ্য ঘটেছে কিনা তা অন্তত আমার জানা নেই। গোটা আফগানিস্তানে যত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে, তাদের সংখ্যা গোটা প্যালেস্তাইন-এর জনসংখ্যার সমান। এমনকি প্যালেস্তাইন বা বসনিয়ার তুলনায় আফগানিস্তানের জন্য আমাদের সহানুভূতি ও সাহায্য দশ শতাংশও পৌঁছতে পারে নি যদিও আমাদের ভাষা এক এবং আমরা একই ভৌগোলিক সীমায় বাস করি।

দোখাবনের কাছে বর্ডার পেরোনোর সময় আমি একটা আকস্মিক বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, যেখানে ভ্রমণার্থীদের বিশেষ একটি বিষয়ে সতর্ক করা ছিল। বিষয়টি হলো মাইন। আমি পড়েছিলাম প্রতি ২৪ ঘন্টায় ৭ জন মানুষ আফগানিস্তানে মাইনের আওতায় পা দেয়।

রেড ক্রসেব একটি শিবিরে আমি আরো নির্মম কিছু তথ্য জেনেছিলাম। কানাডার যে দলটি মাইনগুলো নষ্ট করে দিতে এসেছিল, তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। জমিকে সুরক্ষা করা আর বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা মাথায় নিয়ে পাতা যে মাইনগুলো, সেগুলো দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আগামী পঞ্চাশ বছরে আফগানদের আরো বেশি অরক্ষিত করবে। কারণ এই যে প্রতিটি গোষ্ঠীই অন্যটিকে ধ্বংস করার জন্য মাইন খুঁড়েছে অথচ এগুলি পাতার সময় কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাদের মাথায় ছিল না বা কোন মানচিত্র রক্ষা করা হয়নি যাতে পরে এগুলিকে খোঁজা যায়। এর মানে এই দাঁড়ায় যে, একটি জাতি নিজের হাতেই তার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছে। আর যখন খুব বেশি বৃষ্টি হয়, জল বাইরে চলে আসে—তখন একসময় যে সব রাস্তাগুলি ছিল যাতায়াতের সুরক্ষিত মাধ্যম সেগুলোই বিপদের খাদ হয়ে দাঁড়ায়।

এই পরিসংখ্যান থেকে আন্দাজ করা যায় আফগানিস্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ কতখানি ভয়াবহ হয়ে গেছে, আর ঠিক সেই কারণেই এত বেশি সংখ্যক আফগান তাদের বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। প্রতি মুহূর্তে যেখানে খাদ্য সংকট আর মৃত্যুভয়—মানুষ কেন সেখান থেকে সরে অন্য আত্মনা খুঁজবে না? যে দেশের মানুষের গৃহত্যাগের হার ৩০ শতাংশ, বোঝা যায় ভবিষ্যত সম্পর্কে তারা কতটা হতাশ। বাকি যে ৭০ শতাংশ, তার মধ্যে ১০ শতাংশ মারা যায় বা মেরে ফেলা হয়, আর বাকি যে ৬০ শতাংশ তারা সীমান্ত পার হতে পারেনা, আর পারলেও প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাদের পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্য বিদেশিদের উপস্থিতি নেই আফগানিস্থানে। কোনও ব্যবসায়ীই এদেশে বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে চাননা, একমাত্র মাদক বিক্রেতা ছাড়া, আর রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা তো চান সরাসরি পশ্চিমে পাড়ি দিতে আফগানিস্থানকে কেউ প্রায় ছুঁয়েও যেতে চান না। এইসব কারণেই আফগানিস্থানের সমস্যা সমাধান করাটা আরো বেশি কঠিন হয়ে পড়ছে। তার ওপরে গোটা বিশ্ব আফগানিস্থানের সমস্যার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, কারণ এই সমস্যা সম্পর্কে তাদের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই।

আমি নিজেই প্রায় কুড়ি হাজার নারী পুরুষ ও শিশুকে শহরের কেন্দ্রে বসে খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাতে দেখেছি। তারা হটিতে পর্যন্ত পারছিল না, শুধু মাটিতে বসে অপেক্ষা করছিল সেই অবশ্যস্তুবী ভয়াবহ ভবিষ্যতের জন্য যার নাম মৃত্যু। এই হলো সাম্প্রতিক আকালের প্রত্যক্ষ চেহারা। ঠিক সেইদিনই সাদাকো ওগাতো এইসব মানুষকে দেখে কথা দিয়েছিলেন যে গোটা বিশ্ব এদের পাশে দাঁড়াবে। এর তিন মাস পরে ইরানি রেডিওতে খবর শুনলাম, শ্রীমতী ওগাতো বিশ্বকে জানাচ্ছেন যে আফগানিস্থানে মৃতের সংখ্যা দশ লক্ষাধিক।

এর থেকে একটা সত্যি আমি বুঝতে পেরেছি, বুদ্ধদেবের মূর্তি কেউ ধ্বংস করেনি। তিনি নিজেই লজ্জায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন এই ভেবে যে, গোটা বিশ্ব কী করে আফগানিস্থানের এই শোচনীয় পরিস্থিতিতেও এতটা নির্বিকার হয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকতে

পারে। বুদ্ধদেবের লক্ষ্য এই ভেবেও যে তাঁর শিক্ষা তাঁর আদর্শ মানুষের কোনও উপকারে আসেনি, কাউকে এতটুকু সং পথ দেখাতে পারনি, ভেঙে পড়া ছাড়া তাঁর আর কীই বা করার ছিল?

আমি তাজাকিস্তানের দুশানবেহ অঞ্চলে লক্ষাধিক আফগানকে পায়ে হেঁটে দক্ষিণ থেকে উত্তরে পালাতে দেখেছি। এদের দেখে মনে হচ্ছিল আজ বোধহয় পৃথিবীর শেষ বিচারের দিন। চূড়ান্ত ধ্বংসের মুহূর্ত। গোটা বিশ্বের কোনও দেশের প্রচার মাধ্যম এদৃশ্য দেখায়নি। যুদ্ধ বিধবস্ত, ক্ষুধা পীড়িত শিশুরা মাইলের পর মাইল পথ খালি পায়ে দৌড়ে যাচ্ছে শুধু প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে। তাদের ওপরও আক্রমণ চালানো অভ্যস্তরীণ শত্রুরা, তাজাকিস্তান তাদের আশ্রয় দিতেও রাজি হলো না। হাজার হাজার মানুষ মারা গেলেন তাজাকিস্তান আর আফগানিস্তানের মাঝের জনবিহীন এলাকায় (no man's land)—কেউ তাদের সন্ধান পর্যন্ত করল না।

অবয়বহীন এক রাষ্ট্র—আফগানিস্তান

আফগানিস্তান এমন একটা দেশ, যার নিজের কোনও চেহারা নেই, যদিও তার একাধিক কারণ আছে। আফগান মহিলাদের তো মুখই দেখা যায় না, অর্থাৎ ২০ মিলিয়নের মধ্যে ১০ মিলিয়ন মানুষকে জনসমক্ষেই আনা হয়না। যে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকটাই পর্দার আড়ালে, সে দেশের কোনও সম্যক চেহারা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। গত বেশ কয়েক বছর ধরে গোটা দেশে কোনও দূরদর্শন সম্প্রচার হয় না। খালি গোটা কয়েক দু পাতার খবরের কাগজ বের হয়, শরিয়ৎ (shariat), হিবাদ (Heavd) ও অনীজ (Anise) তাতে শুধু লেখা থাকে, কোনও ছবি থাকে না। এই হলো গোটা আফগানিস্তানের প্রচার মাধ্যমের চেহারা; ছবি আঁকা আর ছবি তোলা তো ধর্মের নামে বহুকাল আগেই বন্ধ করা হয়েছে। কোনও বাইরের সাংবাদিককেও ভিতরে ঢুকে ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া হয় না।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে দাঁড়িয়ে গোটা দেশে একটাও ছবি তৈরি হয়না বা কোনও চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহও নেই। আগে অবশ্য ১৪টা প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় ছবি দেখানো হতো আর ভারতীয় ছবির অনুকরণে ফিল্ম স্টুডিওতে ছোট বাজেটের ছবিও তৈরি করা হতো—তবে সে সব এখন সুদূর অতীত।

গোটা বিশ্বের চলচ্চিত্র দুনিয়াতে প্রতিবছর হাজার হাজার ছবি তৈরি হয়। সেখানে আফগানিস্তানের কোনও ভূমিকা নেই এই চলচ্চিত্র জগতে। হলিউড কিন্তু আফগানিস্তান যুদ্ধের উপর 'ব্যান্সো'র মতো ছবি বানিয়েছে, অথচ গোটা ছবিতে আফগানদের কোনওভাবেই যুক্ত করা হয়নি, গোটাটাই শুটিং কবা হয়েছে হলিউডে। একটি মাত্র বিশ্বস্ত ও সঠিক দৃশ্য ছিল পেশোয়াবে (পাকিস্তান) ব্যান্সোর উপস্থিতি। এর জন্য ধন্যবাদ দিতে হয় ব্যাক প্রজেকশনের দক্ষতাকে। মূলত মারামারির দৃশ্যগুলি দর্শকের উত্তেজনা উদ্বেক করার জন্য জোর করে ঢোকানো হয়েছে। হলিউডের কাছে গোটা দেশের চিত্রটা

কি এইরকমই? অথচ আফগানিস্তানের প্রকৃত চেহারা তো অনাহারে মৃত্যু আর গৃহত্যাগের মতো বেদনায় মোড়া।

রাশিয়ানরা রাশিয়ান সৈনিকদের স্মৃতি রোমন্থনের জন্য দুটো ছবি বানিয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পরে মুজাহিদিনরা কয়েকটা ছবি বানিয়েছিল, যেগুলো মূলত ভ্রান্ত প্রচারমূলক—যার সঙ্গে অতীত ও বর্তমান আফগানিস্তানের কোনও সম্পর্ক নেই। এইসব ছবিতে খালি আফগানিস্তানের মানুষদের বীরত্বের ছবি দেখানো হয়েছে—যারা মরুভূমিতে লড়াই করে।

আফগানদের দেশত্যাগের ঘটনাকে ভিত্তি করে ইরান দুটি ছবি তৈরি করেছে (ফ্রাইডে ও রেল)। আমি তৈরি করেছি দ্য সাইক্লিস্ট ও কান্দাহার। ইরান ও গোটা বিশ্বের কাছে এই হলো আফগানিস্তানের চেহারা। দূরদর্শনের ক্ষেত্রেও সারা পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটা তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে এই দেশটির ওপরে। আসলে এটা গোটা দুনিয়ার ভিতর ও বাইরের একটা গভীর ষড়যন্ত্র আর বিশ্বব্যাপী উদাসীনতা (আফগানিস্তানের প্রতি) যা আজ অবধি আফগানিস্তানকে নিজের একটি স্বতন্ত্র চেহারা গড়ে তুলতে দেয়নি।

গোষ্ঠী সংঘাত—অতীত ও বর্তমান

ইরান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর থেকেই আফগানিস্তানে ব ভরাডুবি শুরু। আড়াইশো বছর আগে এটি ছিল ইরানের অংশ, তাবও পূর্বে নাদির শাহের আমলে ছিল বৃহত্তর খোরাসানের অংশ। ভাবতবর্ষ থেকে ফেরার পথে একদিন মধ্যরাত্রে গুচান (Ghoochan) এলাকায় নাদির শাহ খুন হন। আহমদ শাহ আবদালি নামে একজন আফগান সেনাপ্রধান সেই সময়ে প্রায় চার হাজার সেনা নিয়ে লড়াই করেন ও নিজেদের ইরান থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করেন। এই-ই হলো আফগানিস্তানের জন্মবৃত্তান্ত।

সেই সময়ে দেশের মানুষের বৃহৎ অংশ ছিল কৃষক কিন্তু নেতৃত্বদানের ক্ষমতা চলে গেল গোষ্ঠীর নেতার হাতে। আহমদ আবদালি নিজে ছিলেন পাশতুন গোষ্ঠীর লোক, তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাজিক (Tajik), হাজারে (Hazareh) বা উজবেক (Uzbek) ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলো আবদালিকে তাদের সর্বময় কর্তা হিসাবে বা গোষ্ঠীপ্রধান বলে মেনে নিতে চায়নি। তাই তখন ঠিক হয় প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেবে সেই গোষ্ঠীর কোনও এক নেতা। বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে একটি সমবায় তৈরি করে যার নাম হয় লয়া জিরগা (Laya Jirga)। এই প্রথার ফলে আফগানিস্তানের অর্থনীতি কোনদিনই কৃষিকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারেনি, শুধু তাই নয়, গোষ্ঠীর শাসনের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা কোনদিনই গড়ে ওঠেনি।

একজন আফগান নিজেকে আফগান হিসাবে ততক্ষণ অবধি সম্মান করতে পারেনা, যতক্ষণ না সে আফগানিস্তান ত্যাগ করে। তারপর তার সম্মান শুরু হয় পবের দয়া

ইরানে একমাত্র কুর্দিস্তান এলাকাটা বাদ দিয়ে আমরা সবাই সবার আগে ইরানি। জাতীয়তাবাদের অনুভূতি আমাদের সম্মিলিত অস্তিত্বের প্রাথমিক ভিত্তি। কিন্তু আফগানিস্থানে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাথমিক পরিচয় নির্ধারিত তার নিজস্ব গোষ্ঠীর পরিচয়ে। ঠিক এই জায়গাতেই একজন ইরানি ও একজন আফগানের অভ্যন্তরীণ মানসিক শক্তির তফাৎ, ক্ষমতার উৎসের ক্ষেত্র দুই দেশের মধ্যে এইভাবেই আলাদা হয়ে যায়। এমনকি রাষ্ট্রপতির নির্বাচনেও ইরানে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর অস্বর্গত হবার জন্য প্রার্থীরা কোনও বাড়তি সুবিধা পায়না। আহমদ আবদালির সময় থেকে আজ অবধি অর্থাৎ যখন তালিবানরা প্রায় গোটা দেশের ৯৫ শতাংশ শাসন করছে, প্রায় সব নেতারা এই এসেছেন পাশতুন গোষ্ঠী থেকে [ব্যতিক্রম শুধু নমাস হাবিবুল্লা গালেখানির শাসন। যার পরিচিতি বাচে সাঘা (Bacheh Sagha) নামে আর দু বছর তাজিক গোষ্ঠীর বুরহানুদ্দিন রব্বানির শাসন কাল]।

আমি ‘কাম্পাহার’ ছবিটি তৈরির সময় সীমান্ত এলাকার রিফিউজি ক্যাম্পে ছিলাম। তখনও দেখেছি, সেখানকার আফগানরা নিজেদের একটি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মেনে নিতে পারে না। তাদের মধ্যে তখনও বিরোধ বর্তমান—নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী নিয়ে। দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক এখনও স্বীকৃত নয়, এমনকি দুটি পৃথক গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবসা পর্যন্ত হয় না। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, খুব ছোটখাট ঝগড়াতেও দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে খুন-জখম রক্তপাতের মতো বড় ঘটনা ঘটে যায়। আমি এক গোষ্ঠীর লোককে, অন্য গোষ্ঠীর লোককে খুন করে ফেলতে দেখেছি নিছক খাবারের লাইনে আগে দাঁড়ানোর জেরে—ব্যাপারটা কতদূর ভয়াবহ ভাবতে অবাক লাগে।

নিয়াতক রিফিউজি ক্যাম্পে (ইরান-আফগান সীমান্তে), যেখানে প্রায় পাঁচ হাজার লোক বাস করে, সেখানে পাশতুন ও হাজারা গোষ্ঠীর বাচ্চাদের পক্ষে একসঙ্গে খেলা সম্ভব নয়। এই সামান্য ঘটনাতেও পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে। হাজারা ও তাজিক গোষ্ঠী পাশতুনদেরই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শত্রু বলে মনে করে, আর একই ধারণা উন্টো ক্ষেত্রেও। একে অন্যের মসজিদে প্রার্থনা করতে পর্যন্ত যায় না। আমরা একটা ছবি দেখানোর জন্য এইসব গোষ্ঠীর বাচ্চাদের পাশাপাশি বসাতে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। শেষ অবধি তারা একটি সমঝোতায় পৌঁছয় এবং দুটি গোষ্ঠীর শিশুরা আলাদা আলাদা সময়ে ছবি দেখে।

অনেক অসুখ আছে, যেগুলো এইসব ক্যাম্পে নিয়মিত হয়ে থাকে, কিন্তু সেসবের চিকিৎসার জন্য কোনও ডাক্তার নেই। একজন ডাক্তারকে যদিবা শহর থেকে আনা হয়, ক্যাম্পের বসবাসকারীরা আগে বেশি অসুস্থদের দেখার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে রাজি হয়নি। সেক্ষেত্রেও গুরুত্ব পায় গোষ্ঠীগত প্রাধান্য অর্থাৎ এক একটি গোষ্ঠীর চিকিৎসা ক্রমান্বয়ে হবে, এমনটাই তাদের দাবি। একটি দিন নির্ধারিত হয় হাজারাদের জন্য, অন্য একদিন ঠিক হয় পাশতুনদের জন্য। পাশতুনদের মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ আছে, তাই একই দিনে দুটি শ্রেণী ডাক্তারখানায় আসতে রাজি হয় না।

ছবির গুটিং-এর সময় যখন একদুইদের দরকার হতো তখনও আমাদের ঠিক করতে হতো যে আমরা হাজেরা না পাশতুন কোন গোষ্ঠী থেকে লোক নেব। অথচ সবাই এরা গৃহহারা এবং একই ধরনের দুঃখ-যন্ত্রণার শিকার। তবু যেকোনও সিদ্ধান্ত নেবার সময় সবার আগে বড় হয়ে ওঠে গোষ্ঠীর লড়াই। অবশ্য এদের মধ্যে অধিকাংশরাই 'সিনেমা' শব্দটির সঙ্গে ঠিকমতো পরিচিত নয়, অনেকটা আমার ঠাকুমার মতো এরাও অবিরত ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে যে তারা কখনোও কোনও প্রেক্ষাগৃহে পা রাখেনি।

আফগানিস্থানের নিরন্তর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অনেকটাই জড়িয়ে আছে তাদের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে। প্রতিটি আফগান গোষ্ঠী একটি করে পাহাড়ি উপত্যকার ভৌগোলিক প্রাচীরে আবদ্ধ আর সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে তারা পাহাড়ি প্রকৃতির মাঝে বন্দী, এমনকি কৃষি অর্থনীতিতেও তারা প্রাকৃতিক সীমানা অতিক্রম করতে পারেনা। সংস্কৃতিগত বিরোধটা মূলত মিশে গেছে আফগান উপত্যকার কৃষি পরিস্থিতির সঙ্গে। খুব কাবা করে বললে, বলা যায়, গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের শিকড় ততটাই গভীর, যতটা উপত্যকাগুলি গভীর ও গহন।

ভৌগোলিক বিচারে আফগানিস্থানের ৭৫ শতাংশ পাহাড়ি এলাকা, যার মধ্যে মাত্র ৬ শতাংশ কৃষিযোগ্য। এখানে কোনও শিল্পস্থাপনের সম্ভাবনা নেই। গোটা দেশ সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভর এবং অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য তাদের একমাত্র উৎস হলো সবুজ অঞ্চলটুকু। আবারও সেই পুরোন কথাই বলছি যে, যাবতীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পিছনে মূলত কৃষিভিত্তিক সমস্যা যা পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিয়েছে অন্যান্য সংঘাতের। এই সংঘাত আফগানিস্থানের আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পথে প্রধান বাধা, তাহাড়া এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কিছুতেই আফগানিস্থানের মানুষকে তাদের জাতীয়তাবাদী অস্তিত্বটা অনুভব করার সুযোগ দিচ্ছে না।

'আফগান' কিংবা 'আফগানিস্থান' এই শব্দগুলোর প্রতি কোনওরকম স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাবোধ নেই সেদেশের মানুষের। আমরা আফগান—এই বৃহত্তর, ব্যাপকতর পরিচয়টা এখনও মেনে নিতে নারাজ আফগানরা। আসলে ধর্মযুদ্ধের নামে, তারা লড়ে চলেছে গোষ্ঠীগত লড়াই। তাজিক যারা আজ তালিবানদের সঙ্গে লড়াই করছে উভয়পক্ষই ধর্মে মুসলমান এবং সুন্নি। আহমদ আবদালির কূটনৈতিক বুদ্ধির প্রশংসা আজও করতে হয়। যিনি জন্ম দিয়েছিলেন গোষ্ঠীগত বিরোধের। তাঁর ক্ষমতা ও পারদর্শিতা অন্য সকলের চেয়ে বেশি ছিল নিঃসন্দেহে, যারা স্বপ্ন দেখেছিল একটি গোষ্ঠীর অথবা একটা গোটা জাতির নেতৃত্ব দেবার—কারণ তখনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আর অর্থনৈতিক পরিকাঠামো একইরকম ছিল। পাশতুনরা ৬০ লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে আফগানিস্থানের সর্ববৃহৎ গোষ্ঠীরূপে স্বীকৃত, দ্বিতীয় স্থানে তাজিকরা প্রায় ৪০ লক্ষাধিক। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে হাজেরা ও উজবেকরা যাদের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৪০ লক্ষ এবং ১০ থেকে ২০ লক্ষ। বাকি থাকে আরো কিছু ছোট গোষ্ঠী যথা ইমাঘ (Imagh), ফারস (Fars),

বালুচ (Balouch), তুর্কমান (Turkman) এবং কুয়েজলবাস (Quezelbash)।

পাশতুনরা মূলত বাস কবে দক্ষিণ অঞ্চলে, তাজিকবা উত্তরে আর হাজারার বাসভূমি হলো মধ্যাঞ্চল। ভৌগোলিক দিক থেকে এই অবস্থানগত পার্থক্য গোষ্ঠীগুলিকে আরো বেশি বিচ্ছিন্ন করেছে এবং অন্যদিকে সেই প্রাচীন লয়া জিরগা (Laya Zirga), প্রথা চালিয়ে যাবার জন্য বাধ্য করেছে। এই দুটি চিত্রকে বদলাবার পথ একটাই, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বদল এবং নিজেদের গোষ্ঠীপরিচয়কে বদলে একটি জাতিরূপে পবিচিত হওয়া ও জাতিগত অস্তিত্ব অনুসন্ধান।

আমরা যদি ইরানে একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করি, তাহলে দেখা যাবে জ্বালান তেল-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনটাই সেখানে প্রাধান্য পাবে, কোনও বিশেষ সাবেকি পরিচয় নয়—অন্তত বিগত শতকের ছবিটা এমনই। প্রশ্নটা কিন্তু তেলের পরিমাণ বা গুণমান দিয়ে বিচার্য নয়—আসলে একটি কৃষিকেন্দ্রিক দেশের অর্থনীতিতে যখন থেকে তেলটা ঢুকে পড়ল শুধু যে অর্থনৈতিক কাঠামোটা পাল্টালো তাই নয়, দেশটা পৃথিবীতে রাজনৈতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করে নিল। ইরান যখন থেকে মূল্যবান খনিজ তেল রপ্তানি শুরু করল পরিবর্তে তারা ক্ষেবত পেতে আরম্ভ করল শিল্পনির্ভর দেশগুলির উদ্বৃত্ত উৎপাদন। এইভাবেই বদলাতে লাগল ইরানের আর্থ-সামাজিক কাঠামো আর প্রচলিত সংস্কৃতি ভেঙে তৈরি হতে লাগল এক আধুনিকতর রাষ্ট্র যারা তেল রপ্তানি করে ধনতান্ত্রিক শিল্পনির্ভর দেশগুলির থেকে ভোগ্যপণ্য আমদানি করে। আমরা যদি অর্থকে বিনিময়ের প্রতীকী মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার না করি তাহলে সরাসরি তেলের বদলে আমরা পেতে পাবি পণ্যদ্রব্য। কিন্তু আফগানিস্তান কী বিনিময় করবে বিশ্বের বাজারে, তাদের কাছে মাদক ছাড়া তো কোনও উৎপাদন নেই। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই আফগানিস্তান বিশ্ববাজার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আড়াইশো বছর আগে যদি আফগানিস্তান ইরান থেকে আলাদা হয়ে না যেত, নিঃসন্দেহে খনিজ তেলের থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের জোরেই তাদের ভাগ্য সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে পারত।

ইরান তেল থেকে সব রাজস্ব আদায় করে, আফিম থেকে আফগানিস্তানের প্রাপ্ত রাজস্ব তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ২০০০ সালে ইরানের উদ্বৃত্ত আয় প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার যেখানে আফগানিস্তানের আফিম বিক্রি ৫০০ মিলিয়ন ডলাব ছাড়াতে পারে নি।

বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইরান তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বদলে পেয়েছে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য। আজ আমাদের কাছে অনেকগুলি বিকল্প আছে, আমরা পণ্যদ্রব্য বাছাই করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারি। এইভাবেই আমরা আরো বেশি আধুনিক হয়ে উঠছি ক্রমশ। অথচ পাশাপাশি আফগানিস্তানের মানুষ শুধুই চাষআবাদ করে, তাদের জীবন সেই উপত্যকায় ঘেরা, তার বাইরে কোনও স্বতন্ত্র জীবন নেই তাদের। এর সঙ্গে আছে গোষ্ঠী সংঘাতের মতো কঠিন সমস্যা। এই সব মিলিয়ে গোটা বিশ্ব অর্থনীতিতে আফগানিস্তান একবারেই গুরুত্বহীন। বিশ্ব বাজারে জায়গা করে নিতে গেলে সাংস্কৃতিক

ও অর্থনৈতিক বিবর্তন ভীষণভাবে দরকার।

আড়াইশো বছর আগে ইবান ও আফগানিস্তান একই ইতিহাসের অংশ ছিল কিন্তু খনিজ তেলের কারণে আজ ইরানের চেহারা বদলে গেছে আর আফগানিস্তানকে যদি তাদের পরিস্থিতি বদলাতে হয়, তবে তার জন্য দীর্ঘ সময় দরকার। আফিমই একমাত্র দ্রব্য যা আফগানিস্তান বিশ্বকে দিতে পারে। আফিম থেকে যতটা উৎপাদন হওয়া সম্ভব সেটা তেলের থেকে প্রাপ্ত আয়ের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আফিম বাবদ আয় হয় ৫০০ মিলিয়ন ডলার তার সঙ্গে উত্তর আফগানিস্তানের গ্যাস বাবদ যে ৩০০ মিলিয়ন ডলার আয় হয়—সেদুটিকে যোগ করে যদি কুড়ি মিলিয়ন জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তবে দেখা যাবে দেশের বার্ষিক আয় দাঁড়াচ্ছে ব্যক্তি প্রতি গড়ে ৪০ ডলার। আরো ভেঙে বললে ৩৬৫ দিনে একজন আফগান দিনপ্রতি ১০ সেন্ট রোজগার করে, যেটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একটা পাউরুটির দামের সমান।

কিন্তু দেশের বার্ষিক রোজগারটা সরকারের হাতে এবং অপবাধ জগতের হাতেই অটকে থাকে—যথায়থভাবে আদৌ বন্টিত হয় না। তাই রাজস্বটা জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয় এবং তা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল পাল্টাবার জন্য নিতান্ত নগণ্য।

তিরিশ শতাংশ মানুষ দেশত্যাগ করল কেন

গবাদি পশু পালকরা তাদের জন্তুগুলির জীবনরক্ষার কারণেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিক্রমা করে। যারা শহরের বাসিন্দা অথবা কৃষক তারা কিন্তু জায়গা বদলায় না। গবাদি পশুপালকদের স্থান পরিবর্তনটা আফগানিস্তানে মূলত কৃষিকেন্দ্রিক। তারা অনবরত গরম জায়গার খোঁজ করে যাতে পশুগুলি খাবার জন্য সবুজ ঘাস পায় আর ঠাণ্ডার কবলে না পড়ে। তাদের ভ্রাম্যমানতার দ্বিতীয় কারণ স্থায়ী পেশার অভাব। তারা জায়গা বদলায় মূলত অনাহারে মৃত্যুর ভয়ে।

ঘুম থেকে ওঠার পর একজন আফগানের মাথায় থাকে চারটি চিন্তার বোঝা। প্রথম তাদের গবাদিপশুগুলির জন্য চিন্তা করতে হয় যাতে দুর্ভিক্ষ বা আকাল তাদের কোনও ক্ষতি না করতে পারে। একটি গোষ্ঠী বা জাতির জন্য লড়াই করা তার দ্বিতীয় চিন্তা এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জীবিকার অভাবে আফগানরা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। পরিবারকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাজের চিন্তা হলো তার তৃতীয় চিন্তা আর একান্ত কাজ না পেলে সে মাদকের ব্যবসায় ঢুকে পড়ে। শেষ বিকল্পটি খুব সীমিত কিন্তু যে বিকল্পটি সবচেয়ে ব্যাপক বিকৃত সেই ৫০০ মিলিয়ন ডলারের আফিম চাষ একটা ২০ মিলিয়ন জনসংখ্যার বিশাল দেশের তুলনায় খুবই সামান্য। তাই আফগানদের বাইরে থেকে আফিমের চোরাকারবারী—এই শিরোপাষ ভূষিত করাটা অত্যন্ত অন্যায্য হবে। আর এই কথাটি সত্যি হলেও, তা খুব সীমিত কিছু মানুষের সম্পর্কে বলা যায়—গোটা আফগান জাতি সম্পর্কে নয়।

আধুনিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ

১৯১৯ থেকে ১৯২৮ সাল অবধি আফগানিস্তানের নেতা ছিলেন আমানুল্লা খান, যিনি রেজা শাহ ও কামাল আতাতুর্কের সমসাময়িক ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আধুনিকতার পক্ষে ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি ইউরোপ গেছিলেন এবং ফিরে এসেছিলেন একটি রোলস রয়েস গাড়ি নিয়ে। ফিরে এসে তিনি একাধিক সংস্কার মূলক কার্যকলাপে যোগ্যতা করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্তনের চিন্তা ছিল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোরখা ব্যবহার করতে বারণ করেন এবং পুরুষদেরও প্রচলিত পোষাকের বদলে পশ্চিমি পোষাক পরার কথা বলেন। আফগানদের প্রচলিত পুরুষতন্ত্রের বিপক্ষে গিয়ে তিনি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন। সনাতনপন্থীরা তৎক্ষণাৎ আমানুল্লাহর বিরোধিতা শুরু করে দিল। কোনও কৃষকগোষ্ঠীই এইসব পরিবর্তন মেনে নিতে বাজি হলো না উপরন্তু এরই প্রেক্ষিতে দাঙ্গা শুরু করে দিল।

এখানে, আধুনিকতা নিছক একজাতীয় আরোপিত ঘটনা যেখানে আধুনিকতার কোনও আর্থসামাজিক পটভূমি নেই, যেখানে একটি শিল্প বা বাণিজ্যের অবকাশ নেই, যাদের কাছে কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, এমনকি যারা দু'গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে পর্যন্ত স্বীকার করতে রাজি নয়, তারা আধুনিকতার ভাষা বুঝবে কী ভাবে? আফগান সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করার জন্য বাইরে থেকে আরোপিত আধুনিকতা চাপিয়ে দেওয়াটা বোকামি—সেইজন্যই আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আফগানরা আধুনিকতাকে যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে মানতে পারছে না।

আধুনিকতার দাবি মেনে তারা এখনও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে বা বিশ্ববাজারে কাঁচামাল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে পারে নি। আফগানিস্তানে যারা সবচেয়ে বেশি আধুনিক মনস্ক তারাও মেয়েদের স্বাধীন মতামত পোষণ বা ভোটদানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। আফগানিস্তানের যে বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় গৃহযুদ্ধে জড়িত তারাই যখন মেয়েদের স্বাধীনতাকে মানতে পারছে না তখন রক্ষণশীলরা যে মেয়েদের শিক্ষা ও সামাজিক জীবন যাপনের স্বাভাবিকতা মেনে নেবেনা, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এর সামগ্রিক ফল এই যে, দশ মিলিয়ন নারী আফগানিস্তানে বোরখার আড়ালে বন্দী। পুরুষশাসিত আফগান সমাজে আমানুল্লা খান সম্ভব বছর আগে যেখানে পুরুষের এক বিবাহ চালু করার চেষ্টা করেছিলেন—আজও সেখান থেকে মেয়েদের বোরখা প্রথা বন্ধ হলো না, পুরুষ আজও পরিবারকে হারেম বলে ভাবে আর নারীরা আজও পুরুষের বহুগামিতাকে স্বচ্ছন্দে মেনে নেয়, এমনকি ইরান-আফগানিস্তান সীমানার শরণার্থী শিবিরেও। আমি পাশতুন আর হাজারাদের বিয়েতে হাজির থেকে দেখেছি তারা বিয়ের পর বরকে আরও ভাল পরবর্তী বিয়ের শুভেচ্ছা জানায়। আমি এটা ঠাট্টা ভেবেছিলাম, কিন্তু পরে অন্য একটা বিয়েতে মেয়েপক্ষের পরিবারকে বলতে শুনেছি : যদি বর খরচ চালাতে পারে, তবে চারটে বউ সতিই ভাল, তাছাড়া এটা ধর্মীয় প্রথা, উপরন্তু এতে কিছু অভুক্ত মানুষের খাবারও সংস্থান হয়।

‘কাম্বাহার’ ছবির একটি দৃশ্যে বিয়ের সঙ্গীত তোলবার জন্য আমি সাবে-র (Saveh) শরণার্থী শিবিরে গিয়েছিলাম, যেখানে একটি দুবছরের মেয়ের সঙ্গে একটি সাত বছরের ছেলের বিয়ে হচ্ছে। ওই ছেলে বা মেয়েটি, যে দোলনায় দুলছিল, তারা এই বিয়েটা ঠিক করবেন। এই ছবিটা থেকে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার একটা চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রাশাপাশি এটাও মনে হয় অন্য দেশ থেকে আমদানি করা আমানুল্লাহর আধুনিকতা কতখানি স্বতঃস্ফূর্ত আর কতটা আরোপিত?

কিছু মানুষ তো মনে করে, মেয়েরা যদি বোরখার বদলে একটু কম শরীর ঢাকা পর্দা ব্যবহার করে, তাহলে ঈশ্বর রুষ্ট হবেন আর তারা পাথরে রূপান্তরিত হবে। কেউ যদি জোর করে তাদের বোরখার বাইরে আনতে পারে, তবেই তারা বিশ্বাস করবে যে তাদের ধারণাটা মিথ্যে ছিল এবং তখনই তারা নিজেদের জন্য অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

আমানুল্লাহর আধুনিকতার ধারণা কিছুটা পক্ষপাত দুষ্ট ছিল। প্রচলিত সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব কিংবা ধনী শ্রেণী বা রংবদল আধুনিকতাবাদ। ইরানী সমাজেও দেখা যায়, বনেদি পরিবার তাদের বাড়ি ভিতরটা প্রায় প্রাসাদের মতো সাজান অথচ বাইরেটা গরীবদের ভয়ে ভীষণ বিবর্ণ করে বাধে, যাতে বাইরে থেকে ভিতরের চেহারাটা ধরা না পড়ে।

সব সময় যে রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলো আধুনিকতার বিরোধিতা করে এমন নয়, কখনো কখনো গরীবরাও বড়লোকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। আমানুল্লাহর সময়ে বড়লোকদের ঘোড়া পোষাটা ছিল রীতিমত বনেদিয়ানার পরিচয় আর গরীবদের খচ্চরের পাশে সেটা ছিল বড়লোকি দেখাবার সহজ রাস্তা—তাই রোলস রয়েসটা ছিল গরীবদের কাছে ভীষণই অপমানজনক। আধুনিকতা আর সাবেকিয়ানার মধ্যে লড়াইটা একদম গোড়ায় ছিল রোলস রয়েস আর খচ্চরের লড়াই; দারিদ্র আর সম্পদের সংঘাত।

আফগানিস্তানে একমাত্র আধুনিক জিনিস হলো অস্ত্র। আর এই গৃহযুদ্ধের জেরে আফগানিস্তান একটি আধুনিক অস্ত্রের বাজারে পরিণত হয়ে গেছে। এমনিতে যতই পিছিয়ে থাক আফগানিস্তান, আধুনিক যুদ্ধের বাজারে তো তাদের পক্ষে ছুরি বস্ত্র নিয়ে লড়াই করা সম্ভবও নয়। অস্ত্রের এত বেশি ব্যবহার, দেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। মিসাইল বা ক্ষেপণাস্রম থাকাটা বড় দাডি রাখা বা মেয়েদের বোরখা পরার মতোই আধুনিক ধারণা।

আধুনিক কালে আফগানিস্তানে যারা মুজাহিদ—তাদের অস্ত্র রাখার পিছনে একটা অর্থনীতির ধারণা কাজ করেছে, অস্ত্র তৈরির সঙ্গে তারা কর্ম সংস্থানকে এক করেছে। সব অস্ত্র যদি আফগানিস্তান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, যদি আর কাউকে আঘাত বা আক্রমণ করার মতো অবস্থা না থাকে, দেখা যাবে মুজাহিদিনরাও অন্যদেশে গিয়ে শরণার্থী শিবিরে ঠাই নিচ্ছে। আফগানিস্তানের যুদ্ধ শান্তি, রক্ষণশীলতা-আধুনিকতা কিংবা গোষ্ঠীবাদ বনাম জাতীয়তাবাদের মতো ইস্যুগুলো বিশ্লেষণ করার আগে তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও কর্মসংস্থানের সংকটের দিকে চোখ রাখা দরকার। এটাও

আমাদের মাধ্যম রাখতে হবে এখানকার অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের কোনও আশু পথ আমাদের জানা নেই। আকস্মিক সব ঘটনা আফগানিস্থানে ঘটেই চলেছে আর তার ফলে খালি যে সেনা আক্রমণ ঘটছে তাই নয় অর্থনীতিতেও তার চাপ পড়ছে। সত্যিই কি বারবার এই আকস্মিকতা আসে নি আফগানদের ইতিহাসে? রাশিয়ার পিছু হটে যাওয়া অলৌকিক নয়? মুজাহিদিনদের সার্বভৌমত্ব তাদের তরফে বিশ্বায়ক নয়, অথবা তালিবানদের জয়? তাহলে সমস্যাটা কোথায়? আধুনিকতা নিয়ে আলোচনা শুরু হলে দুটো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা চোখে পড়ে। প্রথমত আফগানদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং দ্বিতীয়ত আধুনিকতার প্রতি সনাতনপন্থীদের তীব্র অনীহা ও অনাস্থা।

ভূগোল ও আফগানিস্থান

আফগানিস্থানের অন্তর্ভুক্ত এলাকা ৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার যার মধ্যে ৭৫ শতাংশ পাহাড়। আফগানরা বাস করেন উপত্যকা ও গিরিকন্দরে যার চারধারে রয়েছে উঁচু পাহাড়ের চূড়া। এই উঁচুতে বসবাসেব ফলে মানুষজন রক্ষণশীল, ব্যবসার পক্ষে এই অবস্থান প্রতিবন্ধকতাব সৃষ্টি করে তাই নয় এব থেকে বোঝা যায় আফগানরা কেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। আর ঠিক এই অবস্থানগত কারণেই এই সব আফগান গোষ্ঠীর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র একধরনের বন্ধনে আটকে রয়েছে। রাষ্ট্র স্বল্পতার জন্য যারা আফগানিস্থান জয় করতে চায় তারাও ভালমতো লড়াই করতে পারে না, আবার ব্যবসায়ীরাও ব্যবসা বাড়াতে পারে না—অথচ ব্যবসায়িক উন্নতি হলে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত হতে পারত।

এই উঁচু পাহাড়, পাহাড়ি এলাকার দুর্গমতার জন্য বিদেশিরা আফগানিস্থানে ঢোকে না, আর সেইজন্যই আফগানিস্থান বিদেশের সঙ্গে সংস্কৃতি ও ব্যবসায়িক আদান প্রদানের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। যে দেশের এলাকার ৭৫ ভাগ পাহাড়, তাদের পক্ষে পণ্য শহরের বাজারে পাঠানো বা শিল্পশহরগুলিতে কৃষি উৎপাদনগুলি রপ্তানি করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এত আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করার পরও যুদ্ধগুলি দীর্ঘমেয়াদি হয় এবং তার কোন নিষ্পত্তি হয়না তার জন্যও দায়ী এই ভৌগোলিক পরিবেশ।

অতীতে আফগানিস্থান ছিল যাবাবরদের যাতায়াতের পথ। সিল্ক রোড দিয়ে চীন যাবার পথে তারা বাল্খ, ভারতবর্ষ ও কাস্পাহার পার হয়ে যেতো। বিগত শতকে জলপথ ও আকাশপথ আবিষ্কার হবার পর, আফগানিস্থানের এই বাণিজ্যিক পথ বন্ধ হলো। প্রাচীন সিল্ক রোড উট ও ঘোড়ার চলার পথ ছিল, তাকে আধুনিক রাস্তা হিসাবে ভাবার কারণ নেই কোনও। এই পথেই নাদির শাহ, আলেকজান্ডার, তৈমুরলং এবং মামুদ গজনী ভারতে গিয়েছিলেন। তাদের ব্যবহৃত কাঠের সেতুগুলি গত দুই দশকে গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক যুদ্ধের ফলে ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। আজকে, গোটা আফগানিস্থান চায় এমন একটা দল জিতুক যারা আফগানিস্থানের ভাগ্যকে একটা স্থায়ী চেহারা দিতে সক্ষম হবে, তা সে ভাল হোক বা মন্দ। আসলে এই পাহাড়গুলোই ওখানকার প্রকৃত যোদ্ধা, যারা

কখনোও পরাজয় স্বীকার করেনা, মাথা নত করে না যদিও আমরা দরিদ্র সাধারণ আফগান জনগণকে যোদ্ধা ভেবে ভুল করি।

আমি শেষ অবধি এটাই বুঝতে পেরেছি আফগানিস্থানে যদি এত পাহাড় না থাকতো রাশিয়া সহজেই আফগানিস্থান জিতে নিতো অথবা আমেরিকা একে কুয়েতের মতোই গ্রাস করতো এবং তা এশিয়ার বাজারের কাছাকাছি চলে আসতো।

পাহাড়ের জন্যই যুদ্ধের খরচ এতটা বেড়ে যায় আর যুদ্ধশেষে পুনর্গঠনের কালে ব্যয়ভার অসম্ভব বেশি হয়। আফগানিস্থান যদি এতটা অনুর্বর না হতো তবে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাস অন্যরকম হতো। এটা কি নিছক ভৌগোলিক দূর্ভাগ্য? চিন্তা করে দেখুন, একজন যোদ্ধাকে অবিরাম পাহাড়ে উঠতে আব নামতে হয়। যদি ধরে নেওয়া যায়, কেউ গোটা আফগানিস্থান জিততে চায়—তাহলে?

তাকে ও তার যোদ্ধাদের শুধু পাহাড় চূড়াগুলোকে জিততে হবে। তবে এই পাহাড়গুলো আফগানিস্থানকে বাইরের শত্রু আর ভিতরের বন্ধুদের থেকে আড়াল করে রাখে।

প্রত্যেক গোষ্ঠী তার নিজের উপত্যকাকে রক্ষা করে। কিন্তু যেই শত্রুরা চলে যায়, তারা আবার বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপের মতো হয়ে যায়, নিজেদের উপত্যকাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় তাদের পৃথিবী। এই পাহাড়ের জন্যই চাষআবাদ খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

গোটা এলাকার মাত্র ১৫ শতাংশ কৃষিযোগ্য যদিও তার ঠিক অর্ধেক অংশে চাষআবাদ হয়। গবাদিপশুর পালনের জন্য পাহাড়ের ঢালে ঘাস ভর্তি জমিগুলি ব্যবহার হয়।

এভাবে বলা বোধহয় সঙ্গত যে আফগানিস্থান তার ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের শিকার। পাহাড়ের ভিতর চলাচলের রাস্তা নেই, আর রাস্তা তৈরি করাটাও অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। যা রাস্তা আছে তা সেনারা ব্যবহার করে আর পাকদণ্ডীর রাস্তা ব্যবহার করে চোরাচালানকারীরা। চওড়া রাস্তা আছে কেবল সীমান্তের আশেপাশে। কিন্তু শুধুমাত্র সীমান্ত এলাকার সড়কগুলি আফগানিস্থানের আবহমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত বিচ্ছিন্নতা দূর করে তাদের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্য বা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য যথেষ্ট নয়। আন্তঃরাজ্য সড়ক সামান্য যা ছিল তাও যুদ্ধের সময় নষ্ট করা হয়েছে। এখন কারা এই এবড়ো খেবড়ো পাহাড়গুলি খুঁড়ে নতুন পথ বানাবার খরচ বইবে? এই সড়ক তৈরিব জন্য প্রসূত অপরিমিত ব্যয়ভাব কার জন্য লাভজনক হবে?

বলা হয়, আফগানিস্থানে নাকি বহু অনাবিষ্কৃত খনিজসম্পদ আছে? কিন্তু সেইসব লক্ষ্যে পৌছবার মতো পথ কি আছে? অনিশ্চিত ভবিষ্যত আর লাভের কথা মাথায় রেখে কে ওইসব খনির জন্য বিনিয়োগের ঝুঁকি নেবে? রাস্তাব অভাবের কারণেই মূলত রাশিয়ান ও আফগানরা খনিগুলি খননের ব্যাপারে উৎসাহ পায়না। পাহাড়ের ভিতরে ভিতরে অনেক চোরাপথ আছে যেগুলি চোরাচালানেব কাজে নিত্য ব্যবহৃত হয়। চোবা কারবারের জন্য কত গোপন পথ, অথচ পাচারকারীদের ধরবার জন্য সহজ কোনও ভাল বাস্তা নেই। এইরকম পথ অশুভ, আর সেগুলো খুঁজে বের করা রোজ সন্তব নয়।

বড়জোর পথের বাকি কখনো কখনো এক আধটা ক্যারামান অপেক্ষা করে। ইরানের সেমনান শহরে (Semnan) একজন চোরাকারবারীকে আটক করা হয়েছিল, সে কান্দাহার থেকে খালি পায়ে ইরান অবধি এসেছে কাঁধে একটা মাদক ভর্তি ব্যাগ নিয়ে। ধরা পড়ার সময়ে দেখা গেল তার পায়ের তলা ক্ষতবিক্ষত।

আফগানিস্তানের পাহাড়ে জল যত না আশীর্বাদ, তার চেয়ে বেশি অভিশাপ। শীতের জল হয়ে যায় বরফ। বসন্তকালে বন্যা হয়ে যায় আর গ্রীষ্মে জলের স্বল্পতার কারণে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এই হলো বাঁধহীন পাহাড়ি নদীর চরিত্র। অনিয়ন্ত্রিত জলের উপদ্রব আর রক্ষ মাটির জন্য কৃষিকার্য ভীষণ ব্যাহত হয়। অনাবিক্ত অজস্র খনি, রক্ষ প্রান্তর, বাঁধহীন পাহাড়ি নদী আর গগনচুম্বী পাহাড়—এই নিয়েই আফগানিস্তান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ যার সঙ্গে বিশ্বজগতের কোনও যোগ নেই। কোনও দেশের সঙ্গে সংযোগহীনতার ফলেই আজ অবধি আফগানিস্তানের সভ্যতা বা সংস্কৃতির উপর বিশ্বজগতের কোনও প্রভাব পড়েনি, ফলে তারা তাদের রক্ষণশীল ধারণা থেকে আজও বাইরে আসতে পারেনি। শুধু এখানকার সাধারণ মানুষের জীবন চর্যাব জন্য তারা বেছে নিয়েছে আফিম চাষকে—আফগান জনগণ, দরিদ্র আফগান শুধু আফিমচাষকে কেন্দ্র করেই বেঁচে আছে।

অর্থনৈতিক উন্নতি না হলে আফগানিস্তানের বর্তমান অর্থনীতি কেবল আধপেট খাবার সংস্থান করতে পারবে। কিন্তু সেটুকুও সাধারণ জনতার কপালে জোটে না কারণ আফগানিস্তানের অর্থ-ভাণ্ডারের সবটাই প্রায় অস্থায়ী সেনাবাহিনীর পিছনে ব্যবহার হয় অথবা অভ্যস্তবীণ অপরাধ জগতের পিছনে।

‘কৃষির বাইরে আফগানরা আর কি করতে পারে? তারা বড়জোর ইরানে নির্মাণ কার্যে (construction) যোগ দিতে পারে, বা রাজনৈতিক যুদ্ধে অংশ নিতে পারে অথবা তালিবানদের ধর্মশিক্ষা স্কুলে ভর্তি হতে পারে। গোটা দেশে আড়াই হাজারের বেশি স্কুলে তিনশো থেকে এক হাজার (স্কুল প্রতি) ক্ষুধার্ত, অনাথ শিশু আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই সব স্কুলে সবাই ন্যূনতম একটা খাবার পায় নিয়মিত, তারপর কোরাণ পড়া, প্রার্থনা, মুখস্থ করা আর শেষ অবধি তালিবানি সেনাবাহিনী যোগ দেওয়া। চাষআবাদ ছাড়া এটাই তো বেঁচে থাকার আর একমাত্র রাস্তা আফগানদের। এত চোরাচালান, এত যুদ্ধের প্রাবল্য আর দেশত্যাগ—সবই এই ভৌগোলিক অসুবিধার কারণে। আমি শুধু ভাবি উত্তরের জোট যদি শেষ অবধি তালিবানদের হারিয়ে ক্ষমতায় আসেও, কি করবে তারা সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য? বোধহয় কিছুই নয়, সেই যুদ্ধ চলবে, আফিম চাষ বাড়বে, আর আকালের সময় দেশবাসী বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবে।

ইরান সীমান্তে জাতিসংঘ যেকোনও শরণার্থী আফগানকে ২০ ডলার দিতে রাজি থাকে, যদি তারা দেশে ফিরতে চায়। তাদের বাসে কবে সীমান্তের কাছে বা আফগানিস্তানের ভিতর কোনও বড় শহরে ছেড়ে আসাও হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, আফগানিস্তানে এত রোজগার বা কাজের অভাব ছেড়ে আসা মাত্র তারা ফেরত

চলে আসে আর যদি ধরা না পড়ে যায় আবার লাইনে দাঁড়িয়ে পরে ২০ ডলার নেবার লোডে। বেরোজগেরে আফগান জনতা যে কোনও কিছুকেই পেশা হিসাবে ধরার চেষ্টা করে। যুদ্ধকে পেশা হিসাবে ধরে কত নেতাই তো অকালে প্রাণ দিচ্ছে। যুদ্ধ পরবর্তী গ্রাণ দিয়ে দিয়ে রাশিয়া জাতিসংঘ এবং অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র আফগানিস্তানকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে, তাই নয় তারা আফগানদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যও দাবি কবে ফেলে। এই সব পারিতোষিক দেওয়া হয় ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য কিন্তু এতে আফগানরা কোনও কাজের সুযোগ পায়না। এটা ভুললে চলবে না যে দুবছরের টানা আকালে সব গবাদি পশু মারা গেছে আর জাতিসংঘের হিসাবে আগামী কয়েক মাসে এই মৃত্যু এক মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। যুদ্ধের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই—এ হলো আকাল আর দারিদ্র্যের নগ্ন চেহারা। যখন চাষবাস কম হচ্ছে তখন দেশত্যাগের ঘটনা বাড়ছে আর যুদ্ধের চেহারা আরও ভয়াবহ হচ্ছে।

একজন সাধারণ আফগান নাগরিকের জীবনের ব্যাপ্তি আন্দাজ করা হয় ৪১ বছর ৬ মাস মতো হওয়া উচিত আর দুবছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৮২ থেকে ২০০। ১৯৬০ সালে আফগানদের গড় আয়ু ছিল ৩৪ বছর যা ২০০০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৪১-এ। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে গত কয়েক বছরে গড় আয়ু ৬০ সালের চেয়েও কম হয়ে গেছে।

আমি কান্দাহার ছবির শুটিং চলাকালীন সময়টা কোনদিন ভুলতে পারব না। যখন আমার দলের লোকেরা বড় বড় আলো জ্বলে মরুভূমির খোঁজ করছে, তখন দেখছি দলে দলে লোক অনাহারে ভেড়ার পালের মতো মরে যাচ্ছে। আমরা ভাবছিলাম এরা কলেরায় আক্রান্ত, তাই তাদের জাবোলের হাসপাতালে নিয়ে গেলাম, কিন্তু দেখা গেল, রোগ নয় এরা মরছে অনাহারে। আমাদের চোখের সামনে সব না খেয়ে মরে যেতে লাগল। সেই সময় আমি চেষ্টা করেও নিজের খাবারটা মুখে তুলতে পারতাম না।

১৯৮৬ থেকে ৮৯ সালের মধ্যে আফগানদের প্রায় ২২ মিলিয়ন ভেড়া ছিল অর্থাৎ জন প্রতি একটি। যে কোন কৃষিকেন্দ্রিক জাতির জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই সম্পদটাও আকালে নষ্ট হয়ে গেল। গবাদি পশু ছাড়া একটা দেশের কৃষি পালনের চিন্তা করাই যায় না। তখন আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি তাদের দারিদ্র্য আর এর থেকে মুক্তির জন্য দরকার অর্থনৈতিক পুনর্বাসন।

আমি যদি সাধারণ মানুষ না হয়ে মুজাহিদিনদের পথ নিতাম—তাহলে হয়তো ফিরে আসতাম। আমি যদি প্রতিবেশি রাষ্ট্রের প্রধান হতাম, তবে আমি রাজনৈতিক তথা সামরিক বিষয়ে মধ্যস্থতার বদলে আফগানিস্তানেব সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিতাম। ঈশ্বর ক্ষমা করুন, যদি আমি ঈশ্বরের জায়গায় হতাম, তবে এমন একটা কিছু আশীর্বাদ দিতাম আফগানিস্তানকে, যাতে তারা পৃথিবীর বুকে বিস্মৃত প্রায় জাতির মতো হারিয়ে না যায়।

ডক্টর কামাল হোসেন, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক উপদেষ্টা (বাংলাদেশ)

থেকে), আমাদের অফিসে এসেছিলেন ২০০০ সালের গ্রীষ্মে, তিনি জানানেন আফগানিস্তানের বিষয় গত ১০ বছর ধরে তিনি জাতিসংঘকে যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক রিপোর্ট দিচ্ছেন। তিনি এসেছিলেন আমাকে একটা ছবির জন্য সাহায্য করতে—যে ছবি আফগানিস্তান বিষয়ে বিশ্বকে জাগিয়ে তুলতে পারে। আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম, আমি চাই এমন কিছু যা সবার হৃদয় স্পর্শ কবে।

একটা কথা অবশ্যই বলা উচিত যে আফগানিস্তান অন্যান্য দেশের মাথা গলানোয় যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি হয়েছে অন্যান্য দেশের উদাসীনতায়। কুয়েতের মতো তৈল রপ্তানিকারক দেশ হলে, আফগানিস্তানের ইতিহাস ভিন্ন হতো। আফগানদের কাছে তেল নেই, তাই অন্যান্য দেশ এদের লোকজনকে নিছক শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। আফগানদের কাছে যখন রৌজগারের কোনও রাস্তা খোলা নেই তখন চোরাচালান, যুদ্ধে যোগ দেওয়া বা তালিবানদের সমর্থন করা ছাড়া কী করতে পারে তাবা—বড়জোর হীরটি, বামিয়ান, কাবুল ও কান্দাহারের রাস্তায় তারা অনাহারে মরতে পারে।

আমি একবার জাবোল (Zabol)-এর একটি বেআইনি শরণার্থী শিবির দেখেছিলাম—শিবিরটা সতিই শরণার্থীদের আশ্রয় না জেলখানা, বৃথতে পারিনি। আফগানিস্তান থেকে যারা তালিবানদের অত্যাচারে কিংবা আকালের যন্ত্রণায় শুধু প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয়ের জন্য অন্য দেশে পালায়, তাদের জোর করেই প্রায় ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এগুলো কি সতিই আইন? কোন মানুষ যে যেকোনও কারণেই বেআইনি ভাবে অন্য দেশে ঢুকে তারা যথাযথ ভাল ব্যবহারটুকুও পায়না—অথচ তাদের শেষ অবশি মৃত্যু হয় অনাহারে। আমরা ওখানে গেছিলাম ছবির জন্য একটু বাছাই করতে। আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, ওই শিবিরে সব লোকেদের বেতে দেবার মতো ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের নেই আর এমন অনেক শরণার্থী আছে যারা এক সপ্তাহ কিছু খায়নি, জল ছাড়া। আমরা তাদের খাবার দেবার ব্যবস্থা করায় তারা চাইল আমরা যেন রোজই ওখানে আসি।

আমরা প্রায় ৪০০ জন আফগানের জন্য খাবার এনেছিলাম যাদের বয়স এক থেকে ৮০ বছর। ছোট ছোট বাচ্চাগুলো খিদের জ্বালায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। আমরা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ওদের রুটি আর ফল বিতরণ করলাম, কিন্তু আমরা আমাদের চোখের জল রোধ করতে পারছিলাম না। কর্তৃপক্ষ দৃংখ প্রকাশ করছিল আর আপশোষ করছিল এই ভেবে যে তাদের জন্য যে টাকা নির্ধারণ করা হয়, তা হাতে পেতে অনেক সময় লেগে যায় আব যে হারে শরণার্থী আসছে, সেই তুলনায় তাদের অর্থ-সামর্থ্য খুবই সামান্য। এই হলো একটি দেশের ধ্বংসের কাহিনী যার বীজ লুকিয়ে আছে তাদের ভৌগোলিক প্রকৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতির মধ্যেই আর প্রতিবেশী দেশগুলির নিষ্ঠুরতার মধ্যে। একজন আফগান কবি, যিনি প্রাণ বাঁচাতে ইরানে আশ্রয় নিতে গেছিলেন এবং বিতাড়িত হয়ে দেশে ফিরে আসেন—মারা যাবার আগে তিনি তার অনুভূতি একটি কবিতায় ব্যক্ত করে গেছেন :

পদব্রজে এসেছিলাম, পদব্রজেই যাব।

যার কানাকড়ি নেই, তাকে ও চলে যেতে হয়—

যে শিশুটির খেলনা নেই, তাকেও যেতে হবে।

আজ রাতেই সাদ্গ হবে আমার দ্বীপান্তরে বাস,

খালি টেবিলটিকে মুড়ে রাখা হবে।

যন্ত্রণায় আমি ঘুবে বেড়াই দিগন্তের চারপাশ—

সকলেই জানে আমি পর্যটক ;

যা আমার নয় তাকে ফেলে যাব।

পদব্রজে এসেছিলাম, পদব্রজেই যাব।

মাদক উৎপাদনের ভূমিকা

আধুনিক অর্থনীতিতে চাহিদা ও যোগান পরস্পর নির্ভরশীল। মাদক উৎপাদন সম্পূর্ণ নির্ভর করে তার ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে। মাদক দ্রব্যের যে বাজার আছে তা ধনী দরিদ্র দুই দেশেই ছড়িয়ে আছে—এব উদাহরণ পাই ভারতবর্ষ, নেদারল্যান্ড এবং আমেরিকার মতো দেশে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী (২০০০) ৯-এর দশকের শেষ দিকে গোটা বিশ্বে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন মানুষ ড্রাগের শিকার। সেই রিপোর্ট ভিত্তি করেই বলা যায় ৯০ শতাংশ অবৈধ আফিম বা ৮০ শতাংশ অবৈধ হেরোইন যে দুটি দেশে উৎপাদন হয়, তার একটি হলো আফগানিস্থান। কেন? যদিও মাদক থেকে আফগানিস্থানের আয় ৫০ কোটি ডলার কিন্তু বিশ্ববাজারে এই উৎপাদনের টার্নওভার বছরে ৮০ বিলিয়ন ডলার। মাদক চালানোর পর এর দাম প্রায় ১৬০ গুণ বাড়ে—তবে কাদের হাতে যায় এই ৮০ বিলিয়ন মুদ্রা?

উদাহরণ স্বরূপ হেরোইন যখন তাজাকিস্থান ঢোকে তার যা দাম থাকে, বেরোবার সময় হয়ে যায় দ্বিগুণ। একই চিত্র উজবেকিস্থানে। ড্রাগ যখন নেদারল্যান্ডের গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে তার দাম আসল মূল্যের প্রায় ১৬০ থেকে ২০০ গুণ অবধি বৃদ্ধি পায়। এই সব অর্থ গিয়ে পড়ে দেশের অপরাধমূলক সংস্থাগুলোর হাতে, যারা দেশের রাজনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

যে কোনও মধ্য-এশিয় দেশের গোপন বাজেট নিয়ন্ত্রিত হয় তার মাদক উৎপাদন ও যোগানের হিসাবের দ্বারা। যে লোকটি কান্দাহার থেকে পিঠে মাদকের বস্ত্র নিয়ে ইরান অবধি খালি পায়ে হেঁটে আসে—তারা কেন লাভবান হয়না এই মাদক ব্যবসায়? এদের কি আমরা সত্যিকার মাদক পাচারকারী বলব?

মজার ব্যাপার এই মাদক উৎপাদন এত বেশি হলেও আফগানরা এর ব্যবহার করেনা। মাদক ব্যবহার সেখানে নিষিদ্ধ কিন্তু উৎপাদন বৈধ। এর ধর্মীয় ব্যাখ্যা হলো এই যে ইসলামের যারা শত্রু সেই ইউরোপ ও আমেরিকার হাতে তারা আফিমের নামে বিষ তুলে দিচ্ছে। এই কথাটা আপাতভাবে স্ববিরোধী শোনালেও আফগানিস্থানের বাজেটে

এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছে।

গোটা বিশ্বের বাজারে ড্রাগ থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলার আর আফগানিস্তান এই বাজারের শিকার কেন আফগানিস্তানের প্রাপ্ত অংশ মাদকের মোট উৎপাদনের ৮০০ ভাগের এক ভাগ? উত্তরটা যাই হোক মাদকের চূড়া থেকে নেমে বাজার যদি একটা সভ্য জায়গা হয়ে উঠতো, তবে নিশ্চয়ই আফগানরা উপকৃত হতো। আফগানিস্তানে বিপজ্জনক খাদের বদলে যদি ভাল চণ্ডা সড়ক থাকতো, যুদ্ধের যদি সমাপ্তি হয়ে অর্থনীতির বিকাশ হতো আর যে ৫০ কোটি ডলার তাদের আফিম চাষ করে আয় হয়, তার বদলে তারা যদি অন্য কোনও উপায়ে রোজগার করতে পারত- তাহলে বিশ্ববাজারের ৪০০ বিলিয়ন ডলারের কী হতো?

মধ্য এশীয় দেশগুলির গুপ্ত অর্থ বাজেট নির্ধারিত হয় ড্রাগের দ্বারা। এই কারণেই বোধহয় ক্ষয়িষ্ণু আফগানিস্তানের অর্থনীতির দূরবস্থার প্রতিও বিশ্ববাসী সম্পূর্ণ উদাসীন। অনেকের কাছেই মাদকের ব্যবসা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কিছু মাস আগে যখন আমি আফগানিস্তানে ছিলাম, দেখেছি প্রত্যেকদিন একটি প্লেন সরাসরি প্রাচ্যদেশগুলিতে মাদক পৌঁছে দেয়। ১৯৮৬ সালে যখন আমি দ্য সাইক্লিস্ট ছবির জন্য গবেষণার কাজ করছিলাম, তখন একবার আমি বাসে করে সড়ক পথে পাকিস্তানের মির্জাবেহ (Mirjabe) থেকে গেছিলাম কোয়েটা ও পেশোয়ার পর্যন্ত। এই যাত্রায় সময় লেগেছিল বেশ কয়েকদিন। মির্জাবেহ থেকে আমরা একটা রংচং করা বাসে উঠলাম (যে রকম বাস আপনারা সাইক্লিস্ট ছবিতে দেখে থাকবেন), বাসে ছিল অদ্ভুত চেহারার সব যাত্রী। এদের লম্বা দাড়ি, মাথায় বড় পাগড়ি ও বড় ঝোলা জামা ছিল পরনে। প্রথমে খেয়ালই করিনি, যে বাসের মাথাটা বক্স বক্স মাদকে ভর্তি। বাস নোংরা রাস্তা দিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। এতটাই নোংরা রাস্তা যে আবর্জনা চাকা আটকে যাচ্ছিল এমন কি নরম মাটিতে চাকা আটকে যাবার সম্ভাবনাও ছিল। আমরা এসে পৌঁছলাম দালির আঁকা ছবির মতো একটা সুরিয়াল (Surreal) ফটকের সামনে। এটি না কোথাও ঢোকার মুখে, না বেরোনোব। গোটা মরুভূমির মাঝে একটা আঙ্গুর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল এই ফটকটা। বাসটা ফটকের গোড়ায় থামল। তখন দেখলাম, বাইকে করে দুজন লোক এসে হাজির হলো সামনে, আর আমাদের বাসের চালককে নামতে বললো। তারা পরস্পর অল্পসময় কথা বললো, তারপর এক ব্যাগ টাকা এনে গুনতে লাগলো। এরপর বাইকের লোকদুটি আমাদের বাসে উঠলো আর আগের চালক আর তার সহকারী নেমে বাইকে করে চলে গেল। নতুন চালক আমাদের জানাল সে এখন এই বাসের মালিক এবং এই বাসের সমস্ত বস্তুর ওপরও তার মালিকানা আছে। আমরা তখন বুঝতে পারলাম অন্যসব কিছুর সঙ্গে আমরাও বিক্রিত হয়ে গেছি।

ঘন্টায় ঘন্টায় এই ধরনের বিনিময় চলতে লাগল আর আমবা বারবার বিক্রিত হতে লাগলাম বিভিন্ন চোরাকারবারীর হাতে। আমরা লক্ষ্য করছিলাম বাসটা যতবার বিক্রি হচ্ছে, তার দাম বাড়ছে। প্রথমে বিক্রি হবার সময় দাম ছিল এক ব্যাগ টাকা, এখন

তা বেড়ে গেল দুই, তিন বা তারও বেশি বস্ত্রয়। তাছাড়া ভ্রাম্যমাণ বণিকদলগুলো তাদের উটের পিঠে করে বয়ে আনছিল মেশিনগান। বাস আর উটের পিঠের অস্ত্রগুলো বাদ দিলে মনে হচ্ছিল আমরা সেই আদিম যুগে বাস করছি। এরপর আবার সেখানে কেনাবেচা হলো অল্পশস্ত্র। বুলেট তো এমন ব্যাগ ভর্তি দরে বিক্রি হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন কেউ সবজি কিনছে। কিলো কিলো বুলেট দাঁড়িপাল্লায় ওজন হচ্ছে আর বিক্রি হচ্ছে। সত্যিই তখন মনে হলো, এমন সব জায়গার অস্তিত্ব আছে বলেই না বিশ্বের মাদক আর অস্ত্রের বাজার এমন রমরমা।

আমি খোরাসান গেছিলাম এবং সীমান্ত এলাকায় ছবির শুটিং-এর জায়গা খুঁজছিলাম। সীমান্ত এলাকায় সকালে যে সব গ্রাম আছে, বিকালে সূর্যাস্তের আগে দেখতাম সব খালি। চোরাকারবারীদের ভয়ে সব গ্রামবাসী পালিয়ে যেত অন্য শহরে। ওরা আমাদেরও পালাতে বলত। এত বেশি গুজব ছড়িয়ে যেত যে সূর্যাস্তের পর মাত্র দু'একটা গাড়ি যাতায়াত করত। বাতের অন্ধকারে সব রাস্তাঘাট চোরাচালানের জন্য তৈরি। যারা এই চোরাকারবার করে তাদের একটি দলে মোটামুটি পাঁচ থেকে একশোজন লোক থাকে আর তাদের বয়স মোটামুটি ১২ থেকে ৩০। প্রত্যেকের কাঁধে থাকে একটা করে মাদক ভর্তি ব্যাগ আর কেউ কেউ হাতে রকেট লঞ্চর বা অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র রাখে, নিজেদের দলকে বহিরাগত আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য।

মাদক প্লেনে না গেলে মানুষের পিঠে পিঠে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছে যায়। চিন্তা করুন, এই যাতায়াতের পথে চোরাকারবারীরা কতটা দৌরাভ্য করে, আর সাধারণ মানুষের মধ্যে, বিভিন্ন প্রান্তে কতটা ভ্রাস তৈরি করে নিজেদের ৮০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য।

তালিবানি একজন অফিসারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে চোরাকারবারীরা কি হারে সাধারণ মানুষকে মারে। উত্তর পেয়েছিলাম যে ১০৫ জন গত দু বছরে হয় খুন হয়েছেন বা অপহৃত হয়েছেন। আমি খুব দ্রুত একটা হিসেব করে দেখলাম প্রায় সপ্তাহে একজন এই অত্যাচারের কবলে পড়েন। একটা অঞ্চল যদি এতটাই বিপজ্জনক হয়, তাহলে কি করে দরিদ্র গ্রামবাসী নিশ্চিন্তে ঘরে থাকার কথা ভাববে? সেক্ষেত্রে তারা যদি দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পালায়, তাদের দোষটা কোথায়? বিগত কুড়ি বছরে প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন করে নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে তারা দেশত্যাগ করে আসবে না আমাদের দেশে? তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিলেও তারা আবার পালিয়ে আসবে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। আমি রাস্তার ধারে নিযুক্ত থাকা অফিসারদের কাছে এই হত্যা বা অপহরণের কারণ অনুসন্ধান করেছিলাম। ইরানের বণিকরা মূলত কার্যকলাপ চালায় সীমান্তের গ্রামের লোকেরদের সঙ্গে। যদি ইরানের চোরাকারবারীরা সঠিক সময় টাকা না দিতে পারে, সে বা তার পরিবারের কেউ অপহৃত হয়। অবশ্য টাকা পেলে তাদের ফেরত দেওয়াও হয়। আমি বুঝতে পারি, এই ধরনের আক্রমণের একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে। দোঘারুনের সীমান্তে (Dogharoon) কাস্টমস অফিসাররা

আমায় জানিয়েছিলেন যে এই গোটা অঞ্চলটি গত আট বছর ধরে যথেষ্ট বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে আছে অথচ সংবাদপত্রের হিসাবে সেটা মাত্র দু বছর। উদারতার আপেক্ষিক টেডেয়ের হেতুটিকে ইরানি সংবাদপত্রের নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়।

দেশত্যাগ ও তার ফলাফল

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গবাদি পশুকে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া ছাড়া দুদশক আগে আফগানিস্তানের কৃষকরা আর কোনও কারণে জায়গা ছাড়তো না। সেইজন্যই আফগানদের ছোটখাট ভ্রমণও তাদের জীবনের ওপর খুব গুরুত্বপূর্ণ ছাপ ফেলতো। যেমন আমানুল্লা খান ও আরো কিছু ছাত্র যারা পশ্চিমে পড়াশোনা করতে গেছিলেন, তারাই ফিরে এসে আধুনিকতা আফগানিস্তানের জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন, যদিও শেষ অবধি তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

আফগানিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ যে আজকের দশকে দেশ ছাড়ছে, তারা কেউই কিন্তু পড়াশোনার কারণে দেশ ছাড়ছে না। যুদ্ধ আর দারিদ্র্য তাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। আড়াই মিলিয়ন আফগান ইরানে ও তিন মিলিয়ন পাকিস্তানে শরণার্থী হয়ে এসেছে—এতে দুই দেশই ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্ন। আমি যখন একজন অফিসারকে বলেছিলাম যে এভাবে শরণার্থীদের দেশে ফেরত পাঠানো উচিত নয়, তারা আমাদের অতিথি—উত্তরে তিনি বলেছিলেন গত ২০ বছরে এই সংখ্যাটা এত বেড়ে গেছে যে আর বেশি প্রশ্ন দিলে তা জাতীয় জীবনে যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ষোড়শান, সিস্তান, বালুচিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে শরণার্থীর সংখ্যা এত বেশি যে তারা হয়তো কদিন পরে নিজেদের স্বাধীনতা দাবি করে বসবে অথবা সীমান্ত সমস্যা আরোও বাড়িয়ে দেবে, এমনকি সীমান্তের সুরক্ষা ব্যবস্থাও বিমিত হতে পারে।

পাকিস্তান যেরকম মুজাহিদিনদের প্রশিক্ষণের জন্য তালিবান স্কুল তৈরি করেছে, ইরান তেমন কিছু করেনি। আমি সাইক্লিস্ট ছবির জন্য অভিনেতা খুঁজতে অনেকবার আফগানিস্তান গেছি। সেই সময় একজন অফিসার আমায় বলেছিলেন ইরানী বিশ্ববিদ্যালয় যদি আফগান ছাত্রদের পড়ার সুযোগ দিত তাহলে রাশিয়ানরা আফগানিস্তান ছেড়ে যাবার পর অস্তুত দেশের সরকার চালাবার জন্য এমন একদল মানুষ পাওয়া যেত, যাদের স্নাতক ডিগ্রিটা আছে। নাহলে শুধু একদল মূর্খ যোদ্ধা নিয়ে যুদ্ধ চালানো যাবে, দেশ চালানো যাবে না।

পরবর্তীকালে কিছু আফগানকে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়বার সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু তারা আর দেশেই ফিরতে চায়নি। তাদের না ফেরার পিছনে যুক্তি ছিল তারা অনিশ্চয়তা আর দারিদ্র্যকে ভয় পাচ্ছে। তাদের একজন বলেছিল আফগানিস্তানের যে মানুষটা সবচেয়ে আরামে থাকে তার সঙ্গে তুলনা চলে ইরানের সবচেয়ে কষ্টে থাকা মানুষটির। আমি হীরাটে গিয়ে শুনেছিলাম যে ওখানকার রাজ্যপালের

মাসিক মাইনে হলো ১৫ ডলার অর্থাৎ একদিনে পঞ্চাশ সেন্ট (Cent) বা ৪০০০ ইরানি মুদ্রা (rials) এতবেশি সংখ্যক আফগানদের দেশত্যাগের সূত্র ধরে ইরানের চোরাকারবারীরা একটা নতুন ব্যবসা শুরু করেছে—মানুষ পাচার করা। তেহরানে পৌঁছতে হলে আফগান পরিবাসগুলোকে এত বেশি বাস্তা হাঁটতে হয়, তার ওপর যেকোনও শহরে ধরা পড়ার ভয় থাকে—ফলে তারা নিজেদের ভাগ্য এইসব মানুষ পাচারকারীদের হাতে ছেড়ে দেয়। প্রতি ব্যক্তিকে তেহরান পৌঁছে দেবার জন্য তারা মাথা পিছু ১০ লক্ষ ইরানি মুদ্রা (rials) দাবি করে।

৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় আফগান পরিবারগুলো এত টাকা দিতে পারে না, তখন তারা জমিন হিসাবে তেরো চোদ্দ বছরের কিশোরী মেয়েকে রেখে চোরাপথে তেহরান পৌঁছয়। যতক্ষণ না পরিবারগুলি কাজ পেয়ে ঋণ শোধ করে, কিশোরী মেয়েটি পড়ে থাকে চোরা চালানকারীদের হাতে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা টাকা শোধ করতে পারেনা কারণ গড়ে ১০ জনের পরিবার হলে ১৫ মিলিয়ন মুদ্রা দিতে হয়, তার ওপর তিন মাস অতিক্রান্ত হলে দিতে হয় সুদ। তাই শেষ অবধি বেশিরভাগ মেয়েই বৈশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে অথবা চোরাচালানকারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে যায়। একজন সরকারি কর্মচারীর হিসাব মতো প্রতিটি শহরে এই রকম বৈশ্যার সংখ্যা প্রায় ২৪,০০০।

আমার এক বন্ধু যার তেহরানে বাড়ি তৈরি হচ্ছে, একটা অদ্ভুত ঘটনা বলেছিল আফগান শ্রমিকদের বিষয়ে। বন্ধুটি লক্ষ করেছিল, দুটি ইরানি লোক প্রায় আসে আর এদের বেশির ভাগ টাকা পরস্পর হাতিয়ে নিয়ে চলে যায়। কারণ জানতে চাইলে আফগান শ্রমিকরা জানায়, তাদের আনা হয়েছে বিনা শ্রমে কাজ করবার জন্য। এই শর্তে যে, পরে তাদের ধার এরা শোধ করে দেবে। বাকি টাকা এরা জমিয়ে রাখে নিজেদের পরিবার নিয়ে আফগানিস্তানে ফেরত যাবার জন্য, কারণ কখন তারা এদেশ থেকে বিতাড়িত হবে তা নিজেও জানেনা। এই চিত্রটা পাকিস্তানের শরণার্থীদের চেয়ে একদম আলাদা।

যারা ইরাণে আসে তারা হাজারে—এরা ফার্সী ভাষায় কথা বলে এবং শিয়া মতাবলম্বী (ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা)। ইরানের সঙ্গে ভাষা ও ধর্মের সামঞ্জস্য এদের ইরানের প্রতি আকৃষ্ট করে। কিন্তু এদের দুর্ভাগ্য এদের চেহারা ইরানিদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মঙ্গোলিয়ান খাঁচের মুখের দরুণ এরা খুব সহজে ইরাণে নজরে পড়ে যায়। পাশতুন গোষ্ঠীর লোকেরা পাকিস্তানে যায় এবং ধর্ম-ভাষা ও চেহারার সাদৃশ্যের দরুণ সহজেই মিশে যায়। হাজারেদের কাছে ইরানের তুলনায় পাকিস্তান অনেক উদার রষ্ট্র বলে প্রতিভাত হয় কিন্তু পাকিস্তানে পাওয়া স্বাধীনতার চেয়ে ইরাণে কাজের সুযোগ তাদের অনেক বেশি আকর্ষণ করে। সত্যিই তো, পেটে খিদে নিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা যায় না। স্বাধীনতা খোজার জন্য চাই পেটভরা খাবার। তবেই স্বাধীনতার একটা অর্থ পাওয়া যায়।

কাজ পাওয়া যায় না বলে সুন্নি মতাবলম্বী পাশতুন সম্প্রদায় খুব সহজেই

পাকিস্তানের ধর্মশিক্ষার কেন্দ্রগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়—কারণ সেখানে খাদ্য ও আশ্রয় পাওয়া যায় সহজে। তালিবানদের আফগানিস্তানের ওপর শাসন করতে মদত দিয়ে, সংগঠিত করে দিয়েছে পাকিস্তান—কারণ এর পিছনে তাদের স্বার্থ আছে। প্রথম স্বার্থ হলো ডুরান্ড রেখা (Durand line)। পাকিস্তান ভারত থেকে আলাদা হবার অনেক আগে ভারত ও আফগানিস্তান একটি ভৌগোলিক সীমা ব্যবহার করতো। কিন্তু পাশতুনিস্তান (Pashtoonestan) অঞ্চল নিয়ে দুদেশের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলটিকে ডুরান্ড লাইন দিয়ে এমন ভাগে ভাগ করে দেন যে তার এক অংশ আসে ভারতের হাতে, অন্যটি যায় আফগানিস্তানের দিকে। তবে শর্ত ছিল এই, একশো বছর পরে পাশতুনিয়ার যে অংশটি ভারতের হাতে এসেছে, সেটা আবাব আফগানিস্তানের দখলে চলে যাবে। ইতিমধ্যে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হলে, ভারতে অবস্থিত পাশতুনিস্তান অংশটি চলে গেল পাকিস্তানের দিকে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী প্রায় ৬ বছর আগে পাকিস্তানের উচিত ছিল সেই অঞ্চলটি আফগানিস্তানকে ফেরত দেওয়া। যে পাকিস্তান এতকাল ধরে কাশ্মীরের দাবি ছাড়তে পারছে না, তারা নিজেদের আয়ত্তে থাকা অঞ্চল কি করে আফগানিস্তানকে ফিরিয়ে দেবে?

সবচেয়ে ভাল সমাধান বার করল পাকিস্তান—একদল অভ্যুত্থান মুজাহিদিন তৈরি করে দিল আফগানিস্তানকে চালাবার জন্য। এই মুজাহিদিনরা, যারা আফগানিস্তানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসল, খুব স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতাবশত নিজেদের পৃষ্ঠপোষকের কাছে পাশতুনিস্তানের দাবি করতে পারবে না। আর ঠিক একশো বছরের সময়সীমার আশেপাশেই তালিবানরা আত্মপ্রকাশ করল। দূর থেকে দেখলে মনে হয় তালিবানরা ভয়ঙ্কর রকম মৌলবাদী ও তাদের কার্যকলাপ ভীষণভাবে অযৌক্তিক। কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে দেখা যাবে অভ্যুত্থান অনাথ শিশুরা বাধ্য হয়ে ধর্মশিক্ষার স্কুলে যোগ দেয়—এই যোগদানের পিছনে বলবান শক্তি হলো অনাহার, খাদ্যাভাব। তালিবানদের উদ্ভবের পিছনে লুকিয়ে আছে পাকিস্তানের হীন রাজনৈতিক ও জাতীয় দুরভিসন্ধি।

গান্ধির গণতন্ত্রী ভারতের স্বপ্ন থেকে স্বাধীন হবার পিছনে যে কারণ ছিল পাকিস্তানের—তা হলো মৌলবাদ, আর ঠিক সেই একই মৌলবাদকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে পাকিস্তান নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও দেশকে আরো বিস্তৃত করে তোলার জন্য। বিধে পাকিস্তানের তাৎপর্য কমিউনিস্ট রাশিয়ার পতনের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পেল কারণ পাকিস্তান সাম্যবাদী প্রাচ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবোধ গড়ে তুলেছিল, যা পশ্চিম দেশগুলির কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

রাশিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম প্রচার মাধ্যমের কাছে আফগানিস্তানের বীরত্বময় গৌরব যেমন হ্রাস পেল, পাকিস্তানও তার গুরুত্ব হারাণ এবং মুখোমুখি হলো এক তীব্র কর্মহীনতার। সমাজতন্ত্রের হিসাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কিছু জিনিস ক্রয় ও কিছু বিক্রয় করে। এই সূত্র ধরে বলা যায়, সেনাবাহিনী তার সেনাদের নিজের দেশ বা অন্য দেশ ও সরকারের কাছে বিক্রি করে। বিশ্বের রাজ্যে পাকিস্তানের জাতীয় বৃত্তি কি?

আপাতভাবে পাকিস্তানের সেনা প্রাচ্যের সেনাবাহিনী হলেও তারা নিজেদের সেনাবিভাগকে আমেরিকার হাতে বেচে দিয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই শেষ হবার পর পাশ্চাত্যেরও আর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রয়োজন হলো না।

পাকিস্তান তখন কি করবে—কার কাছে তার জাতীয় বৃত্তি, সেনা বিক্রি করবে, কি ভাবে রক্ষা করবে সেনাবাহিনীকে? এই জন্যই তারা তালিবানদের তৈরি করল যাতে তারা আফগানিস্তানকে ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখতে পারে—যাতে করে আফগানরা কোনওভাবেই পাশতুনিস্তান দাবি না করতে পারে। এই কারণটাই পাকিস্তানকে নানা অসংপন্থা নিতে বাধ্য করেছে। যে কোনও বড় যুদ্ধের ক্ষেত্রে দেশের অনেকটা শক্তি ব্যয় করে গড়ে তোলা হয় একটা সেনাবাহিনী যুদ্ধ শেষ হবার পব স্বভাবতই তারা চেষ্টা করবে কি করে তাদের কাজটাকে চালু রাখা যায়। আমি একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে, নিজের দেশে ছবি তৈরির সুবিধা না পাই, খুব স্বাভাবিকভাবেই আমি জীবিকার প্রয়োজনে অন্য জায়গায় চলে যাব। সেনারাও ঠিক তেমনই। যখন তারা নিজেদের পেশা বিক্রি করার সুযোগ না পায়, হয় সে হতাশ হয়ে পড়ে বা জ্বরদখল শুরু করে দেয়। অনেক দেশে এও দেখা যায় যে সেনাবাহিনীকে বেকার বসিয়ে না রেখে তাদের পুলিশে বাজ্ঞে ব্যবহার করা হয়, অথবা কৃষিতে সহায়তার জন্য ব্যবহার করা হয়। মাঝেমাঝে তারা রাষ্ট্র তৈরির কাজেও যোগ দেয়।

রাশিয়ার যুদ্ধের আগে, আফগানরা ছিল সাধারণ কৃষক। সোভিয়েত আক্রমণের পরে প্রত্যেক আফগান হয়ে উঠল একজন মুজাহিদিন—যারা মরীয়া ছিল নিজের উপত্যকা রক্ষা করার জন্য। অল্প সংগঠন তৈরি হলো। সোভিয়েতদের পিছু হটার পর বিভিন্ন গোষ্ঠী পরস্পরের মধ্যে লড়াই শুরু করল। ছুটি প্রতিবেশি রাষ্ট্র, আমেরিকা, রাশিয়া প্রত্যেকটি দেশ নিজেদের প্রয়োজনীয় সেনা সংগ্রহ করল, আফগানদের থেকে। গৃহযুদ্ধ এত তীব্র আকার ধারণ করল যে রাশিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়েও দেশ এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সাধারণ মানুষ বিগত দু বছরের গৃহযুদ্ধে যখন হতাশ ঠিক তখনই সাদা পতাকা হাতে তালিবানদের সেখানে পাঠিয়ে দিল পাকিস্তান—যাদের লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে শান্তি পুনঃস্থাপন। খুব সাধারণভাবেই সাধারণ জনগণ এদের খুশিমনে আহ্বান জানাল। অল্প সময়ের মধ্যেই তালিবানরা আফগানিস্তানের দখল পেয়ে গেল, তারপর থেকেই তালিবানদের পিছনে পাকিস্তানের মদতও স্পষ্ট হয়ে গেল।

তালিবানরা কেন উদ্ধৃত হয়েছে কেউ জানতে চায়নি, শুধু সমালোচনা করা হয় তাদের মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গির। যে আফগান কবি পায়ে হেঁটে ইরানে পৌঁছেছিলেন ও বিতাড়িত হয়েছিলেন সেখান থেকে কিংবা যে আফগানটি অনাথ হয়ে এসে পড়েছিলেন পেশোয়ারে আর আরবের একটা টয়েটো গাড়ি চালাবাব চাকরি নিয়েছিলেন একদিন—আফগানিস্তানে ফিরে আসতে পারার স্বপ্ন নিয়ে, এদের কথা কে মনে রাখে।

যে দেশের সমস্যা অনেক, সেই দেশ তালিবানদের খাদ্য, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র দেয় কীভাবে? এক্ষেত্রে পাকিস্তান কিছু আরব দেশের সাহায্য নিয়েছে, এই দেশগুলো হলো

সৌদি আরব আর সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, যারা আবার ইরানের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইরানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ দুটো—এক, ইরান মক্কায় একসময় উত্তেজনা তৈরি করেছিল। দুই, ধর্মীয় শক্তির দখল। ইরান ইসলামের গোঁড়া রক্ষক। সৌদি আরব বা আমিরশাহী গোঁড়া তালিবানদের সমর্থন করে নিজেদের গোঁড়া ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে মুসলিম বিশ্বের নজর কাড়তে চাইল। সুতরাং পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় এই দেশ দুটো তালিবানদের মতো গোঁড়া নির্বিচারবাদীদের সমর্থন করে বসল।

তালিবান কারা

সমাজতত্ত্বেব মতে, সরকারের কাছ থেকে যেকোন রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা দাবি করে, অন্যান্য দাবির আগে। অনেক পরে আসে, সমাজ সংস্কার, উন্নতি ও স্বাধীনতার কথা। সোভিয়েত রাশিয়া পিছু হটে যাবার পর এত বেশি রকম গৃহযুদ্ধ শুরু হলো যে গোটা দেশে অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি হলো আর দেশ আরো বেশি ক্ষতির পথে পা বাড়ালো। প্রত্যেক দল ভাবতে লাগলো অন্যের সঙ্গে লড়াই করলে নিজের অস্তিত্ব সুরক্ষিত হবে। কেউই কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বজায় রাখতে পারেনি। এই সময়ের সবচেয়ে বড় বেদনার কথা এই যে, প্রত্যেকটি দলই নিজেদের সুরক্ষার নাম করে গোটা দেশটাকে আরও বেশি অসুরক্ষিত করে দিচ্ছিল।

তালিবান, যারা দাবি করেছিল যে তারা খুব দ্রুত দেশে শান্তি এনে দেবে, অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করে দেবে, সহজেই জনসমর্থন আদায় করে নিল। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ ছিল যুদ্ধাকেন্দ্রিক আর তাতে দেশে কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল না। আমি হীরাটে তালিবানদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলাম। দোকানদাররা বলেছিল তালিবান জমানার আগে অভুক্ত আর সশস্ত্র লোকজন নিত্য দোকান লুণ্ঠ করে নিত। যারা তালিবান শাসনের বিরোধিতা করেছে, তারাও তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট খুশি ছিল।

দুদিক দিয়ে এরা সুরক্ষা ব্যবস্থা সাজিয়েছিল। প্রথম, তারা সাধারণ মানুষের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল আর দ্বিতীয় তাদের শক্তিদানের ব্যবস্থা। শান্তি হিসাবে তারা চোবেদের হাত কেটে নিত। তাদের শক্তি ছিল এত নির্মম ও অসহ্য ও দ্রুত যে আফগানিস্তানের হীরাট শহরে কুড়ি হাজার বুড়ো মানুষ যদি একসাথে একটুকরো পাউরুটি পড়ে থাকতে দেখে, তারা সেটা তুলে নেবার সাহস পর্যন্ত করবে না। আমি দেখেছি যেসব ট্রাকচালকরা আফগানিস্তানে ট্রাক নিয়ে নিত্য যাতায়াত করে, তারা গত দুবছরে তাদের গাড়িতে কখনোও তালা দেয় না, রাস্তায় থোলা দাঁড়িয়ে থাকে। কখনোও কিছু চুরি হয়নি। আফগানরা খালি অর্থনৈতিক সুরক্ষা চায়নি, তারা প্রতিদিনকার বাস্তব সমস্যা ও হেনস্থার হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। আমি বিভিন্ন গল্প শুনেছি, কিভাবে অন্যান্য জাতি ও গোষ্ঠীগুলি তালিবানদের জীবনকে অতিষ্ঠ করেছে। পাথর ছুঁড়ে মারা আর অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেবার মতো কঠিন পদক্ষেপ নেবার পর থেকে সেসব একটু কমেছে।

এখন, যদি আপনি আফগানিস্তানে ঢোকেন, দেখবেন, রাস্তার ধারে ধারে লোক শুয়ে আছে। তাদের উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই, এতটুকু ক্ষমতা নেই যে তাবা হাত দিয়ে লড়াই করে। শক্তির ভয়ে তারা অপরাধমূলক কাজও করে না। মানবতার চেয়ে উদাসীনতা যেখানে বড়, সেখানে বসে বসে মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া কি করতে পারে তারা?

যার হৃদয় এখনও পাষাণ হয়নি—সে হলো বামিয়ানের বুদ্ধদেব। তিনি যাবতীয় ঐশ্বর্য ও বিশালতা নিয়ে এই ভয়াবহ ট্রাজেডি দেখে লজ্জা অপমানে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। তাঁর যাবতীয় ঔদার্য, চাহিদাহীনতা, ঐশ্বর্য ও স্বেচ্ছক নাড়িয়ে দিয়েছে একটি গোটা জাতির ক্ষুধার যন্ত্রণা। বুদ্ধদেব নিজেকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছেন যাতে এই দেশের দারিদ্র্যের বা দুরবস্থার খবরটুকু বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, জনগণ শুধু বুদ্ধ মূর্তির ভেঙে যাবার খবরটাই জানল—আর কিছুই না। একটি চিনা প্রবাদ চালু আছে, “যদি তুমি চাঁদেব দিকে আঙুল তোল, দেখবে বোকা লোকেরা তোমার আঙুলের দিকে তাকিয়ে আছে।” কেউ বুদ্ধের দেখানো ভেঙে পড়া জাতিটির দিকে দৃষ্টিপাত করল না, চোখ গেল তো কেবল ভাঙা মূর্তির দিকে। আমাদের কি শুধু বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলির দিকে অর্থহীন ভাবে দৃষ্টিপাত করা উচিত, নাকি তাদের দেওয়া খবরের গুঁড় অথটাই অনুধাবন করা প্রয়োজন? গোটা বিশ্ববাসীর আফগানিস্তানের দুর্ভাগ্যের প্রতি যে অবজ্ঞা—তালিবানদের অশিক্ষা, অজ্ঞতা বা মৌলবাদ কি তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর?

বুভুক্ষু আফগানদের নিয়ে ছবি করার জন্য বাংলাদেশের কামান হোসেন, যিনি জাতিসংঘের প্রতিনিধি তাকে যোগাযোগ করেছিলেন। আমি আফগানিস্তানের উত্তর ও দক্ষিণ দুদিকেই যেতে চাই। উত্তর দিকটি উত্তরের ছোট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, দক্ষিণ দিকটি তালিবান অধ্যুষিত। তারপর ঠিক হলো আমরা একটা ছোট দল যাব, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমরা মাত্র দুজন (আমি ও আমার ছেলে) মাত্র একটা ছোট ক্যামেরা নিয়ে যাবার অনুমতি পেলাম। আমাদের যাবার জন্য ইসলামাবাদ থেকে প্লেন ধরতে হবে—যে প্লেনগুলো সপ্তাহে একবার করে মাত্র ১০ জন যাত্রী নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ আফগানিস্তানে যায়।

জাতিসংঘের অফিস থেকে আমাদের ডাক এলো প্রায় দুসপ্তাহ পরে। আমরা যাবার জন্য তৈরি ছিলাম কিন্তু ওরা জানাল যে আরো একমাস অস্বস্ত লাগবে—এক মাস পরে আরো বেশি ঠাণ্ডা পড়বে আর আরো বেশি লোক মারা যাবে, এটা ছবির জন্য আরো বেশি আকর্ষণীয় হবে। ওরা জানাল, ফেব্রুয়ারিটা সবচেয়ে ভাল সময়। আমি প্রশ্ন করলাম, তখন কি আরো বেশি আকর্ষণীয় হবে? ওরা জানাল, হয়তো এসব থেকে পৃথিবীর মানুষ একটু সচেতন হয়ে উঠবে। আমি বুঝতে পারলাম না কি বলা উচিত। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, আমি দুদিকেই আদৌ যেতে পারব কি না। তালিবানরা রাজি হলো না। তারা একদম সাংবাদিকদের পছন্দ করেনা। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি শুধু সেই আফগানদের নিয়ে ছবি কবব যারা খিদেয় মারা যাচ্ছে। তবুও তালিবানরা রাজি হলো না। আমি তাদের বার বার জানালাম, পাকিস্তানে

দু'কতে হলে আমাকে আবার জাতিসংঘের অনুমতি জোগাড় করতে হবে। কদিন পরেই পাকিস্তান দূতাবাস থেকে স্ববর পেলাম যেন আমি তেহরানের পাকিস্তান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমি খুশি হলাম এই ভেবে যে কিছুদিন আগে কাশ্মীরের ছবির পোষাক সংগ্রহের জন্য পাকিস্তান যাবার ভিসা পেয়েছিলাম আমি। আমি দেখা কবলাম ঠিকই, কিন্তু ওরা আমায় তেমন সাদর অভ্যর্থনা জানাল না। কিছু পরে আমার ডাক এল এবং একজন ভদ্রমহিলা ও একজন ভদ্রলোক আমায় একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি মিনিট কুড়ি ওই ঘরে ছিলাম, তার মধ্যে পনেরো মিনিট তারা আমার মেয়ে সামিরার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মহলে খ্যাতি নিয়ে আলোচনা করল। মূল বিষয়টা তারা এড়িয়ে গেল এবং জানতে চাইলো সরাসরি তাদের না জানিয়ে আমবা কেন জাতিসংঘের মাধ্যমে ভিসার আবেদন করলাম। তারা এও জানাল যে তারা এমন কোনও ছবির ব্যাপারে আগ্রহী নয়, যেখানে তালিবান সরকারের প্রস্তাব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। তারা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল আমি যেন আফগানিস্তান না গিয়ে পাকিস্তান যাই। আমার সত্যিই তখন মনে হচ্ছিল যে আমি আফগান দূতাবাসে বসে আছি।

আমি তাদের জানালাম যদি তারা আমাব দ্য সাইক্লিস্ট ছবিটি দেখে থাকেন (যার কিছুটা পেশোয়ারে তোলা) তবে বোঝা উচিত যে ছবিটি রাজনৈতিক নয়। আমার উদ্দেশ্য ভীষণভাবে মানবিক এবং আমি আমাব ছবির মাধ্যমে আফগানদের সাহায্য করতে চাই বিশেষত যারা অনাহারে দিন কাটায়। আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আমাব ছবি মূলত বে-রোজগার আর অনাহার নিয়ে। তারা বললো ইরানে তো আড়াই মিলিয়ন আফগান শরণার্থী আছে—তাদের নিয়ে ছবি করছি না কেন? কথাটা চলিয়ে যাবার কোন অর্থই ছিল না। তারা আমার পাসপোর্ট আটকে রাখল এবং অত্যন্ত ভদ্রভাবে চলে যেতে বললো। কদিন পরে পাসপোর্ট ফেরত পাওয়া গেল, সঙ্গে এ জানানো হলো আমি নিছক ট্যুরিস্ট হিসাবে পাকিস্তান যাবার ভিসা পেতে পারি, সিনেমা বানাবার জন্য নয়। আফগানিস্তান যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

সবাই আমায় সাবধান করে দিচ্ছিল। সীমান্তে অপহরণ আর জঙ্গি হানা খুব সাধারণ ঘটনা। জাবোল আর জাহেদান-এর মধ্যকার সড়ক পথে তালিবানরা প্রায়ই বিরোধীপক্ষকে হত্যা করে থাকে। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেই গেলাম যে আমার উদ্দেশ্য মানবিক, রাজনৈতিক নয়। ঘটনাচক্রে আমরা সীমান্তে যখন শুটিং প্রায় শেষ করে এনেছি। একদিন ওইখানে ঘোরাফেরা করার সময়ে একদল লোক হয় আমায় খুন করতে বা তুলে নিয়ে যেতে এসেছিল। তারা আমার কাছেই আমার খোঁজ করছিল, অবশ্যই না জেনে। আমি আফগান পোষাক পরেছিলাম আর মুখে ছিল লম্বা দাড়ি। একটা মাসুদি (massoudi) টুপি ছিল মাথায় আর শাল দিয়ে মাথা ও মুখের অনেকটা ঢাকা ছিল বলেই আমাকে অনেকটা আফগানদের মতো লাগছিল। আমি তাদের অন্য পথে পাঠিয়ে প্রাণ ভয়ে দৌড় দিলাম। আমি বুঝে উঠতে পারলাম না তাদের কোনও রাজনৈতিক দল পাঠিয়েছিল নাকি টাকা হাতাবার জন্য কোনও চোরাকারবারী।

আমি আবার ফিরে যাই সেই নিরাপত্তার প্রসঙ্গে। তালিবানরা সব সাধারণ মানুষের থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল আর শুরু করেছিল নিষ্ঠুর শাস্তির বিধান। তারা চোরদের হাত কেটে দিত, অবৈধ সম্পর্ক ধরা পড়ে গেলে পাথর ছুঁড়ে মারত আর বিদ্রোহ করলে নির্মমভাবে হত্যা করত—এসবের মধ্যে দিয়ে একটা সাময়িক পরিবর্তন এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। কোথাও যদি লড়াই হয়, শরিয়ত রেডিও (তালিবানদের কণ্ঠ) যারা কিনা মাত্র দুঘণ্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে—কখনো সেই মারামারির খবর জানাবে না, নিছক জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থে। উদাহরণ স্বরূপ খবরে বলা হলো তাকহার (Takhar) প্রদেশটি তালিবানদের শাসনকে স্বীকৃতি জানিয়েছে—তখন বুঝে নিতে হবে, তালিবানরা তাকহার আক্রমণ করেছে ও জয় করে নিয়েছে। বাকি খবরগুলো থাকে শুক্রবারের প্রার্থনা (নমাজ) বিষয়ে অথবা বামিয়ানে একজন ডাকাতের হাত কেটে নেওয়া হয়েছে বা কোনও অবৈধ কিশোর প্রেমিককে কান্দাহারে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছে অথবা কোন নাপিতকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এই অপরাধে যে সে কিছু কিশোরের মাথার চুল পশ্চিমি স্টাইলের আদলে কাটার ষ্ট্রীতা দেখিয়েছে। যাই হোক, এইসব শাস্তি আর তার প্রচার নিয়ে আফগানিস্তানে একটা সুরক্ষার বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল।

তালিবান সরকার জনগণের মঙ্গলের জন্য অর্থনৈতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি—যদিও, তালিবান সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। যারা তালিবানদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, তারা দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেয়েছে—আর যারা এদের সমর্থন করেছে, তারা মনে প্রাণে চেয়েছে, আফগানরাই আফগানিস্তান শাসন করুক। যেই শাসক হয়ে আসুক তাকে প্রাথমিকভাবে দেশের নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে হবে। যেকোনও ধরনের যুদ্ধই দেশের সুরক্ষার ব্যবস্থাকে বিমিত করে আর যেহেতু আফগানদের মধ্যে গোষ্ঠীসংঘাত অত্যন্ত প্রকট, তাই যে কোনও দলই ক্ষমতায় আসুক, নিরাপত্তাব্যবস্থা বিমিত হবেই। তাই প্রথমেই দেখতে হবে যাবা শাসকগোষ্ঠী হতে চায় তারা আদৌ দেশের খাদ্য সংকট মেটাতে পারবে কিনা—তবেই অগ্রসর হওয়া উচিত। সব দলই তালিবান শাসনের সমালোচনা করে এই বলে যে, তারা আফগানিস্তানবাসীর স্বাধীনতার ব্যবস্থা করতে পারেনি—কিন্তু আফগানিস্তানের মতো অরক্ষিত ও ক্ষুধার্ত জাতির সর্বাগ্রে প্রয়োজন খাদ্য ও জনহিত—স্বাধীনতা ও উন্নতির কথা অনেক পবে আসে।

তালিবানবা কী, এই প্রশ্নের উত্তরটা হওয়া উচিত এইবকম যে তালিবানরা রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট আফগান সরকারের হাতের অস্ত্র। বিচ্ছিন্নভাবে এদের দেখলে দেখা যাবে তারা হলো বুভুক্ষু তরুণ আফগান সম্প্রদায় যারা ছাত্র হিসাবে শিক্ষা পেয়েছে পাকিস্তানের তালিবান স্কুলে। তারা প্রথমে ঢুকেছিল এক টুকরো কটির আশায়, কিন্তু ক্রমশ আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ও সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের লোভ তাদের উৎসাহিত করল। একটি রাজনৈতিক দলের মতে, তালিবানরা হলো মৌলবাদের কট্টর প্রচাবক আবার অন্য রাজনৈতিক দল মনে করে এই পাশতুনরাই আফগানিস্তানের

একমাত্র শাসক হবার যোগ্য যারা কিনা আহমদ শাহ আবদালির সময় থেকে শাসন করছে। আজ তাবা আবার যাবতীয় অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়িয়ে নিজেদের প্রাধান্য, ক্ষমতা ও শক্তিকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের মধ্যে বিগত আড়াইশো বছর ধরে কেবল পাশতুনরাই (মাঝে তাজিকদের শাসনের ন মাস আর পরে দুবছর যখন রব্বানি জোট শাসন ক্ষমতা পায়) দেশকে চালনা করে এসেছে আর আজ তাদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে দেশ চালনায়।

আমি এসব ভাল বুঝি না। আমার কাজ ছবি বানানো, আব আমি এইসব তত্ত্বে মাথা ঘামাই শুধু এই কারণে যাতে আমার ছবির চিত্রনাট্য নিখুঁত ও বিশ্লেষণাত্মক হয়। যতই ভিতরে ঢুকি, দেখি সমস্যা আরো জটিল হয়ে যায়। যখন আমেরিকা মনে করল, ঠিক তিনদিনে কুয়েতকে কেড়ে নিল ইরাকের হাত থেকে। এইভাবে আধুনিকতাকে পণ্য না করে, তার ফায়দা না তুলে এমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া যায়না যাতে করে আফগানিস্তানের ১০ মিলিয়ন নারী—যাদের জন্য কোন শিক্ষা নেই, কোনও সামাজিক অস্তিত্ব নেই, এমনকি যাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে বোরখার আড়ালে, তাদের একটা সামাজিক অস্তিত্ব তৈরির ব্যবস্থা করা যায়? কেন এই প্রাচীন পন্থাকে রোধ করার কোনও ব্যবস্থা নেই, আজকের দিনেও? আগেও বলেছি, হয় এদের ক্ষমতা নেই অথবা কোথাও উৎসাহের ঘটিতি আছে।

আর একটা কথাও শুনেছিলাম—যদি আমেরিকা আর কয়েক বছর তালিবানদের সমর্থন করে যায়, তবে ইসলামের যে কার্য ও ভ্রান্ত চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে ফুটে উঠবে, তাতে প্রত্যেকেই এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, ঠিক যেমন আফগানিস্তানের জনগণ আমানুল্লা খানের আধুনিকতাকে ভাল চোখে দেখেনি। বিপ্লব আর পুনর্বিদ্যাসের সঙ্গে তালিবানদের ইসলাম ধর্মের অপব্যাক্যকে কেউ যদি গুলিয়ে ফেলে তবে শেষ অবধি কেউই ইসলামের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে পারবে না। আমি অবশ্য জানি, আমার এই ব্যাখ্যা অনেকের কাছেই 'খুব বিবর্ণ আর ক্লিশে মনে হবে—তাই এ বিষয়ে আমার বিস্তৃত আলোচনা না করাই ভাল।

বিশ্বের সর্বাধিক শোষিত নারীরা

আফগান সমাজ পুরুষ শাসিত। এর অর্থেক অর্থাত্ প্রায় দশ মিলিয়ন নারী—কিন্তু, তাদের অধিকার আফগানিস্তানের দুর্বলতম, অজ্ঞাত গোষ্ঠীগুলির তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। প্রকৃত সত্য এই যে, আফগানরা (তাজিকরাও এই ভাবনায় शामिल) মেয়েদের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করে না।

তালিবানদের জমানা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সব মেয়েদের স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, এমনকি বহুদিন পর্যন্ত মেয়েদের রাস্তায় বেরোন পর্যন্ত বন্ধ ছিল। এমনকি তালিবানদের আগেও কুড়ি জনের মধ্যে একজন মহিলা লিখতে ও পড়তে পারত। সংখ্যাভেদের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, আফগান সমাজ ও সংস্কৃতি ৯০ শতাংশ মহিলার শিক্ষার অধিকার দেয়নি

আর বাকি ৫ শতাংশকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তালিবান সরকার। তাহলে প্রশ্ন কবতেই পারি যে, তালিবানরা আফগান সংস্কৃতিকে পাণ্টেছে, না এই সংস্কৃতির দৌলতে তালিবানদের অবির্ভাব?

আমি আফগানিস্তানে থাকাকালীন দেখেছি মহিলারা বোরখা পরা অবস্থাতেই ভিক্ষা কবে কিংবা বাজার করে। আমার যে জিনিসটা সবচেয়ে অবাধ লেগেছিল তা হলো বোরখা পরা মহিলারা রাস্তার ধারে বসে থাকা ছেলেদের দিকে বোরখার তলা থেকে হাত বের করে দেয়—নেলপালিশ পরার জন্য। আমি বেশ কিছুদিন অবধি বুঝতে পারতাম না এরা নেলপালিশ কিনে বাড়িতে গিয়ে লাগায় না কেন? পরে বুঝেছিলাম, এটাই সবচেয়ে শস্তার উপায়। একবার ব্যবহারের তুলনায় নেলপালিশ খুব বেশি দামি। তবে এটা ভেবে আমার ভাল লাগতো যে এত দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও তারা নিজেদের সৌন্দর্যের যত্ন নেয়।

আফগান মহিলারা নিজেদের যত্ন নেয়, সৌন্দর্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাতে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে হেরে না যায়। বহুবিবাহ আফগানদের মধ্যে, এমনকি তরুণ পুরুষ সম্প্রদায়ের মধ্যেও খুব সাধারণ। কখনো কখনো এই বিয়ের ফলে এক একটা বাড়ি হারেম হয়ে ওঠে। বিয়ের খরচ ওদেখে খুব বেশি—বলা যায় একটি বিয়ে গানে একটা মেয়েকে কেনা। আমি ছবির শুটিং এর সময়ে দেখেছি, একজন বৃদ্ধ লোক দশ বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করে কিনে নিয়ে যাচ্ছে—আর পাত্রীর বাবা যা টাকা পাচ্ছে তাই দিয়ে নিজে ওই বয়সী একটি মেয়েকে কিনে নিচ্ছে। এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে একটা সীমিত অর্থ লাগাতার এক হাত থেকে অন্য হাতে ঘুরছে আর তার পরিবর্তে একটি মেয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি পৌঁছেছে। ওখানে এমন অনেক মহিলা আছে স্বামীর সঙ্গে যাদের বয়সের ফারাক তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বছর।

অনেক ক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী একই বাড়িতে থাকে, এমনকি এক ঘরেই। এটা তারা মেনে নিয়েছে তাই শুধু নয়, এই ধরনের জীবন যাপনে তারা রীতিমতো অভ্যস্ত। আমি আমার ছবির জন্য আফগানিস্তান আর পাকিস্তান থেকে বহু পোষাক আর বোরখা নিয়ে এসেছিলাম। আমার ছবিতে যে সব মহিলারা দীর্ঘদিন ধরে একস্ত্রীর কাজ করেছিল তারা টাকার বদলে একটা বোরখা চেয়েছিল। একজন মহিলা তো তার মেয়ের বিয়ের জন্য একটা বোরখা চেয়েছিল। বোরখা ইরানেও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে এই আশঙ্কায় আমি কাউকেই একটাও বোরখা দিইনি। একবার আমার ছবিতে কাজ করবার জন্য কিছু আফগান মহিলাকে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাদের স্বামীরা তাতে রাজি ছিলেন না কারণ তারা মনে করেন স্ত্রীলোকরা ছবি কবলে তাদের পবিত্রতা নষ্ট হবে। আমি তাদের বুঝিয়েছিলাম যে ছবিতে তারা বোরখা পরা অবস্থাতেই আসবেন তবুও তারা মত দেননি এই যুক্তিতে, যারা ছবি দেখছে তারা যখন জানবে বোরখার নিচে একটি মহিলা বয়েছে—তখন তা তাদের পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করবে অনেকখানি।

বারবার আমি নিজেকে একটাই প্রশ্ন করি—তালিবানরা বোরখা নিয়ে এসেছিল আফগান সমাজে, নাকি বোরখার সূত্র ধরেই তালিবানরা আফগানিস্থানে ঢুকেছে? রাজনীতির প্রভাবেই আফগানিস্থানের সমাজ বদলেছে নাকি এই সমাজই ঢুকতে দিয়েছে এই রাজনীতিকে? ইরানে নিয়াতক শরণার্থী শিবিরে আফগানরা নিজেরাই জনসাধারণের ব্যবহৃত স্নান ঘর বন্ধ কবে দেয় এই যুক্তিতে যে পথচলতি লোকরা যখন মনে মনে জানবে দেওয়ালের ওপারে একজন নগ্ন নারী বা পুরুষ (বিপরীত লিঙ্গ) স্নান করছে—তখন তা মনে একটা পাপের জন্ম দেয়।

এই মুহুর্তে গোটা আফগানিস্থানে কোনও মহিলা ডাক্তার নেই আর কোনও মহিলার যদি ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হয় তবে তাকে স্বামী, ছেলে বা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় এবং তাদের মাধ্যমে কথা চালাতে হয়। এমনকি বিয়ের ব্যাপারেও সব সিদ্ধান্ত নেয় ভাই বা বাবা—পাত্রীর সেখানে কোন ভূমিকাই নেই।

আফগান আগ্রাসন

মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েডের মতে মানুষের মধ্যে যে জোর করে কিছু অধিকার কবার প্রবণতা আছে, তার মূলে রয়েছে মানুষের অস্বনিহিত জৈববৃত্তি আর সেই বৃত্তিকে একটা পাতলা আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে সভ্যতা। এই আবরণটা এত পাতলা যে আঙুলের সামান্য চাপে তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। হিংসা কোথায় নেই—প্রাচ্যেও আছে, পাশ্চাত্যেও আছে, তফাৎ শুধু তার ব্যবহারিক প্রয়োগে, তার অস্তিত্বে নয়।

ছোরা কিংবা তরবারীর কোপে মানুষের মুণ্ড কেটে নেওয়া আর বুলেট, গ্রেনেড, মিসাইল ব্যবহার করে মানুষ মাঝে-মধ্যে এই দুয়ের মধ্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগ্রাসনের বিরোধিতা করা হয় শুধুমাত্র তার পদ্ধতি নিয়ে। আফগানিস্থানের দশ লক্ষ মানুষ বিনা দোষে নিহত হলো—এটা বিশ্ববাসীর চোখে আগ্রাসন নয়, গৃহযুদ্ধ আর রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে যে দশ শতাংশ মানুষ আফগানিস্থানে মারা গেল, তাদের মৃত্যুও আগ্রাসনের স্বাভাবিক গুণে না—নাম গুণে শুধু একজনের যার মাথা তরবারীর ঘায়ে কেটে ফেলা হয়েছে। উপগ্রহ চ্যানেলের সংবাদে সেই লোকটি কতদিন শিরোনামে থাকে!

এটা সত্যি যে একজনের মাথা কেটে নেওয়ার খবরটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বীভৎস, কিন্তু যখন হাজার হাজার মানুষ মাইনের কবলে পড়ে প্রাণ দেয়, তখন সেই একই অনুভূতি আমাদের মনে আসে না কেন? কেন ছুরিটাকে ভয়ঙ্কর মনে হয়, মাইনকে নয়? আধুনিক পাশ্চাত্য জগত কেবল আফগানিস্থানের আগ্রাসনের ভয়াবহতার প্রকার নিয়ে কথা বলে সমালোচনা করে—কিন্তু তার মূল শিকড়টির দিকে দৃষ্টিপাতও করেনা। পাশ্চাত্য একটা মর্মর মূর্তির পতন নিয়ে দুঃখজনক গল্প ফাঁদতে পারে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু সংখ্যাতত্ত্বের বেড়া জাল টপকাতে পারে না। স্টালিন বলেছিলেন : “একজনের মৃত্যু একটা ট্রাজেডি কিন্তু দশ লক্ষের মৃত্যু একটা সংখ্যাতত্ত্ব মাত্র।”

যবে থেকে আমি আমার মেয়ের হান্নার (Hanna) বয়সী একটি কিশোরী মেয়েকে খিদের জ্বালায় আমার কোলের মধ্যে মারা যেতে দেখেছি, আমি সেদিন থেকে এই অনাহারের যন্ত্রণাকে জনসমক্ষে হাজির করতে চেয়েছি। কিন্তু শেষ অবধি আমাকে শেষ করতে হয়েছে নিছক অসাব এক সংখ্যাতত্ত্বে। হে ঈশ্বর, আমি বেন আফগানিস্তানেরই মতো দুর্বল, ক্ষমতাহীন? আমার মাঝে মাঝেই হীরাটের সেই কবির কবিতার কথা মনে পড়ে, যিনি অনাহারে পথের কোনও এক প্রান্তে প্রাণ হারিয়েছেন আর তখনই বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তির মতোই লজ্জা-দুঃখ-অপমানে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে—

পদব্রজে এসেছিলাম, পদব্রজেই যাব।

যার কানাকড়ি নেই, তাকেও চলে যেতে হয়—

যে শিশুটির খেলনা নেই, তাকেও যেতে হবে।

আজ বাতেই সাঙ্গ হবে আমার দ্বীপান্তরে বাস,

খালি টেবিলটিকে মুড়ে রাখা হবে।

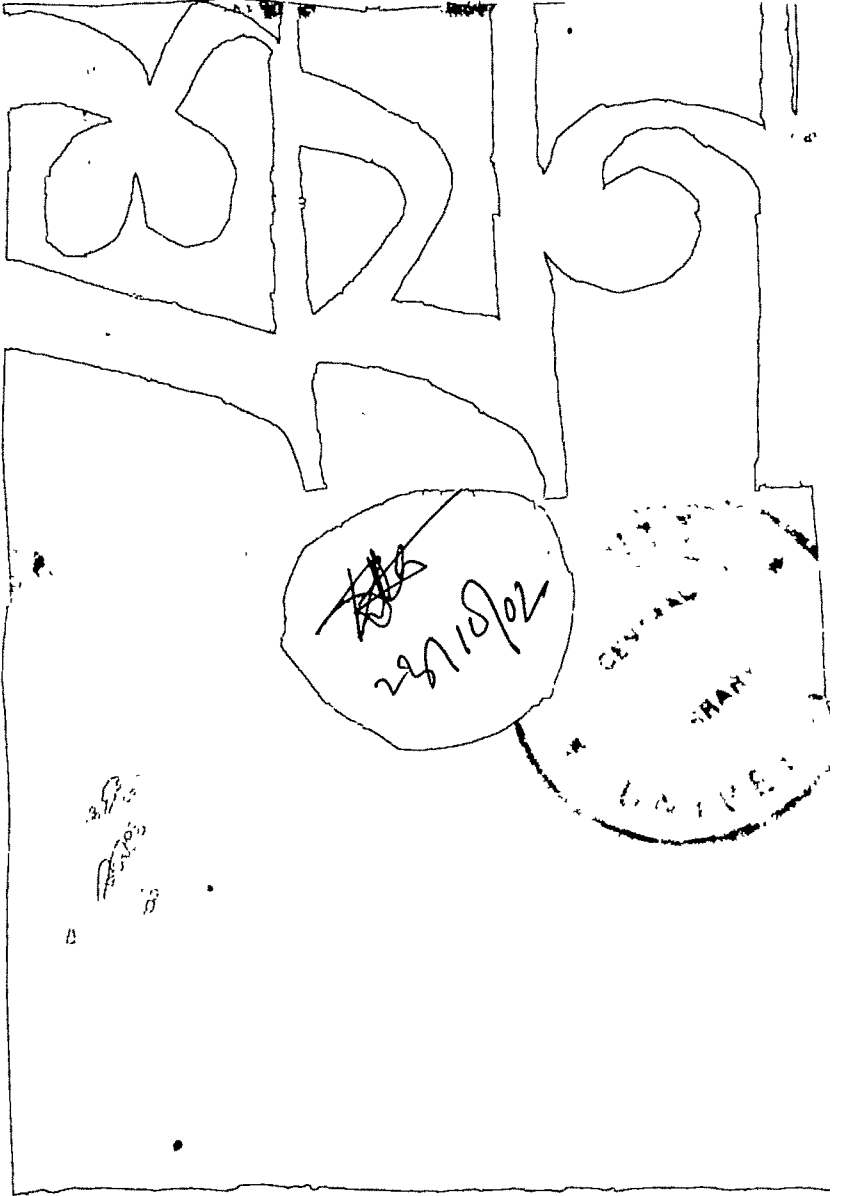
যন্ত্রণায় আমি ঘুরে বেড়াই দিগন্তের চারপাশ—

সকলেই জানে আমি পর্যটক ;

যা আমার নয় তাকে ফেলে যাব।

পদব্রজে এসেছিলাম, পদব্রজেই যাব।

[মহসীন মখমলবাক (Mohsen Makhmalbaf) ইরানের খ্যাতনামা চলচ্চিত্রকার। শাহ আমলের বাজনৈতিক বন্দী এই মানুষটির দুটি ছবিই আফগানদের নিয়ে। নাম তাদের ‘দ্য সাইক্লিস্ট’ ও ‘কান্দাহার’। মখমলবাকের বর্তমান নিবন্ধটি ২০ জুন ২০০১ সালের “দ্য ইরানিয়ান” পত্রিকায় ছাপা হয়। সামান্য অদলবদল করে সেটি তারপর “মাছুলি রিভিউ” প্রকাশ করেন। আমরা একে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার কথা ভেবে মখমলবাকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি সাগ্রহে অনুমতি দেন, রবীন্দ্রনাথ-সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় এই লেখাটি মুদ্রিত হচ্ছে জেনে স্পষ্টতই তিনি উদ্দীপ্ত। অনুবাদ করেছেন রূপা দত্ত।—সম্পাদক, শ্রয়ণ।]



বর্ষ ৭
সংখ্যা ২

স্বনির্ভরতা

জুলাই-ডিসেম্বর
২০০২

ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও আত্মজাগরণ বিষয়ে কৃষ্টিপত্র

কৃষ্টি

বর্ষ ৭ সংখ্যা ২ ॥ শয়নস্থল ॥ জুলাই - ডিসেম্বর ২০০২

বিষয়

স্বনির্ভরতা : ব্যক্তিক ও সামাজিক উদ্যোগ

কৃষ্টি

২ বি প্রতিরূপা, ৪৯ বি সন্তোষপুর ইস্ট রোড, কলকাতা ৭৫, দূরভাষ ৪১৬ ২১০২

ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও আত্মজাগরণ বিষয়ে কৃষ্টিপত্র

শ্রয়ণ

বর্ষ ৭ সংখ্যা ২ || শ্রয়ণস্থল || জুলাই - ডিসেম্বর ২০০২

বিশ্বের উত্ত-অশুভ পরিবর্তনকে সহজভাবে অর্থ সত্যের অশ্লাপ না করে সবার কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। একই সঙ্গে চাইছি, আমাদের পরিচিত বিশ্বে যারা পরার্থমূলক সেবার কাজ করে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে সবার পরিচয় ঘটাতে। এই দুই কাজ করতে করতে শ্রয়ণ সাত বছর পার করল। আট বছরে পৌঁছবার আগে বন্ধুদের কিছু কথা জানাতে চাই। প্রথম, পত্রিকার আর্থিক অবস্থা নিয়ে - এখনো পর্যন্ত আমাদের দুই বন্ধু পত্রিকা খরচের সিংহভাগ বহন করছেন, বেশিদিন এভাবে চালাতে পারবেন বলে মনে হয় না ওদেরও। সেক্ষেত্রে শ্রয়ণ, গ্রন্থনকার মত, সুন্দর ও শাবিত রূপে বার করতে হলে আমাদের একটা মজাবুত ব্যালেন্স তৈরি করতে হবে। আমরা দশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা আবেদন রাখছি - যিনি যতটায় সক্ষম তিনি ততটাই দেন। টাকাটি আমরা, যতদিন শ্রয়ণ প্রকাশিত হবে, ততদিন রাখব, তার সুদে পত্রিকা চালাব। যেদিন শ্রয়ণ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবে, টাকাটি ফেরত দেব, অথবা, তিনি চাইলে, তখনকার কোন ক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেব। শ্রয়ণের মত পত্রিকা প্রকাশ ও নানাবিধ কাজ করা একটি নিশ্চিত সমাজসেবার কাজ, সেই কাজে এই অর্থ ব্যবহার করতে আপনার কি কোন সংশয় আছে?

জানাবেন। টাকা Shrayansthal নামে ঢেকে পাঠাবেন।

শ্রয়ণ - সম্পাদনা গবেষণা

অভিজিৎ চক্রবর্তী, স্বাতন্ত্র্য মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম রায়,

রূপা দত্ত, শামিম আহমেদ, শুক্লা বসু, সৌরভ ঘোষ

শিল্প সম্পাদনা

শুভাপ্রসন্ন

সম্পাদনা

পথিক বসু

মুদ্রণ : প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা ৯

সদস্যমূল্য : ২ বছর ১৫০ টাকা, ৪ বছর ৩০০ টাকা,

যতদিন শ্রয়ণ ২০০০ টাকা, আর্থিক স্বনির্ভরতায় দশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা

এই সংখ্যার মূল্য ২০ টাকা

শ্রয়ণ

২ বি প্রতিরূপা, ৪৯ বি সম্ভাষণপুর ইন্সট রোড, কলকাতা ৭৫, দূরভাষ ৪১৬ ২১০২

সম্পাদকীয়

সহজ কথা এই যে আমাদের বড় হওয়া মানুষ হওয়ার ওপর সমাজপ্রকৃতির দান বিস্তর, পরিবার সংসারের মাধুর্য্য মমতাকে অস্বীকার না করেই বলা যায় সেক্ষেপ। তাই বড় হয়ে মানুষ হয়ে আমাদের একটি কর্তব্য হওয়া উচিত সমাজপ্রকৃতিতে নিঃস্বার্থ কিছু সেবা করা যাতে সমাজপ্রকৃতি পারে পরের সারির মানুষদের তা দিতে - শাস্ত্রভাবে স্থিরভাবে। জিজ্ঞাসা সেখানেই - দিতে পেরেছি কি? জিজ্ঞাসা এটাই - কিভাবে দেব? ব্যক্তি কতটা দিতে পারে? সমষ্টি ছাড়া দল ছাড়া একা কি কিছু করা যায়? তাহলে যদি দল না গড়তে পারি একা একা কি করব? প্রশ্নগুলো আসে।

এই পর্বে আমরা দুটি উদ্যোগ, দু ধরনের অবস্থার বিশ্লেষণ ও একটি প্রশ্নাব রেখেছি। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সামাজিক উদ্যোগে অংশ নেবার প্রশ্ন পরিপ্রশ্ন মাথায় রেখে এই বিন্যাস ঘটেছে।

উদ্যোগ পর্বে দুজন চিকিৎসক তাঁদের পথ সম্বন্ধে বলছেন। এঁরা দুজনেই ব্যক্তি হিসেবে সমাজের প্রতি মমতায় পটভূমিকে নিঃস্বার্থে কিছু দেব এই মানসিকতা নিয়ে পথ নির্মাণ করেন। পুণ্যব্রত গুণ জীবনের শুরুতেই পেয়েছিলেন একজন ব্যক্তিত্বকে একজন নেতাকে যার নাম শঙ্কর গুহ নিয়োগী। ব্যক্তিত্ব কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে এক মরে ও তাদের মধ্যকার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তার প্রকাশ পেয়েছিল শঙ্কর গুহ নিয়োগীর অনিহত গ্রান্ডোলনে, যার পরিচয় পুণ্যব্রত শ্রয়ণের অনেক লেখায় দিয়েছেন। এখানে বিষয়টি অন্য। শঙ্কর খুন হয়েছেন, তাঁর সংগঠনে নেমে এসেছে সংকট, মতাদর্শের গরমিলে পুণ্য হাতে গড়া শহীদ হাসপাতাল ছেড়ে দিচ্ছেন - লে এসেছেন বাংলায়, ফের একটু একটু করে গড়ে উঠছে মৈত্রী হাসপাতাল, শ্রমিককৃষকের হাসপাতাল। কেবুবে - সেটাই এবারের পাঠ। অন্যজন, অসীম চট্টোপাধ্যায়, একটি জটিল ফিজিওলজিক্যাল (অথবা ট্যাক্সলজিক্যাল - ভেদাবেই বলি না কেন) ব্যাধির বিরুদ্ধে নেমেছেন, এই ব্যাধির বিরুদ্ধতা করার মত ফর্মাল ঐক্য তাঁর ছিল না, একটু একটু করে তিনি শিবছেন, প্রথিতযশা শিক্ষকদের কাছ থেকেই শিবছেন, অন্যদিকে ঐক্যটির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছেন। কখনো কোথাও তিনি একজন নন, আবার একজন মানুষই; তিনি সর্বত্র ঐক্যের মানুষের - সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ - হাজার জনের একজন হয়ে আসছেন যাকে ঘিরে সমাজকল্যাণ স্থির ক্ষেত্র সংগঠিত হয়ে চলেছে। একই কথা, পুণ্যের সম্বন্ধেও বলা যায়।

তখন নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আমি কি পারব? আমি কতটা পারি? কি করতে পারি সেটাই বা বুঝি কেমন হবে? আমার কাজ আমাকে পবিত্র থেকেই শুরু করতে হবে। সর্বোপরি সমাজের কল্যাণমূলক ভাবনা তো বাজার-অর্থনীতি, সবিশেষে বিশ্বব্যাঙ্ক, ভাবছে; নোবেল প্রাপক, শ্রান্তির অপেক্ষায়, এমন তাদের অর্থনীতিজ্ঞেরা কল্যাণের অর্থনীতিতে বাজার-অর্থনীতির সুউচ্চ ভূমিকার কথা বলেও বেড়ান - টাকাও অর্জল আসছে। মানুষ কতটুকু স্বনির্ভর হচ্ছে সেইদিক নিয়ে, বনবাসী আদিবাসী মানুষদের দিক দিয়ে আলোচনা করেছেন আনন্দমোহন কর। সমাজবিজ্ঞানের এই নবীন অধ্যাপকের থেকেই জানতে পারলাম এই বনবাসীরা যদি পৃথক দেশ গঠন করতেন তাহলে লোকসংখ্যার বিচারে সেই দেশটি চীন এবং অবশিষ্ট ভারতের পরেই স্থান পেত। এই বিপুল জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত হয়েছেন, বাজার-অর্থনীতির সংনিষ্ঠাবান রূপকারদের অসামান্য পরিশ্রমে কিন্তু কিছু হলেও পাচ্ছেন। এদিকটি নজরে আসার পর জানতে চাইব, টাকা তারা পাচ্ছেন বাজার-অর্থচক্র থেকে ঠিকই কিন্তু কিসের বিনিময়ে এই পাওয়া? কি তারা দিচ্ছেন যার বিনিময়ে পাচ্ছেন টাকা? সেই দেয়াট কার দান? শিখছি এই যে, তারা পাচ্ছেন তাঁর থেকে যিনি আমাদের ধারক - মা-প্রকৃতি। প্রকৃতির দেয়া বর্ষসম্পদ তারা বেচছেন, বাজার আছে সেই সম্পদের তাই বেচতে পারছেন, বাজার মন্দা হলে কি হবে সেটাও ভাবা দরকার। এও তো দেখছি, বাজার অর্থনীতির এই উদার গতির মধ্যেও ধ্বংস হত্যা হানাহানি - এককথায় আফগানিস্তান - এও হয়, যখনতখন ছলছুতোয় হয়। তখন কি হবে? কে বাঁচাবে?

বাঁচাবেন মা-প্রকৃতি। এই হবে স্বনির্ভরতার আন্দোলন আর এই কাজ এইমত শুভ সমাজ নির্মাণের ফর একটু একটু করেই, ঘর থেকে, নির্মাণ করা যায়। সেই নিয়ে লিখেছেন পথিক বসু।

শেষ হবে একটি প্রস্তাবনা দিয়ে। শ্রমণের বন্ধুরা ইতিমধ্যে এই নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। কিতাবে খেতে পাওয়া দরদী মানুষেরা, ঘরে থেকেই, নিঃস্ব মানুষের মঙ্গলে যৌথ উদ্যোগ নিতে পারেন তার নির্দিষ্ট কর্মসূচী এখানে দেয়া হচ্ছে। যিনি কাজে নামতে ইচ্ছুক তিনি যাতে কিছুটা হলেও একটা কাজের দিক পান, অকণা তিনি তাঁর মত করেই কাজ সাজাবেন, প্রয়োজনে আমাদের প্রস্তাবনাতে অগ্রাহ্য করবেন, এই স্বাধীনতা মেনে শ্রমণ ভাবাচ্ছে, ভাবছে।

সূচিপত্র

উ দ্যোগ

স্বনির্ভরতার পথে । ৯। পূণ্যব্রত গুণ

চিকিৎসক অসীম চট্টোপাধ্যায় । ১২। ভৃগু হাঁসদা

তৃতীয় বিশ্বে ক্যানসার চিকিৎসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা । ২১। অসীম চট্টোপাধ্যায়

বি শ্লেষ ৭

যৌথ প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনা । ২৫। আনন্দমোহন কর

স্বনির্ভরতা । ৪৪। পশ্চিক বসু

প্রস্তাব

দুটি কর্ম-পদ্ধতি । ৬৪। শ্রয়ণ প্রতিবেদন



শ্রৱণস্থল

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র নিবন্ধিকরণ নিয়মাবলী (১৯৫৬)র ৮ ধারা অনুসারে জেনে
রাখার বিষয় - ১. প্রকাশস্থান - ২বি প্রতিরূপা, ৪৯বি সন্তোষপুর ইস্ট
রোড, কলকাতা ৭৫; ২. প্রকাশকাল - দ্বিমাসিক; ৩. প্রকাশক, মুদ্রাকর, সম্পাদক
ও মালিকানা - পথিকবসু, ভারতের নাগরিক, ২বি প্রতিরূপা, ৪৯বি সন্তোষপুর
ইস্ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০৭৫। আমি জানাচ্ছি এই তথ্য সর্বাংশে সত্য।

৩১ মার্চ ২০০২

পথিক বসু

— **গ্রন্থ** —

স্বনির্ভরতা : ব্যক্তিক ও সামাজিক-উদ্যোগ

শনিভরতার পথে

পুণ্যব্রত গুণ

কাজ শুরু করেছিলাম ১৯৯৫ এর ২০ মার্চ, হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমায় চেন্দাইল-বেলতলার এক মহানুভব মহিলার ছোট্ট আউটহাউসে। কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শুরু শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কাজ বাড়তে মহিলার বাড়ির উঠোন আর পরিত্যক্ত মুরগির চালা দখল নিতে হয়েছিল। এখানেই সাত বছর কাজ চালিয়ে ২০০২ এর ১ মে আমরা কাজ শুরু করব যথাযথ এক আউটডোর ভবনে।

এত সময় লাগত না যদি আমরা হাত পাততাম সরকারি বা বেসরকারি কোন ফান্ডিং এজেন্সির কাছে। বছর পনেরো আগে হাতে এসেছিল একটা বই - ডেভিড ওয়ার্নারের Helping Health Workers Learn। লেখক বলেছিলেন, বাইরের সাহায্য মানে বাইরের নিয়ন্ত্রণ। কথাটা আমরা মাথায় রাখি সবসময়। তাছাড়া যে কর্মনীতিতে কাটিয়েছি চিকিৎসক জীবনের প্রথম আটটি বছর - সেই শহীদ হাসপাতাল, ছত্তিশগড়ের দম্মীরাজহরার খনিশ্রমিকেরা যাকে গড়ে তুলেছিলেন পুরোপুরি নিজেদের সামর্থ্যে বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই।

কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন সদস্যসংখ্যার বিচারে ছত্তিশগড় মাইল শ্রমিক সংঘের ধারেকাছে আসে না, নেই এতে শংকর গুনিয়োগীর মত বড় মাপের কোন নেতা। কেবল শ্রমিকদের ক্ষমতায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা যাবে একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। তবু ফান্ডিং এজেন্সির অনুদান না নেবার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প থেকেছি। তাড়াতাড়ি ফুলেফেঁপে না উঠে, চেয়েছি, বাড়ব আস্তেআস্তে, মানুষের ওপর নির্ভর করে, দীর্ঘস্থায়ী হবে সে বিকাশ।

শুরুর সময়ে হাতে ছিল অল্প কিছু ডাক্তারি যন্ত্রপাতি, শ্রমিকদের দেয়া কিছু টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চ আর ওষুধপত্র কেনার জন্য ইউনিয়নের দেয়া দেড় হাজার টাকা। ইউনিয়ন প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা দিত ডাক্তারের ভাতা বাবদ, অবশ্য কারখানা বন্ধ থাকলে এ টাকা মিলত না। রোগী পিছু এক টাকা নেয়া হতো তখন চিকিৎসা পরামর্শের জন্য, এই টাকা থেকে এক হাজার টাকা দেয়া হতো এক স্বাস্থ্যকর্মীকে, যিনি চব্বিশ ঘণ্টাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকতেন। বাকি কজন কর্মী সেসময় অবৈতনিক ছিলেন, প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। স্থায়ী কর্মসূচি চালাতে স্থায়ী কর্মীবাহিনী লাগে, কর্মীদের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা না করলে তাদের ধরে রাখা যায় না। তাই আয় বাড়াবার কথা ভাবতে হয়েছে প্রথম থেকেই। শুরুর দেড় হাজার টাকা দিয়ে ওষুধ কেনা হলো কলকাতার কমিউনিটি

ডেভলপমেন্ট মেডিক্যাল ইউনিট থেকে, ওষুধ ছাপা দামের থেকে অনেক কম দামে পাওয়া গেল। তার ওপর পাঁচ শতাংশ হারে লাভ রাখলাম ওষুধ আনানেওয়া ও বিক্রি বাবদ। রোগী বাজারদরের প্রায় অর্ধেক দামে ওষুধ পেলেন, আমরা লাভের টাকা জমিয়ে ওষুধের স্টক বাড়াতে লাগলাম।

অপারেশনের কিছু যন্ত্রপাতি ছিল, ছিল দাঁত তোলার যন্ত্রপাতি আর দুটো স্টেরিলাইজিং ড্রাম। ছোটখাট সিস্ট, টিউমার কাটা শুরু হলো, দাঁত তোলা হতে লাগল। অর্জিত অর্থ জমিয়ে কেনা হলো নাক-কান-গলা পরীক্ষার সেট, মূত্রনালীর রোগে ব্যবহৃত ইউরেক্সাল ডায়ালেটর সেট, রক্তের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষার জন্য হিমোগ্লোবিনোমিটার, পেছাপে চিনি ও প্রোটিন মাপার যন্ত্র এবং রাসায়নিক।

শূণ আকারে শুরু হলো প্যাথোলজি ল্যাবরেটরি। হিমোগ্লোবিন ও পেছাপের সুগার ও অ্যালবুমিন মেপে যথাক্রমে পাঁচ ও চার টাকা নেয়া হতো। একে একে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ও ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি কেনা হতে লাগল এ টাকা জমিয়ে। মাইক্রোস্কোপ কিনতে বেশি টাকা দরকার। এক শুভানুধ্যায়ী হাজার তিনেক টাকা দিলেন। ১৯৯৫ এর ১ আগস্ট শুরু হলো ল্যাবরেটরির কাজ। ব্যবসায়িক ল্যাবরেটরিতে কোন পরীক্ষার জন্য রোগী যে টাকা দেন তার অর্ধেক যায় যে ডাক্তার রোগী পাঠাচ্ছেন তাঁর পকেটে, বাকি অর্থের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ লাগে আসল পরীক্ষা করতে। আমরা ঠিক করলাম স্থানীয় বাজারদরের অর্ধেকেরও কমে পরীক্ষা করব। স্বাবলম্বনের পথে বেশ কিছুটা এগোনো গেল। সেপ্টেম্বর থেকে কর্মীদের ভাতা দেওয়ার অবস্থায় আসা গেল।

ই সি জি মেশিন আমাদের আরো স্বাবলম্বী করল। ই সি জি মেশিন কেনার কুড়ি হাজার টাকা দিলেন আরেক শুভানুধ্যায়ী। তাঁর সঙ্গে কথা হলো মেশিনের আয় থেকে প্রতি বছর দু হাজার টাকা দেব আমরা, সেই টাকা তিনি অন্য সমাজসেবার কাজে লাগাবেন। ই সি জি করতে উলুবেড়িয়ার ডাক্তাররা নেন একশ টাকা করে। আমাদের চার্জ ঠিক করা হলো পঞ্চাশ টাকা। ১৯৯৬ এর নভেম্বর থেকে আয় বাড়ল এ থেকে।

১৯৯৬ এর জানুয়ারি মাসে কানোরিয়া জুট মিলে লকআউট হলো, একদিকে ইউনিয়নের কাছ থেকে অর্থ আসা বন্ধ, অন্যদিকে কর্মহীন শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতে হবে, তাই রোগী দেখার ফি এক টাকা থেকে বাড়িয়ে দু টাকা করা হলো। তাও সংকট কাটে নি প্রায় বছর দুয়েক, মাঝেমাঝেই ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বিনা ভাতায় বা অর্ধেক ভাতায় কাজ করেছেন। ১৯৯৭ থেকে ডাক্তারের সংখ্যা বাড়তে থাকে, রোগী দেখার ফি, ই সি জি, প্যাথলজি ও ওষুধ বিক্রির আয় থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্বাবলম্বী হয়ে যায় ৯৮ এর ডিসেম্বর মাসে।

কোন ফান্ডিং এজেন্সি থেকে টাকা নিলে কর্মীদের এই কষ্ট করতে হতো না। কিন্তু আমাদের কয়েকজনের অল্প কিছু সময়ে ফান্ড-গ্রাহক-এন জি ও'তে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। সেখানকার কর্মীরা জনতার জন্য কাজ করছি এই আত্মতৃপ্তিতে তৃপ্ত থাকলেও

আসলে অভ্যস্ত হতে থাকেন আরামের জীবনে। এও বলার যে, ফান্ডিং এজেন্সি (বিশেষত সরকারি দপ্তর যখন ফান্ড জোগায়)-র অর্থ সরবরাহ মাঝেমাঝে অনিয়মিত হয়, কাজ তখন থমকে দাঁড়ায়। ফান্ডিং এজেন্সির শর্ত থাকে কিছু লক্ষ্যমাত্রা পূরণের, টাকা পেতে এন জি ও'কে প্রায়ই মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয়। ফান্ডিং এজেন্সি যে কাজ করতে বলে অনেক সময় তা হয়ত এলাকার মানুষের প্রয়োজনের কাজ নয়, তবু সে কাজ করে যেতে হয় টাকা পেতে। এছাড়াও দেখেছি সেখানে ভাউচারে একরকম টাকায় সই করিয়ে কম টাকা দেয়া, হিসেবে লুকোচুরি, পরিচালনায় গণতন্ত্রের অভাব ইত্যাদি অবাঞ্ছিত ব্যাপারসমূহ। এ পথে চলব না - দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমাদের।

কর্মীদের ভাতা রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ক্লিনিকের আয় থেকে চললেও, সে আয়ে বাড়ি তৈরি বা অন্য কোন বিকাশের কাজ সম্ভব নয়। তাই আমাদের কয়েক দফায় টাকা তুলতে হয়েছে। টাকা তোলার আবেদনে দেখবেন আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছি সমাজ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে কি আমাদের মতামত, আমরা কি করতে চাই। আমাদের পরিচিত এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের কাছে হাত পাতলে একজনের দানই হয়ত আমাদের প্রস্তাবিত আউটডোর ভবনের একটা তলা হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা আমাদের মতের সমর্থক নন, তাই তাঁদের কাছে হাত পাতি নি।

সাধারণ মানুষ যাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছি কেবল তাদের মুষ্টিভিক্ষাতেই যদি আউটডোর ভবন গড়ে তোলা যেত, সেটাই হতো সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলতে যে লোকবল দরকার, তা আমাদের ছিল না। স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা জানা তেরো হলেও তারা ভীষণ ব্যস্ত থাকেন চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলেছি তখন যখন তারা ক্লিনিকে আসেন। বলা বাহুল্য সে অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। সময়ের তাড়া আছে কেন না ২০০২ এর ১ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে সরকারি গেজেট, ৩১ জানুয়ারি ২০০১ অবধি সংশোধিত পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট আইন। সমস্ত ডাক্তারখানাকে সে আইনের নির্দেশ মেনে লাইসেন্স নিতে হবে ২০০২ এর ১ এপ্রিলের মধ্যে। আমাদের মুরগির চালায় চলা ডাক্তারখানা আইনি স্বীকৃতি পাবে না। এই তাড়াও আমাদের বাধ্য করেছে, সমর্থক ও বন্ধুদের সাহায্য নিতে। শ্রমিকরা যাদের উদ্যোগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পথ চলা শুরু, তারা উদ্যোগ নিতে পারলে অবশ্য কেবল এলাকার মানুষের অর্থই বাড়ি তৈরি হতে পারত। কিন্তু গত সাত বছরে মিল লকআউট থেকেছে ছয়বার। তাছাড়া সমস্যা ছিল আরও যা এখানে বলা অবাস্তব। সম্প্রতি শ্রমিকরা উদ্যোগ নিয়েছেন চাঁদা তুলে শেষ পর্যায়ের কাজ পুরো করতে।

চিকিৎসক অসীম চট্টোপাধ্যায়

ভৃগু হাঁসদা

ক্যানসার চিকিৎসা নিয়ে অসীম চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা। কাজটি উনি করে যাচ্ছেন পঁচিশ বছর ধরে। বিজ্ঞাননির্ভর চিকিৎসা যেভাবে হয় অসীমবাবু শুরু করছেন সেভাবেই তবে ওঁর চিকিৎসায় মূলত ব্যবহৃত হচ্ছে একটি হোমিও ড্রাগ, নাম সোরিনাম, উৎস খোসপাঁচড়া থেকে গড়িয়ে পড়া রসখোসামামড়ি। এর অ্যালকোহলিক এক্সট্রাক্ট নিম্নশক্তিব করে নিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে তর্কটা এসময়ে উঠবে তা ওঁর ড্রাগের বেলাতেও উঠেছে - নিম্নশক্তিসম্পন্ন ড্রাগে আদর্শে কোন অণু আছে কি না সে নিয়ে বিশ্বজোড়া তর্ক চলছে। অসীমবাবু এর থেকে সরতে পেরেছেন, কারণ উনি সরতে চেয়েছেন, সচেতনভাবে সরতে চেয়েছেন, চেয়েছেন মেনস্ট্রিম বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে ওঁর দেখাবোঝাকে জুড়তে। তাই খোসপাঁচড়া থেকে বার করা ওষুধটি তিনি মেনস্ট্রিম গবেষণায় এনেছেন, খ্যাতনামা বিজ্ঞানীচিকিৎসকেরা তা নিয়ে কাজ করেছেন। একটা ফল এখনি বলা যাক - হাই পারফেকশন লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি দিয়ে ওঁর ওষুধ বিশ্লেষণ করে এখন পর্যন্ত এগারোটা বিভিন্ন অণুর অস্তিত্ব মিলেছে, অণুগুলোর চরিত্র নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে। যা উনি নিশ্চিতভাবে পারছেন তা হলো - ক্যানসারের প্রচলিত থেরাপি যখন আর কাজ করতে পারে না, যে স্তরটাকে টার্মিনাল স্তর বলা হয়, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে দুভাবে মাপা হয় - এক, কার্নোপস্কি স্কেলে ৫০ এর নিচে চলে যাওয়া অথবা, দুই, ই সি ও জি স্কেরে এক দুই পার হয়ে তিন কি চারে চলে যাওয়া। রোগ যদি এই স্তরে পৌঁছে যায় তাহলে কি কেমোথেরাপি কি রেডিয়েশন থেরাপি দুটোকেই কাহিল শরীরটা আর নিতে পারে না। এসময়েই চিকিৎসকেরা রুগীকে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে রাখা ব্যতীত কিছু করতে পারেন না, বাড়িতে চলে যেতে বলেন, প্রয়োজনে রক্ত দেয়া ইনফেকশনে অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া ইত্যাদি প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট করার পরামর্শ দেন। এই অবস্থায় শুরু হয় অসীমবাবুর কেরামতি। ওঁর দাবি, ওঁর চিকিৎসায় রুগী কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সেরে গেছে; যারা পুরোপুরি সেরে উঠতে পারে নি তারা টার্মিনাল রুগীর সম্ভাব্য আয়ুর থেকে অনেকটা বেশি বেঁচেছে অনেক কম কষ্ট পেয়ে মারা গেছে; যারা মারা গেছে তারা অনেকসময় অন্য কোন ব্যাধির কবলে পড়ে মারা গেছে। একটি মেয়ের কথা বলি। এখন সে কলকাতার একটি কলেজে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পাঠরতা। পাঁচ বছর আগে ওঁর যেধরনের জরায়ু ক্যানসার হয় তার নাম আনডিফারেন্সিয়েটেড ম্যালিগন্যান্ট টেরাটোমা, যা মারাত্মক ব্যাধি হিসেবেই বিজ্ঞানমহলে পরিচিত, সম্ভাব্য আয়ু ছ'মাস। মুম্বাইতে ওঁর সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট হয়, কেমোথেরাপি হয়।

হ'মাসের মধ্যে ফের কাহিল হয়ে পড়ে, এবার দেখা যায় ক্যানসার কোষেরা ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য। প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্টের পরামর্শ নিয়ে ও ফিরে আসে, কারো থেকে শুনে ওরা আসে অসীমবাবুর কাছে। চিকিৎসা চলতে থাকে। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে, ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়। এখন অঙ্গি সুস্থই রয়েছে সে (প্রার্থনা করি সুস্থ থাকুক সে)। ওষুধ সেই সোরিনাম, ব্যাস। কিন্তু প্রকৃতির ইচ্ছেটা কি - এটাও যেন জানতে ইচ্ছে করে।

বহু মৃত্যু দেখা অসীমবাবুর একান্তই নিজস্ব সিদ্ধান্ত, ক্যানসার তারই হবে যার জিন অক্সিজিনে বদলে যাচ্ছে। এর সঙ্গে ভুল খাদ্যাভ্যাস কি ধূমপান ইত্যাদির সম্পর্ক ততটাই যে, ধূমপান করলে তারই ক্যানসার হবে যার হতেই, হয়ত আশিতে হতো, ধূমপানের ফলে হচ্ছে যাটে। অসীমবাবু দেখছেন, জনগোষ্ঠীর এক অংশে ক্যানসার হচ্ছেই, নিরামিষভোজী কি আমিষভোজী, খুব মেপেবেঁধে চলা কি বেহিসেবি চলা কোনটাই ফ্যাক্টর নয়। অবশ্যই এপিডেমোলজিস্টরা আপত্তি করবেন, তাই উনি ওঁর একান্ত সিদ্ধান্ত বলেই এটিকে ধরছেন।

আরো কতগুলো ব্যাপার আসছে। আমরা অসীম চট্রোপাধ্যায়ের পরীক্ষা নিয়ে লিখতে বসেছি কেন? - কয়েকটা গভীর কারণ পাচ্ছি যা বর্তমান সংখ্যার পক্ষে শেখার বিষয়। প্রথম, একজন মানুষের ইচ্ছাশক্তির পরিক্রমা এভাবে যদি বলি তো ভুল বলা হবে না। অসীমবাবুর জীবনেতিহাস অনুসন্ধান করে দেখছি, কোনকিছু ভাল না লাগার ব্যাপারটা হঠাৎই তাঁর দিদির ক্যানসারে মৃত্যুর পর নিবিষ্ট হচ্ছে ক্যানসার-ভাবনায়। যে বয়সে ভাবনাটা ঝিলিক দিচ্ছে সে বয়সে অ্যালোপ্যাথিতে অ্যাকাডেমিক পাঠ নেয়া যাচ্ছে না, উনি ভর্তি হচ্ছেন হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে। কলেজেও ভাললাগছে না। সিম্পটম দেখে ওষুধ নির্বাচন করা - এটাই ওঁর ভাল না লাগার বিষয়। সে সময়টা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। যা বলতে চাইছি, চিকিৎসক হবার পর থেকে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছেন ক্যানসারে, প্যাথলজি ধরে ক্যানসার বোঝার জন্য বিজ্ঞানচর্চা করেছেন, ড্রাগটার অরিজিন হোমিওমতে কিন্তু তার কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য মেনস্ট্রিম ল্যাবে গেছেন, কখনো দাবি করছেন না যে তাঁর টোটকায় ক্যানসার হার মানছে, এই ব্যাধি যে অনেককিছুকে বিকল করে এবং একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকমের হয়ে আসতে পারে, ব্যর্থতা যে এর অন্যতম সাথি, তবু চেষ্টা চালানো দরকার, কম পয়সার ম্যানেজমেন্ট যে সম্ভব - সেটা জোরের সঙ্গে বলছেন। এই গোটা ব্যাপারটা অভিনব, একটা আলাদা ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি গড়ে উঠছে, আর সেটা ঘটছে ওঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে, সেই জোর আনছে বন্ধু (শ্রদ্ধা)। চাইলে একজন মানুষ যে পারেন কিছু করতে সেটা বিজ্ঞানসম্মত জুড়ে যে করা যায় - তারই নিদর্শন অসীম। সমস্যা অন্যভাবে আসছে। ইতিমধ্যে ওঁর ম্যাজিক ড্রাগ বিশ্বের বিজ্ঞানমহলে পরিচিত হয়ে গেছে, বিভিন্ন ল্যাব কাজ শুরু করে দিয়েছে। ওঁর পরিচিত একজন ঐ ড্রাগ আর তার ব্যবহারের নথিপত্র লোপাট করে একদুটো পেপার ছাপিয়ে ফেলেছে (জানাজানি হতে হতভাগ্যের ওপর চাপ পড়ে, অসীমবাবুই অসবার

ওকে উদ্ধার করেন)। অসীম জানেন ওঁর ড্রাগ চুরি করার কোন বাড়তি অর্থ নেই, ওষুধটা সহজ, খোসপাঁচড়া থেকে পাওয়া যায় এবং ওষুধটা ভয়ঙ্কর। সোরিনামের আবিষ্কর্তা লিখেছিলেন - আমি একজন উদ্ভাদ কাক্সির হাতে ছোরা তুলে দিতে পারি কিন্তু কোন অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে সোরিনাম দিতে পারব না। সর্বোপরি ক্যানসার ম্যানেজমেন্ট এই মারাত্মক ব্যাধির একমাত্র প্রতিরোধ, এটা চুরি করার বিষয় নয়।

অসীমবাবু বলছেন, আমি সত্যের আলো দেখেছি আমার এটাই আনন্দ। অসীম জানেন কেউ কেউ হয়ত এই ড্রাগ নিয়ে তন্মিষ্ট গবেষণা চালাচ্ছে। জানেন ওঁর পক্ষে এর বেশি এগোনো সম্ভব নয়। ঐ ম্যাজিক ড্রাগের মধ্যকার অণুদের চেনা, মানবদেহে জিনচক্রে তাদের কাটাকুটি খেলা বোঝা - এটা অতি যত্নসম্মত অতি অর্থবান ইনস্টিটিউটের পক্ষে সম্ভব যা ভারতে দুর্লভ। তার পরের ব্যাপারসাপার যে উনি বুঝছেন না তাও নয়। হারভার্ডের চিফ সার্জন, অধ্যাপক অমিতাভ ঘোষ রায় যখন বলছেন, অসীম সম্ভাবনা রয়েছে ঐ ড্রাগটার মধ্যে - অসীম মর্মার্থ ঠিকই বুঝতে পারছেন। কিন্তু জানেন ওঁর পক্ষে যা করা সম্ভব তা হলো অতি সহজে এই ড্রাগটা তৈরি করা, সম্ভায় ক্যানসার ম্যানেজমেন্ট করা - এটাই ওঁর কাজ সেবা, যাই বলি না কেন।

২

কিভাবে তৈরি হলেন অসীম? একজন সাধারণ মানুষের জীবন, এখনো যিনি মাটির মানুষ হিসেবে নিচতলায় চিহ্নিত - এই জীবনটা অসাধারণ হয়ে উঠছে। ... খুঁজে পাচ্ছি পরিবারের সহায়তা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতা। আরো বড় কথা, ইচ্ছাশক্তি। স্রেফ এটাই। আঙ্কো রুগী দেখতে রুগীর বাড়ি চলে যান, পরিবারের আর্থিকমানসিক অবস্থা বুঝে নেন, পারিশ্রমিকের প্রশ্ন নেই, উন্টে গরীব রুগীর পথ্যটা ওঁকেই জোটাতে হয়। এমন মেঠো মনের চিকিৎসকের সংসার চলে কি করে সেই প্রশ্ন উঠবে। দেখলাম সংসার চলছে পৈত্রিক সম্পত্তি দিয়ে, সমমনস্ক স্ত্রী ও তাঁর পিতামাতার সহায়তাসহদয়তায়। নির্লোভ নিরাসক্ত এই মানুষটির একমাত্র পুত্রসন্তানও শিখে নিয়েছে বাবা নিজের বাইরে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। স্বনির্ভর সমাজ গঠনের প্রসঙ্গে আমরা বলেইছি, আজ যা কিছু করার তা শুরু করতে হবে ব্যক্তিক পারিবারিক স্তর ধরে। এত ধরনের হৃদীয় শেয়ার এত ধরনের অনরন-শিক্ষা-সত্র এত ধরনের জেরঙ্গ-লুটোপুটি এতভাবে সারা বিশ্বকে কলুষিত করে তুলেছে যা রাতারাতি কোন বিপ্লবে মোছা যাবে না - খুবই ছোট ছোট ক্ষেত্র দিয়ে ব্যক্তিপরিবারের সীমানা দিয়ে মানুষসমাজপ্রকৃতির শুভ সম্ভাবনা আনার কাজ করে যেতে হবে। অসীমবাবু ঠিক এটাই করছেন। ওঁর চিকিৎসায় কজন সারল কজন মারা গেল কজন মারা যেতে পারে - এ নিয়ে তর্ক গবেষণা চলছে, বন্ধুদের কেউ কেউ সন্দিহান ওঁর ওষুধ আদৌ কাজ করছে কিনা তা নিয়ে - চলুক তর্ক। যা এর মধ্যেই শিখে নিতে পারব তা হলো ওঁর অভিযান। একটু পেছনে ফেরা যাক।

৩

জন্ম ১৯৫১। সত্তরের অস্থির দিনে ওঁর বয়স আঠারো। এমনকিছু ওঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না যাতে আস্থা রাখা যায়। স্কুল পালানো কলেজ পালানো, এ বিষয় সে বিষয়, কখনো বিজ্ঞান কখনো অর্থনীতি কখনো ম্যানেজমেন্ট কখনো আইন - পাঠ্যবিষয় স্থির করার মত দৃঢ়তা নেই অথচ ওঁর বাবা কিভাবে যেন আশাবাদী। এর অনেক পরে অসীম যখন মেডিকেল শপে বসে দোকানদারি করবেন, বাবা বলছেন, ওটা তোর কাজ নয়, তুই বরং ননকনভেনশনাল হোমিও ড্রাগগুলো নিয়ে দেখ তো, তোকে দিয়ে হতে পারে।

অথচ অসীমদার মধ্যে হবার কোন লক্ষণ দেখছি না। বাবা, রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি তৎকালীন এল এম এফ ডাক্তার, বসিরহাটে পৈত্রিক বাড়ি ও বিপুল জমিজায়গার মালিক। অসীমদা এক ছেলে, দিদি, ইরা চক্রবর্তী, প্রায় বারো বছরের বড়। দিদির ক্যানসার হলো, ওষুধসেবা চলছে কিন্তু দিদি চলে যাচ্ছেন। মারা গেলেন ১৯৭৪ এ, অসীমদা বৌবাজারের মেট্রোপলিটান হোমিওপ্যাথিক কলেজে খোঁজ নিচ্ছেন পড়া যাবে কি না। ভর্তি হলেন। এবং এখানেও ভাললাগছে না। সিম্পটোম্যাটিক চিকিৎসায় যুক্তি পাচ্ছেন না; অর্গানন পড়ছেন, যুক্তিবহ মনে হচ্ছে না, ক্লাস করছেন করছেন না। একটা জিনিস স্পষ্ট হচ্ছে - হোমিও ড্রাগের বিশাল বিচিত্রতা, কফ থুতু ঘা খোসপাঁচড়া টিবি-রুগীর-কফ, গাছগাছালি তো রয়েছেই। এসব থেকে ওষুধ হওয়া - ভাববার কথা। তেমন নিস্পৃহতার ব্যাপারটা চলছে, ফার্মাকোপিয়া নেই, প্যাথলজি নেই, এ কেমন জ্ঞান, এতো হাত দেখার সামিল। অতএব উৎসাহহীনতা।

উৎসাহহীনতা তাই ওঁর বিশিষ্টতা - এমনটাই যেন দাঁড়াচ্ছে। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করলেন হই সেকেন্ড ডিভিসনে। বাবা খুশি। বন্ধুরা নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বন্ধুদের বাঁচাতে অসীমদা তাদের সঙ্গে থাকলেন। এটুকুই। এ সময়টার কথা শুনেছি, মনে হচ্ছে ওঁর ভাললাগার বিষয় ছিল নদীর পার চাষের জমি এবং চাষিভূমি সম্প্রদায়। এই নিচতলার সাহচর্য ওঁকে, নকশাল বন্ধুদের পাশে থাকলে কি হবে, নকশাল আন্দোলনের ধার সম্বন্ধে সন্দিহান করে তুলেছিল। মনে হচ্ছিল, একটা ধারণা ওপর থেকে আসছে যেন, চাষিদের আজন্মচর্চিত অভ্যাসের বদল এভাবে হতে পারে না। কিছু ফলও দেখা যাচ্ছিল, জমিদারি দাপট, সুদখোর মহাজনী প্রথা সরে যাচ্ছিল; কিন্তু চাষিরা তাদের মত করে আসতে পারছিল না, চিনের চেয়ারম্যান কোন যুক্তি কি ভালবাসা কি আবেগে আমাদের চেয়ারম্যান হবেন - এমনটাই যেন কৃষকদের মনে ঠেকেছিল বলে অসীম বুঝছেন।

অর্থাৎ এতেও ভাল না লাগা। পঞ্চাশ পার করা এই মানুষটির মধ্যে দেখেছি প্রচলিত পথ শাস্ত্র সম্বন্ধে ভাল না লাগতে লাগতে একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পথ নির্মাণ করা যা ওঁর ইচ্ছাশক্তি আর বন্ধুদের ওঁর সততার প্রতি আস্থা থেকে তৈরি হয়ে চলছিল।

৪

১৯৭৫ সাল। দিদির ক্যানসার ধরা পড়ল। তৎকালীন যা চিকিৎসা চলতে লাগল। অসীমের মনোযোগ কাড়ল একটি অ্যান্টি-ক্যানসার ড্রাগ - সিকাফেক, হোমিও ওষুধ অ্যালোপাথি

অ্যাডজাস্টমেন্টে তৈরি। তার প্রয়োগ চলছে কিন্তু জরী হচ্ছে ক্যানসারই, দিদি চলে যাচ্ছেন। মাথায় এল দুটি বিষয় - সিকাফেক নাহয় পারল না, অন্যকিছু কি পারতে পারে এবং এই ব্যাধিটা কি যার নাম ক্যানসার।

ভর্তি হলেন মেট্রোপলিটান হোমিও কলেজে। এখানেও ভাললাগছে না। দুবছরের কোর্স শেষ করতে লাগছে চার বছর। যুক্তি নেই শুধু সিম্পটম দেখে শেখা, তবুও হ্যানিম্যানের প্রজ্ঞাকে অন্যভাবে শিখছেন অসীম। চিকিৎসকের হাতচোখনাককান - সব মিলিয়ে চিকিৎসক হবেন একটা বিষয় একটা অতি দক্ষ বিচারক যিনি লহমায় বুঝে নেবেন কি রোগ কোথায় বাসা বেধেছে। এই দক্ষতা না আয়ত্ব হলে সিম্পটোম্যাটিক ট্রিটমেন্টে যুক্তি নেই মুক্তিও নেই। ফাইন্যাল পরীক্ষা। ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। প্রশ্ন এল - আলসার রুগী, কি ট্রিটমেন্ট। অসীম উত্তর করছেন - যদি রাতে প্রকোপ হয় তাহলে সিফিলিনাম ও সোরিনাম, যদি দিনে হয় তাহলে মেডরিনাম ও সোরিনাম। প্রশ্নকর্তা উত্তেজিত। এমন নির্বোধ উত্তর যে দিচ্ছে সে ডাক্তার হয়ে তো মানুষ খুন করবে। স্টান্ডার্ড ওষুধ যখন লাইকোপডিয়াম কি কার্বোভেজ, সেখানে সোরিনাম - যার আবিষ্কর্তা রহস্যময় সেই উক্তি করেন, আমি উন্মাদ কাকির হাতে ছোরা তুলে দিতে রাজি আছি কিন্তু কোন অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে সোরিনাম তুলে দিতে পারি না। এই অর্বাচীন তাকে কিনা আলসারে ব্যবহার করবে? ভয়ঙ্কর উত্তেজিত পরীক্ষক, হবু হোমিওপ্যাথকে ঘর থেকে বার করে দিতে উদ্যত, চিংকার চোঁচামেচি, ঢুকছেন প্রিন্সিপাল, ব্যাপারটা কি - জানতে চাইছেন।

প্রশ্ন শুনলেন, উত্তরও শুনলেন। তিনিও হতাশ এবং ক্রুদ্ধ। তুমি যা বলছ তার পরিণাম জান? অসীম বললেন, জানি।

অঙ্কটা অন্যভাবে ঘটছে। ভাল যে লাগছে না তার উত্তর এভাবে পাচ্ছি যে, তিনি প্রচলিত নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকতে চাইছেন না। তিনি কেণ্টের হোমিও ধারণার সঙ্গে ইতিমধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। সেখানে, কেণ্ট, ওষুধটা যে অবস্থা থেকে তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে অসুখটা যে অবস্থা থেকে এসেছে ও যদিকে যাচ্ছে তার সাদৃশ্য বিচার করে সিম্পটোম্যাটিক ট্রিটমেন্টের কথা বলছেন। সাপ শীতে ঘুমোয়, গরমে জাগে, বর্ষায় হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর - সাপের বিষ থেকে তৈরি ওষুধ, ক্রেটেলাস হ্যারিডাস সেই সেই অসুখে কাজ করবে যারা শীতে চাপা থাকে, গরমে দেখা দেয়, শীতে ভয়ানক হয়ে ওঠে। কেণ্টের জ্ঞান ধরে অসীম প্রশ্নকর্তাদের জিজ্ঞাসা করেন, লোকটির আলসার কেন হলো - সে কি রাতে নেশা করত নাকি দিনের খাদ্যাভ্যাসে গরমিল ঘটছিল? যদি রাত থেকে ব্যাঘাত হয় তাহলে সিফিলিনাম (সিফিলিসের জার্ম থেকে তৈরি ওষুধ - পাঠক আরো এগিয়ে যান), যদি ব্যাঘাত ঘটে দিনের ক্রটি থেকে তাহলে মেডরিনাম এবং দুয়ের ক্ষেত্রে সোরিনাম তো স্বয়ং কেণ্টে প্রদত্ত।

উচ্ছ্বসিত প্রিন্সিপাল। আবেগে বলে ফেলছেন, অন্যতম সেরা চিকিৎসক হবে এই যুবক। কিন্তু অসীম-সুংকটটা তো অন্যত্র। কি হবেন তা অসীম জানেন না। ওঁর প্রশ্ন এখন

দুয়ে - দিদির ক্যানসারে মৃত্যু এবং সিকাফেক যদিবা ব্যর্থ তো অন্যকিছু কার্যকর হলেও হতে পারে। বাবা তো ছেলের হায়ার সেকেন্ডারি পাশেই খুশি। হোমিওপ্যাথি পাশ করতে ঝুঁকি এবার বলছেন, অসীম ননবন্ডেনশনাল হোমিও ড্রাগগুলো নিয়ে দেখ তো কিসে কি হয়। অসীম কেটে মন দিচ্ছেন - রোগ রোগী ওষুধ আর ওষুধের উৎস এক সুতোয় বাঁধা যেন। বিজ্ঞানের যুক্তিতে এটা আঁটছে না। কিন্তু ঐ যে বলা হচ্ছে, চিকিৎসক তাঁর দেহমন প্রয়োগ করে রুগীর রোগ ধরে ফেলবেন, যাকে ক্লিনিক্যাল আই বলেন সব প্যাথির চিকিৎসকেরা, এর একটা দার্শনিক দিক আছে।

অসীম কি করছেন?

৫

অসীম দশটা হোমিও ড্রাগ নির্বাচন করলেন। ১৯৭৯-৮০ সাল। সাপের বিষ থেকে বার করা ক্রোটেলাস হ্যারিডাস, খোসপাঁচড়া থেকে সোরিনাম, টিবি থেকে টিউবারকুলিনাম, সিফিলিস থেকে সিফিলিনাম, কার্ডোয়াস মেরি, মর্গান পিওর ইত্যাদি। এর মধ্যে বিশেষ নজর সোরিনামের দিকে কারণ তার সম্বন্ধে ঐ অদ্ভুত উক্তি।

একদিকে ওষুধ নির্বাচন অন্যদিকে পড়াজানা হলো শুরু। অধ্যাপক রাধেশ্যাম ভক্তের কাছে পাঠ নিচ্ছেন চেস্ট আর ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স বিষয়ে, অধ্যাপক সুবীর দত্ত শেখাচ্ছেন প্যাথলজি, অধ্যাপক বিশ্বপতি মুখার্জির কাছে বায়োকেমিস্ট্রি এবং ক্যানসার বিষয়ে পাঠ নিচ্ছেন অধ্যাপক আর এন ব্রহ্মচারির কাছে। অ্যানাটমির পাঠ জরুরি আর তা কাজ করতে করতে শেখা চলল। এর পরে এক্স রে ও সি টি স্ক্যান দেখে রোগের গভীরতা বোঝার জ্ঞান নিচ্ছেন অধ্যাপক শক্তি ভৌমিকের কাছে। ১৯৮০ থেকে ৮৫ অবধি যা কাজ হলো, দশটা ওষুধের কোনটা কাজ করছে, তার শনাক্তিকরণ। সাপের বিষ কাজ করতে পারে এমন একটা জোরালো অনুমান ছিল কিন্তু তা ব্যর্থ প্রমাণিত হলো, বিষ্ময়কর ক্ষমতা নিয়ে অসীমকে অধিকার করে বসল সোরিনাম।

শেখার দিক দিয়ে সহায়তা করলেন অধ্যাপক অমীয় কুমার হাটি, অধ্যাপক হিরন্ময় কুন্ডু স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ওঁকে কাজ করার সুযোগ দিয়ে। ড্রাগটি নিয়ে প্রাণীদেহে কাজ করার অধিকার মিলল অধ্যাপক মঞ্জু রায়ের কাছে কান্টিভেশন অফ সায়েন্সে। অসীম শিখলেন ক্লিনিক্যাল স্টাডি আর সায়েন্টিফিক স্টাডির ফারাকটা কোথায়, মঞ্জুদিই ওঁকে হাতে ধরিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কাজের সূক্ষ্মতা শিখিয়েছেন তা বারবার ওঁর কাছে শুনেছি। এরপর বেসিক মেডিসিন আর ট্রপিক্যাল মেডিসিনে সেল লাইনে সোরিনামের প্রভাব নিয়ে অনুসন্ধান করলেন অধ্যাপক সৌমিত্র চৌধুরির কাছে। এর মধ্যে চলছে ক্যানসার নিয়ে সবিশেষ পাঠ - পি জি'র অধ্যাপক অনুপ মজুমদার, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক সুবীর গাঙ্গুলি আর মুম্বাই টাটা মেমোরিয়ালের অধ্যাপক দীপঙ্কর দাসগুপ্তের কাছে। প্রধানত ঐরা, এছাড়া আরো অনেকে, যখন যেমন প্রয়োজন তখন

তেমন তেমন মানুষের কাছে গিয়েছেন।

৬

শেখা হিসেবে শেখা নয়, রোগ শিখতে শিখতে রুগীর কাছে প্রধান শেখাটা শিখতে শিখতে বিজ্ঞাননির্ভর পাঠ চলছিল। অনেক হোমিওপ্যাথ অনেক কবিরাজ অনেক অন্টারনেটিভ থেরাপিস্ট বলে থাকেন তাদের চিকিৎসায় ক্যানসার সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে। এদের কজন জানেন ক্যানসারের প্যাথলজি? শিখলেন কাদের থেকে? অসীমবাবু কখনো দাবি করেন না ওঁর চিকিৎসায় ক্যানসার পুরো পরাভূত, কেউ সারছে কেউ সারছে না। স্বপ্ন উনি দেখছেন ঠিকই যে সোরিনাম সেই ম্যাজিক ড্রাগ। কিন্তু উনি বিলক্ষণ জানেন, ক্যানসার একটা মিশ্র ব্যাধি এবং তার বহিঃপ্রকাশ একেকজনের কাছে একেকরকম। তিনি তাই ক্যানসার ম্যানেজমেন্ট বিষয়টার ওপর জোর দিচ্ছেন। কুড়ি বছরের অনুসন্ধান ঠিক কি ভাবে চলল আর ক্যানসার ম্যানেজমেন্ট ব্যাপারটাই বা কি সেটা অতঃপর দেখা যাক।

- প্রথম পর্ব হিসেবে দেখছি ১৯৮০-৮৫র সময়টা - দশটা হোমিও ড্রাগ ঘুরিয়েফিরিয়ে ব্যবহার চলছে, সবশেষে সোরিনাম সঠিক হয়ে আসছে। দ্বিতীয় পর্ব ১৯৮৬-৯৭ অবধি চলছে। প্যাথলজি দেখে ক্যানসার শনাক্ত করার পর রুগী সাধারণত কেমনে কি রেডিয়েশন থেরাপি নিতে যান। রোগের স্তর যখন কার্নোপক্সি স্টেজে ৫০ এর নিচে নেমে যায় অর্থাৎ ই সি ও জি স্কোরে ৩ বা ৪ এ পৌঁছে যায় তখন চিকিৎসাশাস্ত্রমতে কেমনে কি রেডিয়েশন থেরাপি রুগী সহ্য করতে পারে না, রুগী তখন টার্মিনাল পেসেন্ট বা নো-হোপ পেসেন্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যান। এসময়ের চিকিৎসা হলো, ক্যানসার কোষেরা তো নির্বোধের মত আশ্রয় ও খাবারের সন্ধানে ফাঁকা জায়গার খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছে, তারা জায়গায় জায়গায় কলোনি বানিয়ে রক্তের প্রবাহকে (ওটাই ওদের খাবারের জোগানদার) নিজেদের কলোনিতে ঠেলে ঢোকাচ্ছে অথবা নিজেরা রক্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, সুবিধেমত অন্য
- জায়গায় আখড়া গড়ছে - ফলত, দেহের রস ও রক্তক্ষরণ একটা সমস্যা, ঘন ঘন জীবাণু সংক্রমণ, খাদ্যনালীতে আখড়া বানিয়ে খাদ্যদ্রব্য ঢুকতে বাধা দেয়া, বাধা অন্যান্য স্থানেও একই কারণে দেয়া। কলোনিগুলো যখন হাড়ে ঢুকছে অথবা দেহের একেকটা অংশের জন্য নির্দিষ্ট স্পেশে ঢুকছে তখন আসছে ব্যথা, অস্বাভাবিক যন্ত্রণাময় সেই ব্যথা - এগুলো ক্যানসারের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে, আসবেই এরা। অন্টারনেটিভ মেডিসিনের কোন বিজ্ঞ যখন দাবি করেন যে তাঁর টোটকায় ক্যানসার সেয়ে গেছে তার ব্যাখ্যা একটাই হতে পারে - তিনি ভাল করে জানেন না প্যাথলজিক্যাল ক্যানসার বিষয়টা কি। অসীমবাবু যখন দ্বিতীয় পর্বে কাজ করছেন, রুগী পাচ্ছেন সাধারণত টার্মিনাল স্তরের, হয় গরীব রুগী নাইয় কোন ইনস্টিটিউশনের চিকিৎসক বন্ধুর থেকে পাওয়া রুগী যার আর কোন আশা নেই, বন্ধুরা বলছেন শেষ চেষ্টা একবার করে দেখতে পারেন। এখিকালি একজন অ্যালোপ্যাথ ফার্মাকোলজিহীন ড্রাগ নিতে বলতেও পারেন না। এইসব পেসেন্ট পাচ্ছেন অসীম, প্রযুক্ত

হচ্ছে সোরিনাম, কিন্তু নির্বোধ ক্যানসার কোষেরা টার্মিনাল হতভাগ্যদের সারা শরীরে যে ছেয়ে গেছে, ফলে রসরক্তক্ষরণ কি যন্ত্রণা কি খাদ্যনালী আটকে যাওয়া কি জীবাণু সংক্রমণ কি কোন কোন প্রত্যঙ্গের অকেজো অবস্থা - এগুলোর মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই পর্বে অসীম যা পেলেন তা হলো - কেউ কেউ সারছেন, এমন অনেক ঘটছে যারা সম্ভাব্য মারা যাবার থেকে বেশি বাঁচছেন কিন্তু অন্য কোন ব্যাধির কবলে পড়ে মারা যাচ্ছেন। ওঁর যখন চিকিৎসা-কর্ম চলছে তখন কেমো বা রেডিয়েশন দেয়া হয় নি, ক্যানসার-কোষ যদি হাড়ে চলে যায় একমাত্র তখন রেডিয়েশন দেয়া হয়েছে (এই সময় রেডিয়েশন ভাল ফল দেয়)। তিন, উনি যে ধরনের ক্যানসার নিয়ে কাজ করতেন তারা হলো - লাঙ, লিভার, গল ব্লাডার, স্টমাক, প্যানক্রিয়াস, কোলন রেঙ্কাম, ওরাল - বাদবাকি অংশের ব্যাধিতে কাজ করেন নি। এই সব ক্যানসার নিয়ে কাজ করার বিশেষত্ব হলো, এসব অঞ্চলের সার্জারি চলে না, কেমো রেডিয়েশনের খুব একটা ভূমিকা নেই, খুব দ্রুত কার্নোপক্সি স্কেলে ৫০ এর নিচে নেমে যায়, এই অঞ্চলে ক্যানসার হওয়া রুগীর সম্ভাব্য আয়ু ছ'মাস তাই তা পার করতে পারলে গবেষণার সুযোগ বেড়ে যায়, এই সব ক্যানসার মোকাবিলা করার ব্যক্তি বেশি তাই খুব কম রুগী থাকলেও শেখার সম্ভাবনা অনেক বেশি হয়ে যায়। কার্যত এই পর্বেই অসীম ক্যানসার ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি আয়ত্ত্ব করেন। শুধু সোরিনাম নয়; রসরক্তক্ষরণে, জীবাণু সংক্রমণে, খাদ্যপুষ্টির প্রশ্নে, হঠাৎ হঠাৎ কোন প্রত্যঙ্গে বাধা, সর্বোপরি ব্যথা - অসীম আজ জ্ঞানেন কোন সমস্যায় কি করতে হয়। আরো বড় কথা, জীবাব পাওয়া রুগীর পাশে থাকা; তারো বড় কথা, রোগটিকে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ফেলা - রিজ্ঞাওলার ক্যানসার হয়েছে, তার পাশে কতটা থাকব কখন তার মৃত্যু কামনা করব - অসীম এর উত্তর জেনেছেন। ১৯৯৮ সাল থেকে আর একটি কাজ শুরু করেছেন, কেমো বা রেডিয়েশন দেয়া হয়েছে - এর সঙ্গে সোরিনাম কি ফল আনতে পারে তার কাজ চলছে। যদিও অসীমবাবুর মত, এতে আশানুরূপ ফল আসছে না। ২০০০ সাল থেকে আরেকটি কাজ শুরু হলো - কেমো অ্যাডজাস্টেড সোরিনাম প্রয়োগ ও তার ফলাফল খতিয়ে দেখা, অর্থাৎ কেমোর সঙ্গে সোরিনাম মিশিয়ে বোঝা।

জ্ঞানতে চেয়েছিলাম, শুধু সোরিনাম কতটা এফেকটিভ, অলটারনেটিভ মেডিসিনের কার্যকারিতা যাচাই করা যাবে কি করে। দুয়ের উত্তর এক জায়গা থেকেই আসছে। ক্যানসার যে কতক নির্বোধ কোষ তৈরি করে তাদের লাগামছাড়া ভাঙচুড়ের দ্রুত ধ্বংসনামা হতা যেমন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এও তো ব্যাপার যে ইনফেকশন হবে, রসরক্ত বেরোতে থাকবে, একেকটা প্রত্যঙ্গ কাজ করতে বাধা পাবে, ক্যানসার ছড়িয়ে যাবে, ব্যথা দুঃসহ হয়ে উঠবে - এই গোটা ব্যাপারটা মনিটর করতে হবে, হবেই, তাই কোন একক ওষুধ সব দুরবস্থাকে কখনোই সারিয়ে তুলতে পারবে না। এবং যে কোন ওষুধ, সে যে সোর্স থেকেই আসুক, তাকে চলতি বিজ্ঞানপ্রযুক্তি মেনেই আসতে হবে। অসীমদা জোর দেন প্যাথলজির ওপর - প্যাথলজি বলবে ক্যানসার হয়েছে প্যাথলজি বলবে ক্যানসার সেবেছে,

তৃতীয় বিশ্বে ক্যানসার চিকিৎসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা

অসীম চট্টোপাধ্যায়

ক্যানসারের নাম শুনলেই অনিবার্য এক মৃত্যুর অনুবঙ্গ মনে আসে। বায়োপ্লি রিপোর্টে যখন রুগীকে ক্যানসার রোগাক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তখন রিপোর্ট গ্রহণকারী রুগীর প্রিয়জনদের প্রথম থেকেই চেষ্টা থাকে কি করে আসল কথাটা রুগীর কাছ থেকে গোপন রাখা যায়। সবাই ভাবেন মৃত্যুর পরোয়ানা না জানানোই মঙ্গল। পরিণত বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী একথা জ্ঞানার পর আত্মীয়স্বজনরা হয়ত বা এই আঘাত সহ্য করার মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকেন বা পারেন। তবুও প্রতি মুহূর্তে এই অনিবার্য পরিণতির কথা মাথায় রেখে চিকিৎসা চালানো বড় সহজ কাজ নয়। আর সেটা প্রায় অসম্ভব এবং অনেক বেশি দুঃসহ যখন রুগী হয় অল্পবয়সী, কি ছোট্ট শিশু, কখনও ছোট্ট শিশুর বাবা বা মা এবং যিনি সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। সব কিছুর বিনিময়ে এমনকি ভিটেমাটি, জীবনের শেষ সম্বল বিক্রি করেও চলে রুগীর জীবন বাঁচানোর প্রাণান্তকর প্রয়াস। এর মধ্যে অস্থিরচিন্তার কারণে চিকিৎসার বেশির ভাগটাই হয়ে থাকে এলোপাথারি চিকিৎসা। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সামাজিক পারিবারিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে এবং ক্যানসার রোগের ওষুধের পার্শ্বক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দিক ধরে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও রুগীর আত্মীয়বর্গের দ্বারা সমস্যাগুলিকে সঠিক অনুধাবন করা ও তদনুযায়ী কাজ করতে থাকা।

রুগীর ক্রমহ্রাসমান জীবনীশক্তি, তার আত্মীয়বর্গের সীমাবদ্ধ অর্থবল লোকবল, সর্বস্ব পণ করেও রোগ আরোগ্যের অনিশ্চয়তা এবং যেহেতু এখনো রোগ নিরসনের প্রকৃত কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি তাই সমগ্র পরিস্থিতি স্বভাবতই এক সর্বনাশা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। অবশ্য এর মধ্যেও একটা আশার কথা এও যে রোগের প্রকৃত ওষুধ আবিষ্কারের জন্য পৃথিবী জুড়ে নিরন্তর গবেষণায় যুক্ত রয়েছেন অসংখ্য গবেষক নানা প্রচলিত ও অপ্রচলিত পদ্ধতির ব্যবহার করে।

কিন্তু যতদিন না এই রোগমুক্তির ওষুধ আবিষ্কৃত হবে ততদিন পর্যন্ত এই রোগাক্রান্ত মানুষজনদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পরিবারগুলি যাতে বিভ্রান্তি না হয়ে যায় সেজন্য কি কিছু সদর্থক চিন্তাভাবনা করা যায় না? মনে হয় ওষুধ আবিষ্কারের গবেষণার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণে রেখে দায়িত্ববান চিকিৎসকদের এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

এ রোগের চিকিৎসায় স্বীকৃত ও প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে সার্জারি রেডিয়েশন থেরাপি কেমোথেরাপির সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং তার জন্য কি পরিমাণ

আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন এবং তার দ্বারা রোগের কতটুকু উপশম হতে পারে, রোগীর জীবন যন্ত্রণাহীনভাবে কতটা দীর্ঘায়িত হতে পারে এ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা রুগীর পরিবারবর্গকে অবশ্যই দেয়া প্রয়োজন যাতে অর্থবল লোকবল এবং অন্যান্য পারিবারিক দায়দায়িত্বের কথা মনে রেখে পরিবারটি তাদের স্পর্শকাতর মানসিকতা কাটিয়ে উঠে বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে অবশ্য প্রতিটি চিকিৎসকের মহান কর্তব্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রুগীর জীবন রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তাই রুগীর আর্থিক সঙ্গতি বা তার পরিবারের দায়দায়িত্বের কথা খেয়াল রেখে চিকিৎসকের যৌক্তিক সিদ্ধান্তকে পাশ্চাত্যের প্রচেষ্টা ঐ মহান ঐতিহ্যের পরিপন্থী কিনা সেটা ভাববার বিষয়। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য সংক্রান্ত বিষয়টিকে ক্যানসার চিকিৎসার মধ্যে না আনলে সার্বিক দায়িত্বের প্রকৃত মর্মার্থ অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

যে দেশে মুমূর্ষু রোগীকে পরিশ্রুত জল যোগানো সবসময় সম্ভব হয় না, ঘন ঘন দান্ত হওয়া রোগীর শরীরে ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স রাখতে বিকল্প হিসেবে নুন চিনির জল খাইয়ে রাখতে হয়, একশো শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে পাঁচশো রুগী থাকতে বাধ্য হয় সেই প্রেক্ষাপটে ক্যানসারের মতো জটিল আর ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসায় চিকিৎসককে অবশ্যই রুগীর আর্থিক সামর্থ্যের কথা মাথায় রেখে ওষুধ দিতে হবে আর প্রকৃত সমাজসেবীর ভূমিকায় আসতে হবে। একথাও মনে রাখা দরকার যে সমগ্র চিকিৎসক সমাজের মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশই ক্যানসার চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেছেন। একথা তাঁরা ভাল করে জেনেবুঝেই এসেছেন যে আজ পর্যন্ত এই কালান্তক ব্যাধিটির নির্দিষ্ট কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি। কতকগুলি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই রোগের কিছুটা উপশম সম্ভব হতে পারে এবং ব্যাধিটির প্রকারভেদে রুগীর জীবন স্বল্প বা দীর্ঘ হতে পারে। এই রোগের চিকিৎসা হিসেবে আজ পর্যন্ত যতগুলি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার কোনটাই শতকরা একশোভাগ সাফল্যের দাবি করে নি এমনকি শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি সাফল্যের দাবিদারও কোন পদ্ধতিতে নেই। অর্থাৎ সার্জারি রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি বা অপ্রচলিত কোন ওষুধ প্রয়োগ যাই হোক না কেন সবগুলির পাশাপাশি সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ সময়মত আলট্রাসোনোগ্রাফি এন্ডোস্কোপি রক্তের ও শরীরের নানা অংশের পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যেতেই হবে আবার তরল খাদ্য, রক্ত, গ্লুকোজ, স্যালাইন ইত্যাদি দেয়ার ব্যবস্থা রাখতেই হবে।

এ সবার বন্দোবস্ত না রাখতে পারলে দশ লাখ টাকার ওষুধ কিনলেও রুগীর জীবন দীর্ঘায়িত করা যাবে না এই সত্যটি সকলেরই জেনে রাখা দরকার। এই ব্যয়সাধ্য ওষুধ কিনে ফতুর হবার আগে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলিকে অব্যাহত রাখতে বিচক্ষণতার প্রয়োজন। আর চিকিৎসকের পরামর্শ একমাত্র ভরসা। রুগীর জীবন প্রলম্বিত করার তাগিদে এসব আর্থিক সঙ্গতির ব্যবস্থা রেখেই চিকিৎসককে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমাজমনস্ক মানুষের

ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে তার চিকিৎসা বিষয়ক আদর্শটিও না বিচ্যুত হয়।

এ দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয় যে যথেষ্ট ব্যয়বহুল কোন একটি ওষুধের ডোজের জন্য শেষ সম্বলটুকু খোয়ানোর পর রুগীকে প্রয়োজনীয় পথ্য ও রক্ত জোটাতে না পেলে তার মৃত্যু দ্রুততর হয়ে গেছে। এসময় মনে হয় ওষুধ প্রয়োগের আগে চিকিৎসকের পক্ষে সার্বিক পরামর্শের যে দায়বদ্ধতা ছিল সেটা অবহেলিত হয়েছে। আমাদের সমাজে এইসব অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের মনে এমনই ভীতি ও আশঙ্কার সঞ্চার করে যে এ থেকে প্রায়ই অনেক অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে থাকে।

বহুরথানেক আগে কলকাতার একটি নামী বিদ্যালয়ের ত্রিশোৰ্ধ শিক্ষক মহাশয়ের ব্যায়োজ্ঞিতে ক্যানসার ধরা পরার পর জীপুত্রের ভবিষ্যত বিপন্ন হবার শঙ্কায় তিনি সমস্ত বিষয়টি চাপা রাখেন এবং কাউকে না জানিয়ে ক্রমে ক্রমে বিনা চিকিৎসায় জীবন শেষ করেন। তাঁর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু কম ছিল না। যাদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি জীবন দিলেন তাদের সঙ্গে আর কটা দিন বেশি কাটাবার আকাঙ্ক্ষা থাকাটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে ক্যানসার চিকিৎসা পদ্ধতির কোন আশ্বাস তাঁর সামনে না থাকায় তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন। এরকম ঘটনা কত ঘটছে কে তার হিসেব রাখে।

আসলে ক্যানসারের ব্যাপারে একটা গোড়ার কথা আমাদের অনেকেই জানা নেই, যা হচ্ছে প্রায় সব অসুখ সর্বদা একরকম কিন্তু ক্যানসার বিভিন্ন ধরনের। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য চিকিৎসাতেই তা সারছে কি রুগী দীর্ঘদিন বাঁচছে, আবার কিছু ক্যানসার আছে যেখানে প্রচলিত অপ্রচলিত সব চিকিৎসা করেও রুগী বেশিদিন বাঁচে না। যদিও টিভি রেডিও মারফৎ বলা হয় যে প্রাথমিক পর্বে ক্যানসার ধরা পড়লে চিকিৎসা করলে বাঁচা যায় কিন্তু এটি সর্বতোসত্য নয় - কিছু কিছু অঞ্চলে ক্যানসার যে পর্বেই ধরা পড়ুক না কেন যেমন প্যানক্রিয়াসে কি যকৃতে, তাতে প্রচলিত বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করলেও বেশিদিন বাঁচানো যায় না।

এ কারণেই বোধহয় আমাদের আগে জানা দরকার যে শরীরের কোন কোন অংশে ক্যানসার হলে বেশিদিন বাঁচানো সম্ভব আর কোথায় ক্যানসার হলে তা অসম্ভব। এর সঙ্গে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ - কোন কোন জায়গায় ক্যানসার হলে কি কি সমস্যা আসতে পারে। খুব খারাপ জায়গারা যেমন, লিভার, প্যানক্রিয়াস, গল ব্লাডার, স্টমাক, খাদ্য নালী কি ব্রেন টিউমার। আবার কয়েক জায়গায় ক্যানসারের চিকিৎসার ফল খুব আশাব্যঞ্জক যেমন, শ্বাসনালী, জরায়ু, স্তন, ডিম্বকোষ, মূত্রস্থলী, প্রোস্টেট, অন্ডকোষ ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথমোক্ত অঞ্চলগুলিতে ক্যানসার হলে অবস্থাভেদে আয়ু ছমাস থেকে দেড় বছর। এই নিশ্চিত পরিণতি সত্ত্বেও কি পরিমাণ অর্থ শ্রম ও লোকবল ব্যয় করা হবে এই কথাটি কিন্তু আঙ্গ ভাবা দরকার। আবার পরবর্তীগুলির ক্ষেত্রে আয়ু অত ক্ষীণ হবার সম্ভাবনা কম বা বাঁচার সম্ভাবনা বেশি। এমনকি ১৫-২০ বছর পর্যন্ত বাঁচার সম্ভাবনা

আশা করা যায়। স্বভাবতই এসব ক্ষেত্রে চেষ্টা সর্বাধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চিকিৎসার ব্যাপারে বলতে গেলে রেডিয়েশন থেরাপি সাধারণত সরকারি সাহায্যে দেয়া হয়ে থাকে এবং মোটামুটি কম খরচে সেটা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কেমোথেরাপির ওষুধ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে কিনতে হয়। আমরা দেখেছি কেমোর ওষুধ অল্প দামের পাওয়া যায় আবার বেশি দামেরও পাওয়া যায়, কিন্তু যতদূর জেনেছি যে ফুল-উভয়দামের ওষুধের ক্ষেত্রেই প্রায় সমান।

গোদের ওপর বিষফোড়ার মত আবার রয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীন মিডিয়া থেরাপি। রোগ সারিয়ে দেবার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টিভিরেডিওকাগজে বিজ্ঞাপন। মৃত্যুপথযাত্রী রুগীর বাঁচার ইচ্ছে কতটা প্রবল তা সহজে অনুমেয় - রুগীর এই মানসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে যারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই কুৎসিত কাজ করে পয়সা লুটতে চান তাদেরকে সমাজবিরোধী আখ্যা দেয়াই সঙ্গত। যদি সত্যিই এই রোগ নিরাময়ের কোন ওষুধ জানা থাকে তাহলে স্টোকে পেটেন্ট করে নিয়ে তারা মেনস্ট্রিম গবেষণায় আনছে না কেন? সেই ওষুধে সফলতা এলে তো তাদেরও অর্থোপার্জনের সুযোগ এবং সমগ্র মানবজাতিরও উপকার।

উপরে বলা সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে গোটা চিকিৎসক সমাজের কাছে আমার একটি বিনয় আবেদন আছে। ক্যানসার রোগ সম্বন্ধে নানা ভুল ধারণার ফলে রোগীর চিকিৎসা বিস্মৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিকিৎসকের ছদ্মবেশে অর্থলোলুপ একদল মানুষ যারা চিকিৎসার নাম করে নানা ছুতোয় অর্থ শোষণ করে চলেছে নীতিহীনভাবে। যদিও এর পাশাপাশি সংবেদনশীল লড়াইকু অসংখ্য মানবদরদী চিকিৎসকও রয়েছেন যাদের কথা আমরা শ্রয়ণে নিয়মিত পাই।

জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও যেসব চিকিৎসাবিজ্ঞানী এই রোগের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য নিরন্তর গবেষণায় রয়েছেন, এই কঠিন সময় তাঁদের আরো একটি বাড়তি দায়িত্ব অর্পণ করেছে - সেটি হলো, ক্যানসার রুগীর সর্বাঙ্গীণ পরিচর্যা। অর্থাৎ রুগীর রোগের অবস্থা নিরূপণ করে আর্থিক সংগতি পারিবারিক দায়বদ্ধতা শারীরিক সক্ষমতা প্রয়োজনীয় খাদ্যরক্তস্যালাইনপ্লুজ ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা ও অন্যান্য পরীক্ষানিরীক্ষা করার সক্ষমতার দিকে নজর দিয়ে রুগীকে সুস্থ করে তোলার দিকে সুনজর দেয়া।

পরিশেষে আরেকটি কথা - একটা ক্যানসার রুগীর বাড়িতে তো শুধু রুগীই থাকে না, তার স্ত্রী বা স্বামী, বাবা-মা, পুত্রকন্যা, ভাইবোনও থাকে। সবাইকে নিয়েই তো সংসার। এখানে যদি এমন হয় যে রুগী নিশ্চিতভাবেই মৃত্যুপথযাত্রী সেক্ষেত্রে সব অর্থ তার পেছনে শেষ করাটা কতখানি যৌক্তিক সে কথাটাকেও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার সময় এসে গেছে।

(কৃতজ্ঞতা - ডা. অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, পুস্পেন ভৌমিক, অরদীপ চট্টোপাধ্যায়)

যৌথ প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনা

আনন্দমোহন কর

শ্রয়ণের বর্ষ ৭ সংখ্যা ১ এর বিশ্বায়ন: বিজ্ঞান ও কৌশল সংখ্যায় সমাজের সম্ভাব্য সংকটের আলোচনার শেষে বলেছিলাম আজ সময় এসেছে এক সাদাসিঁদে জীবনযাত্রার কথা পৃথিবীর মানুষের ভাববার, বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে। কেন উন্নত বিশ্বে? সেক্ষেত্রে উল্লেখ করেছিলাম গিডেনস'এর উক্তি আর গোদিনের কথা। তাঁদের বক্তব্য যে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয় যদি রোধ করতে হয় তবে ধনীদেশের জনসাধারণকে ভোগবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং এ থেকে বেড়িয়ে এসে ফিরে যেতে হবে সহজ সরল জীবনযাপনে। গিডেনস'এর কথায় -

given the vast global inequalities, there is little chance that the poor third world countries will sacrifice economic growth on their own part because of environmental problems created largely by the rich ones. Yet the earth does not seem to possess anywhere near sufficient resources for everyone on the planet to live at the standard of living most people in the industrialised societies taken for granted. Hence if the impoverished sectors of the world are to catch up with the more favoured ones, the richer countries are likely to have to revise their expectations about constant economic growth (Giddens:1996).

কিন্তু কেবল উন্নতদেশের মানুষদের প্রকৃতিপ্রেমী জীবনযাত্রায় ফেরার অপেক্ষায় হাপিতোশ করে বসে থাকলে তৃতীয়বিশ্বের চলবে না। ধনীদেশগুলোতে এধরনের ভাবনা এসেছে ভোগবাদী সাংস্কৃতিক পরিবেশে পুঞ্জিবাদের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের ফলে উদ্ভূত সংকটের আশঙ্কা। কিন্তু অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের যুগে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি গরীব মানুষের কাছে - বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোর কাছে এসেছে আরো গভীর সব সমস্যা - কাজ না পাবার সমস্যা, কাজ হারাবার সমস্যা, দারিদ্রের অতল আঁধারে হারিয়ে যাবার সমস্যা। বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, পশ্চিমবঙ্গেই বোঝা যায় এই পরিস্থিতি। নাগরিক মঞ্চের 'পশ্চিমবঙ্গ অন্য চোখে - একটি আর্থসামাজিক প্রতিবেদন' থেকে দেখা যাচ্ছে কাজ পাওয়া শ্রমিকের তুলনায় কাজ হারানো শ্রমিকের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। সুতরাং আজকের দিনে, বিশেষ করে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে মুক্ত বাজার অর্থনীতির ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দূষণের হাত থেকে বাঁচতে চাই এমন এক স্বনির্ভর কর্মনীতি যা গড়ে উঠবে প্রকৃতিকে ভিত্তি করে প্রকৃতিকে সংরক্ষণের সংকল্প নিয়ে। এভাবে স্বনির্ভরতা আসতে

পারে তখনই যখন সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাদের পুনরুৎপাদন ব্যাহত না করে। অন্যথায় সাস্টেনেবল ডেভলপমেন্ট হয় না। বর্তমান সময়ে একদিকে যেমন সুযোগ এসেছে প্রাকৃতিক সম্পদের নানাভাবে ব্যবহারের তেমনি চিরাচরিত জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে আধুনিক গবেষণা নিয়ে এসেছে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের সম্ভাবনা। এই দুয়ের মিলনের প্রয়াস চলেছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে, পশ্চিমবঙ্গেও।

বর্তমানে উদ্ভিদবিজ্ঞানী থেকে শুরু করে সমাজতত্ত্ববিদ পর্যন্ত অনেকেরই গবেষণার বিষয়বস্তু হলো বায়োমাস (Biomass) অর্থনীতি। এই অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল মানুষদের গ্যাডগিল ও শুহ অভিহিত করেছেন eco-system আখ্যায়। এরা গরীব মানুষ। জীবিকানির্বাহের জন্য প্রায় পুরোপুরি চারপাশের প্রকৃতির ওপর নির্ভর। তাদের সমস্ত প্রাথমিক প্রয়োজন, যেমন - খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানী কাঠ, গোবর, জৈব সার, পাতা, গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ, আসবাব তৈরির কাঠ, ভেষজ দ্রব্য - সবই প্রকৃতির দান। এই মানুষদের সংখ্যাকে অবহেলা করার উপায় নেই। গ্রামীণ ভারতের কমবেশি সমস্ত পরিবারই এই বায়োমাস অর্থনীতির আওতায়। এর মধ্যে আছে ১০ কোটি বনবাসী। রয়েছে আরো ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ যারা তাদের জীবনযাপনের অনেককিছুই আহরণ করে অরণ্য থেকে। সম্প্রতি বাঁকুড়ার জঙ্গলে কাজ করত্রে আসা এক অস্ট্রেলীয় গবেষক বলেছেন যে এরা যদি আলাদা এক দেশ গড়ত, তাহলে লোকসংখ্যার বিচারে চীন ও অবশিষ্ট ভারতের পরেই হতো তাদের স্থান। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাজেটে এদের জীবনযাত্রার বিষয়টি অনেকখানিই উপেক্ষিত।

এই অবহেলার ফল হতে পারে মারাত্মক। গ্রামাঞ্চলের প্রায় সমস্ত পরিবার বায়োমাস অর্থনীতির ওপর কমবেশি নির্ভরশীল হলেও যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বা কাছাকাছি, তাদের মধ্যে এই প্রকৃতি নির্ভরতার পরিমাণ বেশি। যেমন - মহিলা, তপশিলি জাতি এবং বিশেষ করে উপজাতির মত সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষজন। প্রকৃতির ওপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এরা সাধারণত বাস করে দুর্গম অঞ্চলে যেমন পাহাড় জঙ্গল প্রভৃতি স্থানে। ঘন লোকালয় বা বাণিজ্যিক অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন এসব অঞ্চলে অন্যান্য জীবিকা নির্বাহের সুযোগ কম। সেখানে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পগুলো ঠিকমত পৌঁছয় না, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগও নয়। প্রকৃতিনির্ভর এই অর্থনীতির আর্থসামাজিক মূল্যও অপরিসীম। যখন কাজের মরসুম চলে যায়, এই প্রকৃতিনির্ভর অর্থনীতিই তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে স্যোসাল সেফটি নেট হিসেবে। সেজন্য দারিদ্র্যের মাত্রার সাথে এই প্রকৃতিনির্ভর সম্পর্কটি অনেকেরই গবেষণার বিষয়। আশির দশকের মাঝামাঝি ভারতের সাতটি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর রাজ্যের ১২টি জেলায় সমীক্ষা চালিয়ে যোদ্ধা দেখলেন যে, যে সমস্ত পরিবার গরীব নয় তাদের ক্ষেত্রে বায়োমাস অর্থনীতি থেকে আয়ের পরিমাণ মাত্র ১ শতাংশ এবং ৮-৩২ শতাংশ এসেছে এই অর্থনীতি থেকে। কিন্তু অন্যদিকে গরীব পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে জ্বালানীকাঠের ১১-১০০ শতাংশ ও ইন্ধনের ৬৬-৮৪ শতাংশ সরবরাহ করেছে এই প্রাকৃতিক অর্থনীতি।

সমীক্ষায় প্রকাশ যে পশ্চিমবঙ্গে ৬ সবচেয়ে গরীব অংশের ১০-২৫ শতাংশ আয় আসে এই অর্থনীতি থেকেই। মহিলারা দৈনিক গড়ে ১-৫ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করেন এই অর্থনীতিতে কাজ করে নানান বনজ সম্পদ আহরণে। পশ্চিমবঙ্গে ১৮৯ রকমের নন-টিম্বার-ফরেস্ট-প্রডাক্ট পাওয়া যায়। স্থানীয় জীবনযাত্রার বাইরেও এর ব্যবহার নানাবিধ।

যৌথ বন পরিকল্পনা : ইতিহাস

ইংরেজ আসার আগে ভারতের অরণ্যবাসী জনজাতিদের কাছে বনের বাণিজ্যিক কদর ছিল না। ইংরেজ শাসকেরা বনজঙ্গল দখল করে জমিদারঠিকেন্দারদের সঙ্গে রফা করলেন। শুরু হলো গাছ কেটে বাজারে চালান। রক্ষা পেল না বাংলার উত্তরের ডুয়ার্সের জঙ্গল, দক্ষিণের সুন্দরবন, পশ্চিমে জঙ্গল মহল। প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণের পাশাপাশি বনবাসী মানুষের ওপর দীর্ঘস্থায়ী অত্যাচার ও শোষণের পালা শুরু হলো। কিন্তু ইংরেজরা চলে যাবার পরেও স্বাধীন ভারতবর্ষে অরণ্যের বাণিজ্যিক শোষণ পদ্ধতি রইল অপরিবর্তিত। সারা ভারতবর্ষেই প্রায় এক ছবি। বনদপ্তরও পারে নি তাদের ঔপনিবেশিক চরিত্র বদলাতে। বনবাসী মানুষেরা উচ্ছেদ হতে লাগল তাদের আবহমান বাসভূমি থেকে। বন কেটে প্রথমে ঠিকাদারদের ও পরে বনদপ্তরের মাধ্যমে কাঠের রমরমা ব্যবসা চালু রইল।

ভেবে দেখা হলো না যে এই মানুষরা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রহরী। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই বন এলাকায় ৬০ লক্ষ মানুষের বাস। সরকার বুঝতে পারলেন না যে, আবহমানকাল ধরে বনবাসী মানুষেরা যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করেন তাই নয়, তারা বনকে দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা দিতে পারেন। বনের সঙ্গে এত নিবিড় সে যোগ।

অনেক পরে হলোও শেষ পর্যন্ত সরকার অনুধাবন করলেন বনবাসী মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে বনরক্ষা সম্ভব নয়। ভারতে জাতীয় বননীতি গৃহীত হলো ১৯৮৮ সালে। এতে বলা হলো অরণ্য সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসীদের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণ করার কথা। তাদের প্রথাগত অধিকারকে গুরুত্ব দেয়া। দুবছর পরে ১৯৯০ সালে ভারত সরকারের এক সার্কুলারে প্রস্তাব এল স্থানীয় গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে খয়ে যাওয়া বনভূমি পুনরুদ্ধারবনের। এই নীতিই যৌথ বন পরিচালনার দিকে যাবার পদক্ষেপ। ১৯৯২ সালে জাতীয় সংরক্ষণ নীতিতে এই ৮৮ সালের বননীতিকেই সমর্থন করা হয়। কিন্তু ১৯২৭ সালের অরণ্য আইনকে তখনো সংশোধন করা হয় নি - যা কোনভাবেই যৌথ পরিচালনার ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক নয়। যাই হোক, বর্তমানে বিশেষজ্ঞ ও বনদপ্তরের ধারণা সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনে এবং পঞ্চায়েত প্রসারলাভের ফলে বনসৃজন পরিকল্পনা এগোচ্ছে। ১৯৯০ এর পর থেকে গোটা দেশে চালু হয়েছে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট। অনেকের অনুমান এই যৌথ বন পরিচালনার ধারণাটি এসেছে মূলত পশ্চিমবঙ্গ থেকে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭০ এর শুরুতে আরাবারি পরীক্ষার মাধ্যমে যৌথ বন পরিচালনার

সূত্রপাত। আরাবারি একটি রেশম সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্র। অবস্থান মেদিনীপুর থেকে ২০ কিমি দূরে। সেখানে গবেষণা ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছিল স্থানীয় মানুষের গোচারণ ও জ্বালানীকাঠ কাটার ফলে। শেষ পর্যন্ত মুখ্য আধিকারিক আশেপাশের এগারোটি গ্রামের বাসিন্দের সাথে এক সমঝোতায় এলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন গ্রামবাসীদের সর্বশেষ উৎপাদন থেকে আয়ের ২৫ শতাংশ দেবার। আর স্থানীয় বাসিন্দারাও কথা দিলেন গবেষণার কাজে কোন বাধা সৃষ্টি না করার। স্থাপিত হলো প্রথম অরণ্য রক্ষা কমিটি আর এই সহযোগিতার মধ্যেই সুপ্ত ছিল ভবিষ্যতের যৌথ বন পরিচালনার বীজ।

ধীরে ধীরে এ ধরনের একের পর এক প্রকল্প গড়ে উঠল রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে। সরকার খুঁজে পেলেন উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকৃত এক পথ। কিন্তু সমস্ত বনরক্ষা কমিটি ছিল একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া সামগ্রিক বন পরিচালনায় তাদের বিশেষ গুরুত্বও ছিল না। ১৯৮০ সালের বন সংরক্ষণ বিলে অতীতে জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রাখার যে প্রবণতা ছিল তার থেকে কিছুটা হলেও সরে আসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে এই বিলেও স্থানীয় চাহিদা অপেক্ষা জাতীয় প্রয়োজন অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাথে বনদপ্তরের মুনামা ভাগাভাগীর ব্যাপারে দুদিকে উৎসাহ থাকলেও মূলত তা ছিল ব্যক্তি বন-আধিকারিকের সাথে গ্রামবাসীদের সমঝোতা। অধিকাংশ সময়েই এইসব আধিকারিকের কোন একটি অঞ্চলে কার্যকালের মেয়াদ ছিল তিন বছর। আটের দশকেই স্থানীয় মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচিত হয় সামাজিক বনসৃজন কর্মসূচিতে। উদ্দেশ্য ছিল জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন মেটানো।

এই সময় বিশ্ব জুড়ে বনসৃজন গুরুত্ব পায়। পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের ১৯৮১/২ - ১৯৮৬/৭'র সময়ে মোট বাজেটের পরিমাণ ছিল ৪৩.৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলার। এই অর্থের ৬৯ শতাংশ ঋণ হিসেবে এসেছিল বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে। কিন্তু বাণিজ্যিক দিকে অত্যধিক মনোযোগ দেবার কারণে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। সেজন্য সমালোচনা হয়েছে প্রচুর। এই প্রকল্পে জোর দেয়া হয় ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানোর ওপর। ঐ গাছের চাহিদা রয়েছে কাগজের কলে। যারা লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে গবেষণা করেন তাদের মতে কেবল পুরুষের চাহিদার (অর্থ) কথাই ভাবা হয়েছে, নারীরা উপেক্ষিত। ইউক্যালিপটাস থেকে কেবল যে জ্বালানী পাওয়া যায় তা হলো পাতা। এই পাতারও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার অপটিম্যাল নয় কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে তেল থাকে। ফলে মহিলাদের জ্বালানী কাঠ জোগাড়ের সময়, পরিশ্রম ও সেই সাথে পরিবার পিছু জ্বালানীর জন্য ব্যয়, যেমন কেরাসিন - সবই বৃদ্ধি পায়।

আটের দশকের মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গের বন দপ্তরের উপলব্ধি হলো কেবলমাত্র জোর খাটিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর কর্তৃত্ব করে বন রক্ষা করা যাবে না। তাই প্রয়োজন স্থানীয় সহযোগিতার। আরাবারি উদাহরণ চোখের সামনে ছিলই। এই সময় থেকে বনদপ্তর তাদের আধিকারিকদের উৎসাহিত করেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে মৌখিক সমঝোতায়

আসার জন্য। এজন্য বনপরিচালনা কমিটির ভিত্তিতে পুরস্কারের কথাও বলা হতে থাকে। ফলত দ্রুত বনরক্ষা কমিটির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা। এটাই সূচনা পর্ব।

পশ্চিমবঙ্গের এই পরীক্ষা ভারত সরকারের ১৯৮৮ সালের বননীতিকে প্রভাবিত করে (চোপরা ১৯৯৫)। অতীতে যে নীতি ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপেক্ষা করা হয়েছিল তা থেকে সরে আসা হয়, প্রাধান্য পায় স্থানীয় মানুষের চাহিদা পূরণ। এদিকে ১৯৮৯ সালে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতাকে আইনগত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম প্রস্তাব পাশ করে, বনরক্ষা কমিটিগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ততদিনে রাজ্যে ১২০০ বনরক্ষা কমিটি কাজ করে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূল বিষয় হলো - বন পরিচালনার ক্ষেত্রে এলাকার বনবাসী মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সেজন্য বাসিন্দারা অরণ্য ব্যবহারের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনা তথা রূপায়ণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন। সেই উদ্দেশ্যে গঠিত হবে বিভিন্ন বন সুরক্ষা সমিতি, আর বন্যপ্রাণী এলাকাগুলোতে গঠিত হবে ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটি।

যৌথ বন পরিচালনার জন্য গঠিত বনরক্ষা সমিতিগুলোকে পঞ্চায়েত ও অন্যান্য সরকারি বিভাগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দেয়া হবে। সমিতিগুলোর আওতায় যে এলাকা থাকবে তার বন সম্পদে সমিতির অংশ থাকবে। সেই সঙ্গে বনসজনের মাধ্যমে বনবাসী মানুষদের কর্মসংস্থানের দিকে চেষ্টা হবে, লক্ষ্য রাখা হবে মানুষ যাতে নন-টিম্বার-ফরেস্ট-প্রোডাক্ট যথা ফল পাতা ইত্যাদি আরো বেশি করে পেতে পারেন। সর্বোপরি মানুষের সচেতনতা গড়ার দিকে যেন দৃষ্টি থাকে - সেটাও ভাবা হয়েছে।

এতসব প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো - প্রত্যেকবার বনের গাছ কেটে যে আয় হতো তার ২৫ শতাংশ সমিতিতে অংশ নেয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্টন করা হবে। লক্ষ্য থাকবে সমাজের দরিদ্রতম অংশ, মূলত তপশিলি জাতি উপজাতিরা যাতে লাভবান হন।

বনদপ্তর ও স্থানীয় মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে সরকারি মোড়ক দেবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রস্তুত হয়। তৈরি হয় পঞ্চায়েত বনদপ্তর ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিনিধি নিয়ে এক্সিকিউটিভ কমিটি। স্থানীয় বিট অফিসারকে সমিতির সদস্য সচিব করা হয় এবং দায়িত্ব দেয়া হয় বছরে অন্তত একবার কমিটির মিটিং ডাকার জন্য। জেলা বন আধিকারিককে ক্ষমতা দেয়া হয় যে যদি কোন কমিটির সদস্যরা ১৯২৭ সালের ভারতীয় অরণ্য আইন লঙ্ঘন করে তাহলে সেই কমিটি ভেঙে দেয়া। জেলা পরিষদের বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতিতে অধিকার দেয়া হয় বনরক্ষা কমিটির কার্যকলাপ দেখাশুনো ও পর্যালোচনা করার। ১৯৯০ সালে একটি সংশোধনী আসে, সেই অনুসারে সমস্ত স্থায়ী পরিবারকে যৌথ বন পরিচালনায় যোগদানের অধিকার দেয়া হয়। এরপর আসে মহিলাদের

উপেক্ষার প্রপ্ন। সেজন্য ১৯৯১ সালের সংশোধনীতে বলা হয় 'যৌথ সদস্যপদ' এর কথা, অর্থাৎ স্বামী যদি কমিটির সদস্য হন তাহলে স্ত্রীও সমিতির সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

নানা দেশের অভিজ্ঞতা

অনেকের ধারণা যে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ পথিকৃত। কিন্তু পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যাবে একই ধরনের পরিকল্পনা প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন দেশে নেয়া হয়েছিল। কিভাবে এমনটা হলো? সে আলোচনায় আসার আগে দেখা দরকার অন্যান্য দেশে পরিকল্পনার ধরন।

শ্রীলঙ্কায় জাতীয় বননীতি ও বন সংক্রান্ত মাস্টার প্ল্যান নেয়া হয় ১৯৯৫ সালে। এই পরিকল্পনায় স্বীকৃত হয় স্থানীয় মানুষ ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা। ১৯৯৭ সালে নেয়া হয় উপকূল অঞ্চল পরিচালনার পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে উপকূলজ সম্পদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের সহায়তায় যৌথ পরিকল্পনার দিকে নজর দেয়া হয়। দুটি স্থানের নাম উল্লেখনীয়। হিঙ্গাদুয়া যা উন্নত পর্যটন শহর, দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে। অন্যটি হলো উপকূলীয় লেগুনে অবস্থিত একটি গ্রামীণ এলাকা - রেকাওয়া।

নেপালে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ১৯৮৮ সালে। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত নেপালের বননীতি ছিল অরণ্যকে শোষণের উদ্দেশ্যে। ১৯৮৮ সালে স্থানীয় উপভোক্তাদের দিকে সহানুভূতি আসে। এমন ব্যবস্থা প্রণয়নের চেষ্টা চলছে যাতে অরণ্য থেকে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ সুবিধে বনবাসী মানুষদের কাছে পৌঁছয়। সেজন্য অরণ্য-আধিকারিকদের ভূমিকা হয়েছে সহায়কের, আইনরক্ষকের মত বলপ্রয়োগের নয়। এইসব উদ্দেশ্যই পরে উল্লিখিত হয়েছে ১৯৯৩ সালে জাতীয় অরণ্য আইনে। দেশের পশ্চিম পার্বত্য এলাকার মুসটাংজেলায় পাইনবনভূমি পরিচালিত হচ্ছে থাকালি নামক এক জনগোষ্ঠীর পরিচালনামন্ডলীর মাধ্যমে। এই মন্ডলীর অনুমতি ব্যতিরেকে বনে ভেড়া বা ছাগল চড়ানো, জ্বালানী বা আসবাব তৈরির জন্য কাঠ কাটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এছাড়া পাইন গাছের শুকনো পাতা ও ঘাস সংগ্রহ করতে দেয়া হয় বছরে ৯-১০ দিন। এতে উপকার দুধরনের - প্রথমত, জঙ্গলে আগুন লাগার সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং দ্বিতীয়ত, এর ফলে জীবজন্তুর শয্যার উপকরণ ঘাস পাওয়া যায় যার ফলে পশুদের রাখার জায়গা তৈরিতে সুবিধে হয়।

বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বশাসিত ও বেসরকারি সংস্থা গঠিত হচ্ছে আর সেজন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়াস চলছে। এর একটি হলো পর্যটন। এইভাবে উপার্জিত অর্থ স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্টের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তার ফলে উদ্যান ও অভয়ারণ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণের উৎসাহ বেড়েছে। কয়েকটি উদাহরণ হলো অন্তর্পুর্ণ সংরক্ষিত এলাকা, মাকালু বরুণ সংরক্ষণ প্রকল্প, রয়্যাল বারদিওয়া জাতীয় উদ্যান। এদের মধ্যে অন্তর্পুর্ণ পার্কটির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি এশিয়ার বৃহত্তম সংরক্ষিত অঞ্চলগুলির একটি যা সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত

হয় স্থানীয় আদিবাসীদের সহযোগিতায় এক বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে।

নেপালে ১৯৭৩ সালে ন্যাশানাল পার্কস অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন অ্যাক্ট তৈরি হয় প্রাকৃতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও তাদের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য। সম্প্রতি এক সংশোধনের মাধ্যমে রাজ্য বস্টনের কথাও বলা হয়েছে। এই সংশোধন অনুসারে স্থানীয় বাসিন্দাদের অধিকার দেয়া হয়েছে যে প্রকল্প থেকে উপার্জনের ৩০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত নিজেদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য ব্যয় করার। এই অর্থ সর্বসাধারণের তহবিলে যাবে এবং ব্যবহৃত হবে সম্প্রদায়ের কল্যাণে ও বৃহত্তর স্বার্থে।

একইভাবে পাকিস্তানে বন-সংক্রান্ত একই নীতির ঘোষণা হয় ১৯৯১ সালে। বর্তমানে সমগ্র পাক-এলাকার মাত্র ৪ শতাংশ বনভূমি। ১৯৭০ পর্যন্ত বনবাসীদের প্রতি অবহেলাই দেখতে পাই যা অপরাপর রাষ্ট্রে দেখা গিয়েছিল, পরবর্তীকালে কালাম সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনায় এক নজির সৃষ্টি করে। এখন এই প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে ১৮২টি সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থা ও ১৭টি মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে। ১৯৮১ সালে এর শুরু। এর উদ্দেশ্য ছিল বন পরিচালনার উন্নতি, আসবাবের কাঠ উৎপাদন ও পার্বত্য সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির পুনরুদ্ধার সাধন।

এইজন্য পরিকল্পনা করতে হয় নানাবিধ। বন সংরক্ষণ প্রকল্প শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ই নজর দেয়া হয় স্থানীয় কৃষির প্রতি। যার অন্যতম হলো অফ-সিজন তরকারি চাষের মধ্যে দিয়ে স্থানীয় মানুষদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা। পাশাপাশি শুরু হয় উন্নত ফুল চাষ, মোমাছি পালন, বীজ উৎপাদন, পশুপালন, আধুনিক উপায়ে ফল সজ্জি বাজারজাতকরণ, পোলট্রি ফার্ম প্রভৃতি। এসবের সঙ্গে শুরু হয় অরণ্যের গুরুত্ব ও তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে স্থানীয় মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ফলে গাছ কাটা ও ভূমিক্ষয় রোধ করা যেমন সম্ভব হয়, ঠিক তেমনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় লোকজন দক্ষ বনকর্মী হিসেবে চাকরিও পান। বনের কাঠ থেকে যে আয় হয়, বর্তমানে তার থেকে ৬০ শতাংশ পাচ্ছেন আদিবাসীরা। এই সবের ফলে বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই বনভূমিতে ১০টি চেকপোস্ট তৈরি হয়েছিল স্থানীয় সহযোগিতা ও বনদপ্তরের যৌথ প্রয়াসে কাঠের চোরাচালান আটকানোর উদ্দেশ্যে।

প্রকৃতিনির্ভর সাসটেনেবল ডেভলপমেন্টের লক্ষ্যে কারো থেকে পিছিয়ে নেই মঙ্গোলিয়া। এদেশে সমস্ত জমিই সরকারের। ১৯৯২ সালের নতুন সংবিধান অনুসারে অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, যদিও বলা আছে যে সকল জমিই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ৭০ বছরের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পর ১৯৯১ সালে রাষ্ট্র এক নতুন গণতান্ত্রিক সরকার ও মুক্ত বাজার নির্ভর অর্থনীতি গ্রহণ করে। এই নতুন অবস্থায় যে উন্নয়নের পরিকল্পনা নেয়া হয় তা নির্দেশ করে রাষ্ট্র, জনতা আর পরিবেশের সমতাকে নিয়ে। ব্যাপারটা ঘটেও প্রায় তাই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে আটের দশকের মাঝামাঝি জনগণ খেডসগোল ফসফরাস খনির বিরোধিতা করে পরিবেশের ক্ষতির কথা

মাথায় রেখে। এই প্রকল্প কিন্তু বিজ্ঞানীদের অনুমোদন পেয়েছিল। জনতার প্রতিবাদে শেষে সরকার এই প্রকল্প বাতিল করে।

পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখা গেছে। এই দেশের শহর ও গ্রামের উভয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই। আইনকানূনের ঘাটতিকেও এর ফলে অনেকাংশে কম করা সম্ভব হয়েছে। দেশের গ্রামীণ পশুপালকদের মধ্যে এক তীব্র ঘৃণা রয়েছে শহরের সেসব লোকদের প্রতি যারা নিছক ফুর্তির জন্য শহর থেকে গিয়ে পশু শিকার করে। ১৯৯৪ সালে মঙ্গোলিয়ায় গ্রিন মুভমেন্ট শুরু হয়। শুধু তাই নয় পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়কে তুলে ধরার জন্য এবং সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করার জন্য গ্রিন পার্টি নামে এক রাজনৈতিক পার্টির জন্ম হয়। আরো বড় কথা, ১৯৯৫ সালে মঙ্গোলিয়ান ইকোট্যুরিসম সোসাইটি স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য সাসটেনেবল পর্যটনের বিকাশ নীতির নির্ধারণ ও একই সঙ্গে পরিবেশের ওপর পর্যটন শিল্পের প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণা। এই সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রমের আয়োজন করেছে বিভিন্ন ধরনের ট্রায়ের জন্য। আমাদের দেশে ২০০২ সালের আন্তর্জাতিক ইকোট্যুরিজম বর্ষে তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় নি, যদিও স্বনির্ভরতার জন্য এই পরিবেশ-পর্যটনের ভূমিকা বিশেষ স্বীকৃত।

স্বনির্ভরতার আয়োজন: ভারতের নানা প্রান্তে

এ পর্যন্ত আলোচিত স্থানীয়, সম্প্রদায়ভিত্তিক সংরক্ষণ প্রকল্পগুলোর ধরন একই রকম। তাদের ক্রটি বিচ্যুতিও অনেক। এই ক্রটি দূর করার জন্য দেখা দরকার আরো বেশ কিছু প্রকৃতিনির্ভর স্বনির্ভরতার উদ্যোগ। সারা পৃথিবীতে চলেছে এই কর্মকাণ্ড। আমাদের দেশেও উদাহরণ রয়েছে প্রচুর। আমরা এখানে ভারতের কয়েকটি প্রান্তর - উত্তর, উত্তরপূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, মধ্যভারতের পাঁচছটি উদাহরণ আলোচনা করব।

শুরু করা যাক উত্তর থেকে। দেবাদুনের ২৪ কিমি দূরে লাচ্ছিওয়াল গ্রাম। এক অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছেন ওখানকার মানুষেরা। কচুরিপানা, পার্শেনিয়াম, ল্যানটানার মতো সাংঘাতিক আগাছা গ্রাস করেছিল গ্রামটিকে। এদের মধ্যে ল্যানটানা (*Lantana camara*) সবচেয়ে মারাত্মক। পৃথিবীর দশটি সবচেয়ে মারাত্মক আগাছাগুলির মধ্যে এটি একটি। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশরা এই আগাছা রোপণ করেছিল প্রাচীর হিসেবে। এই ল্যানটানা এত দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে যে প্রায় রাতারাতি কোন গ্রামকে গ্রাস করে ফেলে। একবার শিকড় গেড়ে ফেলে সাদা, গোলাপি, হলুদ ফুলের এই উদ্ভিদকে কিছুতেই বিনাশ করা যায় না - গাছ কেটেও না, রাসায়নিক ঢেলেও না। অন্যদিকে মাটিতে বিষজনিত প্রভাবে অন্যগাছও জন্মাতে পারে না। ভারতের নানা স্থানে ল্যানটানার প্রকোপ চোখে পড়ে, যেমন - দাক্ষিণাত্য, নীলগিরি, উত্তরপ্রদেশ, শিবালিক শ্রেণী, পশ্চিম ঘাট, বিহার, ছোটনাগপুর ও উত্তর ভারত।

এই সাংঘাতিক ল্যানটানা গ্রাস করেছিল লাচ্ছিওয়াল গ্রামকে, কিন্তু দমাতে পারে নি।

দেবাদুনের এক বেসরকারি সংস্থা - হিমালয়ান এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিস অ্যান্ড কনজারভেশন অর্গানাইজেশন - গ্রামবাসীদের বোঝাবার চেষ্টা করে আগাছা নির্মূল করা যখন যাবে না তখন আগাছাদের বাণিজ্যিক ব্যবহার ছাড়া গতি নেই। সংস্থা থেকে গ্রামবাসীদের কারিগরি জ্ঞান ও বাজারজাত করার সুবিধে প্রদান করা হয়। তারপরই আসে স্থানীয় জীবনে পরিবর্তন।

ল্যানটানার সাথে কাদা মিলিয়ে তৈরি করা হলো বাড়ির দেয়াল, মুরগির খাঁচা। ছাল ছাড়িয়ে কীটামুক্ত করে ল্যানটানার কাণ্ড দিয়ে বানানো হতে লাগল আসবাবপত্র, বুড়ি ইত্যাদি। ল্যানটানার তৈরি সোফাসেট বিক্রি হতে লাগল ১৫০০ টাকায়, যা বেতের তৈরি সোফাসেটের চেয়ে অর্ধেক দামের। তিতকুটে ফুলের থেকে তৈরি হলো মশা তাড়ানোর ধূপ ও ধূপকাঠি। জীবনযুদ্ধে জয়লাভের জন্য আবিষ্কার হয়েছে আগাছা থেকে বাঁচার কৌশল। পার্থেনিয়াম থেকে অ্যাজমা ও নানারকম চর্মরোগ হয়। সংস্থার বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে অ্যালার্জেন হলো ফুলের রেণুরা। সুতরাং যদি আগাছায় ফল আসার আগেই তা বিনষ্ট করা যায় তাহলে কষ্ট কম হওয়া সম্ভব।

বর্তমানে আগাছার নানা বাণিজ্যিক ব্যবহার সামনে আসছে। ল্যানটানার শেকড়কে গুঁড়ো করে দাঁতের সংক্রামক রোগের নিরাময়ে ব্যবহার করা যায়। আরেক আগাছা - ইউপ্যাটোরিয়াম প্লাটফাইলা (*Eupatorium platyphylla*) ব্যবহার করা হচ্ছে পশুর প্রতিষেধক হিসেবে। তেমনি ব্যারব্যার'স এশিয়াটিকার কাজ ভাইরাস-প্রতিরোধী চোখের ওষুধ হিসেবে। এখানেই শেষ নয়, বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় অন্যান্য আগাছা যেমন *Perthanium hystrophorus*, *Rumex sp.*, *Euphorbia royleana* ব্যবহার করা হচ্ছে কম্পোস্ট সার হিসেবে অয়েস্টার মাসরুম চাষে। ১০০ ব্যাগ আগাছা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে গ্রামের লোকেরা ১০০ কেজি মাসরুম তৈরি করছেন যা থেকে আয় ৫০০০ টাকা। ফলে আর্থিক লাভ হচ্ছে এমন রাজ্যের মানুষের যেখানে শিল্পের সুযোগ ও সম্ভাবনা কম। আগে জীবিকা নির্বাহের জন্যে এলাকার মানুষকে দৈনিক মজুরের কাজ করতে হতো বা বনের জ্বালানী কাঠ কেটে বিক্রি করতে হতো। এখন আগাছার নানারকম ব্যবহার করে গ্রামের পরিবারগুলো গড়ে ৭৫০০০ টাকা আয় করেছেন, হয়ে উঠেছেন সাবলক্সী ও স্বনির্ভর।

এবার দক্ষিণে। চেন্নাই নগর থেকে ৫ কিমি দূরে চিংগেলপেট জেলার ভাদানেমেশী গ্রাম। এখানে ইরুলা উপজাতির বাস। কয়েক পুরুষ ধরে তাদের জীবিকা সাপ ধরা। আগে তারা রুজিরোজগারের জন্য নির্ভর করতেন সাপের চামরার ওপর। কিন্তু ১৯৭৬ সালের ভারতীয় বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অসহায় হয়ে পড়েন ইরুলারা। শেষ পর্যন্ত পথের দিশা পাওয়া যায়। ১৯৮২তে স্থাপিত হয় ইরুলা স্নেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটি - এই সাপের বিষ নিষ্কাশন সংস্থার কাছ থেকে, ইরুলারা সাপ ধরে আনার ছাড়পত্র পান। সাপ ধরে বিষ বার করে নেবার কাজ চলে তিন

সপ্তাহ ধরে তিনবার। এরপর তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেয়া হয়। প্রতিটি বিষধর সাপ ধরে আনার জন্য ইকলারা ১৫০ টাকা করে পান। এছাড়া সংস্থার লাভের ৩০ শতাংশ তারা পেয়ে থাকেন বোনাস হিসেবে।

এই অর্থের পরিমাণ মোটেই কম নয়। ১৯৯৯-সালে এই সংস্থা থেকে যে পরিমাণ সাপের ওষুধ বিক্রি হয়েছিল তার দাম ৩০ লক্ষ টাকা। হাতে ছিল আরও ৫০ লক্ষ টাকার মজুত ভান্ডার। সাপের বিষের চাহিদা ও দাম বাড়ছে দিন দিন। রাসেল'স ভাইপার ও কোবরার বিষের দাম গ্রাম প্রতি ৬০০০ টাকা। অন্যদিকে কমন ফ্রেইটের এক গ্রাম বিষের দাম ১৫০০০ টাকা। বর্তমানে আর্থিক সাফল্যের পর সংস্থার তরফ থেকে তামিলনাড়ুর নানা স্থানে ১৩টি শাখা স্থাপিত হয়েছে। চেষ্টা চলছে রপ্তানিরও। হাত দেয়া হয়েছে সাপের কামড়ের চিকিৎসার দিকেও। বর্তমানে এই সংস্থা থেকে উপকৃত হয়েছেন ২০২টি ইকলা পরিবার। সংস্থার সাতজন বোর্ড অফ ডায়রেক্টরস এর মধ্যে ৫ জন ইকলা শ্রেণীভুক্ত।

এবার যাব গুজরাটে। গুজরাটের রাজ্য ভূমি উন্নয়ন পর্ষদের একজন অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক মানসুখ সুভাগিয়া ও আরেক শিল্পপতি হীরে ব্যবসায়ী মাথুর সাভানির উদ্যোগে খরা প্রবণ সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের ৬টি জেলার - জুনাগড়, ভাবনগর, আমরেলি, জামনগর ও রাজকোট জেলার শতাধিক গ্রামের বাসিন্দারা জলের ক্ষেত্রে নিজেদের স্বনির্ভর করে তুলেছেন।

এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল সুভাগিয়ার পরামর্শে ভিচিয়াওয়াদ গ্রামে। গ্রামবাসীরা স্থানীয় দুই শ্রোতস্থিনীর ওপর ১২টি চেক ড্যাম তৈরি করেন ১.৫ লক্ষ টাকা খরচে। এই চেক ড্যামগুলির লক্ষ্য হচ্ছে বৃষ্টির জল ফতটা সম্ভব ধরে রাখা ও তা পানীয় জল আর চাষে ব্যবহার। সুভাগিয়ার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসেন ৩৮ বছরের সুরাটের হীরে ব্যবসায়ী সাভানি। তিনি তাঁর গ্রামের অন্যান্য হীরে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন। নিজে দেন ১৫ লক্ষ টাকা। গ্রামবাসীরা তোলে ৩৫ লক্ষ টাকা। সেই সাথে স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দারা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এর ফলস্বরূপ ভাবনগর জেলার খোপলা গ্রামের আশেপাশে জলখারার ওপর ২১০টি বাঁধ নির্মিত হয়েছে। ফলে গড় বৃষ্টিপাতের চেয়ে কম বৃষ্টি সত্ত্বেও এলাকায় জলের অভাব নেই। শ্রোতখারাগুলো জলে উপচে পড়ছে।

এখন ভিচিয়াওয়াদ ও খোপলা গ্রামের দেখাদেখি সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের ৬০০০ গ্রামের মধ্যে ২০০০ গ্রাম এই ধরনের কাজের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে। সাভানির উদ্যোগে গঠিত হয়েছে সৌরাষ্ট্র জলধারা ট্রাস্ট। প্রাথমিক সাফল্যলাভের পর এসব প্রকল্প সরকারের নজরে আসে। বর্তমানে সরকারি সহায়তাও আসছে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। গড়ে উঠেছে সরকারের সাথে গ্রামবাসীদের এক নতুন অংশীদারী সম্পর্ক। সরকারের সহায়তায়, গ্রামবাসীদের পরিশ্রমে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের ৬ জেলায় বর্তমানে ১০,০০০ চেক ড্যাম প্রস্তুতির

পথে। সরকার থেকে নেয়া হয়েছে Build Your Own Check Dam প্রকল্প। এর আওতায় ড্যাম তৈরির মোট খরচের ৬০ শতাংশ সরকার দেবে। বাকিটুকু স্বেচ্ছাশ্রম দান করে গ্রামবাসীরা পুষিয়ে দেবে। এর জন্য নিয়মকানুন সরল করা হয়েছে।^{১০} প্রথমে ১১ জন গ্রামবাসীর একটি দল গঠন করতে হয় রাজ্যের স্থানীয় ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের কাছে আবেদন করার আগে। এরপর দ্রুত প্রকল্পের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয় এবং প্রকল্পের স্থান স্থানীয় আধিকারিকদের দ্বারা অনুমোদিত হলে সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। প্রথমে সরকারের তরফ থেকে বছরে ৫০ কোটি টাকা এই প্রকল্প খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত জনসাধারণের উৎসাহ দেখে সরকার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে। ২৫,০০০ আবেদনপত্র জমা পড়ে। স্থানীয় মানুষের উৎসাহ দেখে সরকার ৫০ কোটির সীমা তুলে দেন।

এই ধরনের অল্প খরচের বাঁধের গুরুত্ব অপরিসীম বিশেষ করে সেখানে যেখানে কোন বড় নদী নেই। সারা বছর জল থাকার নদী তো নেইই। গত কয়েক বছরে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের জলস্তর ১০০ থেকে ৭০০ ফুট নিচে নেমে গেছে। এর জন্যে দায়ী সরকারের খরা প্রতিরোধ কল্পে ভ্রান্ত নীতি। সরকার থেকে খরা প্রতিরোধে টিউবওয়েল ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। এতে নির্বিচারে জল তোলার ফলে জলস্তর নিচে চলে যায়। আশা করা যায় নতুন ড্যাম তৈরির প্রকল্পের ফলে ভূগর্ভের জলস্তর বাড়বে। তাহলে বিদ্যুতের খরচও কমানো সম্ভব। কৃষিক্ষেত্রে এলাকার মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৪০ শতাংশ ব্যবহৃত হয়। আরও বলা যায়, গ্রামে যদি জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়, মানুষ স্বনির্ভর হয়, তাহলে শহরেও লোকসংখ্যার চাপ কমবে। অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দিক ব্যতিরেকে এ অঞ্চলে এ ধরনের প্রয়াসের সামাজিক গুরুত্বও কম নয়। জুনাগড় জেলায় জুমকা গ্রামে ব্রাহ্মণ, প্যাটেল, হরিজন, মুসলমান - সকলের সম্মিলিত শ্রমদানে গড়ে উঠেছে ৫০টির মত চেক ড্যাম। সামাজিক ঐক্যের জন্য এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

এই একই রকমের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের অঞ্চল ঝাবুয়া জেলায়।^{১১} ৬০ এর দশকে সেখানে ৩৩ শতাংশের বেশি বনভূমি ছিল, ৮০র দশকের মাঝামাঝি তা নেমে আসে দশ শতাংশে। বন পরিষ্কার করায় বাড়ে ভূমিক্ষয়, অনিয়ন্ত্রিত গোচারণ, গাছ কাটা আর আগুনে নষ্ট হতে থাকে বনভূমি। ১৯৯৫ সালে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বৃষ্টির জল সঞ্চয় ও ভূমিক্ষয় প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেয়া হয়। নির্মিত হয় এক হাজার চেক ড্যাম, খনন করা হয় ১০৫০টি পুকুর, নেয়া হয় ১১০০ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প - যার অধিকাংশই বর্তমানে পরিচালিত হয় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে। পার্বত্য ভূখণ্ড এধরনের জলপ্রকল্পের পক্ষে আদর্শ। তাছাড়া স্থানীয় আদিবাসী মানুষের একতা এর রূপায়ণের আদর্শ। ফল তাই যথেষ্ট আশাপ্রদ। গত পাঁচ বছরে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৮ শতাংশ। আগে ঝাবুয়া জেলায় বাইরে থেকে পশুখাদ্য আমদানি করতে হতো। এখন এই জেলা থেকেই তা পার্শ্ববর্তী রাজ্য গুজরাটে রপ্তানি করা হচ্ছে। প্রকল্পগুলো রূপায়ণে

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় এলাকার বাইরে আদিবাসীদের কাজের খোঁজে যাওয়াও বন্ধ হয়েছে।

এবার উত্তরপূর্ব ভারতের মেঘালয়। মেঘালয়ে এখন ব্যাপক হারে চাষ করা হচ্ছে ঝাড়ুঘাসের (*Thysanolaena Maxima*)।^১ এখানকার পার্বত্য অরণ্য এই একবর্ষজীবী ঘাসের পক্ষে উপযুক্ত। এর জন্য প্রয়োজন নেই বিশেষ কোন যত্নের। কেবল মাঝে আগাছা পরিষ্কারই যথেষ্ট। পরিশ্রম রয়েছে গাছ কাটা ও শুকনো করার সময়।

এই ঝাড়ুঘাস চাষ করে গ্রামবাসীরা পান প্রতি কেজি বোল টাকা করে। নিঃসন্দেহে বেশির ভাগটাই যায় মধ্যস্থত্বভোগীদের হাতে। তবু যা থাকে তার গুরুত্ব বাসিন্দাদের কাছে কম নয়। এই চাষ থেকে প্রতি পরিবার বছরে গড়ে ৬০০০ - ৭০০০ টাকা অতিরিক্ত আয় করতে পারে। কেউ কেউ করে এর দশ গুণ বেশি। এই আয়ের পরিমাণ যাই হোক না কেন, এতে চাষীদের কাছে শীতকালে একটা উপার্জনের সুযোগ আসে, যে সময় তাদের পক্ষে সপ্তাহে ১০০ টাকা রোজগার করাও শক্ত যদি না কাছাকাছি রাস্তা তৈরির মত কোন কাজ পাওয়া যায়। মেঘালয়ের লোকেরা গ্রীষ্মকালে ঝুম চাষের ওপর নির্ভর করে। শীতে কিছুই করার থাকে না। তখন বাসিন্দারা পরবর্তী ঝুমচাষের জন্য জঙ্গল পুড়িয়ে জমি পরিষ্কার করে, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে, শিকার করে। এতে বন ও বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হয়।

এখানে এই ঝাড়ুঘাস চাষের অন্য প্রাকৃতিক গুরুত্ব আছে। পুরনো ঝুম চাষের জমি অনুর্বর থাকে। সেখানে পরের বার ফসল ভাল হয় না। কিন্তু এই ঘাস যে কোন জমিতেই ভাল হতে পারে। তাই একদিকে যেমন অনুর্বর হয়ে যাওয়া জমিকে ব্যবহার করা যায়, অন্যদিকে তেমনি এই ঘাসের থেকে তৈরি বায়োমাস জমিতে উর্বরতা ফিরিয়ে আনে। রাইবোসোম ও ফাইব্রাস শেকড় ভূমিক্ষয় রোধ করে ঢালু জমির। এছাড়া শীতকালে অতিরিক্ত আয়ের উৎস থাকায় বাসিন্দাদের আর শীতকালে আয়ের জন্য বনের গাছ কাটতে হয় না।

মেঘালয় সরকার এই উদ্যোগ নেন ১৯৯৫ সালে। বর্তমানে এটা দারুণ সাফল্য পেয়েছে। মেঘালয় বনদপ্তর ১৯৯৪ সালে দিল্লিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় এই ঘাস ও তার উপকারিতা প্রচার করে। এর ফলে রাতারাতি এক বছরের মধ্যে এক কুইন্টাল ঘাসের দাম ১১০০ টাকা থেকে বেড়ে ৩০০০ টাকা হয়। এক হেক্টরে ৪০০ থেকে ৬০০ কেজি পর্যন্ত ঘাস পাওয়া যায়। স্থানীয় গ্রাম প্রধানদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যাতে তারা প্রতি পরিবারকে এক থেকে দুই হেক্টর জমি দিতে পারে। বর্তমানে রাজ্য জুড়ে এই চাষ শুরু হয়েছে এবং স্বনির্ভর হচ্ছে প্রায় ৪০,০০০ পরিবার।

এবার যাই মধ্যভারতের মধ্যপ্রদেশে। এ রাজ্যের বস্তার জেলার ৫০০০ আদিবাসী বর্তমানে সমবায় আন্দোলনের ফলে উপকৃত হয়েছেন।^১ জঙ্গলের ওপর নির্ভর করে তারা স্বনির্ভর

হবার লক্ষ্যে এগিয়ে গেছেন বেশ কয়েক ধাপ। সরকারের তরফে কয়েক বছর আগে থেকে এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বনজ দ্রব্য যেমন - কেন্দুপাতা, হররা, শালবীজ ইত্যাদি সংগ্রহ করা শুরু হয়। কিন্তু সরকার অন্যান্য আরো যে বনজ সম্পদ রয়েছে তার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখাননি। এই অন্যান্য বনজ সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে আছে শুকনো ফল চিরোজি, সাবান তৈরির জন্য ব্যবহৃত টোরা, ট্যানিঙের কাজে সহায়ক হররা, তেল উৎপাদক শালবীজ এবং কারকাতিয়া, নিরমালি, পেগু গাছের বীজ যা নানাবিধ ঔষুধ তৈরিতে প্রয়োজনীয় এবং তেঁতুল।

অতীতে আদিবাসীরা মধ্যস্থত্বভোগী ব্যবসায়ীদের কাছে এইসব বনজ সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য ছিল। এই ব্যবসায়ীরা নানাভাবে তাদের ঠকাতো। উদাহরণ চিরোজি ফল। এখন এর দাম কেজি প্রতি ৬০ টাকা। কিছুদিন আগেও ব্যবসায়ীরা এক কেজি নুনের বিনিময়ে গ্রামের হাট থেকে এক কেজি ফল কিনত। এখন সময় বদলেছে। 'বন ধন' আন্দোলনের পর সরকার অরণ্যের গৌণ সম্পদের ওপর পঞ্চায়েতের একচেটে অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তৈরি হয়েছে নানা স্বনির্ভর সংস্থা। এরা বনজ দ্রব্য সরাসরি বিক্রি করেছে সরকারি এজেন্সির কাছে। স্বনির্ভর সংস্থাগুলো পাচ্ছে কমিশন। সরকার থেকে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যও বেঁধে দেয়া হয়েছে। যেমন এক টন লাফা ৫০,০০০ টাকা, এক টন চিরোজি ফল ৬০,০০০ টাকা, এক টন মোম ও আঠা ৪০,০০০ টাকা। এইভাবে প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বাজার অর্থনীতির সুযোগে সরকারের সহায়তায় বস্তার জঙ্গলের আদিবাসীরা সুযোগ পেয়েছেন স্বনির্ভর হবার।

প্রাকৃতিক সম্পদ, বৈদেশিক আগ্রহ

এটা দেখলাম যে, নানা দেশে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় বেশ কিছু সংরক্ষণ প্রকল্প চলছে। কিন্তু প্রথম দিকে এসব প্রকল্প শুরু হয়েছিল মোটেও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুফলকে উপলব্ধি করে নয়। বরং হয়েছিল বহিরাগত অর্থসাহায্য প্রদানকারী সংস্থার চাপে, যেমন এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এর উদ্যোগে সামাজিক বনসৃজন কর্মসূচি। তাই এর ফলে প্রথম দিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণ কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় নি। এমনকি এখনও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্থানীয় মানুষের স্বনির্ভরতায় এদের ভূমিকা বিতর্কের বিষয়।

পাকিস্তানে ১৯৮১ সালে কালাম সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হয় সুইডারল্যান্ডের সহযোগিতায়। শ্রীলঙ্কার সম্প্রদায়ভিত্তিক বনপ্রকল্পের পেছনে ছিল বিশ্ব ব্যাঙ্ক। বিভিন্ন বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে মঙ্গোলিয়ায় যুক্ত ছিল। কিছুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও প্রস্তাবনায়, যেমন - United Nations Conference for Environment and Development (১৯৯২), Agenda ২১ (যা একটি সংরক্ষণ ও সাসটেইনেবল উন্নয়নের খসড়া), রিও ঘোষণাপত্র (যা ইউ এন সি

ই ডি'র অপর নিদর্শন) এবং Convention on Biological Diversity - এই সমস্ত কিছুতেই প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষাবেক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। যদিও এইসব ঘোষিত নীতি থেকে উন্নত মানসিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু আইনগত ও পরিকাঠামোগত অবস্থা মোটেই অনুকূল নয়। অনেক গবেষকের কাছে দেখা গেছে যে বাস্তবক্ষেত্রে আইন ও ভূগমূল স্তরের তার রূপায়ণের মাঝে নানাবিধ প্রশাসনিক নীতি ও পদ্ধতি থাকে যা সাফল্যের সঙ্গে স্থানীয় মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়, এমনকি আইনে তাদের মুখ্য ভূমিকা স্বীকার করা সত্ত্বেও।

ভারতের বেলা বিশেষজ্ঞরা বারবার বলেছেন যে সমাজের নিচতলার কি আদিবাসী মানুষদের আন্দোলনের ফলে যৌথ বন পরিচালনা প্রকল্প গৃহীত হয় নি, তা হয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্কের চাপে। বিশেষজ্ঞ রজার জেফরির মতে বিশ্বব্যাঙ্কের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, যৌথ বন পরিচালনা হলো অরণ্য সম্পদ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস করা। তাদের লক্ষ্যই হলো বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে অরণ্যের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়ে আসা।

বিশ্বব্যাঙ্কের এই উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সরব হয়েছে নানা সংগঠন বিশেষ করে বামপন্থীরা। তাদের আপত্তি করার জায়গা হলো - বহুজাতিক সংস্থারা বিশ্বব্যাঙ্ককে প্রভাবিত করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জৈববিচিত্রতা কুক্ষিকরণ করে চলেছে। গোটা বন ব্যাপারটাই সম্পদ - শুধু কাঠ কেন, ওষুধের গাছ, ফলের গাছ, লতাগুল্ম, তন্তু - লাভজনক হাজারো বিষয় আছে, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তাদের উৎপাদন চলেছে, চলেবেও, যেহেতু সেটা স্থানীয় মানুষদের বাদ দিয়ে ঘটানো অসুবিধেজনক, তাই আদিবাসীদের কিছুটা পাইয়ে দেয়া, যা গৌণ এবং যা প্রকৃতি নিঃশেষিত হলে তাদের অনাহারই ডেকে আনবে।

উপসংহার: রাষ্ট্রের দায়িত্ব

নাহয় তাই, তবু বলব, এসব সত্ত্বেও এই রাজ্যে জে এফ এম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ঘটনা। এই প্রথম সরকারকে মানুষের অধিকারের কথা বলতে হয়েছে। তাদের প্রয়োজনের কথা (খাতায়-কলমে হলেও) স্বীকার করতে হয়েছে। যে রাজ্যে প্রায় কোনো গ্রাম বনভূমি বা সামাজিক বনভূমি, ভিলেজ ফরেস্ট, কমিউনিটি ফরেস্ট নেই, যেখানে প্রাকৃতিক অরণ্যগুলির ওপর, বনসম্পদের ওপর, বনবাসীদের কোন আইনি অধিকার নেই, জে এফ এম সেখানে অস্ত্রত এমন এক জায়গা তৈরি করেছে যা থেকে নিজেদের অধিকার নিয়ে বনবাসীরা আওয়াজ ওঠাতে পারেন। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু বন-সংগঠন যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করেছে তাকে বনকর্মচারীর পক্ষে অবহেলা করা সম্ভব নয়।

জে এফ এম প্রচলনের অসুবিধে সম্বন্ধে যে কয়েকটি প্রধান প্রতিবন্ধকতার কথা বিভিন্ন লেখক গবেষকের আলোচনায় উঠে এসেছে তারা হলো - ১. পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী ধরন, ২. রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক মানসিকতা, ৩. জনগণের সচেতনতার অভাব।

প্রকৃতিপ্রেমীদের নানা লেখায় পরিবেশ দূষণের জন্য পুঁজিবাদের আগ্রাসী নীতির কথা সঙ্গতভাবেই ওঠে। কিন্তু শুধুমাত্র পুঁজিবাদই কি দায়ী? তার অবসান হলেই কি প্রাকৃতিক দূষণের অবসান হবে? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া দরকার। ভুললে চলবে না যে অরণ্য ধ্বংসের অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য, বেরোজগারি, জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি। পথ তাহলে কি - এটা বোঝবার জন্যেই ভারতের পাঁচ প্রান্তে প্রকৃতিকে নির্ভর করে স্বনির্ভরতার প্রয়াসের উল্লেখ করেছি। এই সব জায়গার মানুষেরা পুঁজিবাদের জয়যাত্রার হতাশ হয়ে হাল ছাড়েন নি, সমাধানের পথ বার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ধীরে হলেও অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ছে, বাড়ছে বিজ্ঞানের কলাকৌশলগত উন্নতি, সাধারণ মানুষ শিখছেন প্রকৃতির নানাভাবে ব্যবহার, প্রকৃতিকে সংরক্ষণের গুরুত্ব। যাদের পুঁজি নেই তাদের পক্ষে প্রাকৃতিক সম্পদের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারই হয়ে উঠতে পারে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার উপযুক্ত মাধ্যম।

সুতরাং পুঁজিবাদের থেকে বরং বেশি দায়ী পুঁজিবাদের অবৈজ্ঞানিক ও অবিবেচকের মত প্রসার লাভ (অবশ্য কোন আর্থিক আদর্শের পক্ষে জগতের কল্যাণের নীতি নিয়ে বাস্তবে প্রসার লাভ সম্ভব কি না তা প্রশ্নাধীন কারণ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে স্বার্থপরতা লোভ ক্ষমতালিপ্সা)। এই সর্বগ্রাসী প্রসারলাভ শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে। তখন বনদপ্তর ছিল শোষণের হাতিয়ার। 'জাতীয়' স্বার্থের কথা বলে বঞ্চিত করা হলো বনবাসী মানুষকে, লুট করা হলো প্রাকৃতিক সম্পদ। অরণ্যসম্পদের ওপর একচেটিয়া দখলের জন্য উন্নয়নশীল দেশে বারবার অভিযোগ উঠেছে যে, বনদপ্তর তাদের ঔপনিবেশিক চরিত্র বদলাতে পারে নি। সেজন্য অরণ্যসম্পদে সাধারণ মানুষের অধিকারকে স্বীকার করতে রাষ্ট্রব্যবস্থার সময় লেগেছে এতদিন। এমনকি এখনও অনেক অঞ্চলে আদিবাসীর চেয়ে বনদপ্তরের ইচ্ছা অনিচ্ছা বেশি প্রভাবশালী। সেক্ষেত্রে জনসাধারণের সচেতনতা বাড়ার উদ্যোগ নেয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম জেলাগুলিতে যেসব বন সুরক্ষা সমিতি শক্তিশালী তারাই কেবল যৌথ বন পরিচালনার সরকারি পদ্ধতিতে অংশ নিচ্ছে। অন্যত্র অংশের পরিস্থিতি মোটেও আশাশ্রিত নয়। এর একটি কারণ হলো রাজ্যের বহু স্থানেই জে এফ এম সম্বন্ধে এবং নিজেদের সম্বন্ধে গ্রামবাসী সদস্যরা অবহিত নন। তাদের মধ্যে যথাযথ সচেতনতাই গড়ে ওঠে নি। একথা অনস্বীকার্য যে যৌথ বন পরিচালনার সাফল্যের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎসাহ জরুরি। আর স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎসাহের জন্য প্রয়োজন তৃণমূলস্তরে বনসংরক্ষণের সংস্কৃতি। এই দুইই উপস্থিত মঙ্গোলিয়ায়। এগুলো বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশের আদিবাসীদের মধ্যে শতাব্দী ধরে কিছুটা হলেও থেকে গেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়কালে আদিবাসীদের

মধ্যে বনরক্ষা করার সংগঠনও ছিল। সেসব ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কারণেই দেখা গেছে যে বাঁকুড়া পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার অরণ্যে যৌথ বন পরিচালনা কর্মসূচিতে ব্যাপক সাফল্য। সারা রাজ্যের বনাঞ্চলের মাত্র এক-এর-তিন অংশ এ অঞ্চলে রয়েছে। কিন্তু এখানেই রয়েছে সমগ্র রাজ্যের বনরক্ষা কমিটির প্রায় ৭৫ শতাংশ।

কেউ কেউ বলেছেন বনের ওপর বনবাসীদের সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন হওয়া উচিত, সরকারের উচিত বনপরিচালনার ক্ষেত্রে সরে যাওয়া। এটা সমাধান নয়। সেক্ষেত্রে মাঝ মাঠের খেলোয়াড়রা সুবিধা লুটে নিতে পারে, নিয়েছেও। ভারতের পাঁচপ্রান্তে উন্মিখিত স্বনির্ভরতার প্রয়াসের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা রয়েছে। তেমনটাই হওয়া উচিত। বিশ্বায়নের যুগে সরকারের ভূমিকা হবে সহায়কের, মালিকের নয়। সেটা এখানেও প্রযোজ্য।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন যে, এতো সরকারের ওপর নির্ভরতা তাহলে স্বনির্ভরতা আসবে কি করে? দুটো কথা বলা যায় - এদেশে বনভূমির মালিকানা সরকারের ওপরই ন্যস্ত। দুই, এ প্রশ্নটার মীমাংসা জরুরি যা হচ্ছে, স্বনির্ভরতা কাদের জন্য? কাদের স্বনির্ভরতা? কেবলমাত্র একটি গ্রামের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য? বিশ্বায়নের যুগে নীতিই হলো পরনির্ভরতা - সেটা কতটা সরিয়ে রাখা সম্ভব? গণমাধ্যমের রমরমায়, বিজ্ঞাপনের আকর্ষণে, ভোগবাদী সংস্কৃতির পরিবেশে দূরের জিনিসের হাতছানি তো থাকবেই।

সুতরাং স্বনির্ভরতার প্রশ্নের আরও গভীর আলোচনা জরুরি। ভারতে বন পরিচালনার আলোচনায় অনেকেই বলেছেন যে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দোষ দেয়া হয় রাষ্ট্রব্যবস্থার যা 'শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার' হিসেবে কাজ করে। দোষ দেয়া হয়েছে আমলাতন্ত্রের যার মাধ্যমে এই শোষণ চলে। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা কি বলে? এই কথাই বলে যে দেশের এলিট গোষ্ঠী যতটা পারে নিজেদের সুবিধে করতে ততটাই করে নেয়। এর মধ্যে আছে ধনী পুঁজিপতিরা, আছে বিন্ধ্যশালী চাষিরা আর রয়েছে মধ্যবিত্ত ধান্দাবাজরা (আলোচনা শ্রেণী হিসেবে করা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি হিসেবে নয়)। ভারতে ভর্তুকি দিয়ে গরীব মানুষের উপকারের নামে আসল উপকার হয় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের যা নিয়ে নতুন কথা বলা অপ্রয়োজনীয়। এই পরজীবী মানসিকতা যে স্বনির্ভরতাকে ডুবিয়ে দেয় তার দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। তাই সর্বাত্মক প্রয়োজন দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যেই স্বনির্ভর মানসিকতা গঠনের চেষ্টা।

আর এ কাজ সহজ নয়। প্রয়োজন জাতীয় চরিত্রের উন্নতি। সেজন্য চাই মেধার মর্যাদা যাতে সামাজিক স্থান পরিবর্তন - সোশাল মবিলিটি - সহজ হয়। রাজনৈতিক নেতা বা প্রভাবশালী নেতার কৃপাভিক্ষা যে দেশে প্রতিপদে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে স্বনির্ভরতা সহজ নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও চেষ্টা চলছে। যার উদাহরণ দেশের পাঁচ প্রান্ত থেকে দেখানো হয়েছে। এতে রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকাও দেখা যাচ্ছে। এই বিশাল দেশের পাঁচ লক্ষাধিক গ্রামকে যদি স্বনির্ভর করতে হয়, তাহলে রাষ্ট্রের পারদর্শিতা জরুরি। শুধু একটি বা দুটি বিচ্ছিন্ন গ্রামে

ব্যক্তিগত প্রয়াসে সাফল্য আসতে পারে কিন্তু সেই সাফল্যের মন্ত্র পুরো দেশে ছড়াতে চাই রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকা।

শাসকদেরও বোঝার সময় হয়ে এসেছে স্বনির্ভরতার পথে হাঁটবার জন্য গরীব মানুষদের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। এ প্রসঙ্গে উড়িষ্যার এক ঘটনা দিয়ে লেখা শেষ করব। জায়গাটি হলো কেওনঝাড় ময়ূরভঞ্জ জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় মনোহরপুরের আশপাশের অঞ্চল।^১ এই অঞ্চল শিবোনামে এসেছিল গ্রাহাম স্টেইনস ও তাঁর দুই শিশুপুত্রের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায়। এখানেই আজ ঘটেছে এক নতুন বিপ্লব। এই বিপ্লব আনার জন্য কাজ করছেন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ - সাঁওতাল মুন্ডা হো প্রভৃতি নানা উপজাতির প্রায় ৬০০ জন লোক। এরা কাজ করে চলেছেন কয়েক বছর ধরে। উদ্দেশ্য সরুপানি নদীর এক জলধারা থেকে সতের কিমি খাল কেটে ময়ূরভঞ্জ জেলার ঠাকুরমুন্ডা ব্লকের ৪৩টি গ্রামে জলের ব্যবস্থা করা। খালের প্রস্থ ২০ ফুট আর গভীরতা ১০ ফুট। সমগ্র এলাকায় জলসেচের অবস্থা খুবই করুণ। ভৌগোলিক এলাকার মাত্র ২ শতাংশ জমিতে আছে জলের ব্যবস্থা। দীর্ঘদিন আন্দোলন ও ভূয়ো আশ্বাসের পর বীতশ্রদ্ধ আদিবাসীরা ঠিক করেন যে নিজেদের জলের ব্যবস্থা নিজেরাই করবেন। সেইমত প্রতি সোম থেকে শনিবার অন্যের জমিতে মজুর খাটা আদিবাসীরা রবিবার করে জমায়েত হন নিজেদের জন্য খাল কাটতে। তারা কোন সরকারি সহায়তা পাননি, পাননি কোন দক্ষ এঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ। পরিকল্পনার দায়িত্ব বর্তায় আদিবাসীদের মধ্যকার সাক্ষর লোকদের ওপর। এগিয়ে চলছে কাজ। ১১ কিমির বেশি খাল কাটা হয়ে গেছে। কোন বাধাই তাদের আটকাতে পারে নি। এই খাল শিমলিপাল সংরক্ষিত বনের একটি রাস্তাকে কেটে দিয়েছে। কিন্তু বনদপ্তরের নানা চেষ্টাতেও সম্ভব হয় নি এই খাল খননের কাজকে বন্ধ করা।

এহেন কাজের ঝুঁকি অনেক। কারিগরি জ্ঞান যাদের নেই, তাদের হাতে এমন কাজে প্রকৃতির ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কাম্বিত ফললাভও সম্ভেহের তালিকায়। তবু এর গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গরীব মানুষ স্বনির্ভর হতে চাইছেন। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবার পর ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন। রাষ্ট্র যত তাড়াতাড়ি তা বোঝে তত মঙ্গল, নাহলে তিস্ত উগ্রপন্থা অপেক্ষারত।

তথ্যসূত্র

১. India Today, September 24, 2001, p - 12
২. do - , September 18, 2000, p - 8
৩. do - , May 8, 2000, p - 56
৪. do - , September 11, 2000, p - 59

৫. do - , May 8, 2000, p - 58
৬. do - , February 14, 2000, p - 12
৭. do - , September 11, 2000, p - 11
৮. do - , June 19, 2000, p - 10

গ্রন্থ সহায়তা

অরণ্যের অধিকার (২০০০), রাষ্ট্রীয় বন শ্রমজীবী মঞ্চ প্রস্তুতি পর্যায় রাজ্য কমিটি

Chatterjee M, Roy S B (Eds) : Reflection on Gender Issues in Joint Forest Management : InterIndia Publication, New Delhi : 1995

Gadgil M, Guha R : This Fissured Land - An Ecological History of India : O U P, New Delhi : 1996

— : Ecology and Equity - The Use and Abuse of Nature in Cotemporary India : O U P, Delhi : 1995

Chopra K : Forest and Other Sectors - Critical Note of Government Policy : *Economic And Political Weekly*, June 24, p, 1480 - 1482, 1995

Jeffery R (Ed) : Social Construction of Forestry in India : Centre for South Asian Studies, Edinburg : 1998

Jodha N S : Poverty and Environmental Resource Degradation - An Alternative Explanation and Possible Solutions : *Economic and Political Weekly*, September 5 -12, p, 2384 - 2390, 1998

Pattanaik B K and Dutta S J F M in South West Bengal - A Study in Participatory Development : *Economic and Political Weekly*, December 13, p, 3225 - 3232, 1997

Roy S B : An Assessment of J F M in Regeneration and Management of Degraded Sal Forest in West Bengal . Paper presented at *International Association for the study of Common Property (IASCP) Conference*

Vancouver, British Columbia, Canada : 10 -14 June, 1998

Sarin M . Community Forest Management - Where are the women : *The Hindu Survey of the Environment*, p, 25 - 29 : 1995

Kothari A, Pathak N, Anuradha R V and Taneja B (Eds) : Communities and Conservation - Natural Resource Management in South and Central Asia . Sage, New Delhi : 1998

Myagmarsuren D . Towards Community Based Conservation in Mongolia : in Kothari *et al*, p, 117 - 129 : 1998

Shrestha B : Involving Local Communities in Conservation - The Case of Nepal : in Kothari *et al*, p, 130 - 147 : 1998

Khattak G M : Community Based Conservation - Experiences from Pakistan : in Kothari *et al*, p, 148 - 169 : 1998

Decosse P J and Jayawickrama S S Issues and Opportunities in Comanagement - Lessons from Sri Lanka : in Kothari *et al*, p, 191 - 218 : 1998

Hill D : Investigating the subsistence Economy in West Bengal : *West Bengal - Beyond The Millenium* . Directed Initiative, Calcutta : 2001.

স্বনির্ভরতা

পথিক বসু

প রি স্থি তি

এই পর্বের আলোচনায় যা আমরা বুঝব -

- আজকের আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে মৃত্যু অতি নিকট এক সত্য
- মৃত্যুকে মেনে নেয়া তাই বাঁচার অন্যতম লক্ষ্য
- মনকে মৃত্যুভয়ের ওপরে রাখার অভ্যাস করতে করতে শুভ জীবনের কাজ করতে হবে

- সেই কাজের শক্তি আসবে মা-প্রকৃতি থেকে
- এই মৃত্যু-আকীর্ণ পরিস্থিতিতে থেকেই
বাজার-অর্থনীতির ভাল নিয়ে খারাপ পরিহার করে
সর্বজনের কল্যাণ করতে করতেই বাঁচার যে উদ্যোগ

তাই স্বনির্ভরতা

আর সেটি

দলে সংগঠনে তো হতেই পারে

কিন্তু তার প্রথম প্রধান মুখ্য উদ্যোক্তা হবেন

একেকজন মানুষ ... যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।

আমরা চাই কি? প্রথমত আমরা ভালভাবে বাঁচতে চাই। তারপর আমরা ভাল পরিবেশ আর পরিস্থিতি চাই যাতে করে শাস্তি বজায় থাকে, আমরা আমাদের কাজ ভাবনা নির্বিঘ্নে সারতে পারি, অহেতুক ঈর্ষাসংশয়সন্দেহে যেন তার ব্যাঘাত না ঘটে। এটাই মূলত চাই। কিন্তু পাই না। না পাবার নানা কারণ দেখি। প্রথমে যা চোখে পড়ে বা মনের মধ্যে যে ভাবনাটা ঘুরপাক খায় তা হচ্ছে, আমি ঠিক অন্যেরা বাধা সৃষ্টি করছে, এই। যতদিন কাজ ছিল কষ্টেসৃষ্টে চালাচ্ছিলাম, কারখানায় লকআউট হয়ে গেল এতো আমার দোষ নয়, এখন বাঁচি কি করে - এমন ঘটনাই সাধারণত ঘটে।

এবং এটা ঠিকও। তবে পুরোটা নয়। কারখানা ব্যাপারটা চাকরি ব্যাপারটা বড়জোর পঞ্চাশ কি একশো বছরের পুরনো - তাব আগেও কিন্তু মানুষ ছিল, আমরা ছিলাম, আমরা নিশ্চয়ই বেঁচেছিলাম নাহলে আজ এলাম কি করে। এইভাবে ভাবতে শুরু করলে দেখব আগের বেঁচে থাকায় সহায়তা করত গ্রামজীবন - মাটিজলহাওয়াবোদ ভরা প্রকৃতি।

সেখান থেকে চলে আসতে হয়েছিল। প্রকৃতি তো শুধু মানুষের একার নয়, যাবৎ প্রাণীকুলের, ফলে তার মর্জি বুঝে তাকে নিজের মতো ব্যবহার করার জ্ঞান নিয়মিত চর্চার ব্যাপার, পরিকল্পনার ব্যাপার। সেটি হয় নি ফলে প্রকৃতিব খেলায় চলায় বাধা আসত, কখনো অতিবৃষ্টি কখনো খরা - ব্যাপারটা অস্বস্তিকরই ছিল। যারা প্রকৃতির মন বুঝে তাকে আমাদের জন্য রয়েসয়ে ব্যবহার করাতে পারতেন সেই বিজ্ঞানীভাবুকশিক্ষাবিদ গোষ্ঠী, তারা, সবাই নয়, অনেকের মনে ভাবনায় গবেষণায় তখন অন্য একটি যজ্ঞের পরিকল্পনাআয়োজনউদ্যোগ - যজ্ঞটা হলো শিল্পযজ্ঞ। এতে প্রকৃতির মর্জির ওপর থাকার দরকার নেই, যা প্রকৃতির জমানো রয়েছে - তেলকয়লাগ্যাসখনিজদ্রব্য - এদের বার করে নেবার মতো জ্ঞান এসেছে, নিজেদের ব্যবহার্য দ্রব্য খাদ্যদ্রব্য বানাবার মতো জ্ঞান এসেছে - এই নিয়ে লেগে পড়ে। লোক ভিড় করল শিল্পে-শহরে। ফলে কি হলো, গ্রাম রইল, চাষাবাস নিয়েই রইল, কিন্তু নতুন হতে পারল না, প্রকৃতির খেলার সঙ্গে মানবমনের মেলবন্ধন করতে পারত যে শিক্ষিতদীক্ষিত সম্প্রদায়, তারা শিল্পসভ্যতাকে আধুনিক ও মার্জিত করতে ব্যস্ত - শহুরে জীবন শিল্পের জীবনটাই যে সুন্দর সেটাকেই তাবৎ মানুষ মানবে - এরকম একটা ব্যাপার চলছিল।

ফলে আমরা দেখতে দেখতে প্রকৃতিলালিত গ্রামীণ জীবনটাই ভুলে গেলাম। সেই জীবনটা যে সত্য সুন্দর ছিল তা নয়, তাহলে এত সহজে ভুলে যাওয়া যেতে পারে না। সে জীবনের সমস্যা যা যা ছিল তাকে শিক্ষিত সমাধানে আনা হয় নি - শিল্পসভ্যতার যেহেতু পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে ধনী রাষ্ট্র ও ধনী সম্প্রদায়, তাদের লক্ষ্য ধন সঞ্চয় করা, সেটা যে পথে সম্ভব তারা সেটায় জোর দেবে, তাই তাদের চাপে সেটি জোরের ওপর আছড়ে পড়ে তৃতীয় বিশ্বে। তার মধ্যে নিশ্চিন্তিও ছিল অনেক - কাজ পাওয়া যাচ্ছিল, টাকা পাওয়া যাচ্ছিল, বেঁচে থাকার মত প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পাওয়া যাচ্ছিল। যা ছিল গ্রামীণ জীবনের সমস্যা, শিল্পশহরে ছিল তার সমাধান। তাই শহর গ্রামের একটা ব্যবধান শব্দ হয়ে উঠল। এই শিল্পসভ্যতার মূল ভিত হচ্ছে বাজার, বাজারে পণ্য আসবে এবং পণ্য বিক্রি হবে - তবেই উৎপাদনশিল্প টিকবে। এদিকে বাজারটা দখল করার, নিজের পণ্য প্রচুর মাত্রায় এবং দ্রুতগতিতে বাজারে পৌঁছে দেবার একটা লড়াই থাকবেই শিল্পপতিদের মধ্যে। সেটা তারা সাদা ও কালো দু'পথেই নিষ্পন্ন করে। কালো পথ হলো বাজার দখল করার জন্য ছোটছোট শিল্পগুলোকে গিলে খাওয়া, সেসব শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লোকদের না-দাম করে দেয়া (তারা কি অসুখ হয়ে উঠবে সমাজদেহে?); অসুখ তৈরি করে ওষুধ বার করে ছড়িয়ে দেবার মতো সমস্যা সৃষ্টি করে সমাধান-ব্যবসা করা; প্রয়োজনে যুদ্ধ বাধিয়ে ধ্বংস করে নির্মাণে হাত দেয়া; জাতধর্মবর্ণ বিভাজনকে উসকে একটা অশান্তির আবহাওয়া জ্বিইয়ে রাখা যাতে যুদ্ধাঙ্গ এবং নেশার দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় ঘটিয়ে যুদ্ধশিল্পের ও নেশার বাজার রাখা যায়, সেইসঙ্গে নারী নির্যাতন ও শিশুদের পরিবারচ্যুত করা যায়। নারী নির্যাতন ও শিশুদের অনাথ করা একটা দুরন্ত ষ্ট্রাটেজি, এতে

অশান্তি উন্মাদনা সমাজের একেবারে সেলুলার স্তরে পৌঁছে যায় যেমনটি ক্যানসার মানবশরীরে ঘটায়। মা তার ঘর পাচ্ছে না, শিশু তার বাবা-মা পাচ্ছে না - এমন সজীব দক্ষ জীবনযাত্রা মৃত্যুময় একটা গতি আনে, যা এই সাম্রাজ্যের যুদ্ধের ধ্বংসের সেলুলার চালিকাশক্তি। এগুলো কালো পথ। এবং এরা বাজার বানায়, বাজার রাখে, আমার আপনার কাজ থাকে। আমাদের এক বন্ধু ১৯৯৮ - ৯৯ সালের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টের একটি সারণি ছেঁচে দারুণ তথ্য বার করেছেন। বিশ্ববাজারে খরচের ঝোঁক কোন খাতে কত তার হিসেব পাই এই -

- যুদ্ধপ্রস্তুতিতে খরচ হলো ৭৮০ বিলিয়ন ডলার
- নার্কোটিকে ৪০০
- মদে ১০৫
- ধূমপানশিল্পে ৫০
- জাপান বাজার ধরতে মনমজানো খরচ করে ৩৫
- স্বাস্থ্যপুষ্টি বাবদ খরচ হয় ১৩
- স্যানিটেশনের জন্য ১১
- প্রাথমিক শিক্ষায় ৬ বিলিয়ন ডলার।

এই তথ্য হাতে পেলে বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় যে সাদাকালো এক জায়গা থেকেই উঠে আসছে। তথাকথিত যুদ্ধ তো নেই, ভারত পাকিস্তান একে অন্যকে দেখে হুংকার দিচ্ছে - আসলে যুদ্ধটা ঘটছে গুজরাট অসমে, অর্থাৎ দাঙ্গা। জাপান বাজার ধরতে যে মনমজানো খরচ করছে তা বজায় রাখতে সেক্স-টুরিসম এশিয়-বাঘদের ঘরে ঘোঘের বাসা হয়ে উঠেছে। কালো এভাবেই স্ফীত হচ্ছে। সাদা এখন রাতের রেলগাড়ির মত, চারধারে নিকষ কালো। তাই সাদা আর কালো দিকগুলোকে ভালভাবে বোঝা দরকার। সাদা দিক হলো - প্রচুর পণ্য, অন্যে পৌঁছবার ঢের আগে, বাজারে পৌঁছে না দিলে যদি বাজার হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে যাকে নাইলে এই কাজটি একেবারে চলবে না তা হলো প্রযুক্তি; প্রযুক্তির পথটা হলো সাদা দিক। আমি হাতে একটা জামা তৈরি করব, সেসময় যন্ত্র পাঁচশো জামা তৈরি করে ফেলেছে এবং আমি পায়ে হেঁটে বাজারে পৌঁছবার ঢের আগে যন্ত্র তার পাঁচশো জামা সাজিয়ে ফেলেছে - তাদের দাম কম, টেকসই বেশি, সুন্ধতা বেশি, বৈচিত্র্য বেশি। কে জিতবে?

কিন্তু অসুবিধে একটা হবেই, আজ হোক বা না হোক কাল হবে নাহলে পরশু... পাঁচদশ বছর বাদে হলেও হবে। সেই অসুবিধেটা আজ এসে গেছে। প্রযুক্তির প্রচুর ব্যবহার মানে প্রকৃতিকে অত্যন্ত দ্রুত মাত্রায় অতিবেশি দোহন করা এবং মানবশ্রমের ব্যবহার কমে যাওয়া। আমি যন্ত্র দিয়ে কাপড় কাটছি আরেকজন যন্ত্র দিয়ে কাটা কাপড় বুনছে - এইটা যে সময়ের অপচয় করে সেটা মিটিয়ে ফেলা যায় যদি এমন যন্ত্র ব্যবহার করি যাতে কাপড় কাটা যায় বোনাও যায়। স্বাভাবিক কথা এও যে প্রযুক্তি এদিকটাই

ভাববে, যদি তার মূল লক্ষ্য হয় দ্রুতগতিতে পণ্যকে বাজারে পাঠানো। আর তাই হলে দুটো যন্ত্রের বদলে একটাতে আসতে হয়, একটা লোককে ছাঁটাই হতে হয়। ফলে, প্রযুক্তি যত এগোয় শ্রমিক তত কমে এবং শ্রমিক কমা মানে কেনার লোক কমা - অর্থাৎ বাজারে পণ্য এল, কিন্তু কেনার লোক কমল, অর্থাৎ বাজারটা টলমল করে উঠল। এটাকে সামাল দিতে বিশ্বজোড়া বাজারের কথা ভাবা হয়, করাও হয়, বাজারকে ছড়ানো হয়। কিন্তু সমস্যা তো রয়েছেই আছে, বিশ্ববাজার মানে প্রযুক্তির আরো দক্ষতা, ফলে বিশ্বজুড়ে লোক ছাঁটাই অনিবার্য, ক্ষেত্র কমে যাওয়াও। সঙ্গে অতি লোহনের দুর্ঘটনা তো রয়েছেই। অর্থাৎ সংকট দুদিকে - সার্বিক প্রকৃতিশোষণ এবং সবিশেষ, মানবশ্রমের অব্যবহারে। সার্বিক সংকট নিয়ে শেষে কথা বলব কারণ মা-প্রকৃতির মন বুঝে তার আশিস নিয়ে অথচ তার রক্ষণা কাটিয়ে চলার পথটাই হলো স্বনির্ভরতার পথ, যে পথের পরিচয় নিতে আমরা এখন বসেছি। তার আগে দেখি মানবশ্রমের প্রয়োজনহীনতার সংকট কিভাবে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

অবস্থাকে সামাল দিতে যুদ্ধের আয়োজন করা যায়। বেশ কিছু ধ্বংস করে নির্মাণে হাত দিলে ঐ নির্মাণকে কেন্দ্র করে বাজার-অর্থনীতি চাঙা হয়। যা যা বইপত্র হাতের কাছে এসেছে তা উন্টপাটে দেখছি, ২০০১ সালের শুরু থেকেই বিশ্ববাজারের মন্দা যাচ্ছে, এমনকি মার্কিন বাজারেও মন্দা দেখা দিয়েছিল। মার্কিন কর্মী ছাঁটাই, অন্য বছরের তুলনায়, একটু বেশি বেশি হচ্ছিল, মার্কিন বাজারে বিক্রিবাটা যথেষ্ট কমে যাচ্ছিল। ফলে একটা যুদ্ধ ঘটতে হবেই। এরপর দেখলাম যুদ্ধটা মার্কিন ভূমিতেই শুরু হলো, আফগান গুহায় বসে নাকি এমন একটা বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিক-চূড়ান্ত-ওঠা আক্রমণ রিমোটাইসড হয়েছে এমন অনুমান মিলতেই যুদ্ধযুদ্ধ শিল্পটা উগড়ে দেয়া হলো আফগানিস্তানে। যারা গুহায় বসে মার্কিন প্রতিরক্ষাকে ধোঁকা দিয়ে এত ভয়ঙ্কর এত নিখুঁত এবং যুদ্ধবিজ্ঞানের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে মার্কিন মূলকে এমন আঘাত হানতে পারে তাদের গুহা এত অরক্ষিত - ভাবা যায় না! অবশ্য তারা গুহাতে তো নেই - যিশু যেমন হারিয়ে গিয়েছিলেন এরাও যেন তাই!

মূল বিষয়টা হলো বাজারের সংকট। দুর্নীতি সন্ত্রাসবাদ - সবেরই একটা সূত্র আছে, সেটা ঐ বাজারের সঙ্গে জড়িয়ে। রুশ বাজারকে ঠেকাতে ধর্মযোদ্ধা বিন লাদেন তৈরি হয়, মার্কিন বাজারকে বাড়াতে এবং অগ্রসরমান চীন-রুশ বাজারকে ঠেকাতে সন্ত্রাসবাদী ওসামার ধ্বংসকণ্ঠে আফগানিস্তান দখল করা হয় - অঙ্কটা বহু ভ্যারিয়েবল সমৃদ্ধ কিন্তু ইউক্লিডিয় সারল্যেই বোধ্য।

২
আমাদের দিক থেকে এই কথাই বলতে পারি - মৃত্যু এসবের অন্যতম প্রতিরোধ, একমাত্র যদি বা না হয়। তোমরা তো মারতেই এসেছ, এস, আমি নিজেই নিজেকে মারছি। এটি

চর্চা করতে হবে। এবং চর্চা রাখতে হবে আরেক মস্তের, তাকেই বলছি স্বনির্ভরতা। মৃত্যুর পরিস্থিতি যেকোন সময় যেকোন ভাবে আসতে পারে - কারণ শিল্পসভ্যতার এটা বড়রকমের শর্ত, শিল্পসভ্যতাই কিছু দুষ্টের জন্ম দিয়েছে এবং তাদের দিয়েই যুদ্ধ-অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে - তারা এদেশে বাবরি মসজিদ ভাঙবে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর গণহত্যা ঘটাবে, আফগানিস্তানে ভাঙচুর করবে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসাবে। তাতে মৃত্যুই ঘটবে, সন্দেহ এবং প্রতিহিংসা আরো আরো মৃত্যু ডাকবে, এবং উলখাগড়া আমরাই মরব। এই 'সভ্যতা'য় যখন মৃত্যু নিশ্চিত তখন তাকে নির্ভয়ে বরণ করে নেয়া একটা আর্ট, আমি সেই আর্টের উপাসক হয়েই বলব, যতক্ষণ বাঁচব মানুষের মত বাঁচব প্রকৃতি ও প্রাণের সুন্দরতা নিয়ে বাঁচব সেই বাঁচার কথা বলব এবং সেটা একটা আর্ট। যতক্ষণ বাঁচব, ততক্ষণ। এবং বাঁচার সংকট ঘনীভূত হলে নির্ভীকভাবে মৃত্যুকে ডাকব, সেটাও একটা আর্ট।

বাঁচার মত বাঁচা নির্ভীক যে বাঁচা সেই আর্টের নাম স্বনির্ভরতা এবং আমরা বলছি, এই স্বনির্ভরতার সাধনা ব্যক্তিকপারিবারিক স্তর থেকে চর্চা করতে হবে।

৩

স্বাভাবিক এখানে আজকের সাম্রাজ্য-সভ্যতার ওপর, যাকে বাজার অর্থনীতি বলে চিনি, তার ওপর একটা সতর্ক জেহাদ থাকবে। বিজ্ঞানের বহু সুফল আমরা ভোগ করছি বহু কুফলে আমরা ভুগছি। চিহ্নিতকরণের একটা শিক্ষা থাকবে, কি নেব আর কি নেব না, সর্বোপরি কতটা নেব তার একটা চর্চা থাকবে অভ্যাস থাকবে। আরো বড় কথা হলো, বাজার নেই তো চাকরি নেই, চাকরি নেই তো খাবার নেই, খাবারের খোঁজে বাবরি মসজিদ ভাঙার কাজ কি সংখ্যালঘু নির্ধাতনের কাজ কি হর্ষদ মেহেতাদের শেয়ার চুরির কাজ অথবা আফতাবদায়ুদদের দলে ভেড়া - অনিবার্য এই গতিটিকে রোধ করা দরকার। আগেই বলেছি, মৃত্যুকে বরণ করার সাহস ও জ্ঞান থাকলে এ পথটায় নিবৃত্তি আসবে, সে জোর বা দাপট থাকবে। এর সঙ্গে ভাবতে হবে, বাঁচার আর কোন পথ আছে কি না। ভাবনা তো এই ছিল - আমরা সুস্থদেহে শুদ্ধমনে ভালভাবে বাঁচবো।

কে বাঁচাবে?

এর আগে যিনি বাঁচিয়েছেন যিনি এতকাল বাঁচিয়ে আসছেন তিনিই বাঁচাবেন - মা-প্রকৃতি এবং এও তাঁর দান - আমরা, আমাদের হাত পা মাথা। আমরা বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃতির মন বুঝে শ্রম করে বাঁচব - বাঁচব আনন্দের শপথে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে বাঁচব।

আবার বলব, এই বাঁচায় কিন্তু মৃত্যুকে অতিক্রম করার মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে মৃত্যুকে আর্টের পর্যায়ে নিয়ে যাবার দক্ষতা অর্জন করা একটি অত্যাবশ্যক শর্ত। এবার ভাবব - প্রকৃতিমনস্ক এই বাঁচার পথটি কি, যাকে বলছি স্বনির্ভরতা।

৪

স্বনির্ভরতা বিশ্লেষণে যেতে হলে অনেকগুলো প্রশ্ন আসবে। ব্যক্তির চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠবে - যে তীব্র মানসিক জোর দরকার যা কিনা অনায়াসে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে, এই তেজটি কিভাবে আসবে? এটা কি সংস্কার নাকি অভ্যাস? এরকম প্রশ্ন উঠবে। প্রশ্ন উঠবে সমষ্টি নিয়ে - সামষ্টিক চেতনা, যা বলবে 'আমরা কাজ করি আনন্দে', এমন হওয়াটা একেবারেই সহজ নয়। যখন বলা হচ্ছে, দুর্নীতি সন্ত্রাস এই সভ্যতারই প্রাণময় ভাইরাস তাহলে তো ধরে নেয়া যেতে পারে এরা তৃণে তৃণে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা ব্যক্তিতে রয়েছে সমষ্টিতে রয়েছে - ফলে তারা বাধা দেবে, দেয়ও। তখন কি করার - এটা একটা প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠবে সমষ্টির নেতা ও সাধারণের সম্পর্ক নিয়ে। এসব প্রশ্নগুলো উঠবে। আমরা এসবের মধ্যে ধাপেধাপে যাব।

৭ দুটো সত্য নিয়ে ভাবনা এগোবে। একটা সত্য হচ্ছে ক্যাশ ইকোনমি, যা আজকের সমাজসাম্রাজ্যসভ্যতার মর্মকথা এবং যার ইতিহাসও দীর্ঘ, যদি মার্কস অনুসন্ধান করি তাহলে দেখব যে সময় থেকে দ্রব্য রূপান্তরিত হলো পণ্যে, পণ্যের মধ্যে দুটো বিপরীতধর্মী মূল্য তেলজল মেশার মতো করেই রয়ে গেল, তেলজলের অমিলমিশের মতো পণ্যধর্মী সমাজে অসন্তোষের শুরু সেসময় থেকেই আর ঝগড়াটা মেটানোর যে ছন্দ তাই হলো ক্যাশ ইকোনমি। তার প্রাচীনত্ব এতটাই। এ একটা সত্য। তার মশ্যেকার অশান্তি (যার বিশ্লেষণ আমি করেছি বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন বইতে) তেমনি সত্যি, বারবার সেখান থেকে অশান্তি ওঠে ও তাকে দমানো হয় সেও একটা সত্য। আবার একটা বৃহৎ সত্য আছে যা হচ্ছে প্রকৃতি। প্রকৃতি অনিশেষ শক্তি দান করে চলেছেন সবাইকে, কারোকে বঞ্চিত না করে - রোদবৃষ্টিমাটিহাওয়া সবার। বাস্তবে তা সবার হয় না কারণ আমাদের সৃষ্টপুষ্টি ক্যাশ ইকোনমি - যদিও প্রকৃতির সত্যে সৃষ্টিস্থিতিলয় সবার জন্য সবার ওপর সর্মান প্রযোজ্য। এই বৃহৎ সত্যটা নিয়ে আমাদের ভাবনা সাজাতে হবে। প্রকৃতির শক্তিকে কিভাবে নিজেদের বাঁচার আনন্দে নিযুক্ত করে ক্যাশ ইকোনমির অশান্তিকে উপেক্ষা করতে পারি তার সাহস দেখাতে হবে - স্বনির্ভরতার এই হলো মূল ভাবনা।

আমরা দেখছি এই সমাজসাম্রাজ্যের প্রধানতম, একমাত্র নয়, ঝোঁক হলো যুদ্ধ ও নেশার বিস্তার। এর পরিণাম কি? যা বাস্তবে ঘটছে তাই। যেনতেনপ্রকারেণ দাঙ্গা বাধাবার প্রচেষ্টা - সেলুলার স্তরে অর্থাৎ জাতবিশ্বাসবর্ণ বিভাজনকে উসকে দেয়া। এবং পরিবারগুলোর জন্য শিক্ষাস্বাস্থ্য ঋতে কম টাকা রাখা হয়েছে এজন্যই যাতে তারা এনলাইটেন্ড হবার আগে বিবিধ ধরনেরনেশায় এনটাইটেন্ড হয়ে যায়। তাহলে কি করার? করার মতটাই এই - যেহেতু সংকট সেলুলার স্তরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে তাই ঐ স্তর থেকেই ধ্যানকর্মযজ্ঞ শুরু করতে হবে। বাধা আসতেই পারে। যুদ্ধের ব্যবসা নেশার ব্যবসা যারা করছে তারা ব্যবসা বন্ধ হবার ইশারা পেলে বাধা দেবে (শঙ্কর গুহনিয়োগীকে মনে আনা যেতে পারে) - কিন্তু কোথায় বাধাটা দাঁড়াবে? উত্তরণ শুরু

হচ্ছে পরিবার থেকে তাই একটা শঙ্কর এখন নেই, লক্ষ শঙ্কর নিজের নিজের মঙ্গলে ব্রতী হয়েছে - কজনকে মারা সম্ভব? তবুও প্রথমে স্বীকার করে নিয়েছি, মৃত্যু সবসময় পাশেপাশে থাকছে, তাকে আঁটের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

তাই কাজের ক্ষেত্রগুলো আমাদের সেভাবে সাজাতে হচ্ছে যাতে পরিবারভিত্তিক কাজ করা যায়। এটাই শিক্ষা, এটাই আন্দোলন, এতে ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়, এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষেরা সংগঠন গড়লে সেই সংগঠনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়। এমন প্রশ্ন উঠবে - অবশ্যের এই যুগে একা মানুষ কি একটাদুটো পরিবার কোন দাগই ফেলতে পারে না; দলবদ্ধ না হলে কোন কাজ হয় না। আমি বলছি, যখন দল নেই তখন কি করার? অথবা, ধরা যাক, দল আছে, সে দল ভালো কাজই করছে, তখনো ব্যক্তির নিজস্ব কর্তব্য বলে কিছু থাকবে। এবং এও তো ঘটে - দল আছে, দল এই সাম্রাজ্যের নরমগরম সমালোচক সেজে এই পণ্যগণ্য জ্ঞানতথ্য শোষণে নেমেছে - তখন কি করার? মূল কথা, এটা সেই সময় যার ভার জার্তকের গল্পকারেরা বুঝতে পেরেছিলেন এবং লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কথা বলেছিলেন। এটা সেই অবস্থা যাকে অনুমান করে শ্রীঅরবিন্দ চেতনার ক্রম-উত্তরণের কথা বলেছিলেন, সাংখ্য জ্ঞানিয়েছিল একেক মানুষ নিজের মতো করেই নিজের মুক্তি রচনা করুক (এই নিজ শব্দটা অবশ্যই ব্যাপক)। আমরা বলছি, ব্যক্তিক স্তর থেকেই শুদ্ধ সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে আমাদের কিছু উদ্যোগ নিতে হবে যারা আমাদের উন্নত করবে পরিস্থিতিকে উন্নত করবে। এই 'আমি'রা দলে থাকলে দল সমাজ পরিকর্তনের যোগ্য শক্তি হতে পারবে। সবই পণ্য এমন শক্তিমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধতা করতে গেলে প্রকৃতির স্বৈর্যশক্তি সম্বন্ধে পরিচয় ঘনিষ্ঠতা আনতে হবে এবং ব্যক্তিজনকে উপযুক্ত হতে হবে। বিকল্প বলি বা অন্যপথ বলি সেটা একটাই। সবই পণ্যশক্তি, বিশ্ব এই পণ্যশক্তির ছত্রছায়ায় - এর উপযুক্ত প্রতিবাদ - প্রাণময় প্রকৃতি আর মানুষের সম্মিলিত শক্তির ব্যবহার। আর তার সাধনালব্ধ ফল নিয়ে যে সমাজনির্মাণ সেটাই শুভ সমাজ। যেখানে, সবাই ভালো থাকতে পারে কেউ কারো ক্ষতি না করে। দল তার চর্চা করতে পারে কিন্তু ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম তা করতে হবে। আমিই একমাত্র জানি আমি কতটা ভালো কতটা মন্দ, মন্দ কাটিয়ে ভালো হবার কাজ তাই আমাকেই করতে হবে।

কাজগুলো কি?

কাজগুলো হলো -

সুস্থদেহ বজায় রাখা

শুদ্ধচিত্তে থাকা

পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা চাওয়া

পুষ্টিকর দাবার

টেকসই

দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরি

ঘরোয়া উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের পুনর্ব্যবহার।

এর সঙ্গে যোগ হবে বর্তমান অবক্ষয়ী যুগে যা যা 'ভালো' রয়েছে তাকে সোয়া ব্যবহারযোগ্য করা। যারা হলো -

পরিবার সমাজ প্রকৃতিকে প্রাণময় করার কাজ

পণ্য অর্থনীতির প্রয়োজনীয় দিকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার

বিজ্ঞানপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয় দিকের ব্যবহার

রাষ্ট্রকে সতর্ক করার কাজ

জলহাওয়ামাটিরোদ - প্রাকৃতিক শক্তির বিজ্ঞানচর্চা।

বলার কথা এও যে এর সবকটা পারিবারিক স্তর থেকে করা যায়।

৫

মোটাদাগের একটা তথ্য বলছে - এই ভুবনে ষাট ভাগ মানুষের দরকার পড়ে শিল্পসভ্যতাকে চলিষ্ণু করার কাজে, বাকি চল্লিশের কোন প্রয়োজন নেই। এরা বাড়তি, রাজার ঐটো, যমের অক্লি। ষাট ভাগের আবার ওপরের কুড়ি নিচের চল্লিশের চেয়ে ঢের ঢের অর্থ ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ এটা বোঝাতে চাইছি, শিল্পসাম্রাজ্য থেকে যাবার কোন কারণ দেখছি না, তাকে ভাঙার কথাও ভাবছি না, তাকে উপেক্ষা করার সাহস ও দক্ষতা পেতে চাইছি। শিল্পসাম্রাজ্য তার নিজের ঢঙে চলবে, তার প্রয়োজনে এইডস-প্রতিবেদক ছড়াবে (স্বাভাবিক তাই, এইডস রোগটাও ছড়িয়ে যাওয়া, নাহলে, রোগ না হলে, ওষুধ বিক্রি হবে কি করে) - আমি তাকে উপেক্ষা করতে পারি, মৃত্যুকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি, এই সাহসটা দরকার। কথাটা একটু অন্যভাবে বলতে পারি। যদি এভাবে ভাবি যে, জীবিকা আমার থাক বা না থাক, টাকা আমার থাক বা না থাক, আমি এবং আমার পরিবার প্রকৃতির সহায়তায় কতটা প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারি। উত্তর হলো অনেককিছুই পারি, যদিও সব পারি না। পৌরাণিক সেই ঋষির গল্পটা মনে করা যেতে পারে। এক ঋষি ছিলেন যিনি নদীঋণের জল আর গাছগাছালির ফল খেতেন, ফলতত্ত্ব শুতেন, শীতের বালাই ছিল না, লাগত কেবল একটা কচুপাতা - তা মাথায় দিয়ে তিনি ব্রোদের তাপ ঠেকাতেন বর্ষার জল ঠেকাতেন। তাঁর সবটা তিনি প্রকৃতি থেকেই পেয়ে যাচ্ছেন। আমাদের ঐ মত হয়ে ওঠার একটা কথা বলা যায় বটে, সে সংগ্রামও থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের চাইনা আরো কিছু বেশি। শীতগ্রীষ্মবর্ষার উপযোগী বাসবস্ত্র, বাহুল্য না হলেও, চাই; পা-টাকা জুতো না হলেও, চটি স্যান্ডেল চাই - ইত্যাদি। প্রকৃতি কিন্তু এখনো আমাদের সুস্থদেহ ঐশ্বর্যময়ের খোরাকটা মিটিয়ে দিতে পারেন। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে, দেড় কাঠা জমিতে, জমি না হলে টব, টব না থাকলে পলিথিন শিটের মোড়কে, সারা বছরে দেড় টন সজ্জি ফলাবার কায়দা মানুষ বার করে নিয়েছে। দেড় কাঠা জমির দাম, গ্রামে, মোটামুটি

পনেরো হাজার টাকা - আমরা, যারা ষাটের দলে রয়েছি এবং আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা যদি থেকে থাকে, আমরা নিচের চম্পিশের জন্য ঐ জমিটা খরিদ করে দরিদ্র মানুষটিকে ধার দিতে পারি, সেখানে সে চাষবাসের পরীক্ষা করতে পারে। এবারের প্রশ্নটি মূল্যবান - নাহয় জমি কিনলাম, নিচতলার বন্ধুটিকে দিলাম, নিচতলার বন্ধুটি কি চাষ করবে?

প্রতিটি প্রশ্নই ইঙ্গিত করছে ব্যক্তিমানুষের হয়ে ওঠা নিয়ে। আমরা ক্যাশ ইকোনমিকে কেন উপেক্ষা করব তা বললাম, প্রকৃতির শক্তিতে কেন নির্ভর করব তা বললাম, এবার ভাবব সেই শক্তির ফসল ফলাবে যে মানুষ তাদের নিয়ে। এই এক এক মানুষকে হতে হবে - শ্রমী সংযমী সমব্যাপী - দয়া দয়ধর্ম দস্ত - দাও, অতিরিক্ত লোভভোগকে দমন করো, দয়া করো। এবং এটা শিক্ষার ব্যাপার, করে দেখার ব্যাপার। শিক্ষিত বেকার তৈরি না করে এরকম শিক্ষার পাঠক্রম তৈরি করতে হবে, যাতে শিক্ষিত যুবক বেকার হচ্ছে চাকরির অপেক্ষায় না থেকে, নিজেরটা নিজের হাতে করে নেবার জ্ঞানকর্মে পটু হয়। মৃত্যুকে নির্ভীক ভাবে উপেক্ষা ও বরণ করে নেবার পরবর্তী শর্ত হলো এই শিক্ষাটি নিয়ে কাজ করা বলা আন্দোলন করা। দুটো পরীক্ষার কথা এবার বলব।

৭

তরুণ ভারত সংস্থের জল-জমি-জ্বালানি আন্দোলনের মূল জোর দুটি - মা-প্রকৃতি ও সংঘবদ্ধ মানুষ। মানুষ যদি সংঘবদ্ধ হয় এবং মা-প্রকৃতির মনের কথা বোঝার মত জ্ঞান (যা আমাদের ছিল, শিল্পসভ্যতার দাপটে এটি লোপ পেতে বসেছে) ফিরে পায় তাহলে না-দাম মানুষ মর্যাদা নিয়েই বাঁচতে পারে মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারে। অতি সহজ এবং অতি শক্তিশালী তিনটে অস্ত্র প্রকৃতি দিয়েই চলেছেন, তারক' রক্ষা কর ধারণ কর হাতিয়ার কর - অতি সহজে লভ্য তারা এবং অতি বলশালী। বৃষ্টির জল, এক বিন্দু জল, অপচয় নয়; এক কণা মাটি অপচয় নয়; এই জল ও মাটি জোগাবে অল্পসম্পদ জীববৈচিত্র্য জীবনকে শুদ্ধ করার যাবতীয় হাতিয়ার। আবার বলছি, তবুটা ঠিক এতটুকুই, এতই সহজ। পরিণাম - বৃষ্টির জল ধরে ধরে আরাবরী নদী, ভূমিক্ময় রোধ করতে করতে বিশাল অরণ্য বিপুল সম্পদ।

এখানে অত্যাাবশ্যক শর্ত দুটো। মা-প্রকৃতির মন বোঝার মত শিক্ষার্জন, তদনুসারে কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ। এবং, সংঘবদ্ধ সমিতিবদ্ধ মানুষ, একা মানুষের এটি করার বিষয় নয়। যদিও, এর পরবর্তী পর্যায়ে, সেন্টার ফর সায়েন্স এ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ব্যক্তিজনের কাছে, শহুরে মানুষের কাছে বৃষ্টির জল ধরে রাখার প্রয়োজনীয় কিট বার করতে পেরেছেন। লক্ষ করার ব্যাপার আমরা স্বনির্ভরতাকে ব্যক্তিক স্তর থেকে ওঠাতে চাইছি। তাহলে ঐ কিট আমাদের কাছে লাগতেই পারে। এবং তরুণ ভারত সংঘ যদি সফল হয় তাহলে স্বনির্ভরতার যে যে শর্ত আমরা ভাবছি তা তাত্ত্বিকভাবে সফল ও নিখুঁত। জীবিকায় আমি

রিক্সাচালক হতে পারি মুটে হতে পারি মাটি কাটতে পারি - যা যে কোন সময় আমাকে কর্মচ্যুত করতে না-দাম করতে হত্যা করতে অসামাজিক করতে উদ্যত - এই আমি'দের স্খন্দ্য, আমরা যারা ভাবছি, ইচ্ছে থাকলে আমরা পারি ঐ আমি'দের জন্য মা-প্রকৃতির আশীর্বাদটি বপন করতে। দায়বদ্ধতা আমাদের, যারা লিখছি তর্ক করছি, তাদের।

পাশাপাশি আরেকটি পরীক্ষার কথা বলতে হয়। এই পরীক্ষাটি এতই সফল যে এম এন সি'রা এর মধ্যে চলে এসেছে! ফলে একটু সতর্কতাও দরকার। আমাদের করা অনেকানেক কাজ - ঘর ছইতে, চুবড়ি বানাতে, কি রিক্সার টায়ার সারাতে - কিছু টাকা লাগে। পুনরুজ্জীবিত করব, আমরা ক্যাশ-ইকনমিকে অস্বীকার করার কথা ভাবছি না, কিন্তু গ্রহণবর্জনের সীমারেখাকে কমাতে পারি। জ্বর হলে ওষুধ খাব নাকি শিউলিপাতা চিবিয়ে খাব - এটি নির্বাচন করার সাহস ও ঔদ্ধত্য থাকা দরকার। অবশ্যই জ্বরটি যদি জটিল কোন রোগের চিহ্ন হয় তাহলে, ধরা যাক - টাইফয়েড, গাঙ্গি যে দক্ষতা নিয়ে তাঁর সম্ভানকে এই অসুখ থেকে সারিয়ে তুলতে পেরেছিলেন সেই সাহস একদিনে আসা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে ওষুধ খেতে হবে।

সেই হিসেবে বলছি টাকার দরকার, সে টাকাটা, যত কমই হোক, তৃণমূলে, নিঃস্বমানুষের কাছে থাকার অসাধারণ পথ পাই মহিক্রোডেডিট ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে। সেখানকার চালিকাশক্তি অথবা অভ্যন্তরীণ শক্তিসূত্র হলো - নিঃস্বমানুষের শ্রমই অর্থ, এই অর্থ দশকুড়িজন নিজেদের মধ্যে গচ্ছিত রেখে সুদিনে সঞ্চয়ে, বিপদে ধার করে জীবিকার গেরো খুলতে পারে (শ্রয়ণ জুন ২০০১ সংখ্যাতে শুধু এই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছে - উৎসাহী পাঠক সংগ্রহ করতে পারেন)।

তাই প্রশ্ন হলো অথবা শপথ হলো - রাষ্ট্র আসুক বা না আসুক, রাষ্ট্রশক্তি মানুষ বা না মানুষ, এটাই কাজ; মানুষের, মানুষের মত, বেঁচে থাকার এটাই কাজ। নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা স্বীকৃত হবার ফলে আমাদের বলার প্ল্যাটফর্মগুলো বেড়েছে, কিন্তু তারা না থাকলেও এই কাজটা কাজ হয়েই থাকত। এখন ব্যাঙ্কের আটচালায় বসে, টাকাপয়সা লেনদেন করতে ঐ মানুষদের সুস্থ দেহ শুদ্ধ মন আর মা-প্রকৃতির অফুরান আশীর্বাদের কথা বলতে পারি, এটাই বাঁচা এটাই স্বনির্ভরশীল হওয়া। যার একটু বেশি আছে তিনি একটু দেবেন, যার নেই তিনি এই দেয়াকে কাজে লাগিয়ে নিজের ঘাটতি শ্রমবুদ্ধি দিয়ে মেটাবেন - দানডোলখয়রাতে ভিখারি হবেন না। জলজমিছালানি আন্দোলন আর নিঃস্বমানুষের ব্যাঙ্কব্যবস্থা এই ভিখারিবৃত্তিকে নাড়া দিয়েছে। দুটোই সামষ্টিক, আমরা ব্যক্তিকপারিবারিক উদ্যোগটি বুঝতে চাইছি।

মানব প্রকৃতি

পড়বেন যারা এই লেখা - ধরে নিতে পারি, তারা ওপরের ষাটের একজন, যার মন আছে দরদ আছে, নিচের চল্লিশের না-দাম দশা এবং অনিবার্য সম্ভাসবাদে লিপ্ত হওয়াটা যিন্মি-মেনে নিতে পারছেন না তাদের বলছি, মানুষের মাথার ওপর এখনো মা-প্রকৃতি অসীম প্রভাবশালী - এখনো তাঁর জলমাটিহাওয়ারোদ (বিস্তৃত অর্থে - ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম), কলুষিত হলেও, নিষ্কলুষ হতে পারে। সহজতম পরীক্ষাগুলো আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে, যেমন -

- ১। এক কাঠা জমিতে সম্বচ্ছরের চাষ
- ২। একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার, খুব কম খরচে রাখাশাওয়া
- ৩। প্রাকৃতিক চিকিৎসা - দেহ সুস্থ রাখার সহজতম ঔষধিশুশ্মলতাপাতা চাষ
- ৪। মনের জোর আনা - তেজোদীপ্ত ও সৃষ্টিশীল হবার ধ্যানাভ্যাস
- ৫। সহজে বাসবস্ত্র বানানো
- ৬। সহজে মাটিহাওয়াজলরোদ সঞ্চয় - এরাই এই স্বনির্ভর সমাজের সম্পদশক্তিঅর্থ
- ৭। পরিবারসমাজকে রিচার্জ করার নিষ্ঠা-ব্যবস্থা
- ৮। তবু কিছু অর্থ যদি লাগে মাইক্রোব্যাঙ্কিং মারফৎ তার ব্যবস্থা করা।

এই হলো অন্যের ক্ষতি না করে আনন্দে বাঁচার পথ। ভালভাবে মান মর্যাদা নিয়ে থাকার পথ। আর এর অনেকটাই আজ নাগালে। বাধা যা হয় তা হলো -

- ১। ক্যাশ-ইকনমির ওপর অহেতুক অতিনির্ভরতা - এমনটা ভাবা যে চাকরিই সব, চাকরি না পেলে জীবন বৃথা
- ২। প্রকৃতির স্নেহ ও ক্ষমতা এবং রক্ষতা সম্বন্ধে অজ্ঞানতা
- ৩। ব্যক্তিগত বাধা - যেমন দৃঢ়তার অভাব, ভয় পাওয়া, সর্বত্র প্রসারিত দাদাতন্ত্রের দাপটে আতঙ্কিত থাকা
- ৪। সামষ্টিক হবার বাধা - আমি ভাবছি কিন্তু অন্য কেউ ভাবছে না, তাহলে কি করে কাজ এগোবে - এমনতর সেই বাধা।

এখানে আমাদের স্পষ্ট অভিমত হলো নিজেকে পরীক্ষায় নামানো। প্রথমত, স্বনির্ভরতার এই পথটি নিজে করে দেখা যায়, করতে করতেই আরো সহজে ভাল থাকার পথ পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই পথ চলতি পাওয়া জ্ঞান প্রচার করা যেতে পারে। কম খেয়ে যদি আমি ভাল থাকি ওষুধ না খেয়ে যদি আমি ছোটখাট ব্যাধি সারাতে পারি - সেটা তো বলারই ব্যাপার। এর জন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে লোক খুঁজতে লাগে না দল গড়তে লাগে না। আমার বাড়িতে দুজন লোক কাজ করে, একজন বাসন মাছে অন্যজন রান্না করে ... পথচলতি এরকম লোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ যথেষ্ট হয়। আমি এদের নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে পারি, যদি ইচ্ছে করি। এই মানুষগুলি কাজ সেের ফিরে যাচ্ছে গ্রামেবস্তিতে - অর্জিত শিক্ষা প্রয়োগ করে সেখানে ভালভাবে বাঁচছে, মনের দিক দিয়ে হচ্ছে সাহসী

আনন্দী; এটা স্বচ্ছভাবে অন্যদের এই পথ সম্বন্ধে কৌতুহলী করে তোলে। এই পরীক্ষাটি আমরা করেছি (লক্ষ্মীকে নিয়ে পরীক্ষা : শ্রয়ণ : সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০০) - এমনি শিখেছি। চতুর্থ, প্রথম তিনটে নিয়ে চলতে থাকলেই আমরা আগ্রহী মানুষজনের সাক্ষাত পাই, পাব। ওপরতলার, নিচতলারও - উদাহরণে যাদের টেনে এনেছি, আমার বাড়িতে যে দুজন কাজ করে তারাই আগ্রহী হয়ে ওঠে (এও আমাদের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান)। এই আগ্রহী মানুষদের এখন দরকার দেড় কাঠা জমি, তাতে সে এক ঘন্টা শ্রম দিলে দেড় টন সজ্জি ফলাতে পারবে। এই জমিটি আমার পক্ষে কেনা কঠিন নয়। এখানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্তটি হলো : আগ্রহী জেদী মানুষ পেতে হবে। যতদিন না পাচ্ছি প্রথম তিনটে পথ তো নিতেই পারি। তর্ক অনেক হলো, প্রশ্ন নিয়ে অনেক বাড় বইল - আসল পথ তো এই। মৃত্যুর উর্ধ্ব দাঁড়াব, ক্যাশ ইকনমিকে একমাত্র পথ না ভেবে প্রকৃতির মন বুঝে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা চালাব। পরীক্ষাগুলো সহজ, অনেকগুলো শুরুও হয়ে গেছে, না-দাম মানুষ মর্যাদা নিয়েই বাঁচতে পারছে, অবশ্যই এতে ওপরতলার মানুষের দরদ বুদ্ধি প্রচার আন্দোলন ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে।

২

আমরা কাজ শুরু করব রবীন্দ্রশিক্ষা মনে এনে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার সময় ছাত্রছাত্রী কি শিক্ষকেরা যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদায়ের অনুমতি নিতে যেতেন, জানতে যেতেন কি করতে পারেন শান্তিনিকেতনের জন্য - রবীন্দ্রনাথ বলতেন, যেখানে যাচ্ছ সেখানে একটা শান্তিনিকেতন গড়ো, গড়ার চেষ্টা করো। আমরা ভাবনাটিকে আজকের বাস্তবতার সঙ্গে জড়িয়ে বলছি যে, একটি পরিবার আরেকটি পরিবারকে ভাবুক, নিজের করে নিক। অল্প যদি এই হয়, ওপরে আছে যাট ভাগ নিচে চল্লিশ, তাহলে এক ও একের সম্মিলন বিশ্বকে শুদ্ধ করতে পারবে। এটা স্বপ্ন আশা ঠিকই, স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখতেন আর দেখতেন বলে একটা দুটো গ্রামকে তিনি গ্রহণ করে পরীক্ষা করেছিলেন যারা মডেল হয়ে বিশ্বকে পথ দেখাবে এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল। স্বপ্ন আমরাও দেখব আর এই স্বপ্ন নিয়ে ভাবব বাস্তবে কিভাবে চলব। প্রথমে যে প্রশ্নটি স্বচ্ছ করে নেয়া এবার দরকার তা হলো, আমরা কারা - ওপরতলার যাটভাগ? আমরা সবাই কি অপরের জন্য প্রস্তুত? সজাগ? দরদী? না, নই। শতকরা হিসেব পাব না আর তার প্রয়োজনও নেই, বহু মানুষের বহু অভিজ্ঞতার সারাৎসারমাফিক বলতে পারি - এই সমাজে মূলত চার ধরনের চার চরিত্রের মানুষ রয়েছে। খুবই কম সংখ্যক একদল আছে (কিন্তু ঠাসবুনোন তাদের চক্র) যারা ধূর্ত কৌশলী - সাদাকলোর মিশেল দিতে দক্ষ। তেমনি কম সংখ্যক মানুষ আছেন যারা আদর্শবাদী সমাজমনস্ক। বাকি বেশিদের মধ্যে, সাধারণত ওপরতলার মানুষেরা, যাদের মধ্যবিন্দু বলে কখনো চিহ্নিত করে থাকি, তারা নিজের আবর্তে তৃপ্ত ব্যস্ত ক্ষুদ্র বিষয় বিরক্ত একঘেয়েমিতে ক্লান্ত। আর নিচতলার বেশি সংখ্যক মানুষেরা ইহাও নয় উহাও

নয়' - স্বপ্ন নেই সাধ নেই আকাঙ্ক্ষা নেই, শ্রেফ বাঁচার জন্য বাঁচা - চাহিদা কম উদ্যোগ তলানিতে। এই মানুষরা দিলে হাত পেতে নেবে, না দিলে অনাহার অর্ধাহারে দিন কাটাতে। কিন্তু হাতপামাথা সঞ্চল করে নিজের থেকে নির্মাণে নামবে না। যেমন প্রথম বিশ্বের মানুষ যদি লোভভোগ না কমায় (যে কথাটা এখন বিশ্বব্যাঙ্কের সবকটি সংস্থা ঘুরিয়েফিরিয়ে বলতে চাইছে) তাহলে আমাদের এই তৃতীয় শ্রেণীর দুনিয়ার মঙ্গল অসম্ভব, ঠিক তেমনি, ওপরতলার মানুষ যদি না উদ্যোগী হয় নিচতলার এই বৃহৎ সংখ্যক মানুষ এমনি রাজার ঐটো থেকে যাবে।

তাহলে, মানবচরিত্র যদি এই হয় স্বনির্ভরতার পরীক্ষা কখনো কি একমাত্রিক হবে? এই প্রশ্নটা আমাদের কাছে নানাভাবে এসেছে। আমরা উত্তর খুঁজতে চেয়েছি।

যা পেয়েছি তা হলো ওপরতলার যে বিশাল সংখ্যক মানুষ যারা নিজের আবর্তে সুখীস্বকৃবিরক্ত একঘেয়ে - এই সংখ্যাটা তো বিরাট, এদের প্রশ্নহীন জীবনযাত্রায় সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন এমনি এমনি তোলা বৃথা। তখন প্রশ্নটা আনা যায় যখন এরা সমাজমনস্ক মানুষদের জীবনধারায় আকৃষ্ট হয়। অথবা কোন প্রত্যাশিত আঘাতে (এই সমাজব্যবস্থায় সুখ তো আরো অনিত্য) তৃপ্তির ফানুস যায় ফেটে - তখন এরা বৃহত্তর আনন্দের খোঁজ করে। তাই প্রধান ভ্যানগার্ড এই অল্পসংখ্যক ভালমানুষের চলার নীতিটাই ভাবনায় উঠে আসে। তারাই স্বনির্ভর সমাজের নির্মাণে নামবেন নেমেছেনও। দেখাদেখি আপন গৃহকোণে বদ্ধ তথাকথিত মধ্যবিত্ত মানুষগুলোর মধ্যে ঔৎসুক্য আসে, আমরা দেখেছি। সেই বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য কি ভাবনা কি মন্ত্র? ওপরতলায় বিরাজমান ষাটভাগ মানুষের সিংহভাগ তো এরাই - ওপরনিচ সম্মিলনের যে স্বপ্ন দেখছি তা ততদিন অধরা থাকবে যতদিন এদের পরিপাটি গৃহমন্দিরে দুঃখিনী সমাজজননীর আবির্ভাব না ঘটবে। কি মন্ত্র তাহলে এদের জন্য উপযুক্ত?

আমরা একটা সহজ কথা বলতে চাইছি - নিজের মধ্যে থেকেই নিজেকে ছাড়িয়ে দিন। প্রথমে এই প্রশ্ন করুন নিজের থেকে জানতে চান - এই মুহূর্তে আপনি এমনকি করতে পারেন যা আপনি যেমন আছেন তেমনি থাকতে থাকতেই আপনার পরিধি ছাড়িয়ে দিতে পারে। আপনি খাচ্ছেন, আর একজনের খাবার কি নেয়া যায় না? আপনি পড়ছেন, অন্তত রামায়ণ মহাভারত কি আর কারোকে পড়ে শোনানো যায় না? যায়। যায় তখন যখন এই সহজ প্রশ্নটা নিজেকে করতে পারবেন - এই মুহূর্তে নিজের মধ্যে থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে কি করে - এই সহজ প্রশ্নটিই পারে সহজ উদ্যোগ নিতে।

যার একটু আছে তাকে ওপরতলার একজন বলেই চিহ্নিত করছি, তার কি এই উদ্যোগ নেয়া অসম্ভব? তিনি তার স্বাভাবিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়েই পরাধীনতা করতে পারেন। এই বাঁচা তাকে ক্ষোভ বিষণ্ণতা একঘেয়েমি দুঃখের হাত থেকে উত্তীর্ণ করবে, শাস্ত আনন্দের জগতটা চিনিয়ে দেবে। যে কোন মানুষ যে কোন পরিবার এই এই কাজ করতে পারেন -

- আমি খাচ্ছি, একটা পরিবারকে তাই খাওয়াচ্ছি
- আমি দৈনিক যা টোটকাপথ্য ব্যবহার করছি, মাস্ট্রিনাল পরিবারটিকে তাই দিচ্ছি
- আমি মনকে সংযত করছি, তাদেরও শেখাচ্ছি; সপ্তাহে একদিন রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের যাবার কথা ভাবছি
- আমি ফলফুলের গাছ বসাই, তাকে কেন্দ্র করে পাখিপূজাপতি বাঁচছে
- আমি পাখিদের জন্য খাবার দিচ্ছি, পাখির বাসা করছি
- আমি চিন্তা করছি আমাকে ছাড়িয়ে কি কি আজ করলাম
- আমি ক্লীসস্তানকে নিয়ে এই এই কাজগুলোই আরেকটু বেশিবেশি করছি
- সেকথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে পাড়াঅফিসসংগঠনে বললাম
- জীবিকাশ্বেদ্রে আমি কাজকে সেবাময়তার সচেতন প্রয়াসে আরো উজ্জ্বল করতে পারি
- পরিচিত সবক্ষেত্রে ঐ 'নিজের মধ্যে থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার' পরীক্ষা ও প্রাপ্তি নিয়ে বলতেই পারি।

উ দ্যোগ

তাই আপনি নিজেকে নিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার পরীক্ষা করুন। এটা আপনাকে সাহস দেবে, আত্মশীল হবেন আপনি আপনার কাজের ওপর। সহায়ক হিসেবে আপনি আপনার বাড়িতে কাজ করছে যে মানুষটি তার পরিবারকে অথবা যে মানুষটির রিক্সায় চড়ে আপনি দোকানবাজার করেন তাকে ও তার পরিবারকে প্রথমে বলুন - কত সহজে আপনি দেহেমনে সুস্থ রয়েছেন সেটাই জানান শেয়ার করুন। সে আগ্রহী হলে আপনার কর্মপদ্ধতিটি তাকে দিন। দুই, যে সংগঠনের সঙ্গে আপনার পরিচয় রয়েছে, যেখানে বললে বন্ধুরা আপনার কথা শুনবে - সে পাড়ার ক্লাব হোক, সাংস্কৃতিক সংস্থা হোক, রাজনৈতিক অফিস হোক - যেখানে আপনি পরিচিত - সেখানকার বন্ধুদের বলুন। যা আপনি করছেন ও যা যা ফল আপনি পাচ্ছেন তার কথা। তিন, ইতিমধ্যে একটি কাজ রাষ্ট্রস্বীকৃত, তা হলো মাইক্রোব্যাঙ্কিং প্রথা। এরকম ব্যাঙ্ক এই দেশে, পশ্চিমবঙ্গেও, অনেক রয়েছে - ওখানে সেইসব মানুষেরা যান যারা দুঃস্থ, ন্যূনতমও যাদের নেই, আপনি ওখানে কাজ করুন, সেই সঙ্গে স্বনির্ভরতার যা যা পরীক্ষা আপনি করছেন তা বলতে থাকুন। আমি একঘণ্টা বেটে যদি দেখে সুস্থ মনে শুদ্ধ, সহজে স্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্য তৈরি করতে পারি কি রীতিতে পারি, সহজে টোটকা ওষধি দ্রব্য বানাতে পারি সেটা বলার মতই ব্যাপার। একাজ আপনি করতেই পারেন।

কাজগুলোর পরিচয় নেয়া যাক।

১। দেহশুদ্ধি - ক. সপ্তাহে একদিন বমনযৌতি - পাঁচগ্লাস ঈষদুষ্ণ জল সামান্য নুনে মিশিয়ে খেয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করা। বমি হবার পর একগ্লাস জল খেয়ে নেয়া। যারা কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত এই কাজ তারা পরামর্শ ছাড়া করবেন না; খ. সপ্তাহে একদিন বস্তিযৌতি - দু গ্লাস ঈষদুষ্ণ জলে চারটে পাতিলেবুর রস এবং ২৫ গ্রাম নুন মিশিয়ে খান, বার পাঁচছয় দাস্তের পর এক গ্লাস জল খান, সেদিন গুরুপাক খাবার খাবেন না, হালকা ঝোলভাত খাবেন। যারা ইতিমধ্যে কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত তারা পরামর্শ ছাড়া খাবেন না। পরামর্শের জন্য - শিবানন্দ যোগাশ্রম, ৪৭১ নেতাজি কলোনি, কলকাতা ৯০, দূরভাষ ৫৫৭ ১১১৭; গ. জলযোগ - সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে চার গ্লাস জল খাবেন, সামান্য পায়চারি করে নাভির চারপাশে হালকা চাপে হাত বোলান, পঁয়তাল্লিশ মিনিট মত কিছু খাবেন না, মুখও ধোবেন না, মুখের মধ্যে সারা রাত ধরে জমা বন্ধুজীবাণুরা জলের হাত ধরে এখন আপনার অঙ্গে পৌঁছে গেছে ও হিতকর কাজ করছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর দাঁতমুখ ধোন চা জলখাবার খান। পরামর্শের জন্য - রামকৃষ্ণ মিশন, লাক্ষা, ২২১ ০১০।

এরা হলো সহজতম পথ। খালি হাতে ব্যায়াম এমনি সহজ পথ। একটু খরচের পথ হলো - ১. নিয়মিত (সাধারণত সপ্তাহে চারপাঁচ দিন) এক চামচ মধু ও ছ'আটটি ধানকুনি পাতা চিবিয়ে খাবেন। ২. একেক ঋতুতে হরতুকি গুঁড়োর সঙ্গে একেকটি দ্রব্য যথা - গরমে আখের গুড়, বাদলে সৈন্ধব নুন, শরতে চিনি, হেমন্তে শূঠ, শীতে পিপুল, বসন্তে মধু - আধ চামচ আধ চামচ করে মিশিয়ে খেতে পারেন। এর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন ব্যায়াম প্রাণায়াম, শিবানন্দ যোগাশ্রমের শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

২। চিন্তাশুদ্ধি - যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় এমনকি অতীব সংকটময় কি উদ্বেজনার কালেও আপনি, অবশ্যই দৃঢ় অভ্যাসের সহায়তায়, আপনার প্রতি আস্থা নিয়ে আসতে পারেন। সহজতম যে পদ্ধতিটি আমরা করতে পারি তা হলো - ক. আপনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, আপনার পছন্দসই যে কোন শব্দ, হতে পারে তা ওম্ হতে পারে আত্মাহ্ হতে পারে সোহম্, অক্ষুটে বারবার উচ্চারণ করতে থাকুন। দুতিন মিনিটের মধ্যে দেখবেন আপনার মনের ঝড়টি যথেষ্ট শান্ত হয়ে এসেছে। যত খারাপ অবস্থার মধ্যেই থাকুন না - দুতিন মিনিটের মধ্যেই দেখা যাবে এই শ্রেয় শব্দোচ্চারণ নিমেষে শান্তি এনে দিচ্ছে। এবার আপনি আপনার ভাবনাকে লক্ষ করুন, সে কি ভাবছে। ভাবনাটিকে চলতে দিন কিন্তু আপনি ভাবনাটিকে চোখে চোখে রাখুন, দেখবেন ভাবনাটি, যা সচরাচর দুর্ভাবনাই হয়, আপনার সচেতন অনুসরণের কাছে বশ স্বীকার করছে, সে আর এগোতে পারছে না। খ. এবার আপনি আপনার লক্ষ্য নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে ভাবতে থাকুন। একটা ব্যাপার এসময় আপনি নিজের কাছে পরিষ্কার করে নেবেন যে, যে কোন দুর্ভাবনা, সে আপনার কি আপনার নিকটাত্মীর কোন কঠিন অসুখ হোক, অথবা আপনি কোন

দুষ্টিচক্রের খপ্পরে পড়েছেন যা জানাজানি হলে লোকের চোখে আপনি হয়ে হয়ে যাবেন ইত্যাদি - এইসবই তো ঘটে, তো সুষ্ঠুভাবে ভেবে নিন, এসবের পরিণতি কী ? ব্যাধির পরিণতি মৃত্যু, দুষ্টিচক্রের খপ্পরে পড়েছেন, পরিণাম সম্মানহানি, তারও একটা শুভ সমাপ্তি হলো মৃত্যু। যতক্ষণ পারবেন সততার সঙ্গে সত্যের কথা বলবেন, যখন পারবেন না সম্মানের সঙ্গে মৃত্যু ডেকে নিন। তাহলে, যে কোন দুর্ভাবনার পরিণতি মৃত্যুই যদি হয়, তাহলে দুর্ভাবনা কেন, মনে মনে ভাবুন যতক্ষণ বাঁচছেন সততার সঙ্গে সত্যশুভসুন্দরের কথা বলুন, এই ভাবনাটি নিজে থেকে বুঝিয়ে দিন। এইবার -

- আপনি আপনার লক্ষ্য - নিজের মধ্যে থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া - এই নিয়ে ভাবুন, দেখবেন লক্ষ্যটি নিমেষে আপনার ভাবনায় বসে গেছে, তখন আপনি

- সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য যে কাজটা করা যায়, যে কাজটা আপনি করতে পারেন, সেটি করতে থাকুন।

একাধিক নয়, একটা কাজ নিন ও সেটা সারুন, দেখবেন সেই কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কাজ এনে রেখেছে - এবার তা সারার কথা ভাবুন। চিন্তাশক্তি ও আত্মশক্তি অর্জনের এই হলো সহজতম পথ। এর জন্য কোন আশ্রমমিশনে যাবার দরকার নেই। যদি এ সম্বন্ধে বেশি কিছু জানতে চান তাহলে বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র বা বিনোবা ভাবে বা শ্রীঅরবিন্দ রচনাসমগ্র থেকে ধ্যানপ্রাণায়াম সংক্রান্ত লেখা পড়তে পারেন।

৩। খাদ্যবিধি - ভারতীয় খাদ্যবিধিতে মাছমাংসডিম ইত্যাদি খাবারে বিধিনিষেধ রয়েছে, যদিও লোকনায়কেরা শূয়োরগরুর মাংস কি মদ কি প্রভৃত নারীসংসর্গ কোনটাই বাদ দেন নি, যা রামায়ণ মহাভারত পাঠ করলেই বুঝি। ব্যাপারটা এই যে, মাছমাংসডিম যখন বহু বছর ধরে চলছে তখন না চলার যুক্তি তেমন নেই। আমরা বলছি সাধারণ সজ্জিপাতি নিয়ে সহজ কিছু খাবার আছে যা খেলে পুষ্টির সব উপাদানই প্রায় আপনি পেয়ে যাবেন, সেটা খান, এরপর সামর্থ্যসাধ্যমত আপনি বিলাসী খাবার খেতেই পারেন। মাছমাংস না খেলে যে আপনি প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাচ্ছেন না তা নয়। আমরা তিনটে খাবারের কথা বলব। এক, একটি স্বাস্থ্যপানীয় - যে কোন গুঁড়ো খাবারের চেয়ে এর পুষ্টিমূল্য কম তো নয়ই বরং বেশি। নির্দিষ্ট মাপের ছোলা বা যব সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন জল থেকে তুলে পরিষ্কার কাপড়ে তাদের ছড়িয়ে দিয়ে ছায়াতে রেখে দিন। একদু দিনের মধ্যেই যবছোলা থেকে ছোট ছোট অঙ্কুর বের হতে শুরু করবে। তিন চার দিন রাখার পর অঙ্কুরগুলো এক থেকে দেড় ইঞ্চি বড় হলে পর এই অঙ্কুরিত ছোলা যবকে শুকিয়ে নিয়ে তাদের বাটলে যে গুঁড়ো হবে সেটি রেখে দেয়া যাবে বেশ কিছুদিন। এই মশ্ট জলে ফুটিয়ে বা জ্বাল দিয়ে স্বাদু মিষ্টি পুষ্টিকর পানীয় তৈরি করা যাবে। দুই, কাঁচাছোলার কল অর্থাৎ শিকড় বার করুন। শিকড় আসা মানে মূল্যবান মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, ভিটামিন মিনারেল, চলে এল। এই শিকড়তোলা ছোলা এবং খোসাসহ আলু সেদ্ধ করুন - আলুর খোসা ছাড়ান, টুকরোটুকরো করুন, ছোলার সঙ্গে বিট নুন বা সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে খান।

যে পয়সা দিয়ে আমার রিজার্ভালক বন্ধুরা কি এবাড়িসেবাড়ি কাজ করতে থাকা মায়েরা চাবিস্কুট কিনে খান তার চেয়ে কম পয়সায় এই অসাধারণ পুষ্টিকর খাবারটি সহজে পাওয়া যায়। তিন, এটা একটা খিচুড়ির ফর্মুলা - ক, আপনি চাল নিতে পারেন, চালের বদলে যে কোন মিলেট জাতীয় খাবার যেমন গম জোয়ার ভুট্টা রাগি বাজরা - যা মন চায় তাই নিন। খ, যে পরিমাণ চাল বা গম নেবেন তার এক তৃতীয়াংশ বা একটু বেশি ডাল নেবেন। সাধ্যমত মেশানো ডাল নিন, যতটা সাধ্য। গ, এবার যোগ করুন চালের দ্বিগুণ মাত্রার সহজলভ্য সজ্জি - যে ঋতুতে যে সজ্জি বেশি ওঠে তাই দিন, অসময়ের 'ফুলকপি' না হলেই বরং ভাল। এতে যা আপনি দেবেনই তা হলো; এক, নারকেল (ভারতীয় খাদ্যবিধিতে নারকেল অতিপ্রয়োজনীয় খাবার, যেকোন পুজোপার্বণে তাই প্রতীকী রূপে ডাব রাখার রেওয়াজ), নারকেল কুড়ে দিলে বাড়তি করে তেল দিতে লাগবে না; দুই, সময়ের শাক, তিনটে শাকের একটা, যেটি সেই সময়ে সহজে জন্মায়, তারা হলো কলমি পালং বা নটে; হয় কলমি নয় পালং নাহলে নটে আপনাকে দিতেই হবে। এই মিশ্রণটি - চাল ডাল ও সজ্জির মিশ্রণ আপনি খিচুড়ি করে খেতে পারেন (তাতে রাঁধার সময় লাগে কম ছালানি খরচ কম), আলাদা করে, আপনার পছন্দমত ডাল ভাত সজ্জি রোধে খেতে পারেন। আজকের বাজার মূল্যে একজনের এই খাবারটির খরচ ছ'টাকা। হিসেব করে দেখুন, আপনি একবেলায় ছ'টাকার বেশি খান কি খান না। যদি এর বেশি খান তাহলে কিছুটা টাকা আপনি সঞ্চয় করতে পারছেন যা আপনি নিজে কোন বন্ধুর পরিবারে ব্যয় করতে পারেন - এভাবেই এগোতে হবে।

৪। দৈনন্দিন ব্যবহৃত টোটকা - একেবারে কম খরচে আপনি ঘরোয়া জিনিসপত্র দিয়ে মাজন, সাবান, মাথা-গায়ে মাখার তেল, পেট খারাপ কি পুড়ে যাওয়া কি কাটাছেঁড়া কি ব্যাথাবেদনার টোটকা করে নিতে পারেন। পারেন অতি প্রয়োজনীয় ছ'সাতটি লতানেভেষজ গাছের চাষ করতে, মাত্র দুতিনটে টবই যথেষ্ট - বাসক থানকুনি কালমেঘ তুলসি শিউলি দুর্বা ইত্যাদি। এরাই আপনার কাছে ভোগ্যপণ্য হয়ে আসছে, এদের প্রয়োজনীয় অংশটা কিন্তু কম খরচেই ঘরে রাখা যায়।

৫। চাষাবাদ - ইতিমধ্যে কাজ করে সুফল পেয়েছেন অনেক প্রতিষ্ঠান। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন - সার্ভিস সেন্টার, ৫৮ এ ধর্মতলা লেন, বাসপুকুর, কলকাতা ৪২, দূরভাষ ৪৪২ ৭৩১১। মুম্বাইয়ের আর টি দোশি বাড়ির ছাদে পলিথিন পাত্রে যাবতীয় ফসল ফলাচ্ছেন। গ্রামের বন্ধুরা অবশ্যই এই পরীক্ষায় সামিল হবেন, শহরের বন্ধুরা যাদের জমিজায়গা নেই তারা চাষাবাদ বাদ রেখে প্রথম চারটি কাজ এখনই শুরু করে দিতে পারেন।

২

আমরা সহজে সমষ্টির পথ নিতে পারি না। নিজেকে উপযুক্ত করে তোলার একটা অভ্যাস রয়েছে, সামষ্টিক শোরে গোল মেলানো সহজ কিন্তু প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নিয়ে সামষ্টিক

আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে নিজেকে উপযুক্ত স্তরে আনতে হয়, এমন একটা পর্যায়ে আসতে হয় যেখানে সামূহিকতার পদক্ষেপ আর আপনার ব্যক্তিত্ব একযোগে মেলে - এটি হতে গেলে নিজ লক্ষ্যের সঙ্গে নিজেকে কর্মমেননে একীভূত করার চেষ্টা রাখতে হয়। তার কথাই এতক্ষণ বলা হলো।

এই ব্যক্তিক পর্বেও আরো কিছু কাজ রয়েছে, যা আমি আমার পরিবারে আপনি আপনার পরিবারে করতে পারেন। যা ফল পেলে তার কথা বলতে পারেন।

এভাবে ভাবব যে, আমি ভাল থাকব যদি আমার দেহমন ভাল থাকে। এটি হলো ব্যক্তিক স্তরে ভাল থাকা। এর সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে পরিবারের ভাল থাকা। পরিবারের বয়স্কজনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক থাকতে হবে, স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ভাল সম্পর্ক থাকতে হবে, সন্তানদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক থাকতে হবে। এই তিন স্তরে ভাল সম্পর্ক রাখতে হলে বেশ কিছু অভ্যাস বেশ কিছু দৃঢ়তা দরকার। আপনি আপনার মত করে ভেবে দেখতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটি সামাজিক সমস্যার কথা বলি যা ব্যক্তিক স্তর থেকে উঠে আসছে। নারী নির্যাতন, স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রী, মেয়েমানুষের ব্যবসা এবং বাপেখেদানোমেয়েতাড়ানো বাচ্চা নিচতলার কুৎসিততম ব্যাধি। এই অসুখ থেকে প্রতিকার কী ? আমরা একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি যে, মেয়েদের শুধু যৌনশিক্ষায় নয় যৌন আনন্দ পাবার বিষয়টিতে শিক্ষিত ও দক্ষ হতে হবে। সে তার স্বামীকে শুদ্ধ সাহচর্য যেমন দেবে তেমনি যৌনতৃপ্তিও দেবে। যেহেতু সেই নির্যাতিতা হয় (তুলনায় নির্যাতিত পুরুষ নিচতলায় কম) তাই এই কাজ তার দিক থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে সারতে হবে। সে তার স্বামীকে যৌনতৃপ্তি দেবে এবং দুয়ের বেশি বাচ্চা হবার আগে পরিবারকে বাঁচানোর লক্ষ্যে নিজেকে লাইগেট করে নেবে। মূল যে সমস্যা, নারী নির্যাতন ও শিশুদের বাধ্য অসামাজিকীকরণ এটা নির্মূল করতে হলে প্রথমে চাই যৌন-আনন্দ দেবার দক্ষতা অর্জন, অতঃপর জন্মনিয়ন্ত্রণ, এবং অবশ্যই শান্ত ব্যক্তিত্ব (যা অভ্যাসের ব্যাপার)।

পরিবারের ভাল থাকার সঙ্গে এবার জড়িয়ে যাচ্ছে সমাজের ভাল থাকার বিষয়। কিছু কিছু দায়িত্ব আমাদের নিতেই হবে (চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এই দেশকে মোদ্রামোহান্তের নরকে নামানো হচ্ছে), মৃত্যুভয় থেকে যদি মুক্ত হই তাহলে নিঃসংকোচে সমাজের অপরাপার মানুষের প্রতি কিছু কিছু সদ্যবহার করতেই পারি। কি দায়িত্ব কিভাবে করব - তা নিয়ে আপনি আপনার মত ভাবুন পথ নির্বাচন করুন। রিক্সাচালক তাঁর সওয়ারীকে জলবাতাসা দেন, অসুস্থের প্রয়োজনে রক্ত দেন (সেই রিক্সাচালক বন্ধুর নাম নিতাই বর্সাক, ধাত্রীগ্রামে তাঁর বাস)। এমন বন্ধু আছেন যিনি প্রতি মাসে সংসার খরচের পনেরো শতাংশ আর্তের সেবায় ব্যয় করেন। সাহসের সঙ্গে সততার সঙ্গে যিনি যতটা দিতে পারেন ততটা দেবেন, নিঃস্বার্থে দেবেন, এটা দিতে হবে এবং দেনও অনেকে। সর্বোপরি, সব ধরনের ভাল থাকা নিশ্চিত করছে যে শক্তি (টাকা হলো এই সাম্রাজ্যের শক্তি, স্বনির্ভর সমাজের শক্তি হলো মা-প্রকৃতি ও মানুষের বুদ্ধি) সেটি যোগান দিচ্ছেন

যিনি সেই প্রকৃতিকে চিরনবীন চিরসতেজ করার কিছু যজ্ঞ আমাদের করতেই হবে। জলহাওয়ামাটিরোদ - কিভাবে তাদের পুনঃপুনঃ তেজোদীপ্ত করা যায়, প্রকৃতির অপরাপর প্রাণীকুলের বাসযোগ্য পরিবেশ কিভাবে আনা যায় - তার জন্য নিজ ঘর থেকেই, ঘরে থেকেও, যজ্ঞ করা যায় এবং করা দরকার। যে কাজ সবচেয়ে সহজে আজই করা যায় তা হলো, আমার ঘরে বারান্দায় উঠানে আমি গাছ পুততে পারি, ফুল ও ফলের গাছ, যাকে কেন্দ্র করে পাখিপ্রজাপতি বাঁচে ও পৃথিবীকে সুন্দর করার কাজে নামে (এসব পরীক্ষায় আমরা সফলও হয়েছি)। এই একেক ঘরের যজ্ঞ যখন দুনিয়াজুড়ে ঘটতে থাকবে, সব ঘরে, (স্বপ্ন দেখব এবং জোরের সঙ্গে বলব) - সেদিনই এই স্বনির্ভরতার বিপ্লব গুণগত মানে উত্তীর্ণ হবে। আপনি প্রকৃতিকে নবনবীন করার কাজটি কিভাবে করতে পারবেন ভাবুন।

৩

শেষ করব। পয়বর্তী প্রবন্ধে যাবার আগে, সামাজিক উদ্যোগ নেবার পথে (যারা সমাজসংগঠক তাদের কাজ অনুসরণ করে শিখেছি) কয়েকটি লক্ষ্য আর কয়েকটি বাধার কথা বলব। বাধাগুলো মূলত - ১. যাদের টাকা আছে এবং মন আছে, তারা টাকা যদিবা দেন, সময় দিতে চান না; ২. নিঃস্বমানুষ, যাদের উন্নতি নিজেদের শ্রমেই করতে হবে, তারা আলস্যাত্যমসিকতায় আচ্ছন্ন; ৩. দুষ্টচক্রের সবসময়েই একটা দৃশ্য অথবা অদৃশ্য বাধা থাকবে। লক্ষ্য থাকবে - ১. ওপর থেকে নিচ নেটওয়ার্ক স্থাপনা, যার যতটা সম্ভব, নাহলে দুষ্টচক্রের বাধা ঠেকানো যায় না। প্রয়োজনে ইন্টারনেটকে কাজে লাগানো দরকার; ২. মাইক্রোক্রেডিট ব্যাঙ্ক অথবা সমধর্মী কোন প্রতিষ্ঠানের প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করা; ৩. একটা শিক্ষামূলক, হাতেকলমে কাজ করার প্রতিষ্ঠান গড়া যেখানে আগ্রহীদের শেখানো আর নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা থাকবে; ৪. টাকা এবং শ্রমদানের প্রশ্ন তো থাকছেই। সেটা মেটাবার একটি সহজ অঙ্ক হলো, যাদের আছে এমন দশ জন দশ হাজার টাকা রাখলে এক লাখ টাকা হয় এবং দশ জন যদি দুদিন করে শ্রম দেয় তাহলে কুড়ি দিনের কাজ উঠে যায়। অনেকেই আছেন যারা কোন ফান্ডিং এজেন্সির থেকে টাকা নিতে চান না বা জ্ঞানেন না টাকাটা কিভাবে চাওয়া যায় কি নিজের আদর্শমত তা ব্যবহার করা যায় - সেক্ষেত্রে বন্ধুদের মধ্যে দিয়ে এভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। আমরা একাঙ্কও সাফল্যের সঙ্গে হতে দেখেছি।

এইসব পরীক্ষা-ভাবনা হলো স্বনির্ভরতার কর্মপদ্ধতি। যা এক এক করে শুরু করা যায়, বলা যায়, ভাবা যায়। পরের আরো অনেক কাজ রয়েছে। প্রকৃতির বিজ্ঞান তদনুযায়ী প্রাকৃতিক প্রযুক্তি নিয়ে ভাবাশিক্ষা ও এক ধরনের পাঠশালা স্থাপন করা একটা জরুরি কাজ (অআকখ কি কমপিউটারক্যালকুলাস শিখিয়ে শিক্ষিত বেকার বানানো কোন কাজ

নয় তা জোরের সঙ্গে বলব) - এই ধরনের পাঠশালা, ক্যাশ ইকোনমিতে বাঁধা না পড়ে, ছড়িয়ে দিতে হবে। কি হবে সেই পাঠশালার অধীত বিষয় তা ভাবার এবং কাজ করতে করতেই এই ভাবনা রূপ নেবে। দুই, ক্যাশ ইকোনমির যে 'ভালো' দিক এখনো (ইউনিট ট্রাস্ট স্ক্যাম যেকোন সময়েই ঘটতে পারে - গণহত্যা ঘটতেও তো টাকা লাগবে, সে টাকা আসবে কোথা থেকে?) রয়েছে তার ফল কিভাবে সবার ঘরে পৌঁছে দেয়া যায় তা ভাবা দরকার (যথা মেডিক্যাল অ্যাক্সিডেন্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স প্রভৃতি - কিছু এন জি ও তাদের কর্মীদের এইসব কভারেজে এনেছেন)। রাষ্ট্রের নৈতিক অবয়বের মধ্যেই তো কালোদুর্নীতি লুকিয়ে আছে, তার হদিশ পেলে রাষ্ট্রকে সতর্ক করা - এটা একটা অবশ্য কর্তব্য। এখনি যা করতে পারেন তা হলো, চিঠি দিয়ে রাষ্ট্রনেতৃত্বকে দুর্নীতির দিক সম্বন্ধে বলতে পারেন, কি করা উচিত জানাতে পারেন, আপনি কি করতে পারেন তাও। তিন, বিজ্ঞানপ্রযুক্তির বহু সুফল আমরা অহরহ ভোগ করে থাকি - তাদের সবার কাছে কিভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যাবে সে নিয়ে ভাবা দরকার (পুণত্রত এমন ধারায় কাজ করে যাচ্ছেন)। চার, প্রধান শক্তি হলেন প্রকৃতি, তাঁর জলমাটিহাওয়াবোদকে কিভাবে চিরসতেজ করা যাবে এই বিজ্ঞানভাবনাটি বিশেষ জরুরি।

দুটি কর্ম-পদ্ধতি

শ্রয়ণ প্রতিবেদন

আমরা দুটো খসড়া পেশ করছি। এই দুটো নিয়ে শ্রয়ণের বন্ধুরা বিভিন্ন জায়গায় কাজ পরীক্ষা শুরু করেছেন। কিছু তর্ক কিছু অন্য অন্য প্রস্তাবও আসছে।

প্রথমটি তাদের জন্য যাদের কিছু আছে, যারা একটু ভাল কি মাঝারি মাপেরই চাকরিবাকরি করেন বা ব্যবসাপাতি করেন। অন্তর্গত দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষগুলোর থেকে যে ভাল আছেন সেটা মনে মনে মানেন। সমাজের অ্যাফ্লুয়েন্ট শ্রেণীতে এই সংখ্যাটি বেশি। আমরা যারা এখন শ্রয়ণ পড়ছি তারা এই দলেরই। দুবেলা ভাল খাই ভালভাবেই থাকি। কখনোসখনো দারিদ্র্য অনাহার হিংসা হানাহানি মৃত্যু দেখে বিচলিত হই - কিছু একটা করতে পারলে বেশ হয় এমন ভাবি কিন্তু এক ধাপে তো সামাজিক সংগঠনে যোগ দেয়া কি নিজের সত্যতা ও সত্যতা নিয়ে কাজ করা যায় না - তাছাড়া, ব্যক্তিক ধাঁচে যে একক একটি পরিবারে থেকেও উদ্যোগ নিয়ে শুভ সমাজের জন্য কাজ করা যায় তা অজানা থাকার কারণে নিশ্চুপ হয়ে যাই। এই আমাদের জন্য শ্রয়ণের একটি মডেল-কর্মধারা তৈরি হয়েছে। সেটি নিম্নরূপ -

প্রথম কাজ - আপনি ও আপনার পরিবার শ্রয়ণ প্রস্তাবিত দেহচিন্তাশুদ্ধি অনুসারে ভাল থাকুন - নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, সারাদিনে কোন কাজটা আপনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থে সমাজপ্রকৃতিকে দিতে পেরেছেন বা দিতে পারেন বলে পরিকল্পনা করেছেন। এটাই প্রথম কাজ।

দ্বিতীয় কাজ - শ্রয়ণ প্রস্তাবিত খাদ্যবিধি একবেলা অনুসরণ করলে আপনার পরিবার (ধরে নিচ্ছি চারপাঁচ জন নিয়ে আপনার পরিবার - তাহলে জন পিছু ২৫০ টাকা বাঁচবেই) নয় নয় করে এক হাজার টাকা বাঁচাতে পারেন। এছাড়া সাবান, দাঁতের মাজন, শ্যাম্পু, টুকটাক ওয়ুধ - এগুলো প্রায় বিনি খরচে তৈরি করতে পারছেন বলে সেখান থেকেও কিছু টাকা বাঁচছে। অন্তত এক হাজার টাকা তো বাঁচাচ্ছেনই। এইভাবে টাকাটি বাঁচানো, যার সঙ্গে আদর্শবোধ কৃচ্ছসাধন দায়বদ্ধতা সম্পৃক্ত, আপনার দ্বিতীয় কাজ। এটি আপনার জেদ আনবে, সংকল্পে স্থির করবে আপনাকে।

তৃতীয় কাজ - এই টাকাটি এবার আপনি সমাজপ্রকৃতি কল্যাণের স্থির লক্ষ্যে নিয়োজিত

করবেন। আগেও বলেছি, অভাবী মানুষ আপনার ঘরেই ঝাঁটপোছ করতে এসেছে (গাঙ্গি কি এদেরই বলতেন দরিদ্র-নারায়ণ?) তার ও পরিবারের উন্নতি করা যেতেই পারে। জনযুদ্ধ সন্দেহে কেউ আতঙ্কিত হয়ে রাতবিরেতে আপনার বাড়ি তালাস করবে না, আতঙ্কিত আপনিও হবেন না, অথচ একটি নিঃশব্দী স্থৈর্যশীল বিপ্লব আপনার বাড়ি থেকেই শুরু হয়ে গেল। কাজের ধারা নিয়ে এবার প্রশ্ন উঠবে -

ক. ঐ বাড়তি এক হাজার টাকা দিয়ে তাদের পরিবারে একবেলা পুষ্টিকর খিচুড়ি খাওয়ানো যেতে পারে। যাই করুন, কাজ করিয়েই আপনি দিচ্ছেন এই ভাবটি পরিষ্কার করে রাখবেন, ঐ মানুষেরাও বুঝুক দান মানুষকে না-দাম করে দেয়, তাই খেটে খাওয়াই মহৎ উপায় - এটা মনে আনা দরকার।

খ. তাদের ১০ ফুট গুণ ৩০ ফুট মাপের দুটো (অর্থাৎ ৬০০ স্কোয়ার ফুট) পলিথিন বেডে (নাহলে টবে) সজ্জি বাগান করতে উৎসাহ দিন, সামান্য যে টাকা এতে লাগবে তা দিন, আপনার বাড়িতে তাকে মজুরি দিচ্ছেন এমন ভাবেই চাষ করাতে পারেন, স্পষ্টই বলবেন, ফসল যা হবে সবটাই তার।

গ. সপ্তাহে একদিন রামায়ণ মহাভারত পাঠ করুন। মহাকাব্য মানুষকে উত্থালপাখাল করে। আপনিও তাকে চিনবেন; সেও আপনাকে চিনবে। বাঁচার স্বপ্ন দেখবে। শুরু করা যায় হেমচন্দ্রের রামায়ণ বা কুন্ডিবাসী রামায়ণ আর রাজশেখর বসুর মহাভারত দিয়ে।

ঘ. দেহশুদ্ধির কথা বলুন, করতে উৎসাহ দিন। চিত্তশুদ্ধির কথা বলুন, পালন করতে উৎসাহ দিন। কিছু টোটকা অব্যর্থ (আমরা তাদের নিয়ে পরীক্ষা করে সুফল পেয়েছি) - তাদের প্রস্তুতি ও প্রয়োগবিধি জানান।

ঙ. তাদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করুন। শ্রয়ণের বিবেচনায় শিক্ষার সংজ্ঞা ও ধারা অন্যরকম, যা পরের মডেলে দেয়া আছে। সেই অনুসারে তাদের ঘরে শিক্ষা ছড়িয়ে দিন।

চ. যে উদ্যোগই নিন, পারিবারিক ভাবে নেবার চেষ্টা করবেন (রামকৃষ্ণ বিদ্যারূপিনী না অবিদ্যারূপিনী - এভাবে স্ত্রীজাতিতে বিচার করতেন, আসলে বিষয়টা বোধকরি পুরুষের বোধশক্তির ওপর নির্ভরশীল), আপনার সন্তান জানবে শুভ পৃথিবীর সংজ্ঞা ঘর থেকে পাওয়া যায়।

আপনার শুধু নিজেই বারবার এই প্রশ্নটাই করা দরকার - যা রবীন্দ্রনাথ বলতেন, যেখানে যাচ্ছ একটা শান্তিনিকেতন গড়ো, গড়ার চেষ্টা করো। আমি কি কবতে পারলাম? আপনার উপনিষদের ঐ বাণীটিই যথেষ্ট - সুখ কি দুঃখ, চেয়ে পাই কি না-চেয়ে পাই, যাই পাই, অপরাজেয় মনে তাকে শিক্ষণীয় বলে মানব, শিখতে চাইব, ঐটাই আনন্দ।

১. কিসের দ্বিধা আপনার? কিসের জড়তা? ঝেড়ে ফেলুন সেসব।

২

দ্বিতীয় যে মডেলটি পেশ করছি সেটি তাদের জন্য যারা সমাজমনস্ক সক্রিয় ব্যক্তি। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা তাদের যথেষ্ট ও সমাজের জন্য কিছু করতে পারাকে যারা অন্তরের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। নানাভাবেই তারা কাজ করে যাচ্ছেন, নানাদিক দিয়েই তারা কাজ করে যাচ্ছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ তো করছেনই, সাহিত্য সংগীত নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মানবিক নান্দনিক বিষয়ে কাজ করছেন। এই বিশ্বকে সুন্দর শুভ করে তোলার জন্যে তাদের উদ্যোগ শিক্ষণীয় তবু আমি একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলব, তা হলো শিক্ষা নিয়ে। আপামর মানুষের আজ সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া দরকার যাতে সে, পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও, হাত-পা-মাথা সম্বল করে বাঁচতে পারে, প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সহমর্মিতার আনুকূল্যে আনার সাহস দেখাতে পারে। এই শিক্ষায় মানুষজনকে - দরিদ্রেরা তো বটেই, সব মানুষেরই - এই শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দীক্ষিত (যাতে আমি শিক্ষিত হবার পর আরেকজনকে জ্ঞানের এই আলো দিতে পারি - এটাই দীক্ষা) হওয়া দরকার। মৌল কর্তব্য এই। যিনি গায়ক, যিনি নাট্যকার, যিনি কবি শিল্পী - সবার, সবার কাছে এই কাজটি, নিজ নিজ চৌহদ্দিতে এমন পাঠশালা বসানো, আজ প্রথম কাজ। যারা অ্যাঙ্টিভিস্ট তারা তো পারবেনই, যারা শ্রয়ণের প্রথম মডেলের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছেন তারাও, ঘরে বসেই, এই পাঠশালা চালু করে দিতে পারেন। শ্রয়ণের বন্ধুরা এই পাঠক্রম নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। পাঠ্যবিষয়ের সংক্ষিপ্তরূপ দেয়া হচ্ছে - প্রকৃতি নির্ভর শুভ সমাজ সৃষ্টিকর শিক্ষাক্রম - এভাবে বলা যায় এই পড়াশেখাকে।

৩

প্রথম পাঠ ॥ শিক্ষা

শিক্ষা কি

সুস্থ দেহ শুদ্ধ মন নিয়ে সবাইয়ের সঙ্গে বাঁচার চেষ্টা করা যাতে প্রতিকূল পরিস্থিতি এলেও হাত-পা-মাথা খাটিয়ে মা-প্রকৃতির দেয়া বিষয় নিয়ে কাজ করা যায় - এইটে শিখতে পারা দরকার। এটাই প্রথম লক্ষ্য। দ্বিতীয় লক্ষ্য হবে, প্রশ্ন করতে শেখা - যা শিখলাম তার থেকে আরো আরো শেখার উপাদান তো আছে, প্রশ্ন করতে করতে তাদের বার করে আনা।

সেই শিক্ষার ভিত্তিতে পাঠক্রম

তিনটে শব্দের ওপর জোর দিয়েছিলাম - সুস্থ দেহ, শুদ্ধ মন আর সবার সঙ্গে বাঁচা, যাকে খুব ভাল বাংলায় বলতে পারি - সামূহিকতা। প্রথমে এই তিনটে বিষয়ের ওপর শেখা শুরু করব। জানতে চাইব - তারা কি, কিভাবে তাদের আজ সহজে বজায় রাখা যাবে।

‘ময় পাঠ ১। সুস্থ দেহ

দেহ

‘দেহই সুস্থ যার - রোগব্যাদি নেই; থিদে আছে ও উপযুক্ত খাদ্য আছে; কাজ করার ত আছে; ঘুম আছে ও ঘুমের সময় আছে; দেহের মধ্যকার ময়লা নিয়মিত পরিষ্কার হয়।

গ ব্যা ধি থা কে না ক খ ন

রোগ রোগজীবাণু জলহাওয়া বেয়ে যদি না শরীরে প্রবেশ করে;

শ না হয় করল কিন্তু শরীরের মধ্যকার রোগ-ঠেকাবার-ক্ষমতা যথেষ্ট রয়েছে।

‘ভা বে সে ই অ ব স্থা টা ব জা য় রা খা যা বে

রিষ্কার পরিপাটি থাকা

বিশি খাওয়া নয় কিন্তু পুষ্টির খাবারটি রীধা ও খাওয়া

দহশুদ্ধির জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম করা

কিছু কিছু অব্যর্থ টোটকা আছে তা মজুত রাখা

ই। সন্তোষ, রোগব্যাদি হয়, হতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য চিকিৎসার প্রয়োজন হবে।

রি চ্ছ ন্ন প রি পা টি থা কা

দেহ পরিষ্কার রাখা - ১. প্রত্যেক বার খাবারের আগে হাত সাবান দিয়ে ধোয়া; ২. দা/নুন ও খাবার সোডা/নিম ডাল/ভ্যারান্ডা ডাল দিয়ে/পেয়ারা পাতা বা ডাল দিয়ে ত মাজা; ৩. চোখের যত্ন - এক মুখ জল পুরে চোখে জলের বাপটা দিয়ে ঐ ভিজ়ে ষ বদ্ধ রেখে সকালের রোদ লাগানো; ৪. নিমহলুদ/খোল/মাটি/নুনলেবু দিয়ে গা ায়া; ৫. সকালের রোদে স্নান; ৬. জল - পাঁচ মিনিট পুরো ফুটেছে এমন জল ওয়া/ফিটকিরি এক মিনিট শুলে কপূর মিশিয়ে সেই জল খাওয়া।

রদুয়ার পরিষ্কার রাখা -

কাস্ত দরকারি আসবাব -

ময়লা, ফেলে দেয়া দ্রব্যের ব্যবহার অথবা ঠিকভাবে ফেলা -

ঠিক ঠিক খাবারটি খাওয়া

পুষ্টিকর খাবার বলতে বুঝাব -

১। প্রধান খাবার - যারা শক্তি জোগায়। আমরা যত খাটব তত শক্তির খয় হবে ত' শক্তির দরকার হবে বেশি। প্রধান খাবারেরা এই শক্তি বেশি বেশি করে যোগান দেয় এরা হলো -

শস্যজাতীয় - যথা, চাল, গম, জোয়ার, ভুট্টা, রাগি

ফলজাতীয় - আলু, রাজাআলু, সাবু, পেঁপে, কাঁচকলা, কলা।

২। বেশি প্রোটিনযুক্ত খাবার - তারা যারা শরীর গড়ার জন্যে কাঁচামাল যোগান দেয় ঠিকমত বেড়ে ওঠার জন্যে মাংসপেশী, মাংসের ঘিলু, শরীরের নানা অংশ ঠিকঠিক রাখা জন্য এদের দরকার হয়। এরা হলো -

ডাল, শূঁট জাতীয় খাবার, সয়াবিন, বাদাম জাতীয় খাবার

ঘন সবুজ রঙের শাকসব্জি, বিভিন্ন ধরনের নটে শাক

পশুপাখি থেকে পাওয়া খাবার যথা, দুধ দই ছানা ডিম মাছ মাংস।

৩। বাড়তি শক্তির যুক্ত খাবার - তেল ঘি চর্বি গুড় ইত্যাদিতে অনেকটা শক্তি জমা থাকে হঠাৎ হঠাৎ বেশি শক্তির দরকার হলে আমাদের শরীর চর্বিতে চিনি করে নেয়। তাই করে করে হলেও খাবারে তেল ঘি চর্বি চাই, চাই গুড় মধু, সামর্থ্যমত।

৪। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ খাবার - তারা শরীরকে রক্ষা করে, শক্তি জোগাতে কি দেহ গড়তে খেয়ার মাঝির কাজ করে। সাধারণত যেকোন রঙিন (বাইরের থেকে রং করা নয়, সজ্জির নিজের রঙ যখন রঙিন) ফসলের মধ্যে এরা থাকে। যেমন - নটে পালংকলমি; গাজর কুমড়া টমেটো বেগুন ইত্যাদি; টক ফল যথা, লেবু কামরাজা করমচ আমলকি তেঁতুল আম। এছাড়া মিঠে ফল যেমন সবেদা পেয়ারা আম কাঁঠাল লিচু।

ঠিকমত খাবারের মানে হলো - ওপরের চারটে খাবার মিলিয়েমিশিয়ে যতটুকু খিদে আছে ততটুকু খাওয়া। এই খাবারের কোন একটা বেশি খাওয়া কি কোন একটা না খাওয়া দুইই অর্থহীন এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি না পাবার ব্যাপার। বড়রা এই খাবার দুবার খেলেই যথেষ্ট। বাচ্চারা অল্প অল্প খায় তাই বারে বারে একটু একটু করে খেলে পুষ্টি পায়।

আমরা তিনটে খাবারের কথা বলব, যাদের কম সময়ে কম জ্বালানী ব্যয়ে সহজে রান্না যায়।

- ছোলাযব গুঁড়ো

- আলুছোলা সেদ্ধ ; পেঁপেকাঁচকলা সেদ্ধ ; ছোলারাজমা দিয়ে কচুশাক

- খিচুড়ি।

দর সমক্ষে প্রথম প্রবক্ষে লেখা রয়েছে।

হ শু জি র জ ন্য

- জলযোগ -

- গুলি হাতে ব্যায়াম -

- যোগ ব্যায়াম -

- বমণ প্রাণায়াম -

- নিয়মিত বমন/বস্তু দোতি -

কি ছু অ ব্য র্ধ টো ট কা

- রক্ত শোধনে - খোসাওলা পেঁপেঁকাঁচকলার কোল; কুলেখাড়া; ডুমুর

- কিডনির সক্ষমতায় - পুনর্নবা শাক বা পুনি শাক

- যকৃত সুরক্ষায় - কালমেঘ

- হৃদযন্ত্রে - পান পাতা, আদা, রসুন তিনটির খেঁতো করা রস (এক চামচ) মধু দিয়ে ১-

২ বার খাওয়া

- পেটের সক্রিয়তায় - ত্রিফলা; গাঁদাল; থানকুনি

- ঋতু হরতুকির ব্যবহার (ছোটদের নয়)।

বান্ধারা ঋতু পরিবর্তনের আগেপিছের সাত দশ দিন একটা শিউলি পাতা আর দশটা তুলসী পাতা চিবিয়ে খেলে ঋতু পরিবর্তনের সময়কার রোগ থেকে বাঁচতে পারবে। এছাড়া দুচারটে থানকুনি পাতা মধু দিয়ে সপ্তাহে চারপাঁচ দিন খেলে সাধারণত শরীর ভাল থাকে। সাধারণভাবে দেহ সুস্থ রাখার জন্য এই এই শিক্ষা দরকার।

স জি বা গা ন তৈ রি

এক কাঠা জমি থাকলে, ঘরের চারপাশে যেটুকু ফাঁকা জমি থাকে তাতে সজ্জি বাগান তৈরি করলে এবং মিশ্র ধরনের সজ্জি চাষ করলে প্রয়োজনীয় অনেক খাবার ঘরেই ফলানো যাবে, বাজার থেকে কিনতে লাগবে না। এক্ষেত্রে জমি তৈরি ও চাষ করার জন্যে দরকার -

১. মাটি তৈরি (প্রাকৃতিক মতে)

- সার তৈরি (এ)

- জলআলোহাওয়ারোদ খেলানো

- কীটনাশক তৈরি (প্রাকৃতিক মতে)

- কোন সময়ে কোন ধরনের মিশ্র চাষ করা প্রয়োজন।

তৃতীয় পাঠ ॥ চিন্তাশুদ্ধি

চিন্তাশুদ্ধি

তারই মন মলিনতা মুক্ত যার -

- কাজ করতে আগ্রহ ও আনন্দ আছে
- মনের মধ্যে বিরক্তি ঘৃণা হিংসা নেই
- কাজ করছে, সেই কাজকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছে, আরো সহজ আরো ভাল করার কথা ভাবছে।

কি ভাবে মনকে শুদ্ধ করা যাবে

- মনকে বশে আনা - কোন গান গেয়ে বা মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করে
- যে কাজটা করছি তা নিয়ে ভাবা। ধরা যাক পড়াশুনাই করছি - সেটা ভাবা। ভাবা যে, তাতে কি আনন্দ রয়েছে যেটা আমি এর আগে জানতাম না। দুই, যা শিখলাম সেটা তো আরেকজনকে শেখানো যায়, তার সেবায় জানাটা ছড়িয়ে দেয়া যায় - বেশিদূর যাবার দরকার কি, নিজের বাবা-মা-পরিবারে তো এই শিক্ষাটা বলা যায়, সেই চেষ্টা করা যায়। যত তা পারব তত মন ভাল থাকবে। তিন, গতানুগতিক কাজটার মধ্যে যে আনন্দ যে সেবা রয়েছে সেটা তো দিলাম - এ ছাড়াও একটা কাজ করতে পারি। সেটা হচ্ছে, নিজের পাওয়া না-পাওয়াকে গ্রাহ্য না করে সারাদিনে কোন একটা কাজ, যত তুচ্ছই হোক না তা। আমি সমাজপ্রকৃতিকে নিঃস্বার্থে দিতে চেষ্টা করি। যেমন, আমি যদি একটা ফলফুলের গাছ বসাই তার টানে পাখিপ্ৰজাপতির মেলা বসে যাবে - ওরা কেউই আমার উপভোগে লাগছে না কিন্তু আমি সমাজপ্রকৃতির সেবা করতে পারছি। এমনতর অনেক কাজ করা যায়, সেসব কাজ অনেকে করছেনও। আমরা যে কেউ ঘরে বসেই এই কাজ করতে পারি।

চতুর্থ পাঠ ॥ সমাজ শিক্ষা

কে ন এই শিক্ষা

ঘটনাটা এই যে, আমরা সমাজ থেকে সহায়তা পাই তাই আমরা বেঁচে থাকি বড় হ' তাহলে সমাজকে শুদ্ধ রাখাটাও একটা বিশেষ কর্তব্য। সমাজ যদি আমাদের সব দিচ্ ফতুর হয়ে যায় অথবা সমাজ থেকে আমরা সবটা নিয়ে বসি তাহলে পরের ৭ মানুষেরা কি পাবে? সমাজকে সুস্থ রাখা তাই আমাদের কর্তব্য। এমনো হতে পারে এই ব্যাপারটা অথবা এভাবে ভাবটা আমরা ভাবছি আর কেউ ভাবছে না। সেন্

আমার কথা কেউ নাই শুনতে পারে। আমার কর্তব্য তখন হবে - একলা চলা, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে - এই মন্ত্র সঙ্গে করে পথ চলা। আমরা এক এক করে ভাবব - সবার মঙ্গল কামনা কি করা যায় না? কোনদিন কেউ করে নি কি? নাই একাই তাহলেও কি একক কোন উদ্যোগ নেয়া যায় না? ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সত্য ঘটনা গল্পাকারে শেখাতে হবে এই পর্বে।

পঞ্চম পাঠ ॥ প্রকৃতি শিক্ষা

এই শিক্ষার উদ্দেশ্য

সহজ করেই বুঝতে পারি যে, কাজ থাকলে আমি কিছু উপার্জন করতে পারি যা দিয়ে আমি আমার ও সংসারের খাবারদাবার ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ করতে পারি। কিন্তু বাজারে আমার কাজ থাকা কি না-থাকা আমার ওপর নির্ভর করছে না, সেটা বাজার অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। ধরা যাক, আমি একজন রিক্সাচালক। যে রাস্তায় রিক্সা চালাই, হঠাৎ ঠিক হলো যে ঐ রাস্তা দিয়ে দ্রুতগামী বাস চলবে, অন্য কোন যান চলবে না। কিংবা আমি একজন হকার, ফুটপাথে জামাকাপড় বেচি। ঠিক হলো ফুটপাথ সাফা করা হবে। সে অবস্থায় আমি কি করব? কোন জীবিকা নেব? যতদিন না অন্য কোন জীবিকায় যেতে পারছি ততদিন আমার সংসারের পেট চলবে কিসে?

মা - প্রকৃতির দান

মা-প্রকৃতির সহায়তা নিয়ে আমি সজ্জি বাগান করতে পারি। প্রায় নিখরচায় দৈনিক ব্যবহার্য জিনিসপত্র বানিয়ে নিতে পারি। টাকা না থাকলে যে না খেয়ে মারা যাব তা ঠেকাতে পারি যদি মা-প্রকৃতির আশীর্বাদের মর্ম বুঝে কাজে লাগতে পারি। আগেই বলেছি শিক্ষা তাই যা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমাকে কাজ করার সাহস জোগাবে। সাহসটা আসবে জ্ঞান থেকে যে জ্ঞান আসবে আমি প্রকৃতির মন বোঝার শিক্ষা থেকে, যা দিয়ে পথ চলবার সাহস পাব।

কি সেই শিক্ষা

- প্রকৃতির সঙ্গে থাকা

- প্রাকৃতিক প্রাণচক্রকে সজীব রাখা

- জলরোদমাটিহাওয়াকে ব্যবহার করা আর তাদের শুদ্ধভাবে প্রকৃতির কাছে ফিরিয়ে দেয়া। যেমন, ফলফুলের গাছ বসিয়ে পাখিপ্রজাপতি ইত্যাদিদের প্রাণচক্র অটুট রাখা, বৃষ্টির জল ধরা, মাটি অপচয় নয়, গাছ দিয়ে সৌররশ্মি ধরে রাখা, হাওয়ার সুব্যবহার, ইত্যাদি।

গ্রাম ও শহর (বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩-৪) নিয়ে লিখেছেন গোবিন্দচন্দ্র মন্ডল, অরুণ মজুমদার, পান্না-দাসগুপ্ত, অরুণ দাসগুপ্ত, অরুণ মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, অতনুনন্দন মাথ, অভিজিত গুহ, আনন্দরূপ ঘোষ, স্বরাজ সেনগুপ্ত, অতীন্দ্রমোহন গুণ, রণজিৎ চৌধুরী।

ঐতিহ্য আধুনিকতা ও আত্মজাগরণ (বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩-৪) বিষয়ে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতীন্দ্রিয় পাঠক, পথিক বসু, অমূল্যকুমার চক্রবর্তী, সৌরভ ঘোষ, ভৃগু হাঁসদা, থ্যাডিস স্টেইন, রণব্রত সেন, চিত্তরঞ্জন মাহাত, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বতন্ত্র মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ লাল এবং অন্নান দত্ত।

বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ (বর্ষ ৬, সংখ্যা ১-৩) সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, অন্নান দত্ত, অজিত নারায়ণ বসু, অরুণ দাসগুপ্ত, রণজিৎ চৌধুরী, শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শমিত কর, পথিক বসু, অতীন্দ্রিয় পাঠক, অভিজিত গুহ, অমূল্য চক্রবর্তী, সিপ্রা দত্তগুপ্ত, প্রসাদ রঞ্জন রায়, সন্দীপ ঠাকুর, স্নিগ্ধা সেন, অপূর্ব সাহা, অতনুনন্দন মাইতি, অমিতাভ লাহিড়ী, সবিতা গুহ, চিত্তরঞ্জন মাহাত, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শুভিসিতা, চিত্তব্রত পালিত, শামিম আহমেদ, অশোকপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মজুমদার, মৈনাক রায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অনিল সেনগুপ্ত।

নিঃস্বজনের ব্যাক্ত (বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪-৬) নিয়ে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, লিখেছেন ধীরেশ ভট্টাচার্য, মুহাম্মদ ইউনুস, অনিন্দ্য দত্ত, অজিত নারায়ণ বসু, বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌতি ঠাকুর, সুশীল কর, দিলীপ দত্ত, অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা গুহ, অতনুনন্দন মাইতি, জীবন সর্দার, আনন্দমোহন কর, পথিক বসু, মানব সেন, দিলীপ পাল।

বিশ্বায়ন : বিজ্ঞান ও কৌশল (বর্ষ ৭, জানুয়ারি-জুন ২০০২ সংখ্যা) এর ব্যাখ্যায় এসেছে অশোকপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম রায়, অমিতাভ লাহিড়ী, পথিক বসু, অরুণ মজুমদার, দুর্বারা রফিক, বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ ঠাকুর, আনন্দমোহন কর, স্বতন্ত্র মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, অরুণ মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম মন্ডল, সৌরভ ঘোষ, অভিজিৎ গুহ, অজিত নারায়ণ বসু, রণজিৎ চৌধুরী, স্নিগ্ধা সেন, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপা দত্ত, ইরাবতী মিত্র রহমান, শামিম আহমেদ, সবিতা গুহ, নারায়ণ সেন, ক্যাথারিন হেভারসন, মহসীন মখমলবা

শ্রয়ণ : গ্রাহক মূল্য ২ বছর ১৫০ টাকা, ৪ বছর ৩০০ টাকা, শ্রয়ণ যতদিন ২০০০ টাকা, আর্থিক স্বনির্ভরতায় দশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা (চেকে SHRAYANSTHAL নামে পাঠাবেন)

Shrayansthal Vol 7 No 2



July - Dec 2002 Price R

Edited, Published and Owned by Pathik Basu from
Pratirupa, 49B Santoshpur East Road, Calcutta 75 and I
by him at Pragna Prakashani, 8 Narasingha Lane, Calc
Reg No 65916/96